

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি (কলা অনুষদ) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

পার্থ সারথি নাথ

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE0100419

নিবন্ধীকরণের তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Dr. Ananya Baruya, Department of Bengali, Jadavpur University, And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Ananya Baruya.

Countersigned by the Professor
Supervisor: Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Dated: 14.05.25

Partha Sarathi Nath

Candidate:

Dated: 14.05.2025

গবেষণা পদ্ধতি

- ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকাযত রূপ’— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:
- গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুসারে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা একাধিক গ্রন্থাগার ও আন্তর্জালিক আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নাথ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ ও মন্দির থেকে প্রাপ্ত মৌখিক সাহিত্য ব্যবহার করা হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে কথামুখ, ভূমিকা, বিষয়ানুগ ছটি অধ্যায়, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট— এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অত্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫। উদ্ধৃতির দুটি লাইনের মধ্যে ব্যবধান রাখা হয়েছে ১.১৫।
- তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণে Chicago Manual of Style-এর সপ্তদশ সংস্করণ (17th Edition) ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যসূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এন্ডনোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
- সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ও কবিতার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং অন্যান্য গদ্য-উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Block Quotation ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

কথামুখ

‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ’ শীর্ষক গবেষণা পত্রটিতে মূলত অনিসন্ধিৎসু মনের প্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞানচিকীর্ষার নানান বাঁকে ‘নাথ’ উপাধি আশ্রিত সম্প্রদায় ও তাঁদের সাহিত্য আমার অন্তরঙ্গবোধে আবেদন সৃষ্টি করে। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন সূত্রে নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আবিষ্কারে আমাকে অধিকতর উৎসাহিত করে। একপ্রকার অস্তিত্বের সন্ধান ও আত্মবিষ্কারের অদম্য উৎসাহই আমাকে বর্তমান গবেষণা কর্মে ব্রতী হতে প্রাণিত করেছে।

স্বাভাবিকভাবে গবেষণা এখানে তথ্যানুসন্ধানের পাশাপাশি নাথসম্প্রদায়ের আন্তর আবিষ্কারের তাগিদ কাজ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে নাথসম্প্রদায়ের মঠে যাতায়াত, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের কারণে নাথসাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকার জোরালো হতে থাকে, যার চূড়ান্ত পরিণতি গবেষণাকর্মের বিষয় নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়। গত কয়েক বছর (আগস্ট, ২০১৯ থেকে) কাজটি করতে করতে বহু মানুষের সাহায্য পেয়েছি। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

সর্বপ্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়াকে। তাঁর সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষকসুলভ আন্তরিক শাসন এবং দিক-নির্দেশনা আমাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করেছে। আমি কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্করের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—তাঁর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়েছিল গবেষণাপত্রের শিরোনামটি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত

বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবার্চনা সরকার ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখর সমাদ্দারের কাছেও ঋণী। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা করেছেন।

এই গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর গ্রন্থাগার থেকে ভীষণভাবে সাহায্য পেয়েছি। বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করতে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের। তবে গ্রন্থাগারের চেয়েও ক্ষেত্রসমীক্ষা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, নাথসাধুসঙ্গ, স্থিরচিত্র, ই-মেল প্রেরিত তথ্যসমূহ বিশেষ কাজে এসেছে। নাথসন্ন্যাসী যোগী কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ, যোগী অবন্তিকানাথ, যোগী সূর্যোদয়নাথ (পূর্বাশ্রমে রমেশনাথ ভৌমিক), যোগী শনিনাথ, যোগী শিবনাথ, যোগী আনন্দনাথ, যোগী আকাশনাথ, যোগী সুরজনাথ, যোগী ড. বিলাসনাথ প্রমুখ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আসামবঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর পত্রিকা ‘যোগিসংখা’, অসম প্রাদেশিক যোগি-সম্মিলনীর মুখপত্র ‘যুগবাণী’, গোরখপুর গোরক্ষনাথ মন্দিরের মুখপত্র ‘যোগবাণী’, ‘নাথবন্ধু’, ‘নাথপন্থ’, ‘শৈবভারতী’ প্রভৃতি পত্রপত্রিকা বিশেষভাবে কাজে এসেছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অসমের নগাঁও কলেজের বাংলাবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. জীবন নাথ, অসমের গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রফুল্লকুমার নাথ, ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল হালিম প্রামাণিক, চেক প্রজাতন্ত্রের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-দর্শন বিভাগের অধ্যাপক লুবোমীর ওন্দ্রাচকা, আলিপুরদুয়ার

জটেশ্বর লীলাবতী কলেজের অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া, পুথি সংগ্রাহক ড. শ্যামল বেরা, গবেষক অক্ষন বর্মণ, তাপসকুমার নাথ, হিরণ্ময় নাথ প্রমুখ।

পরিবারের মানুষজনের সাহায্য ছাড়া গবেষণাপত্রের কাজ সম্পূর্ণ করা সহজ ছিল না। আমার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সব সময় পাশে থেকে নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজেশ্বর সিনহা, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. পার্থসারথি ভৌমিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. নারায়ণ হালদার, ড. সুদীপ বর্ধন, ড. ঋত্বিক চক্রবর্তীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সহগবেষক বিশ্বজিৎ সরদার, সৃজিতা সান্যাল গবেষণাপত্রটি প্রস্তুতিতে, অক্ষরবিন্যাসে সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন।

সবশেষে এমন একজন মানুষের কথা বলতে হয় যিনি গবেষণা কর্মের বিভিন্ন বইপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি আজ পৃথিবীতে নেই। তিনি হলেন বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ভবনাথ সরকার। তাঁকে প্রণাম জানাই।

আমার সাধ্যমত গবেষণা-পত্রটিকে সার্থক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যতটা ইচ্ছা ছিল ততটা হয়ত পারিনি, কলেবর বেড়ে যাচ্ছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত রয়ে গেল—তার দায় সম্পূর্ণ আমার। আবারও আমার ঋণ স্বীকার করি নাথযোগী সন্ধ্যাসীদের কাছে।

৪৩৩/১ বিধানপল্লী

গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪

পার্থ সারথি নাথ
.....
(পার্থ সারথি নাথ)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথামুখ	i - iii
ভূমিকা	১ - ৯
প্রথম অধ্যায়	১০ - ৮৮
নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	
১. ক. নাথধর্মের উদ্ভব	
১. খ. নাথধর্মের ক্রমবিকাশ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৮৯ - ২৫১
নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন	
২. ক. নাথসম্প্রদায়ের সাধন-বৈশিষ্ট্য	
২. খ. নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক-পরিচয়	
২. গ. নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-জীবন	
তৃতীয় অধ্যায়	২৫২ - ২৯০
সিদ্ধসাহিত্য	
৩. ক. তনের বারমাসি	
৩. খ. মীন-মহুন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ	
চতুর্থ অধ্যায়	২৯১ - ৩১২
যোগীনাটক	
৪. ক. চম্পাহরণ	
পঞ্চম অধ্যায়	৩১৩ - ৫৬৩
নাথসম্প্রদায়ের লোকগান	
৫. ক. যোগীর গান	
৫. খ. যোগীর গান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
৫. গ. গোরক্ষনাথের গান	
৫. ঘ. তিননাথের গান	
ষষ্ঠ অধ্যায়	৫৬৪ - ৬২৫
আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি	

উপসংহার _____ ৬২৬ – ৬৪১

গ্রন্থপঞ্জি _____ ৬৪২ – ৬৬৮

ক. আকর গ্রন্থ
ক.১ বাংলা
ক.২ ইংরেজি

খ. সহায়ক গ্রন্থ
খ.১ বাংলা
খ.২ হিন্দী
খ.৩ ইংরেজি

গ. পত্র-পত্রিকা
গ.১ বাংলা
গ.২ ইংরেজি

ঘ. পুস্তিকা
ঘ.১ বাংলা
ঘ.২ ইংরেজি

পরিশিষ্ট _____ ৬৬৯ – ৬৮৬

পরিশিষ্ট ১: ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্যদাতা

পরিশিষ্ট ২: ছবি

পরিশিষ্ট ৩: ভিডিও লিংক

ভূমিকা

নাথযোগী ও সিদ্ধগণ প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সহ ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে মহিমা এবং প্রভাব অর্জন করে এসেছেন। নব্যভারতীয় আর্থভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি স্বতন্ত্র ধারা নাথসাহিত্য। নাথদেবের মৌলিক ও অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে এই সাহিত্য অনন্যতা লাভ করেছে। গবেষক কল্যাণী মল্লিক, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, সুজনসারথি কর, কমল বিশ্বাস, কুণাল দেবনাথ নাথসম্প্রদায়ের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ, আদিত্যকুমার লালা নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক বিষয় এবং লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় অনালোকিত ও অনালোচিত রয়ে গিয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মজীবন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে। এই কারণে কালে কালে নানা আচার নিষ্ঠার ছোঁয়া পড়েছে। সাধারণ মানুষের চিন্তন-মনন নিয়ন্ত্রিত জীবনের যে ছবি নাথসম্প্রদায়ের আচার-ক্রিয়াতে লক্ষ করা যায়, তার অনুপুঞ্জ পরিচয় খুঁজে বের করা আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য। এখানে নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নাথসম্প্রদায়ের যাপিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি সাহিত্যে নিরূপণ করার প্রয়াস আছে।

নাথপন্থের গবেষক হিসেবে যতটুকু অধ্যয়নে জানতে পেরেছি এখনও পর্যন্ত এই তিনটি গ্রন্থ— ১. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী ২. নাথধর্ম ও সাহিত্য ৩. নাথসাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ গবেষণা গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ ১. সুখময় মুখোপাধ্যায়— বাংলার নাথসাহিত্য ২. বারিদবরণ ঘোষ— নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ৩. আদিত্যকুমার লালা— বাংলার

নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য ৪. রাধাগোবিন্দ নাথ- বঙ্গীয় যোগিজাতি ৫. রাজমোহন নাথ - নাথযোগীতত্ত্ব ৬. ভোলানাথ নাথ- ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয় ৭. এন. সি. নাথ- নূতন আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ৮. ভবনাথ সরকার-নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি রচিত হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মুখপত্র ‘যোগিসংখা’, ‘যোগবাণী’, ‘নাথবন্ধু’, ‘নাথপত্ৰ’, ‘শৈবভারতী’ ইত্যাদি পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নাথধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইগুলি পাঠের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় নাথধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ। কারণ আমাদের মনে হয়েছে এসমস্ত লেখার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নাথধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জীবনশৈলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোথাও নেই। শুধু ধর্ম ও সাধনপ্রণালীতে নয়, জীবনশৈলী ও সাহিত্য ভাবনায় নাথ স্বতন্ত্র পন্থা। তার সামগ্রিক রূপ ও স্বরূপের নিবিড় ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকায়ত রূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নাথধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুসারীদের ভাবচর্চার প্রকৃতি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন, মধ্যযুগের বাংলার নাথসাহিত্যের অনালোকিত বিষয়গুলিকে খুঁজে বের করা শুধু নয়, বর্তমান সময়েও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত ধারাটির স্বরূপ ও মর্মান্বেষণ গবেষণাকর্মের প্রতিপাদ্য।

প্রস্তাবনা অংশে গবেষণার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গবেষণার পরিধি, যৌক্তিকতা, পদ্ধতি, গবেষণার একক (বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক, বিবর্তনমূলক, তুলনামূলক ও ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক), নমুনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে। ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ’ শিরোনামে গবেষণা যাতে যুক্তিবুদ্ধি-গ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সে জন্য গবেষণার সম্ভাব্য পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে—

কথামুখ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১. ক. নাথধর্মের উদ্ভব

১. খ. নাথধর্মের ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক-পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক-জীবন

২. ক. নাথসম্প্রদায়ের সাধন-বৈশিষ্ট্য

২. খ. নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক-পরিচয়

২. গ. নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-জীবন

তৃতীয় অধ্যায়: সিদ্ধসাহিত্য

৩. ক. তনের বারমাসি

৩. খ. মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ

চতুর্থ অধ্যায়: যোগীনাটক

৪. ক. চম্পাহরণ

পঞ্চম অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের লোকগান

৫. ক. যোগীর গান

৫. খ. যোগীর গান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. গ. গোরক্ষনাথের গান

৫. ঘ. তিননাথের গান

ষষ্ঠ অধ্যায়: আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্যদাতা

পরিশিষ্ট ২: ছবি

পরিশিষ্ট ৩: ভিডিও লিংক

প্রথম অধ্যায়ে নাথধর্মের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত রূপটি তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। পুরাণ, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও ইতিহাসের উপাদানের সাহায্যে নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি খোঁজার চেষ্টা করেছি। নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ‘নাথ’ শব্দের উৎপত্তি, ব্যবহার ও অর্থ খোঁজা সম্ভব হয়েছে। নাথধর্মের গ্রন্থে নাথপন্থকে সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যৌগিক রসসিদ্ধ, যোগী সম্প্রদায়, অবধূত সম্প্রদায়, কাপালিক, কৌল ইত্যাদি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অন্যান্য দৃষ্টিকোণ বিশেষত তন্ত্রধারা এবং যোগধারা বিশ্লেষণ করে নাথধর্মের বিশিষ্টতা স্থির করা হয়েছে।

নাথধর্মে শৈব পাশুপতধারা, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, তন্ত্র, কৌলধারা, কালামুখ, লাকুলীশ ধারা ও ভৈরব সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক সম্প্রদায়ও নাথধর্মকে প্রভাবিত করেছে। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ত্র্যম্বক কৌলমতকে অর্ধত্র্যম্বক কৌলমতে পরিণত করেছেন। যোগী গোরক্ষনাথ পুরনো অনেক শৈব সম্প্রদায়কে নাথপন্থে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি পাশুপত শৈবধারার সঙ্গে আগমধারার সমন্বয় সাধন করেছেন। অর্থাৎ সময়ের বিভিন্ন বাঁকে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বিবর্তনের ধারাবাহিক ক্রমপর্যায়ে নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাথসম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী, সামাজিক জীবন ও নাথসংস্কৃতিজনিত বিষয়, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নাথধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিকীকরণ এবং চিত্ত ও আত্মশুদ্ধির কারণে বহু সংস্কার রীতিনীতি ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। সেখানে বেদ, তন্ত্র ও অন্যান্য লোকায়ত জীবনশৈলীর সঙ্গে সামাজিক কারণে নতুন যাপিত জীবনের সংস্কার আরোপ করে নাথসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে সাধনপ্রণালী, রীতিনীতি, সংস্কারের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনকে ব্যাখ্যা করায় সক্রিয় হয়েছি।

‘গোরক্ষবিজয়’, ‘ময়নামতীর গান’, ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ বিষয়ক প্রধান এই তিনগ্রন্থের বাইরে নাথপন্থের অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষত সিদ্ধধারার সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘তনের বারমাসি’ এবং ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থ।

‘তনের বারমাসি’-র মত সিদ্ধধারার গানগুলির মধ্যে জগৎ, প্রকৃতি, আত্মা-পরমাত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ, যোগ, যোগসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ, অনাহত নাদ, সমাধি, অষ্টসিদ্ধি, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় হিসেবে স্বাভাবিক লাভ করেছে। ভাটিয়ালি সুরে সহজ সরল ভাষায় গানগুলি ব্যঞ্জনাবহ এবং কৌতূহলপূর্ণও বটে। মানুষের জীবনকে সার্থক করে তুলতে ‘তনের বারমাসি’-র গান অত্যন্ত সহায়ক সিদ্ধ বলা যায়। ভাষা, বেশভূষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-সমাজ আলাদা রেখেও নাথসাধু ও গৃহস্থরা অভ্রান্ত জীবনের লক্ষ্যে ‘তনের বারমাসি’-র মত গানগুলি রচনা করেছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করেন তন বা তনু বা কায়াসাধনার মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সম্ভব। ‘তনের বারমাসি’-তে পাঁচালি বা ব্রতকথার মত করে

ধর্মীয় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমগ্র ভারতাত্মার আত্মপ্রসাদ স্বরূপ অমরত্বলাভ বা জীবনুজ্জীবাদের তত্ত্বটিই নাথসম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকগীতি ও সাহিত্যের মত এখানেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলিতে আদিবৈদিক যুগ থেকে গণসমাজে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপ্রণালীর সংকেত রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে কায়াসাধনা বিষয়ক এই গানগুলি আজও প্রচলিত আছে, সেই সমাজের লোকেরা এগুলিকে এখনও ধর্মীয় বাণীরূপে সম্মান করে। তার সাহিত্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে বলা যেতে পারে।

‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে নাথপন্থের দর্শন, যৌগিক সাধনপদ্ধতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছি। মৎস্যেন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্ব, লৌকিক ধর্মদর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমকালীন সমাজভাবনা বিষয়ে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থেই দেখি তিনি শিষ্য গোরক্ষনাথকে কায়াযোগ দর্শনের ধারা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর-শৈলীতে যোগসাধনার সমস্যা ও সমাধানের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, শব্দ ব্যবহার এবং কথনশৈলীর নাটকীয়তায় সাহিত্যের দরবারে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ কতটা উপযুক্ত তা বিশ্লেষিত হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকনাটকের ধারায় ‘চম্পাবতী’, ‘বাঘাম্বর পালা’, ‘মোনাই তোলাই’ ইত্যাদি নাটক রচিত হয়েছে। মৌখিক পরম্পরায় নাটকগুলি প্রচলিত ছিল। পালাকার ও কবিরাজ নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে যোগীনাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন। নাথধর্ম, সাধনতত্ত্ব ও জীবনশৈলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার কারণে

লোকজীবনে দীর্ঘদিন এই নাট্যধারা সক্রিয় ছিল। বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে এই লোক-ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। যোগীনাটক বা যুগীনাটক বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে সক্রিয় হয়েছি এই গবেষণায়। দেখা যায় নাটকের কলাকুশলীদের মৃত্যুর কারণে, নতুন দল তৈরি না হওয়ায়, নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে যোগীনাটক প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যেতে বসেছে। বাংলার প্রাচীন লোকনাটক যোগীনাটক বা যুগীনাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গবেষণায় লোকনাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ, মোটিফ, সমাজচিত্র, ধর্ম সমন্বয়ের চিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

নাথযোগীদের ধর্মীয় তত্ত্বমূলক বিভিন্ন গানই যোগীরগান নামে পরিচিত। বিষয়বস্তুর নিরিখে যোগীর গানকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে সংগৃহীত টেক্সট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষত্ব, নাথপন্থের দর্শন ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণে উঠে এসেছে বলা যেতে পারে। যোগীর গান, তিননাথের গান, তিননাথের পাঁচালি, গোরক্ষনাথের মাগনের গান, আকোয়ালি গান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব সংগৃহীত যোগীরগানে নাথধর্মের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে নাথসম্প্রদায়ের কিছু যোগীরগান সংগ্রহ করেছিলেন। এই গানগুলির মধ্যে লোকগীতিকারদের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ খুঁজে বের করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও সাহিত্যকে যোগীরগান কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটাও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে নাথপন্থ ও নাথসংস্কৃতির পরিচয় উদ্ধৃত হতে থাকে। তবে নাথধর্মকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের

আধুনিক ভাষ্য রচনায় লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে। এইভাবে প্রাচীন- মধ্যযুগে নয়, এমনকি আধুনিক যুগে এসেও নাথপন্থকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্য ধরা পড়ল। নাথপন্থকে কেন্দ্র করে এই সময়েও সাহিত্যের নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ চলছে। আহমেদ মাওলার ‘ময়নামতী উপাখ্যান’, মোহিত কামালের ‘লুইপা’র কালসাপ’, শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, রিয়া মুখার্জীর ‘অঘোরী মা ষোড়শীনাথ’, দেবনাথ বকসীর ‘অঘোরীর আনন্দকানন’, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’, কালিকানন্দ অবধূতের ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’, মিরাজুল ইসলামের ‘মুঘল গীবত’, ব্রজেন মজুমদারের ‘সন্ধ্যাদীপের শিখা’, কৃষ্ণ দেবনাথের ‘রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ’, প্রেমময়ী পার্বতী’ প্রভৃতি উপন্যাস ও সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ প্রভৃতি ছোটগল্প এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পূর্ণচন্দ্র’ ইত্যাদি নাটকে নাথপন্থের যোগধর্ম, সাধনপ্রণালী, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসূত্রে নাথপন্থের দর্শন, সাধনা ও সংস্কৃতি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে তুলে ধরাই বিশেষ উদ্দেশ্য।

নাথধর্মের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত রৈখিক বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় উঠে এসেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সংযোগে নাথধর্ম গ্রহণ বর্জন ও রূপান্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। নাথধর্ম শুধু সাধনপদ্ধতি হিসেবে গৃহীত, অপ্রকাশ্য ধর্মমতে পরিণত হয়নি, শিষ্ট ও লোকায়ত সাহিত্য- সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমান জনজীবনেও নাথধর্মের প্রভাব প্রবল। অথচ ভারত এবং বহির্ভারতেও প্রায় সমানভাবে নাথধর্ম ও জীবনশৈলী অনুসৃত হচ্ছে। নাথধর্ম ও সাধনতত্ত্বকে আশ্রয় করে বহু লোকায়ত এবং শিষ্টসাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অর্থাৎ সপ্তম শতকে

যে ধর্মমতের উন্মেষ একবিংশ শতাব্দীতেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সক্রিয়। নাথধর্মের প্রতিটি রূপান্তরের কারণ যেমন গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি এর সাহিত্যরূপের বৈচিত্র্য আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি নাথধর্ম শৈবমত অনুসারে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পন্থ (পাশুপত, সিদ্ধ, রসসিদ্ধ, কৌল, যোগিনী কৌল, ভৈরব, ত্রিকমত, লাকুলীশ, কাপালিক, আগম, অবধূত, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক মত ইত্যাদি) সমন্বিত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সাযুজ্য ও বৈসাদৃশ্য অনেক। কিন্তু নাথধর্ম, সাধনা সমন্বয়ী একে বাঁধা পড়েছে। লোকায়ত ও শিষ্ট এই দুই সাহিত্যধারায় গড়ে উঠেছে নাথসাহিত্য। তবে লোকজীবনের মত ব্যাপ্তি ও গভীরতা শিষ্টসাহিত্যে নেই। শিষ্টসাহিত্যে আছে ধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আর লোকায়ত সাহিত্যে যাপিত জীবনের অনুভবময় আত্মোপলব্ধির প্রকাশ।

প্রথম অধ্যায়

নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১. ক. নাথধর্মের উদ্ভব

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথপন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শৈব-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে নাথযোগী ও সিদ্ধগণের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। নাথপন্থে একদিকে যেমন গৃহত্যাগী সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী যোগসাধনা করতে পারেন তেমনি গৃহস্থ হয়েও যোগধর্মের বিধান অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেও দেহ-মন-চরিত্রের উন্নতি সাধন করেন।^১ এখনও ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, তিব্বত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অগণিত নাথযোগী বসবাস করেন এবং যোগ-চর্চার গৌরব বজায় রেখেছেন। নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় আর্থভাষা সহ অন্য প্রাদেশিক ভাষাতে রচিত হয়েছে। নাথপন্থ বা নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থ ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’-এ ‘নাথ’ শব্দের শব্দগত অর্থ ও দার্শনিক অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়-

‘নাকারো নাদরূপং চ থকারঃ স্থাপ্যতে সদা।

ভুবনত্রয়মেবৈকঃ শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ততে।।’^২

এখানে ‘নাথ’ অনাদিরূপ ও ভুবনত্রয়ের স্থিতির কারণ। ‘না’-র অর্থ অনাদিস্বরূপ এবং ‘থ’-র অর্থ ভুবনত্রয়ের স্থাপিত হওয়া। ‘শক্তিসঙ্গম’ তন্ত্র অনুসারে ‘না’-র তাৎপর্য হল ‘ব্রহ্ম’ বা মোক্ষদানকারী এবং, ‘থ’-র অর্থ অজ্ঞানতাকে যা দূর করে—

‘শ্রীমোক্ষদানদক্ষত্বাত্ নাথ ব্রহ্মানুবোধনাত্।

স্থগিতাজ্ঞান বিভবাত্ শ্রীনাথ ইতি গীয়তে।।’^৩

এই দুই গ্রন্থ অনুসারে নাথতত্ত্ব পরমতত্ত্ব স্বরূপ, তা ভুবনত্রয়ের কারণ, পরমজ্ঞানকারী তথা মোক্ষদানকারী। গোরক্ষনাথের *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ* গ্রন্থ অনুসারে সৃষ্টি- স্থিতি- বিনাশের প্রক্রিয়ায় শক্তি বিশ্বকে সৃজন করে, শিব তাকে পালন করে এবং কালকে সংহার করে নাথ মুক্তিদান করে।

‘নাথ’ শব্দ পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করছে। গোরক্ষনাথ নিজে ‘নাথ’ শব্দের ব্যবহার করেছেন। ‘গোরখবাণী’-র ২৬ নং শ্লোকে ব্যবহার হয়েছে। সেখানে ভণিতায় ‘নাথ’ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে--

‘নাথ কহে তুম আপা রাখে।

নাথ কহে তুম্ সুনহ রে অবধু।’^৪

নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্যে ব্যবহৃত ‘নাথ’ শব্দের দ্ব্যর্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম এবং গুরু। কিন্তু যোগশাস্ত্রে ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে যে সৃষ্টিক্রম স্বীকার করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

‘শিব > ভৈরব > শ্রীকণ্ঠ > সদাশিব > ঈশ্বর > রুদ্র > বিষ্ণু > ব্রহ্মা > সৃষ্টি।’^৫

এই ক্রম থেকে স্পষ্ট হয় যে ‘নাথ’ ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ -গ্রন্থের সৃষ্টিক্রম থেকে পরে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। এখানে এও বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, দেবতা, পর্বত, নাগ, মানুষ, পশু-পাখি সহ সব জীবই স্ত্রীদের কাছে পরাজিত হয়েছে, কেবল নাথ তার মায়াকে অতিক্রম করেছে।^৬ নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধদের জন্য ‘নাথ’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে কবীর উল্লেখ করেছেন। ‘নাথ’ শব্দ একটি উপাধি বিশেষ।^৭ সিদ্ধ বা সাধুরা নাথ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হলে তা দেওয়া হয় এবং দীক্ষান্তে সাধকের নামের শেষে ‘নাথ’ শব্দটি

প্রযুক্ত হয়। কবীর নাথ শব্দের আগে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, আল্লা, খুদা, করিম, গোরখ, মহাদেব, সিদ্ধ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। স্পষ্টত নাথ শব্দ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে পরমতত্ত্ব বা পূজ্য বা উপাস্য। এই সূত্রে নাথপন্থে ‘নাথ’ শব্দটিকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করা হয়।

নাথসম্প্রদায় সাধক বা সিদ্ধ সম্প্রদায়, যাঁরা নাথকে পরমতত্ত্ব বলে জানেন। নাথত্ব প্রাপ্তির জন্য সিদ্ধ দীক্ষান্তে ‘নাথ’ শব্দটি ব্যবহার করেন এবং যোগসাধনা করেন। ড. কল্যাণী মল্লিক অবশ্য বলেছেন নাথপন্থ বা নাথ সম্প্রদায় খুব প্রাচীন নয়।^৮ ঐ সময়ে নাথসম্প্রদায়ের আরও অনেক নাম প্রচলিত ছিল। ঐ নামকরণ সম্প্রদায়ের সাধনা ও ধ্যান সম্বন্ধীয় বিষয়ে ব্যবহার হত বলে মনে হয়। যেমন যাঁরা হঠযোগী তাঁদেরকে যোগী বলা হয়। এই যোগী শব্দের অর্থ বহু বিস্তৃত। শুধুমাত্র নাথ বা কানফাটা যোগী নয়, অন্যদেরকেও যোগী বোঝানো হয়েছে। বার্থ এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।^৯ সন্ন্যাসীদের জন্য এইসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন-কানাফাটা, দর্শনী, গোরক্ষনাথী ইত্যাদি নামে সিদ্ধরা পরিচিত। কানের মাঝখানে ছিদ্র করে দেওয়ার কারণেই কানফাটা বলা হয়। নাথপন্থে সাধক প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর— অওঘোর বা অঘোর যোগী, দর্শনীযোগী ও মোহান্তযোগী। বাংলার যোগীরা মূলত শৈব। এখানে সন্ন্যাসীরা কেবল কানফাটা হন। গৃহস্থরা কানফাটান না। কিন্তু পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, নেপাল সহ অন্যত্র গৃহস্থ যোগীরাও কানফাটা হন। বাংলায় নাথেরা শৈব এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত বলে বলেন।^{১০}

নাথপন্থের সাহিত্যে এইসব নামের উল্লেখ নেই। সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের সময় সাধারণত নাথ সম্প্রদায় সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগী সম্প্রদায়, অবধূত সম্প্রদায়, অবধূতমত ইত্যাদি নামের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

The Nath Cult seems to have represent a particular phase of the Siddha cult of India. This Siddha cult is a very old religious cult with its emphasis on the psycho-chemical process of Yoga, known as kaya sadhana.”

গোরক্ষনাথ প্রণীত ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ নাথসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণী মল্লিক ও গোরক্ষনাথ রচিত ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থ সেকথায় বলেছেন।^{১২} ‘নাথসম্প্রদায়কে সিদ্ধমতের অনুসারী বলে ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’-এ বলা হয়েছে।^{১৩} গবেষকেরা নাথপন্থকে যোগমার্গ, যোগী সম্প্রদায়, অবধূতমত, অবধূত সম্প্রদায় ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’ গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে রসেশ্বরবাদী সাধকেরা জীবনুজ্জি এবং অজরামরত্বের সাধক। তারা রস অর্থাৎ পারদ প্রয়োগ করে জীবনুজ্জির সিদ্ধ হন। নাথসিদ্ধ অনেকেই রসসিদ্ধ বা যৌগিক রসসাধক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন—

‘চর্পটিঃ কপিলোয়ালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ।

এতেন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবনুজ্জাশ্চরন্তি হি।।’^{১৪}

নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, দর্শন আদি বিভিন্ন কারণে গবেষকেরা নাথসম্প্রদায়কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। গোরক্ষনাথে দীক্ষিত সম্প্রদায়ই যোগীমার্গ, কানফাটা, দর্শনীযোগী, নাথযোগী ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নামই প্রাচীন নাম। অন্যান্য নাম সামাজিক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক জীবনকে প্রকাশ করেছে। যোগী বা সিদ্ধ বা ‘নাথ’ শব্দ নাথসম্প্রদায়ের জীবিত বা মৃত সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রচারিত বা সংগঠিত সম্প্রদায় নাথমত বা নাথসম্প্রদায় নামে অধিক পরিচিত। নাথ সৃষ্টিক্রমে প্রাচীনরূপ লক্ষ করা যায়। বলা যায় এই নামে পরমতত্ত্ব বা পরম

উপাস্য রূপে শৈব সম্প্রদায়ের একটি ধারা নাথসম্প্রদায়। কিন্তু প্রাচীনতার দৃষ্টিতে ‘নাথ’ নাম স্বীকৃত নয়। নাথপন্থের সাহিত্যে সিদ্ধমত, যোগমার্গ, যৌগিক রসসিদ্ধ, সিদ্ধ সম্প্রদায়, অবধূতমার্গ, অবধূত সম্প্রদায়, কাপালিক সম্প্রদায় ইত্যাদি যে নাম পাওয়া যায় সেগুলিই প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

নাথধর্মের প্রধান বিষয় হল যোগ। নাথসম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য হলেন শিব, পশুপতি শিব। পশুপতি হলেন সকল প্রাণীর প্রভু। ‘পশুপতি’ শব্দের দুটি অর্থ একটি পশু, অপরটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি। বৈদিক আর্যরা তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে এই ভূখণ্ডের আদি অধিবাসীরা চাষবাস ও পশুপালনের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাই পশুরাই ছিল তাদের জীবন জীবিকার প্রধান অঙ্গ। এক অর্থে তারা তাদের গবাদিপশুর উপকারের জন্য তাদের সর্বোচ্চ উপাসনাটিকে পাশুপত বলে সম্বোধন করেছেন। অন্যদিকে যোগের প্রথম ও সর্বোত্তম উপায় সংবেদনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ। সেই কারণে মহাযোগী শিবের নামকরণ করা হয়েছিল পশুপতি শিব। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে শিবের যোগভঙ্গির অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এমনকি অনেক মূর্তি নাথসম্প্রদায়ের কানফাটা যোগীদের মত দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়ের মতে—

The Practices of yoga was in vogue in ancient India long before the Vedic civilization. The importance of yoga system has been admitted in the beginning of the Vedic literature.^{১৫}

প্রাচীনভারতে বৈদিক সভ্যতার অনেক আগে থেকেই যোগের প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্যের শুরুতে যোগব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—

নাথধর্মের যোগের মতবাদগুলি পশুপতি শিবের উপাসনার সঙ্গে জড়িত।
সিন্ধু উপত্যকার ধর্মপদ্ধতির পশুপতি মূর্তি, যোগীদের চিত্র পাওয়া
গিয়েছে; যা থেকে বোঝা যায় যে এই সমস্ত চিত্রগুলি খুবই পুরানো হতে
পারে। পরে এই সমস্ত ধর্মবিশ্বাস বৌদ্ধ, জৈন, এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল।^{১৬}

প্রাক-বৈদিক, দ্রাবিড় উপাসনার প্রধান মাধ্যম যোগধারা। কালক্রমে বৈদিক আর্যরাও এই
বিষয় গ্রহণ করেছিল। উভয় সভ্যতা সংস্কৃতির আন্তঃবিনিময় এবং সমন্বয় ঘটেছিল। তারফলে
অথর্ববেদে বর্ণিত ব্রাত্যশৈব উপাসনা, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগসাধনা ইত্যাদি
আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সংশ্লেষ হিসেবে কালক্রমে নাথ যোগধারা আত্মপ্রকাশ করে। যার পূর্ণতা
ঘটেছে যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও যোগী গোরক্ষনাথের সময়ে। উপনিষদের যুগে যোগধারা ও
শিবের উপাসনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ‘ছান্দোগ্য’, ‘কঠ’, ‘কৌষিতকি’-র মতো উপনিষদগুলি
তার প্রমাণ। ড. দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী মনে করেন—

The Yoga system was the main system of worship of the pre
-Vedic Aryans i.e. Vratyas and Dravidians. In course of time
this was also accepted by the Vedic Aryans.^{১৭}

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে যোগ বা নাথ যোগধারা আরও উন্নত রূপ ধারণ করে। শিব
প্রধানদেবতা হিসেবে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সঙ্গে পূজিত হতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে ড. কে. সি. মিশ্র
বলেছেন-

In the paurnanic age Vratya-Saiva cult or Yoga Marga attained
its perfection as Natha Dharma or Nathism. Siva was termed
as Natha by the followers of Saivism.^{১৮}

কিন্তু বৌদ্ধযুগে বেদ ও উপনিষদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশ্য আধুনিক অনেক গবেষক মনে করেন আর্যরা বহিরাগত নন। ভিন্টারনিংস মনে করেন যে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস মানে সমগ্র মানব জাতির মানসিক বিকাশের ইতিহাস এবং এর সময় ৩০০০ খ্রি.পূ. আগে নয়।^{১৯}

নাথসিদ্ধরা চেতনায় বৈদিক ছিলেন, তবে বাস্তবে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উদার। তারা প্রণব বা ওঁ-কার সাধনার ঔপনিষদিক যোগধারা গ্রহণ করেছিলেন। যা কঠ, মাণ্ড্যুকা, মুণ্ডক, তৈত্তিরীয় সহ অন্যান্য উপনিষদগুলিতে খুব সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঋগ্বেদের যুগে একশ্রেণির মুনি যাঁরা ‘ওঁ’ উচ্চারণ করে ঘুরে বেড়াতেন। ঋগ্বেদেই পাচ্ছি— ‘তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি’ (১/১৬৪/৪৫)। তুরীয় হল বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর— এই তিন মায়াময় অবস্থার অতীত চতুর্থ তত্ত্ব। অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সঙ্গে অভেদাত্মক আত্মা। সন্ন্যাসী হয়ে একসময় ব্রহ্মগীত গেয়ে ঘোরাফেরা করতেন নাথযোগীরা। এই ব্রহ্মধারণা নাথ যোগাগত। সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকল-এই চেতনাই ব্রহ্মজ্ঞান। নাথযোগীরা সকলের মধ্যে ব্রহ্ম-কে দেখে নিজেও ব্রহ্ম হয়ে যেতেন। ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ‘অথর্বশিখোপনিষদ’ বলেছে- ‘সর্বাণ বৃংহয়তীতি ব্রহ্ম।’ ঋগ্বেদের ২/১২/৬ শ্লোকে যখন বলা হয়-‘যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরে’ তখন নাথযোগের ব্রহ্মজ্ঞান জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় ধর্মাচরণে এই নাদসাধনা নাথযোগীদের আবিষ্কার। এইজন্যই বোধহয় ‘অথর্ববেদ’-এ ১২ বার নাথ শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। একস্থানে বলা হয়েছে-‘দেবান্ যন্নাথি তো হুবে’ (৭/১১৪/৭)। ধনলাভের জন্য অগ্নি আদি দেবতাদের আহ্বান করছি। বেদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ‘নাথ’ শব্দের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ‘নাথ’ শব্দের বহু অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ ব্রহ্ম স্বরূপ। ঋগ্বেদের নাধিতায় (১/১১৮/৮), নাধিত (১/১৮২/৭) এবং নাধসান (২/১২/৬)-র অর্থ

যথাক্রমে প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী এবং প্রার্থনারত স্তুতিকারী। বাংলায় ‘নাথ’ নেই, আছে ‘নাদ’।
মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘নাথ’ শব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ প্রদান করে গিয়েছেন—

‘পরমাণুমুচ্যতে নাথো স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ।

সঃ জীবঃ পরতরো যন্তু সঃ হংসঃ শক্তিপুদ্গলঃ’।^{২০}

অর্থাৎ পরমাণু, পরমশিব, সর্বব্যাপ্ত, জীবের শক্তিমূল হংস। বেদের আমল থেকে নাথ শব্দের
কোনো পরিবর্তন হয়নি। ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন—

শতপথ ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে উপকুর্বান ও নৈষ্ঠিক
ব্রহ্মচারীদের আংশিক ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়,
এইগুলি হইতেছে নাথ ও কায়াযোগেরও গোড়ার কথা। নাথপন্থে
অমাবস্যা পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে কস্ম্যবিশেষে নিষিদ্ধ বা পবিত্র বলিয়া
মানা হয়। এই আচার পুরোপুরি বৈদিক ‘উপোসথ’ এর অনুরূপ।^{২১}

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে যোগদর্শনের বহু তথ্য পাওয়া
যায়। মহাভারতের ‘আশ্রমবাসিক’ পর্বে দেখা যায় বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহের মধ্যে
প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন। ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত বীরগণকে
পরলোক থেকে এনে ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়েছিলেন। এছাড়া ব্যাসদেব, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ
ঋষিগণের যোগবিভূতির এই রূপ বহু অলৌকিক কাণ্ডের বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়।^{২২}
অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদের বহুস্থানে যোগীদের পরিচ্ছদ, যোগের দশনীয়ম, আসন,
প্রাণায়াম, শরীর সর্বতীর্থ, দেহ দেবালয়, শারীর-বিজ্ঞান, শারীর-যজ্ঞ, নাড়ীতত্ত্ব, নাড়ী নিরূপণ,
ইড়া-পিঙ্গলা, ষট্চক্র, প্রাণ-পবন, মনঃচন্দ্র, মনোজপ, অবধূত, পরমহংস, অরিষ্ট-লক্ষণ যোগ
সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নানাকথা বিবৃত আছে এবং দেখা যায়; এইগুলি নাথযোগেরও
উপজীব্য।^{২৩} তারপর চতুর্থ শতকের মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত দত্তাত্রেয় নাথ, ৭ম শতকের

স্কন্দপুরাণে ও নবম শতকের নারদপুরাণে উল্লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথ, ৮ম শতকের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দশম শতাব্দীর পরবর্তী ভবিষ্যপুরাণে গোরক্ষনাথ। ১৩-১৪শ শতকের ‘শূন্যপুরাণ’ কাব্যে উল্লিখিত আদিনাথ, মীননাথ, সর্বাঙ্গনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, ১৫শ শতকের কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের ‘বাণুলীমঙ্গল’ কাব্যে গোরক্ষনাথ, ১৬শ শতকের দ্বিজমাধব রচিত ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ কাব্যে গোরক্ষনাথ, ১৭শ শতকের আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে উল্লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের নাম উল্লেখ দেখে নাথযোগীর ঐতিহ্যময় অধ্যায়ের কথা জানা যায়। ১৪শ শতকে কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বরের ‘বর্ণনরত্নাকর’ গ্রন্থের ৭৬ নাথসিদ্ধ, ১৫শ শতকে স্বাত্মারাম যোগী লিখিত ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’-র ৩৩ নাথসিদ্ধ এবং ১৬শ শতকের ‘বল্লালচরিতম্’ গ্রন্থে উল্লিখিত প্রায় একই ৩২ নাথসিদ্ধ তালিকা উল্লেখযোগ্য।

এবার আমরা বলব ঋগ্বেদ ১০/১৩৬ সূক্তে বাতরসন মুনিদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে একশ্রেণির নাথযোগীর ভীষণ সাদৃশ্য ধরা পড়ে—

- বাতরসন কেশীমুনির অধীন দু্যলোক-ভুলোকের অগ্নি ও জল।
- তাঁরা পিঙ্গলবর্ণ।
- পরেন মলিনবস্ত্র।
- দেবত্ব লাভ করে তাঁরা বায়ুর গতি প্রাপ্ত হন।
- মুনি বলেই তাঁরা আকাশগামী হতে পারেন।
- হিতকারী স্বভাবের বলে তাঁরা দেবতার প্রিয়সখা।
- দেবতার বাঞ্ছিত ছিলেন এই মুনিরা।
- সকল বিষয়ে তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন।

- আনন্দদাতা বন্ধু বলে সকলের প্রিয় তাঁরা।
- তাঁরা রুদ্রভক্ত।

বাতরসন মানে- ‘Naked ascetics. Wind-gift is applied to the Munis and to the Wrisis in the Taittiriya Aranyaka.’^{২৪} অন্যেরা বলেছেন- ‘Probably the ascetic, the Munis or Yogi.’^{২৫}

ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪ সূক্তে নাদধারণার সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ৪ প্রকার বাকের কথায় নাথযোগী সাধকেরা জানেন (ব্রাহ্মণা মনীষিণঃ)। এর তিনটি গুহ্যনিহিত, ৪র্থ বাকই মানুষ বলতে পারেন। একই কথা পাচ্ছি অথর্ববেদেও (৭/১)। তারপর অথর্ব ৬/৪-এ সে মননসাধন মন, জ্ঞানসাধন চেতনা এবং চেতন সাধন চিত্তের কথা পাই, সেখানে নাথযোগের মূল কথায় সূত্রায়িত হয়েছে। আর অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডে আছে নাথযোগীর পৈতৃক আর্কিটেপ শিবের পূর্ণরূপ। ঋগ্বেদে কনফেডার্যাসি তথা মৈত্রীসংঘের অন্তর্গত কতকগুলি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা তুর্বশ, দ্যুহ্য, বিষাণহস্ত শিব, বৈকর্ণ্য, অধ্বর্যু, তৃৎসু প্রভৃতি (ঋগ্বেদ ৭/১৮)। বিষাণিনদের শিরস্ত্রাণ থাকত, শিঙ দিয়ে তৈরি; মহেঞ্জোদারোর শিবের মাথার মতো। অনুমান করা যায় এরা শিবপূজক যোগী জাতিরই একশ্রেণি। আর বৈকর্ণ্য কি কানফাটা যোগী? প্রমাণের অভাবে সিদ্ধান্ত হয় না; শুধু অনুমান।^{২৬}

অথর্ববেদে নাথযোগের বিষয় যেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে কৃষ্যযজুর্বেদ-র অন্তর্গত ত্রি. ৬ষ্ঠ শতকের ‘শ্বেতাশ্বতর’ উপনিষদের ১/১ শ্লোকে ব্রহ্মবাদ, ২/৫ এ নির্বিকল্প সমাধি, ২/৬ এ কর্মযোগ, ২/৭-৯ শ্লোকে যোগানুষ্ঠান, ২/১২ তে যোগের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ‘শুক্ল যজুর্বেদ’-র মত এখানে পাওয়া যাচ্ছে রুদ্র শিবের কথা। এখানে

শিব বিষয়ে এক কবিতায়িত শ্লোক পাওয়া যায়, যেগুলি ড. জীবন নাথ বাংলায় অনুবাদ করে উল্লেখ করেছেন—

‘যখন অতম কিংবা না-রাত্রি না-দিন
না সৎ না অসৎ বিদ্যমান,
তখন ছিলেন কেবল শিব-মঙ্গলময় অব্যাহিত।
সেই সবিতাবরণ্য অক্ষর স্মর—
যার থেকে পুরাণ ও প্রজ্ঞা হল প্রসূত।’^{৪/১৮}^{২৭}

উপনিষদকাররা এখানে ‘কেবলশিব’-কে ব্রহ্ম করে নিয়েছেন।

নাথযোগীর দীক্ষামন্ত্রের উৎস হল ‘শুক্ল-যজুর্বেদ’ (১৬/৪২)। নাথযোগীরা পরম্পর সাক্ষাৎদর্শনে অভিবাদন প্রত্যাভিবাদনের শব্দ ‘আদেশ’ উচ্চারণের উৎস ‘ছান্দোগ্য’ উপনিষদ ১ম খণ্ড (৪৪৭/২)। শঙ্করভাষ্যে এই ‘আদেশ’-র অর্থ হল ‘পরং ব্রহ্ম’।^{২৮} গোরক্ষনাথ বলেছেন যে ‘আদেশ’ অভিবাদনে আত্মা, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একত্ববোধ ঘটে—

‘আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।
ত্রয়াণামৈবসংভূতিঃ ‘আদেশ’ ইতি কীর্তিতঃ।।’^{২৯}

যোগী গোরক্ষনাথ রচিত ‘গোরক্ষবোধ’ গ্রন্থেও উক্ত ‘আদেশ’ প্রসঙ্গ আছে। ‘গোরক্ষবোধ’-এ গোরক্ষনাথ প্রশ্ন করছেন এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ উত্তর দিচ্ছেন—

‘গোরক্ষ:
স্বামীজি! আদেশকা কবন উপদেশ শূন্যকা কবন বাসা,
শব্দকা কবন গুরু বুঝাত গোরক্ষনাথ দাসা।’

অর্থাৎ স্বামীজি আদেশ শব্দের যথার্থ উপদেশ কী? শূন্যের বাস কোথায় এবং শব্দের গুরু কে? দাস গোরক্ষকে বুঝিয়ে বলুন।

মৎস্যেন্দ্র:

‘অবধু আদেশকা অনুপম উপদেশ।

শূন্যকা নিরন্তর বাসা,

শুদ্ধকা পরচা গুরু কথ্যতে

মৎস্যেন্দ্র বিশ্বাসা।।’^{৩০}

নাথসিদ্ধরা অন্যান্য রূপের সঙ্গে ঈশ্বর, শিব এবং শক্তি দুর্গার বিভিন্ন রূপকে উপাসনা করেন। তাঁরা সাবিত্রী-দীক্ষা বা ব্রহ্ম গায়ত্রীকে পবিত্রযজ্ঞ-সূত্র এবং দীক্ষা দেওয়ার বৈদিক আচারকে গ্রহণ ও অনুশীলন করেন। তাঁরা আত্মার তত্ত্বটিকে বিশ্বাস করেছেন (ব্যক্তি আত্মা এবং পরমাত্মা), যেটা বৌদ্ধরা করেননি। তবু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের মত নাথসিদ্ধরা বৌদ্ধদের অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। যদিও অন্যান্য বৈদিক দার্শনিকেরা তা করেছিলেন। ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, মীমাংসা, বৈষ্ণব আচার্যগণ এবং ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভাষাগুলিতে বৌদ্ধধর্মের অবৈদিক নীতিগুলির তীব্র বিরোধিতা ও খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে নাথসিদ্ধরা বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে বৌদ্ধ দর্শনের ২টি মূলতত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যতার মূলনীতি (শূন্যতত্ত্ব, সহজ সাধনা এবং কিছু অন্য বৌদ্ধ পরিভাষা) গ্রহণ করেছেন, অবশ্য নিজস্ব ঔপনিষদিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সাধারণভাবে দুটি বিপরীত দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় একে অপরের পক্ষে এতটাই অনুকূল ছিল যে বৌদ্ধরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ভগবান বুদ্ধের চতুর্থ অবতার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নাথপন্থীরাও যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথকে নেপালে পদ্মপাণি রূপে উপাসনা

করেন। সিদ্ধাচল ও মৃগস্থলীতে মৎস্যেন্দ্রনাথের পদ্মপাণি রূপে এখনও পূজা হয়। এমনকি কাঠমাণ্ডুর কাছে মৃগস্থলীতে গোরক্ষনাথ যোগসাধনায় নিরত ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ শৈব পাশুপত রূপেই নেপালে গিয়েছিলেন।^{৩১}

যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পূর্বেই নাথ যোগধারা প্রচলিত ছিল।^{৩২} অথর্ববেদ, প্রথম দিকের উপনিষদগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালের উপনিষদেও যোগধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কঠ, মৈত্রেয়, তৈত্তিরীয়, নাদবিন্দু, বরাহ, মুক্তিকা, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি উপনিষদ। এছাড়াও লয়, যোগ এবং তন্ত্র ও আগমের কুণ্ডলিনী যোগ ছিল। গ্রীক নস্টিক জাতির মধ্যেও যোগ প্রচলিত ছিল।^{৩৩} এমনকি বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞানীব্যক্তি এবং যোগচর্চাকারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন হিরণ্যগর্ভ, ভগবান শিব, একাদশ রুদ্র, শান্তাকুমার, জনক, হনুমান, শুকদেব, প্রহ্লাদ, দত্তাত্রেয়, ভরত এবং শঙ্করাচার্য।^{৩৪} যোগচর্চার দরজা সব শ্রেণির মানুষের জন্য অবারিত ছিল।^{৩৫} ব্রাহ্মণ, শুদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৌদ্ধ ও অনার্যজাতি থেকে হিন্দু ধর্মে আগত মানুষেরও যোগচর্চার অধিকার ছিল। বাণভট্ট ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থে জটীধারী কানফাটা যোগীদের উল্লেখ করেছেন।^{৩৬} ‘কাদম্বরী’ অষ্টম শতকে লিখিত গ্রন্থ। মৈত্রেয় উপনিষদ-এ লালকাপড় পরিহিত খপ্পরধারী কানফাটা যোগীদের কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায় গোরক্ষনাথ কানফাটা যোগীধারার প্রবর্তক একথা সঠিক নয়।^{৩৭} নাথযোগীদের কানে কুণ্ডল পরা থাকে। কানের মাঝখান বরাবর কানফুটো করে কুণ্ডল পরানো হয়। এটি নাথ সন্ন্যাসীদের দীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। কুণ্ডল পরানো হলে তিনি দর্শনী যোগী হলেন। কুণ্ডল নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পূর্বে বহু নাথসিদ্ধ ছিলেন। ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’-এ বিন্দুনাথ বা যোগনাথ, আদিনাথের উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা

মৎস্যেন্দ্রনাথ বা গোরক্ষনাথের পূর্বে বর্তমান ছিলেন।^{৭৮} ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, শবর, আনন্দভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মস্থনভৈরব, সিদ্ধ, বুদ্ধ, কহুড, কণ্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটি, গোরক্ষ প্রমুখ নাথ সিদ্ধর উল্লেখ রয়েছে।^{৭৯} ‘নারদপরিব্রাজক’ উপনিষদ (মাদ্রাজ সংস্করণ)-এ বলা হয়েছে যে গোরক্ষনাথ অবধূত ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষাংশে গোরক্ষনাথের আগে নাথ সিদ্ধদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে শ্বেতকেতু, রিভু, নিদাঘ, জড়ভরত, ঋষভ, দুর্বাসা, সম্বর্তক, সনৎসুজাত, বৈদেহ (জনক), বট, সিদ্ধ, শুক, বামদেব, দত্তাত্রেয়, রৈবতক।^{৮০} যোগী ঐতিহ্য অনুসারে গোরক্ষনাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, চর্পটি ও কহুডনাথের শিষ্য। যোগী রতননাথের ‘কহুডবোধ’-এ উল্লেখ আছে যে এঁরা গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন।^{৮১}

মহাদেব শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কুড়িটি উপনিষদের সংকলন হিসেবে ‘যোগোপনিষদ’ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি ২০০খ্রি. থেকে ৪০০খ্রি. মধ্যে রচিত হয়েছে বলে ড. কে. আর. নজুগুন মনে করেন।^{৮২} সংকলিত উপনিষদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘অদ্বয়তারক’, ‘অমৃতনাদ’, ‘ধ্যানবিন্দু’, ‘যোগকুণ্ডলী’, ‘যোগচূড়ামণি’, ‘যোগতত্ত্ব’, ‘যোগশিখা’, ‘শাণ্ডিল্য’, ‘হংস’ উপনিষদ। এই উপনিষদগুলির মধ্যে নাথ যোগতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উপনিষদগুলির রচনাকাল এত আগে না হলেও বলা যায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আগে রচিত হয়েছে। এই পৌরাণিক সূত্রগুলির পাশাপাশি ঐতিহাসিক সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিসের রাজা আলেকজান্ডার ভারতে এসে অদ্ভুত যোগী দেখেছিলেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে ব্যাবিলনের বার্দেসানেস ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ যোগীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সপ্তম শতকের শেষদিকে চৈনিক

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও কশিপাতে গায়ে ছাইমাখা মাথায় হাড়ের মালা জড়ানো শৈবযোগী দেখেছিলেন।^{৪৩} নাথসম্প্রদায়ের ‘গোথবিজয়’ কাব্যেও আদিনাথ শিবকে একই রকম রূপে দেখতে পাওয়া যায়—

‘মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা ।

বালমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা ।।’^{৪৪}

অর্থাৎ কাহিনি, উপকথা ও ঐতিহ্যে নাথসম্প্রদায় শৈবযোগী সম্প্রদায়েরই অংশ। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

ভারতবর্ষের মিষ্টিক সাধক কবিরা উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া
বরাবরই তাঁহাদের অধ্যাত্ম উপলক্ষিকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন
প্রহেলিকার ছাঁদে। নাথপন্থী যোগীগুরুরা এই প্রহেলিকা ছড়ার ছাঁদকে
যোগশিক্ষা উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন।^{৪৫}

উত্তরবঙ্গে হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ ‘যোগীকাচ’ বা যোগীযাত্রা আগ্রহের সঙ্গে আজও শোনে। এর মূল বিষয় নাথপন্থী সাধক সিদ্ধদের প্রহেলিকা বিলাস।

‘হঠযোগপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে স্বাত্মারামযোগী ভৈরবানন্দের নাম করেছেন, যিনি গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন। ভৈরবানন্দের নাম ‘শাবরতন্ত্রের’ সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভৈরবানন্দ ৮৪ নাথসিদ্ধের একজন। ইসমাইল শাবরতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যিনি ৮৪ নাথ সিদ্ধের মধ্যে একজন হতে চেয়েছিলেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁর লেখা একটি বই পাওয়া যায় যেটা ‘ইসমাইল বোধ’ নামে পরিচিত।^{৪৬} নানক লুইপাকে গোরক্ষের আধ্যাত্মিক গুরু বলে ডাকেন।^{৪৭} চর্পটের আবির্ভাবকাল হিসেবে তাঁর শিষ্য সাহিল ভার্মার প্রতিষ্ঠার সময়কে ধরা যায়, যিনি চাম্বা রাজ্যের পাঞ্জাব পাহাড়ের শাসক ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৯২০ খ্রি. শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।^{৪৮} লুহারিপা তিব্বতি ঐতিহ্যে লুইপা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

তিনি ৯৮০ খ্রি. নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। লুইপাকে অনেকেই মৎস্যেন্দ্রনাথ বলে মনে করেন।^{৪৯} কহুডনাথ একজন শৈব নাথ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ মূলরাজের সময়ে সরস্বতী নদীতীরে বসবাস করতেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৯৪১ খ্রি. থেকে ৯৯৬ খ্রি. পর্যন্ত।^{৫০} যোগী চৌরঙ্গীনাথের একটি শ্লোকে ফারসি শব্দ ‘মীর’-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রথম ‘মীর’ হিসেবে খ্যাত ছিলেন রাজা সুবুজিগিন, যিনি ৯৭৬খ্রি. থেকে ৯৯৭খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আমীর শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ‘মীর’।^{৫১} অন্যদিকে একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অভিনবগুপ্ত তাঁর ‘তত্ত্বালোক’ গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন।^{৫২} সেই সূত্র ধরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী সিদ্ধান্ত করেছেন যে মৎস্যেন্দ্রনাথ অবশ্যই নবম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।^{৫৩} রাজশেখর ‘কপূরমঞ্জরী’ গ্রন্থে এক ভৈরবানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। রাজশেখর ৯০০ খ্রি. বেঁচে ছিলেন। স্বাত্মারামযোগী ‘হঠযোগপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে নবনাথের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথম, শবর দ্বিতীয়, আনন্দভৈরব তৃতীয়, চৌরঙ্গী চতুর্থ, মীন পঞ্চম, ষষ্ঠত গোরক্ষনাথ। এইসব সূত্রধরে ড. মোহন সিং সিদ্ধান্ত করেছেন যে গোরক্ষনাথ নবম থেকে দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।^{৫৪} ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ নাথসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। সেখানে নবনাথ বা নয়নাথের যে উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, সত্যনাথ, ভীমনাথ, চর্পট, কহুড এবং জালন্ধরনাথ।^{৫৫} এছাড়া চাম্বা রাজ্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে নাগার্জুন দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বিখ্যাত ছিলেন।^{৫৬} বেশ কয়েকবছর আগে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার সামন্তরাজা লোকনাথের একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রীহট্টের কালাপুর থেকে মরুণনাথের আরেকটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই দু’খানা লিপি থেকে তাঁদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। লোকনাথের

তাম্রলিপিতে উল্লেখ করা সময় ৩৪৪ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ।^{৫৭} কালাপুর তাম্রশাসনখানি সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলে কমলাকান্ত গুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন।^{৫৮} এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় সামন্তরাজা মরুণনাথ কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে কিছু ভূমিদান করেন স্থানীয় ব্রাহ্মণদের। অন্যদিকে গৌড়গোবিন্দ বা রাজা ক্রমনাথের রাজ্য শ্রীহট্ট ছাড়াও কাছাড় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।^{৫৯} ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ জুড়ে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস ছিল সেটা ভাটেরা তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয়।^{৬০} ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ-১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, কাছাড় নাথ-রাজবংশের শাসিত এলাকা ছিল। এইসব নাথ রাজা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের কল্যাণে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাথধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটে। এখনও পর্যন্ত এইসব অঞ্চলে নাথসম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

তাই বলতে পারি নাথধর্মের প্রাচীনতা সন্দেহহীন। বেদ বেদাঙ্গ তার উৎস। বেদ ও উপনিষদে নাথযোগ-ধারার বহু কথায় আছে। বিশেষত উপনিষদে আছে তার সংহত রূপ ও বিস্তার। আর এসবই সূত্রায়িত হয়েছে পাতঞ্জল যোগদর্শনে। এসবের এবং অন্য বিষয়ে এক সূত্রবাহী বিস্তার নাথযোগ সাহিত্যধারা। ভারতীয় সাহিত্যে আমরা দেখেছি চতুর্দশ শতকের অসমিয়া রামায়ণ মাধবকন্দলীর ‘সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’-এ যোগীর চিত্র—

‘ন’যোগীর কান্ধত । কাণী জুলি যত ।

হাতে দোয়াদশ কাথি । লয়রন্তে লয় ।

রন্তে নাচে চাণ্ডে । হিয়া মানে গৈল ফাটি।’^{৬১}

ওড়িয়া ভাষায় রচিত ‘জ্ঞানোদয় কোইলি’-তেও দেখি যোগীর চিত্র—

‘জ্যোতি পরে জ্যোতি গোপা,
যামিনী পাহি জ্বলু আছি দীপ লো।
যতন করি জগি বুযোব,
যুগে যুগে যোগী হইবু, তেবে লো।’^{৬২}

হিন্দী সাহিত্যের কবি গোরক্ষনাথের কবিতাবলির একটি পদ নিম্নরূপ-

‘চারি পহর আংগন নিংদ্রা, সংসার জাই বিঘিয়া
উভী বাংহ গোরক্ষনাথ পুকোটর, মূলন বাহী।
হরৌ স্থারা ভাই।’^{৬৩}

পদটির বাংলা করলে দাঁড়ায় -

‘নিদ্রা আলিঙ্গনে যায় দিনের চার প্রহর।
সংসারেতে সদা কাল, বিষয়েতে দেখি মতি দড়।।
দুই বাহু তুলে গোর্থ কহে রে করিয়া চিৎকার।
মূলধন হারিয়ো না ওরে সুজন ভাই আমার।।’

প্রাচীনযুগের বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে মীননাথের একটি দোহা—

‘কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট।।
কমল বিকশিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।।’^{৬৪}

নব্যভারতীয় আর্থভাষার অন্তর্গত অধিকাংশ ভাষার সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটছে নাথ সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। কাজেই নাথধর্ম শুধু নয়, নাথসাহিত্যেরই উদ্ভব ঘটে নবম-দশম শতাব্দীতে। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণের সাহায্যে বলা যায় নাথধর্মের উদ্ভব সপ্তম শতাব্দীর আগেই ঘটেছিল। অবশেষে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।^{৬৫} হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলায় নাথধর্মের উদ্ভবের সময় অষ্টম শতাব্দী বলে

মনে করেন।^{৬৬} অন্যদিকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন নবম শতক।^{৬৭} মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মৎস্যেন্দ্রনাথকে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে স্থান দিয়েছেন।^{৬৮} নাথধর্মের শাস্ত্রীয় ও লোকাযত দু'টি ধারা প্রচলিত রয়েছে। শাস্ত্রীয় ধারাটি বেদ, উপনিষদ ও যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। লোকাযত ধারাটি কাপালিক, কালামুখ, কৌল, ভৈরববাদ, সহজযান, বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ, তন্ত্রের লয় ও কুণ্ডলিনী যোগ, হঠযোগ ও সিদ্ধ ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।^{৬৯} ধর্মের গভীরতা ও পরিণত রূপই হল লোকধর্ম। ধর্মের আগে আত্মপ্রকাশ ঘটে, জনপ্রিয় হলে ধীরে ধীরে লোকধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। নাথধর্মের উদ্ভবের পর জনপ্রিয়তা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতগুলি প্রভাবিত করেছে এবং নাথধর্মও লোকধর্মে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সপ্তম-অষ্টম শতকে বৌদ্ধধর্মে হিন্দু তান্ত্রিকসাধনা ও কায়াযোগ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। অন্যদিকে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। তখন নাথপন্থী মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধ-যোগীরা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। ড. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন- ‘অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম মহাবেগে তান্ত্রিক সাধনা ও কায়াযোগের দিকে এগিয়ে যায়। পরে তখন শৈবযোগীদের একটি সম্প্রদায়-নাথপন্থ প্রবল হয়ে ওঠে, যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেক সাধনাও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।’^{৭০} তারফলে প্রথম সহস্রাব্দের শেষাংশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ধর্ম হয়ে ওঠে নাথধর্ম। বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের সময়ে আজীবিক, জৈনধর্মের মত গণধর্মের মানুষেরাও নাথপন্থে গিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে। তারফলে এইসব ধর্মের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নাথপন্থে লক্ষ করা যায়। ড. অতুল সুরের মতে ‘আজীবিক ও জৈন ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যথেষ্ট বিরোধিতার মধ্যে। কিন্তু এসব ধর্মের অধিকাংশই পরে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী হয়ে গিয়েছিল।’^{৭১}

তথ্যসূত্র

১. রাজমোহন নাথ, *নাথযোগীতত্ত্ব*, পৃ. ১।
২. রামলাল শ্রীবাস্তব (সম্পা.), পৃ. ৩৯।
৩. শক্তিসংগম তন্ত্র, পৃ. ১১; নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরখনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ* (হিন্দি), পৃ. ১।
৪. *গোরখবাণী*, শ্লোক ২৬।
৫. *গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ*, পৃ. ৫৯।
৬. প্রাপ্ত, পৃ. ৬৬।
৭. শ্যামসুন্দর দাস, *কবীর গ্রন্থাবলী*, পৃ. ১৯৯।
৮. কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, পৃ. ১।
৯. Auguste Barth, *The Religions of India*, p.192.
১০. কল্যাণী মল্লিক, প্রাপ্ত, পৃ. ৯।
১১. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, p.192.
১২. Kalyani Mallik, *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other Works of the Natha Yogis*, p.35.
১৩. তস্মাদ সিদ্ধমতং স্বভাব সময়ং।- পৃ. ১২।
১৪. *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চরত্ন (সম্পা.), পৃ. ৮১।
১৫. T. G. Aravamuthan, *Some Survival of the Harappan Culture*, p.1.
১৬. *হিন্দুধর্ম*, পৃ.৬৯।
১৭. *Origin and development of Nath-yoga Cult*. *যোগিসংখ্যা পত্রিকা*, অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ১০৭।
১৮. *The Cult of Jagannatha*, p. 89.
১৯. *অথর্ববেদ*, বিজনবিহারী গোস্বামী (সম্পা.), ১ম কাণ্ড, ১ম অনুবাক, সূক্ত ৩-৪।
২০. *কৌলজ্ঞান নির্ণয়*, ৬/৫।
২১. *গোখবিজয়*, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ৫।
২২. সুখময় ভট্টাচার্য, *মহাভারতের সমাজ*, পৃ.৪৬৮-৫২১।

২৩. গোখবিজয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
২৪. A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic index of Names and Subjects*, Vol.II, p. 284.
২৫. *The Hymns of Rigveda*, RTH Griffith (Trans.), p. 636.
২৬. জীবন নাথ, ভারতীয় নাথযোগ সাহিত্য: প্রাচীনতা উৎস, যোগিসখা পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৫।
২৭. ঐ, পৃ. ১৫।
২৮. দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ২য় ভাগ, পৃ. ৬২১।
২৯. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, রামলাল শ্রীবাস্তব (সম্পা.), পৃ. ১৬৯।
৩০. গোরখবাণী- মহীন্দ্র গোরখ বোধ, পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.), পৃ. ২০৬।
৩১. কল্যাণী মল্লিক, পৃ. ৩৩।
৩২. Mohan Singh, *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*, p.14.
৩৩. Edward Gibbon, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, p.XIII.
৩৪. K. Narayansvami Aiyar, *Thirty Minor Upanishads*, p.145.
৩৫. James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. II, p.91.
৩৬. Mohan Singh, p.17.
৩৭. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. XII, p.169.
৩৮. Nagendranath Vasu, *Hindi Visva Kosha*, Vol. 28, p.743.
৩৯. হঠযোগ প্রদীপিকা, শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী (সম্পা.), পৃ. ১১৭।
৪০. Mohan Singh, p.18.
৪১. *Pothi Ratan Gyan*, Chashma-e-Nur; Mohan Singh, p.18.
৪২. নাথপন্থ অউর ভক্তি আন্দোলন (হিন্দি), পৃ. ১৬।
৪৩. আদিত্যকুমার লাল, বাংলায় নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য, পৃ. ২।
৪৪. গোখবিজয়, পৃ. ১২৩।
৪৫. বিচিত্র সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
৪৬. যোধপুর রাজস্থান রাজ্য গ্রন্থাগার; Mohan Singh, *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*, p.19.
৪৭. Ernest Trumpp, *Adi Granthasaheb*, p. 870.

৪৮. *The Princess of Wales*, Gopinatha Kaviraja (ed.), *Sarasvati Bhavana Studies*. Vol.VI, p.167.
৪৯. *কৌলজ্ঞান-নির্ণয়*, মাইকেল মেগী (অনূ.), পৃ. XIX।
৫০. মেরুতুঙ্গাচার্য, *প্রবন্ধ চিন্তামণি*, পৃ. ১৮৫।
৫১. *নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা*, চন্দ্রধর শর্মা (সম্পা.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৪০৫।
৫২. *অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক*, সুখময় ভট্টাচার্য (অনূ.), পৃ. ৩।
৫৩. *কৌলজ্ঞান-নির্ণয়*, পৃ. ২৮।
৫৪. Mohan Singh, p.21.
৫৫. পৃ. ১৯।
৫৬. পৃ. ১৪৩।
৫৭. *শ্রীরাজমালা*, কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), পৃ.২৮৯-২৯০; *Epigraphia Indica*. Vol. XV, Pp.301-315.
৫৮. Kamala Kanta Gupta, *Copper-Plates of Sylhet*, Pp.69-74.
৫৯. Ibid, p.194; Jagadis Gan Chaudhuri, *Tripura: The Land and its People*, p.18.
৬০. এন. সি. নাথ, *তাম্রলিপি প্রভৃতিতে বিধৃত অলঙ্কিত নাথতন্ত্র*, পৃ. ১১৯।
৬১. পৃ. ২১৯।
৬২. পঞ্চগনন মণ্ডল, *পুঁথি পরিচয়*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।
৬৩. *যোগবাণী পত্রিকা* (গোরখবাণী বিশেষাংক), পৃ. ২২৩।
৬৪. ২১ নং চর্যাটীকা।
৬৫. প্রফুল্লকুমার নাথ, *অসমের নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি*, পৃ. ৮।
৬৬. *৮ম অধিবেশন কার্যবিবরণী*, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, পৃ. ২১-২২; বারিদবরণ ঘোষ, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*, পৃ. ১১৭।
৬৭. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *প্রবাসী*, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩২৮, পৃ. ৫৮৫-৫৯২।
৬৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৬৯. Mohan Singh, p. 25.
৭০. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *আলোকপর্ব*, সন্ধ্যা চৌধুরী (অনূ.), পৃ. ৮২-৯৭।
৭১. *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ৫০-৫২; আর. এম. দেবনাথ, *বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন*, পৃ. ৩৭।

১. খ. নাথধর্মের ক্রমবিকাশ

নাথসম্প্রদায় মূলত শৈব উপাসক সম্প্রদায়। নাথপন্থকে শৈব পাণ্ডপত ধারার একটি শাখা বলা হয়ে থাকে। পাণ্ডপত শৈবধারার অন্য একটি শাখা হিসেবে পরবর্তীকালে নকুলীশ বা লাকুলীশ মতের উদ্ভব ঘটে। নাথসম্প্রদায়কে পাণ্ডপত ধারা লাকুলীশ মতের পরবর্তী রূপও বলা হয়।^১ ফকুহর যোগী গোরক্ষনাথকে সবচেয়ে শক্তিশালী পাণ্ডপত বলে উল্লেখ করেছেন।^২ জি. ডব্লু. ব্রিগস শৈব পাণ্ডপত ধারার সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।^৩ ড. কল্যাণী মল্লিক সহ অন্য গবেষকগণও নাথসম্প্রদায়কে শৈব পাণ্ডপত বলে মত প্রকাশ করেছেন। পাণ্ডপত শৈবধারা ভারতবর্ষের একটি সুপ্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে পাণ্ডপত মত থেকে লাকুলীশ পাণ্ডপত, কাপালিক, কালামুখ বা কালানন শৈব, ভৈরব এবং বামাচারী ধর্ম সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। মহাভারত, বায়ু পুরাণ, শিব পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠকে পাণ্ডপত ধারার টীকাকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. ভি. এস. পাঠক শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে সিদ্ধান্ত করেছেন শ্রীকণ্ঠ পাণ্ডপত ধারার প্রতিষ্ঠাতা।^৪ ‘তন্ত্রালোক’ অনুসারে কলিযুগ আরম্ভ হলে শিবশাসন শেষ হয় এবং শিব শ্রীকণ্ঠের রূপ ধারণ করে আবার শিবশাসন প্রবর্তন করেন।^৫ পাণ্ডপত শৈবধারার সাধনায় ষড়ঙ্গ-যোগ, ভস্মধারণ, প্রণব-জপ প্রধান বিষয়। ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা পাণ্ডপত শৈবধারায় স্থান পায়নি। তারফলে আর্য, আর্যের সহ সমস্ত শ্রেণির মানুষ পাণ্ডপত ধারায় দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। ফলস্বরূপ বৈদিক, অবৈদিক এবং মিশ্রধারার সমন্বয়ে শেষপর্যন্ত লাকুলীশ বা নকুলীশ নামে শৈবযোগী এক নতুন সংগঠন বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, যাকে লাকুলীশ পাণ্ডপত মত বলা হয়। মথুরায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আবিষ্কৃত এক শিলালেখ

অনুসারে ড. ডি. আর. ভাণ্ডারকর সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১২৫ খ্রি. কাছাকাছি সময়ে লাকুলীশ মতের উদ্ভব ঘটে।^৬ লাকুলীশের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুশিক, গর্গ, মিত্র, কৌরুষ, পতঞ্জলি প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কৌরুষ কারুক সিদ্ধান্তের আচার্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যিনি কালানন বা কালামুখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। ছয়টি শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে কালামুখ শৈবধারা একটি। এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম কালদমন, কালানন, কাটক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। কালামুখ বা কালানন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কৌরুষ লাকুলীশের শিষ্য ছিলেন। আচার্য রামানুজ এবং কেশব কাশ্মীরি কাটক সিদ্ধান্তকে কালানন বলেছেন। কালামুখ লাকুলাগমের অনুসারী ছিলেন।^৭ আচার্য যামুন এবং রামানুজ দু'জন বৈষ্ণব আচার্য আগম প্রাধান্যের কারণে কালামুখ সম্প্রদায়কে কাপালিক সম্প্রদায়ের সমকক্ষ মনে করে তাদের আচার অনুষ্ঠানের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। আচার্য সায়ন এবং মাধব কালামুখ মতের আচার্য ছিলেন। শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কালামুখ আচার্যরা বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, গৃহসূত্র, তর্ক, ন্যায়, সংগীত প্রভৃতি অনুসরণ করতেন এবং শুদ্ধ আচার মেনে চলেন। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর শিলালেখে কালামুখ সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তর ভারতীয় শিলালেখে কালামুখ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না।^৮ যোগী গোরক্ষনাথ কালামুখ সম্প্রদায়ে পরিচিত ব্যক্তি, গোরক্ষনাথের রচনাবলীতে তার পরিচয় বহন করছে।^৯ কালামুখ সম্প্রদায়ের সাধনায় যোগবিদ্যার সাহায্যে নির্গুণ সাধনা ও অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস লক্ষ করা যায়। তারফলে কালামুখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ পরবর্তী সময়ে নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়। কিছু অংশ বীরশৈব পরম্পরা গ্রহণ করে। অবশেষে চতুর্দশ শতকের পরে আলাদা করে আর কোনো কালামুখ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রইলো না।

গোরক্ষনাথ ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে কাপালিক সম্প্রদায়ের বর্ণনা করেছেন।^{১০} কাপালিক মতের সঙ্গে শৈবধারা ও সোমসিদ্ধান্তের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। এরা শিবকে কাপালিক রূপে উপাসনা করেন। স্বাভাবিকভাবে এদের সাধনায় উগ্রতা এসেছে। পরবর্তীকালে কাপালিক বংশের অঘোরীরা নাথপন্থে মিশে গিয়েছেন। আজও পূর্বভারতে নাথসম্প্রদায়ের বারোপন্থের অন্তর্গত একটি অন্যতম পন্থ নটেশ্বরী বা অঘোরীপন্থ ভীষণভাবে জীবন্তধারা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে নটেশ্বরী বা অঘোরী ধারার কয়েকশো জন নাথসন্ন্যাসী পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন। বালুরঘাট ও বক্রেশ্বরে নটেশ্বরী বা অঘোরীপন্থের দুটি বড়ো মঠ স্থাপন করেছেন যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী। পশ্চিমবঙ্গে অঘোরী বা নটেশ্বরী পন্থের নতুন নতুন মঠ-মন্দির এখনও স্থাপিত হচ্ছে। কাপালিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ সর্বপ্রথম মৈত্রী উপনিষদে পাওয়া যায়।^{১১} শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতা, তান্ত্রিক সাহিত্য, ভবভূতি রচিত ‘মালতীমাধব’, রাজশেখরের ‘কপূরমঞ্জরী’, কৃষ্ণ মিশ্রের ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ গ্রন্থে কাপালিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য রামানুজ আচার্য ‘শ্রীভাষ্য’ গ্রন্থে কাপালিক সম্প্রদায়ের আচার-বিচারের নিন্দা করেছেন। শ্রীকণ্ঠ প্রবর্তিত শৈবধারা অনুযায়ী কাপালিক মত হলেও পরবর্তীকালে তান্ত্রিক আচার বৈশিষ্ট্য বেশি করে কাপালিকধারাকে প্রভাবিত করেছে। ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ নামক নাট্যগ্রন্থে কাপালিক মতকে পরমেশ্বর সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে, যা অন্য শৈবধারা থেকে পৃথক নয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।^{১২} ড. ভি. এস. পাঠকের মতে চালুক্য শিবশাসনে বর্ণিত মহাব্রতী কাপালিক ছিলেন।^{১৩} কাপালিক মতে যোগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এঁদের সাধনায় শিবশক্তির সামরস্য বা সমরসতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নাড়ীশোধন, কুণ্ডলিনী জাগরণ, বায়ুনিরোধ কাপালিক মতে স্বীকৃত বিষয়। হঠযোগে

সম্মিলিত বজ্রোলী, সহজোলী মুদ্রা প্রভৃতির বিকাশ কাপালিক মত অনুসারে হয়েছে। জালন্ধরনাথ বা হাড়িপা, কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে ড. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেছেন যে কাপালিক সম্প্রদায়ের অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।^{১৪}

কৌলমত কাশ্মীর শৈবদ্বৈত মতের এক ধারা বিশেষ। আগমে কৌল ও কুল দুই শব্দেরই উল্লেখ রয়েছে এবং কৌলমতকে সর্বোৎকৃষ্ট মত বলা হয়েছে।^{১৫} কৌলমতকে প্রাচীন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’ ও ‘মৎস্যেন্দ্র সংহিতা’ গ্রন্থে কৌলমতের পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরে কৌলধারা প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলমত এবং বসুগুপ্ত ও তাঁর শিষ্য কল্লটের কাশ্মীরি শৈবধারা, যেখানে প্রত্যভিজ্ঞা তথা ত্রিক দর্শনের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিক-দর্শন কৌলমতের রূপান্তর মাত্র। শিলালিপি থেকে জানা যায় পাণ্ডপত ধারায় কৌলমতের আচার্য বিশ্বরূপের শিষ্য অল্লট, যাঁর অন্য নাম ছিল ভাবরক্ত। তিনি কৌল সম্প্রদায়ের সূচনাকালের অন্যতম একজন আচার্য ছিলেন।^{১৬} এখান থেকে মনে হয় লাকুলাগম ও তান্ত্রিক শক্তিবাদের সংমিশ্রণে কৌলমতের উদ্ভব ঘটেছে। অতএব ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কৌলমতের উদ্ভব ঘটেছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৌলমতের বিস্তার উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পশ্চিমে সিন্ধু-পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বাংলা-অসম পর্যন্ত ঘটেছে। কৌলমতের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন কৌলাগম, কৌলোপনিষদ, ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’, ‘মৎস্যেন্দ্রসংহিতা’ গ্রন্থে। ‘পরাত্রিংশিকা’ কৌলমতের প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ, এর সঙ্গে প্রত্যভিজ্ঞার উদ্ভাবক সোমানন্দের ভাষ্য পাওয়া গিয়েছে। এইজন্য বলা হয় কুলই পরম তত্ত্ব এবং কুলই বিশ্বের আদি স্থিতি।^{১৭} কুলের শক্তিকে কুল প্রসারকারী কৌলিক শক্তি বলা হয়।^{১৮} কুল এবং অকুল মিলে সাধকের সমরসতা প্রাপ্তি

ঘটে, অন্যদিকে কুল-অকুলের সমরসতা বা সামরস্য জ্ঞান হল কৌলজ্ঞান।^{১৯} কৌলমতে কুণ্ডলিনী জাগরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবাত্মা পরমশিবের সংস্পর্শে চৈতন্য তথা কুণ্ডলিনী শক্তি লাভ করে। এই কারণে কুণ্ডলিনীকে জীবশক্তি বলা হয়। কৌলসাধনার মাধ্যমে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটিয়ে সুষুম্নাকে সহস্রাতে অবস্থিত পরমশিবের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোই কৌলসাধকের কর্তব্য। এটাই শিবশক্তির মিলন। শিবশক্তির এই সামরস্য পরম আনন্দস্বরূপ। কৌলমতে নাথযোগের এক বিশেষ অঙ্গ কুণ্ডলিনী জাগরণের বিকাশ সাধন করা। এর বাইরে কৌলমতে মানবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্রের বিবরণ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ দিয়ে গিয়েছেন। সর্বোপরি উভয়ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যভিজ্ঞা, শৈবাগমের বিকাশ কাশ্মীর থেকেই ঘটেছিল, এই ধারার সাহিত্য রচয়িতাদের অধিকাংশই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। কাশ্মীরের বাইরে এইধারা কাশ্মীরি শৈবমত নামেই পরিচিত।^{২০} আচার্য অভিনবগুপ্ত ‘তন্ত্রালোক’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে রাজা ললিতাদিত্য (৭৩৫খ্রি.- ৭৬১খ্রি.) তাঁর পূর্বপুরুষ বিদ্বান অত্রিগুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।^{২১}

মহাসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ কলিযুগে উত্তরভারতে যোগিনী কৌলধারা প্রচার করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ একা এই দুঃসাধ্য কাজ সাধন করেননি। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রী কুমকুমভা এবং ছয়পুত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁর পুত্র অমরনাথ ত্রিপুরাপীঠে কৌলযোগের সাধনা করার পরে দক্ষিণ ভারত সংলগ্ন অঞ্চল পাতিলা নামক স্থানে কৌলধারা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর স্ত্রী সিদ্ধাই সেখানে কৌলধারা জনপ্রিয় করেছিলেন। বরদেব, মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যপুত্র যিনি কামাখ্যাতে কৌলসাধনা করতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এরুণা কারাভিলা অঞ্চলে কৌলধারা প্রচার করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের অপর

পুত্র চিত্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী কুমারী অটহাস অঞ্চলে কৌলসাধনা করতেন। তাঁরা অটহাস সংলগ্ন উত্তর ভারতে কৌলধারা জনপ্রিয় করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র অলিনাথ তাঁর সাধনসঙ্গী সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌথভাবে দেইকোটা নামক স্থান থেকে কৌলসাধনা শুরু করে সমগ্র পূর্বভারতে কৌলধারা প্রচার করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্য ছেলে বিদ্যনাথ ও তাঁর স্ত্রী মহালক্ষ্মী দক্ষিণাদিতে কৌলসাধনা করতেন। তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কৌলধারা জনপ্রিয় করেন। গুড়িকানাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র যিনি তাঁর স্ত্রী সহযোগে কৌলগিরি অঞ্চলে কৌলসাধনা করতেন। কথিত আছে যে তাঁরা কৌলসাধনার ছয়টি আলাদা পরম্পরা ওভাল্লি নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন; যথাক্রমে বোধ, প্রভু, পদ, আনন্দ, যোগ এবং ওম নামগুলি তার পরিচয় বহন করছে।^{২২} ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় যে মৎস্যেন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে (কলিযুগ) কৌলধারার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন।^{২৩} তিনি আধুনিক যুগে আধ্যাত্মিক অনুশাসনে কৌলসাধনার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কাশ্মীরের অন্যতম কৌলসাধক অভিনবগুপ্ত তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলে ‘তত্ত্বালোক’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।^{২৪} কলিযুগে মৎস্যেন্দ্র বিভু বা মৎস্যেন্দ্রনাথ কৌলসিদ্ধদের পরম্পরা প্রদান করেছেন।^{২৫} পরম্পরা অনুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন যোগিনী কৌলধারার প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মীয়-দার্শনিক চিন্তাধারায় কৌলধারার উপবিভাগ করা হয়েছে।^{২৬} কথিত আছে যে তিনি সরাসরি ভগবান শিবের কাছ থেকে কৌলসাধক হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।^{২৭} গোরক্ষনাথের পূর্বে প্রচলিত কৌলমত নাথ-পরম্পরা নামে পরিচিত ছিল।^{২৮} কাশ্মীরি শৈবমতে গোরক্ষনাথের দ্বিতীয় নাম মহেশ্বরানন্দনাথ। তাঁর নামে কাশ্মীরি অপভ্রংশ ভাষায় ‘মহার্থমঞ্জরী’ নামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। মহেশ্বরানন্দনাথ মহাপ্রকাশনাথের (মৎস্যেন্দ্রনাথ) শিষ্য ছিলেন। স্বয়ং মহেশ্বরানন্দনাথ

নিজের গুরু মহাপ্রকাশনাথকে গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে স্মরণ করেছেন। এছাড়া কাশ্মীরি সংস্কৃত গ্রন্থে প্রকাশিত ‘অমরৌঘশাসনম্’ গ্রন্থ গোরক্ষনাথের লেখা বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থে স্বচ্ছন্দ তন্ত্র ইত্যাদি প্রধান শৈবাগমে বর্ণিত যোগপদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের সঙ্গে আগম এবং কাশ্মীরি শৈবধারার সম্বন্ধ ছিল।^{৯৬} মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কৌলমার্গে পঞ্চ-ম-কারের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ স্বীকৃত হলেও গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় মঠ-রক্ষা ও মঠের অভ্যন্তরে ব্যাভিচার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পঞ্চ-ম-কারের দিব্যকল্প প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। তবু যাঁরা পঞ্চ-ম-কারের প্রত্যক্ষকল্পের ব্যবহার চান সেই সব সাধকেরা অঘোর-সংস্কার নিয়ে শ্মশানবাসী হতে পারেন।

কৌলধারার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথের ছয় রাজপুত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কৌলধারা প্রতিষ্ঠা করেন। ‘সিনসিনিমাতাসারা সমুচ্চয়’ নামে একটি অপ্রকাশিত পুথিতে কৌলধারার তালিকাটির সমর্থন পাওয়া যায়।^{৯৭} মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’ গ্রন্থে কৌলধারার সাতটি পৃথক ধারার কথা উল্লেখ করেছেন- পাদতিষ্ঠ কৌল, মহাকৌল, মূল কৌল, যোগিনী কৌল, বাহনী কৌল, বিষ্ণুতা কৌল এবং সিদ্ধ কৌল। অভিনবগুপ্ত নিজেও বিভিন্ন কৌলবিদ্যার কথা বলেছেন। ‘কৌলরত্নোদয়’ ও ‘সিনসিনিমাতাসারা সমুচ্চয়’ গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধারা ছয়প্রকার— বোধি, প্রভু, পদ, আনন্দ, যোগিনী এবং অবলি।^{৯৮} এগুলি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধিক্রম নামে সিদ্ধির পথে বিভিন্ন কৌলধারা বিশেষ। ‘অর্থরত্নাবলী’ গ্রন্থটি জয়রথের আবির্ভাবের আগেই রচিত হয়েছিল, সেখানে পাঁচটি কৌলধারার কথা বলা হয়েছে। যথা- অকুল, কুল, কুলাকুল, কৌল এবং সিদ্ধকৌল।^{৯৯} কৌলরা সাধারণত শক্তিকে কুল এবং শিবকে অকুল বলে থাকেন। তাঁদের

নিখুঁত ভারসাম্যকে পরম বাস্তবতা বা কৌল বলে। পূর্বকৌলরা দিব্যশক্তি এবং শিবকে যথাক্রমে আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরব নাম দিয়েছিলেন। উত্তর-কৌলরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের বিষয়টিতে দৈবশক্তিকে প্রাধান্য দেন, সেক্ষেত্রে শিব নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কৌলধারা সম্পর্কিত সাহিত্য বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়, যার বেশিরভাগই পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বেশির ভাগ কৌলধারার গ্রন্থগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি গ্রন্থ কেবল আমাদের কাছে অন্য রচনায় সংরক্ষিত উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমেই পরিচিত। কৌলমতের সর্বশেষ সিদ্ধি হল সহজসাধনা। সহজেই অবধূত। আগমের থেকে তন্ত্র এল সময়ের কূল ধরে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে। তন্ত্রের সাধন মূলের দুটি রূপ হল— আগমের রূপকল্পে এল সবিকল্প ধারা এবং বিশুদ্ধ তন্ত্র রূপে রইল নির্বিকল্প ধারা, যা এল কল্পনাকে বাদ দিয়ে যোগের উৎকর্ষের পথ ধরে।^{৩৩}

নাথপন্থীরা নাথপদ্ধতিকে ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ বলেন। ‘গোরক্ষবাণী’-তে এই পদ্ধতিকে ‘যোগপন্থ’ বলা হয়েছে—

‘আপা ভাজিবা সৎগুরু পোজিবা
জোগপন্থ ন করিবা হেলা।
ফিরি ফিরি মণিপাজনম ন পায়রা
করিলৌ সিধ পুরিস সুন মেলা।’^{৩৪}

অর্থাৎ অহংকার ত্যাগ করতে হবে। সৎগুরুর সন্ধান করা প্রয়োজন। যোগমার্গকে উপেক্ষা করা যাবে না। সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎ করে নেওয়া উচিত। এই যোগপন্থের বিশিষ্টতা নির্দেশ করতে ‘নাথপন্থ’ শব্দ প্রচলিত হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ সহ অন্যান্য নাথসিদ্ধগণ ‘দ্বৈতাদ্বৈত-

বিলক্ষণ' নামে এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। জালন্ধরনাথ তাঁর 'সিদ্ধান্তবাক্য' নামক পদাবলীতে নাথসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন—

‘দ্বৈতং বাহ্যদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা।’

‘নাথসূত্র’ নামক গ্রন্থেও এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা দ্বৈত বা অদ্বৈত কোন মতকেই পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করেন নি, তেমনি কোনটিকে ভুল বলে ত্যাগ করেননি। তাঁরা মনে করেন দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের সামরস্য না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ-সত্যের সাক্ষাৎকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই জন্যই নাথমতে এমন একটি সর্বাত্মক সামঞ্জস্যের আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়।^{৩৫} এই কারণে ‘সিদ্ধ-পদ্ধতি’-তে সিদ্ধমত, সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগপন্থ, অবধূতমত, গোরখনাথী, মৎস্যেন্দ্রপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন মত এবং মার্গ নাথপন্থে সম্মিলিত হয়ে এক নতুন পন্থের উদ্ভব প্রাপ্ত হয়েছে, যেখানে নাথপন্থ বা যোগপন্থ নামে সাহিত্য প্রসিদ্ধ হয়েছে।^{৩৬} ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে নাথপন্থকে নাথমার্গ বলা হয়েছে—

‘অস্মিন মার্গে অদ্বৈতোপরিবর্তী নাথো দেবতা প্রাপ্যনিরাকারঃ।

জ্যোতিনাথোদ্যেয়ঃ সাকারনাথ উপাস্যোৎথ চ আদিগুরু।’^{৩৭}

নাথপন্থের সাহিত্যে নাথপন্থ, কানফাটা, যোগী, দর্শনী, গোরখনাথী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। নাথপন্থের পরবর্তী পরম্পরায় কবীরপন্থ, নানকপন্থ, দাদুপন্থ, নিরঞ্জণীপন্থ, গরীবপন্থ ইত্যাদি নানা পন্থ তৈরি হয়েছে।^{৩৮}

ভারতীয় সাহিত্যে সিদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক বিভাগ রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রসেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায়। রসেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায়ের মূল দর্শন হল ‘রসেশ্বর দর্শন’।

‘সর্বদর্শন সংগ্রহ’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় রসেশ্বরবাদীরা জীবনুজ্জি তথা অজর অমরত্বের সাধনা করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একরূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা রস বা পারদ ব্যবহার করেন। জীবনুজ্জির জন্য পিণ্ডরক্ষা অবশ্যই তাঁদের জানতে হয়।^{৮৯} রসেশ্বর সিদ্ধদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোবিন্দভগবতাচার্য, চর্পটি, কপিল, কাপালি, কন্দলায়ন প্রমুখ। এঁরা জীবনুজ্জ হয়ে বিশ্বরক্ষাণ্ডে বিচরণ করছেন।^{৯০} এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এঁদের মধ্যে অনেক সিদ্ধই নাথসিদ্ধ। যোগী গোরক্ষনাথ নাথসম্প্রদায়ে পিণ্ডরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন, রসেশ্বর দর্শন থেকে বিষয়টি গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয়। শুদ্ধ মার্গের সিদ্ধ দেহসাধনা বা যোগসাধনার সাহায্যে নিজের দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন। এমনকি দেহত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করতে পারেন বলে বলা হয়েছে।^{৯১} পতঞ্জলি ‘যোগশাস্ত্র’ গ্রন্থে অনেক প্রকার সিদ্ধের প্রকারভেদ দেখিয়েছেন। রসসিদ্ধ বা রসেশ্বর সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, সমাধিসিদ্ধ ইত্যাদি।^{৯২}

তান্ত্রিক পরম্পরায় নাথপন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়, কাশ্মীর ও কেরলে অঞ্চলভেদে তিনপ্রকার মত প্রচলিত রয়েছে। এঁদের উপাস্য হলেন কালী, তারা এবং সুন্দরী। সুমেরু মঠের ‘কুল-কল্যাণী-পদ্ধতি’ গ্রন্থে (হস্তলিখিত পুথি) নবনাথের সূচি পাওয়া গিয়েছে। যেখানে নবনাথের প্রত্যেকের নামের শেষে আনন্দনাথ উপাধি রয়েছে। ‘পরশুরাম কল্পসূত্র’ গ্রন্থে দিব্য, সিদ্ধ এবং মানব সিদ্ধদের নাম পাওয়া যায়। সেখানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছে-- সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সনৎসুজাত, ঋভু, দত্তাত্রেয়, রৈবতক, বামদেব, ব্যাস এবং শুক্র। মানব সিদ্ধদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নৃসিংহ, মহেশ, ভাস্কর, মহেন্দ্র, মাধব, বিষ্ণু প্রমুখ। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে নবনাথ পৌরাণিক, প্রতীকাত্মক

এবং কাল্পনিক সংকেত অবলম্বনে সৃষ্ট হয়েছে। ড. পরশুরাম চতুর্বেদী নবনাথের কল্পনাসূত্র বিচার করে ৩০টি তালিকা উল্লেখ করেছেন।^{৪৩} মক্কাপুরম শিলালেখ (১৩১৮ খ্রি.) শৈবমতের চার সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শৈব, কালানন, শিবশাসন এবং পাশুপত। বামনপুরাণ, শিবপুরাণ, আগম, শ্রীভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র রচিত ‘শারীরক ভাষ্য’, হরিভদ্র সূরি রচিত ‘ষড়্দর্শন সমুচ্চয়’ এবং অন্য আগম গ্রন্থগুলিতে এইসব সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। শৈবসিদ্ধান্ত মতে কালানন সম্প্রদায়কে কারুক বলা হয়েছে। পাশুপত শৈবধারায় লাকুলীশ একটি শাখা বিশেষ।^{৪৪} দক্ষিণ ভারতের কিছু শিলালেখে ছয় প্রকার শৈব সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভৈরব, বাম, কালামুখ, মহাব্রত, পাশুপত এবং শৈব। ড. ভি. এস. পাঠক অনুমান করেছেন যে ভৈরব কাপালিক ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।^{৪৫} আনন্দগিরি (১২৬০ খ্রি.) ‘শঙ্কর দ্বিগ্বিজয়’ গ্রন্থে শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভট্ট, জঙ্গম এবং পাশুপত নামে ছয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।^{৪৬} এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কালানন, কাপালিক, লাকুলীশ, পাশুপত এবং শৈবসিদ্ধান্ত নামক পাঁচ সম্প্রদায়ের বেশি প্রচার ছিল।^{৪৭}

নাথ সিদ্ধধারা, বৌদ্ধসিদ্ধ মত থেকে আলাদা পরম্পরা হলেও অনেক গবেষক মনে করেন উভয়ের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা মনে করেন নাথসিদ্ধ মত বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তিত শৈবমত। এমনকি তাঁরা নাথপন্থকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাখার একটি উপশাখাও বলে থাকেন। এই সিদ্ধান্ত গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি, সাধনপ্রণালী এবং দার্শনিক চিন্তাধারার সাহায্যে বিচার করা যেতে পারে-

রাহুল সাংকৃত্যায়ন সিদ্ধ জালন্ধরপাদকে আদিনাথ বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ‘বিমুক্ত মঞ্জরী’ নামক বজ্রযানী গ্রন্থ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।^{৪৮} ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর

দৃষ্টিতে লুইপাদ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথকেই নাথপন্থের আদিসিদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।^{৪৯} ‘বর্ণনরত্নাকর’ ও ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থে নাথসিদ্ধদের নামের যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথ শিবের কাছ থেকে সর্বপ্রথম হঠযোগ প্রাপ্ত হন এবং লুইপাদই যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ।^{৫০} তিব্বতী পরম্পরায় অবশ্য লুইপাদ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীনপাদকে পৃথক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের কুল (কৌলাচার) সাধনা পরবর্তীতে অকুলমার্গ-শৈবমার্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই কারণে জালন্ধরপাদ হেবজ্র সাধনাগত সিদ্ধকাপালিক মার্গ ছেড়ে নাথমত-সিদ্ধমত-অথবা সিদ্ধামৃত মার্গকে গ্রহণ করেন। মধ্য, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে জালন্ধরনাথের যৌগিক সাধনা ভীষণ প্রভাবিত করেছে।^{৫১} এখন আমরা বৌদ্ধসিদ্ধ ও নাথসিদ্ধ পরম্পরার দর্শনগত ও সাধনগত ধারা সম্পর্কে বিচার করবো। দুইধারাতেই মহাযান বৌদ্ধধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। অবশ্য নাথসিদ্ধধারা শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধসম্প্রদায়। অভিনবগুপ্ত ‘তন্ত্রালোক’ গ্রন্থে অর্ধত্র্যম্বকমার্গ বা তুরীয়মার্গের উল্লেখ করেছেন। ‘তন্ত্রালোকের’ টীকায় মৎস্যেন্দ্রনাথকে তুরীয়নাথ নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ তিনি চতুর্থ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ড. গোপীনাথ কবিরাজ কাশ্মীর শৈব-পরম্পরা ধারাকে নাথমতের প্রাচীন রূপ বলে মনে করেন।^{৫২} নাথপন্থ স্পষ্টত সেশ্বরবাদী কিন্তু সাংখ্যযোগের প্রভাব নাথপন্থে লক্ষ করা গেলেও সাংখ্যযোগীরা সেশ্বরবাদী নন। ড. সুকুমার সেন মনে করেন—

- The Natha-yogis had no concern with God, each of them was God in the universe of his own body.

(The Natha Cult, Cultural Heritage of India, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Vol. IV, p. 280, 1956)

- নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। (নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, বিচিত্র

সাহিত্য, পৃ. ৩; ১৯৫৬)

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতেও, ‘উত্তর ভারতে বৈদিক আর্যধর্ম বিস্তার লাভ করিবার বহু পূর্ব হইতেই এদেশে নিরীশ্বরবাদী যে সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিল, যোগধর্ম তাহাদেরই অন্যতম’ (গোপীচন্দ্রের গান)। এই মতগুলি আমরা সমর্থন করতে পারিনি। কারণ গোরক্ষনাথ নিজেই শক্তিয়ুক্ত জগৎগুরু আদিনাথ শিবকে প্রণাম করে ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থ আরম্ভ করছেন। তান্ত্রিক শাক্তমত, ত্রিপুরামত এবং ত্রিকমতের সাহায্যে অদ্বৈতবাদে আস্থা প্রকাশ করার সময় ‘শক্তিয়ুক্ত শিব’-র উপাসনার কথা বলছেন—

‘আদিনাথং নমস্কৃত্য শক্তিয়ুক্তং জগদ্গুরুম।

বক্ষ্যে গোরক্ষনাথোহং সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিম।।’ -১/১

এই গ্রন্থে আরও দেখা গেল আদিনাথ শিব পরমগুরু এবং তাঁর সন্তানসম পাঁচ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব নাথসম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা—

‘ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।

এতাশ্চ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ সন্তানানাং ক্রমেণ তু।।’ - ৫/৫৪

শৈবযোগী ও তান্ত্রিকেরা শিব ও ঈশ্বর এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কাজেই নাথধর্ম ও যোগসাধনা নিরীশ্বরবাদী নয়। পতঞ্জলিকৃত ‘যোগসূত্র’ এবং ‘কঠ’ ও ‘শ্বেতাস্বতর’ উপনিষদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সাধনার দুটি ধারা—জ্ঞানবাদী আগুকাশী মুনিধারা ও দেবতা-যজ্ঞবাদী ঋষিধারা। বেদে যোগপন্থী মুনিরা ছিলেন ‘অ-দেবা, অ-যজ্ঞা’ বলে নিন্দিত। মুনিধারার লক্ষ্য মোক্ষ বা অমৃতত্ব; ঋষিধারার লক্ষ্য স্বর্গ ও দেবলোক। যোগে অন্তরক্রিয়া প্রবল, তন্ত্রে বাহ্যক্রিয়া। একই মন্ত্রে অধ্যাত্মার্থে যোগ এবং অধিভূতার্থে তন্ত্রের ধারা বহমান।

যোগে Mystic sense, তন্ত্রে আছে Occult power। বৈদিক ধর্মে দুয়েরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। ত্রিয়াকাণ্ডমূলক পূজোতে পূজারীর অঙ্গ-ন্যাসের পর যোগীর বিধানে নিজে দেবতা হয়ে পূজো সমাপন ঘটে। যোগ হচ্ছে ‘কর্মসুকৌশলম’ অথবা ‘কর্মকু-রঙ্গ’। বেদে ‘ঈশ্বর’ অর্থ রাজা, মালিক, সম্পত্তির অধিকারী। পরমাত্মাসূচক শব্দ হচ্ছে ‘পুরুষ’, ‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’। পতঞ্জলির ‘যোগসূত্র’-ই প্রাচীনতম গ্রন্থ যেখানে ‘ঈশ্বর’ পুরুষ ও পরমাত্মাসূচক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঈশ্বর বেদের পরমপুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম। প্রণব ওঁ তার বাচক। ওঁ-কারের সাধনায় সাধক ঈশ্বর হয়ে যান। পরমাত্মাসূচক যোগরূঢ় শব্দ ‘ঈশ্বর’ যোগপন্থী জ্ঞানবাদী শাখার অবদান।^{৫০} অর্থাৎ নাথপন্থে ঈশ্বর পাতঞ্জলের ঈশ্বর থেকে পৃথক নয়। তাঁদের গ্রন্থে শিব ও ঈশ্বর শব্দটি একার্থবাচক রূপে ব্যবহার করেছেন। আগম-নিগম গ্রন্থে ‘শিব উবাচ’ না বলে সর্বদা ‘ঈশ্বরোবাচ’ বলা হয়েছে। এই শিব-ঈশ্বর যোগী, যোগীর গুরু, যোগধর্ম-প্রবর্তক, যোগীর আদর্শ এবং নাথযোগীদের বংশপিতা। ‘Isvara (of Yoga Sutra) is only an archetype of the yogin— a macro-yogin,— very probably a patron of certain yogic sects.’^{৫৪}

বৌদ্ধ অপভ্রংশ সাহিত্য পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তান্ত্রিক শক্তিধারা, মন্ত্র, সিদ্ধি, পঞ্চ-ম-কার সাধনা, রাজযোগ, হঠযোগ ইত্যাদি তত্ত্ব সহজযানের পূর্ববর্তী বৌদ্ধধারা বজ্রযানে স্বীকৃত হয়েছে। সহজিয়া সিদ্ধ অপভ্রংশ সাহিত্যে গুরুশিষ্য পরম্পরা, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবাদ, কমল-কুলিশ সাধনা বা প্রজ্ঞা-উপায় সাধনা, ধ্যান, বামাচার, দক্ষিণাচার সাধনার প্রভাব পড়েছে। কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদ রচিত সহজিয়া অপভ্রংশ সাহিত্যে মন্ত্র, তন্ত্র ও হঠযোগের পরিচয় পাওয়া যায়—

‘আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।

তা দেখি কাহু বিমন ভইলা।।’ [চর্যা -৭]

বৌদ্ধসাহিত্য থেকে জানা যায় বুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকেই যোগসাধনার প্রাবল্য ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে গয়ার নিকটবর্তী পাহাড়ে যোগসাধনা করেছেন। সেখানে তাঁর আত্মনিরীক্ষণ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন।^{৫৫} তিনি ধ্যান, যোগের কথা বলেছিলেন তাঁর শিষ্য মহাকশ্যপকে। বুদ্ধের উপদেশ পেয়ে অনেক অনুগামী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারপর বৌদ্ধধর্মে যোগধারা গৃহীত হয়।^{৫৬} রাজযোগ, হঠযোগ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। এরপর বৌদ্ধ তন্ত্র নির্মাণ শুরু হয় এবং তন্ত্রসাধনাকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ যোগশাস্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ লাভ করে।^{৫৭} বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগধারা প্রথম লক্ষ করা যায় ‘গুহ্য-সমাজ-তন্ত্র’ নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে যোগসাধনার উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে যোগের বিভিন্ন বিষয় যেমন-প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি, সমাধি সহ যোগের ছয় অঙ্গের নিয়মিত অভ্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে।^{৫৮} বজ্রযান থেকে মন্ত্রযান, সহজযান, কাল-চক্র-যান ধারায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য সিদ্ধসাহিত্য নামে পরিচিত। কিন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথসিদ্ধ ভিন্ন শ্রেণি এবং উভয় সাধন প্রণালীতে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যই অধিক। তবে উপরোক্ত বৌদ্ধ মহাযান ধারাগুলি জড়বাদী বৌদ্ধ দর্শনের যতদূর সম্ভব বিপরীত। বস্তুত মহাযান বৌদ্ধধর্ম নতুনভাবে নতুনরূপে হিন্দুধর্মেরই পুনঃজাগরণ ঘটিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নাথধর্ম গোঁড়াহিন্দু, বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করেছে। হজসন (Hodgson) মনে করেন— ‘Nathism or Saintism serves as the bridge uniting the orthodox and heterodox, the Brahmanical and

Saugata sects.’^{৫৯} জে. এন. ফকুহর-র অভিমত - ‘Both Tantric Buddhism and Tantric Hinduism glorify the whole company of sainted Nath.’^{৬০}

তবে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাথধর্মের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। সহজিয়া ও নাথ সিদ্ধগণ উভয়ই হঠযোগ সাধনা অবলম্বন করে সিদ্ধদেহ লাভের সাধনা করেন। বজ্রদেহ ও সিদ্ধদেহ একই। নাথযোগীদের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ী এবং সহজিয়াদের ললনা, রসনা ও ডোম্বী নাড়ী শুদ্ধ না করলে শিব-শক্তির (প্রজ্ঞা-উপায়) সামরস্য সম্ভব নয়। নাথ ও সহজিয়া সিদ্ধরা উভয় সম্প্রদায়েই পূজ্য। এইসব সাদৃশ্য লক্ষ করে অনেক গবেষক নাথধর্মকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ‘সহজিয়া মতের সাথে নাথ মতে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত যুক্ত মুক্তমার্গ বিশেষ।’^{৬১}

বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও অনেক প্রাচীন। এই ধর্ম প্রথম থেকেই কঠোর পরিশুদ্ধ ছিল। তবুও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভাবে মন্ত্রসাধনা এবং যোগাভ্যাস অনুশীলনের মাধ্যমে অলৌকিক কাজ করার প্রবণতা বিকশিত হয়েছিল।^{৬২} ফলস্বরূপ মঠবাসী এবং চেতনা সম্পন্ন মানুষ, যাঁরা তান্ত্রিকযোগ অনুশীলন করে তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।^{৬৩} জৈনধর্ম অনুসারে সমস্ত উপায় দ্বারা আত্মার শুদ্ধি এবং মোক্ষ অর্জন সম্ভব হলে তাকে যোগ বলে। তবে জৈন আগমে ধ্যান মূলত যোগ হিসাবে বিবেচিত হয়। চার ধরনের ধ্যান রয়েছে, যাকে যথাক্রমে আত্ম, রুদ্র, ধর্ম এবং শুক্ল বলা হয়েছে। তার মধ্যে শুক্ল ধ্যান খাঁটি ধ্যান বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। এর দ্বারা এক নিমেষে দুঃখরূপ কাঠামোটি ভস্ম হয়ে যায়। জৈন দর্শনে সম্যক দর্শন, সম্যক শ্রুতি এবং সম্যক চরিত্রকে যোগসিদ্ধির সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মা

প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই পরিচিতির দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এই বন্ধন থেকে মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ। পরবর্তীকালে জৈনধর্ম হঠযোগ এবং মন্ত্রযোগ উভয়ই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হঠযোগকে একেবারে অপরিহার্য বলে মনে করেনি। ষড়ঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ যোগে প্রাণায়ামের প্রাধান্য রয়েছে, তবে জৈনাচার্যগণ একে আবশ্যিক বলে মনে করেন নি। জৈনাচার্য হরিভদ্র সূরি (খ্রি.৭৫৭-৮২৭) ছিলেন তাঁর যুগের বিখ্যাত দার্শনিক এবং যোগী।^{৬৪} তাঁর গ্রন্থের তালিকার দিকে তাকালে জানা যায় যে তিনি জৈনাগম সম্পর্কে ভাষ্য লিখেছেন। আগম সম্পর্কে বহু বিষয় লিখেছেন; গল্প, দার্শনিক রচনা, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং স্তুতিগ্রন্থ তাঁর রচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটা সম্ভবত যে যোগ সম্পর্কে লেখার পাশাপাশি, আচার্য নিজেও যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ উদারতাবাদ তাঁর জীবনে স্থান লাভ করে।^{৬৫} তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে কোনও আত্মসন্ধানী ব্যক্তি যদি প্রাণায়াম থেকে উপকৃত হন তবে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে, এতে কোনও নিষেধ নেই। তবে প্রাণায়াম প্রত্যেকের প্রয়োজন হয় না। জৈনধর্মে শিবশক্তি, সামরস্য বা যুগনন্ধের মতো ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী জাগরণের কোন ধারণাও নেই। তবু তিনি যোগকে মোক্ষ অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।^{৬৬}

এমনকি জৈনসম্প্রদায়ের প্রচলিত অপভ্রংশ দোহাতেও যোগপন্থী সিদ্ধ সাধকের প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়-

‘প্রশ্ন। কালহিঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ
চউ একট ঠহঁ বাসু।

হউঁ তুহিঁ পুচ্ছউঁ জোইয়া
 পহিলে কাসু বিণাসু।।
 উত্তর। সসি পোষই রবি পজ্জলই
 পবণ হলোলে লেই।
 সত্ত রজ্জু তমু পিল্লি করি
 কন্মইঁ কালু গিলেই।।'^{৬৭}

নাথসম্প্রদায়ের মতন জৈনধর্মের প্রথম গুরু আদিনাথ। জৈনধর্মের সিদ্ধান্তের মধ্যে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এবং অলৌকিক সিদ্ধিলাভের স্থান আছে। সুতরাং তাদের আদর্শ, সাধনপন্থা এবং উপাধিতে নাথধর্মের একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ নাথসিদ্ধ দত্তাত্রেয় নাথের গুরু ছিলেন। গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি রাজ্যে একসময় নাথ ও জৈন সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাস ছিল এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলত। ড. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, ‘পরবর্তীকালে ইহার (জৈনধর্মের) এক শাখা রসসিদ্ধি, আসনবন্ধ, মুদ্রাদিকরণ প্রভৃতি যোগচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শৈব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া নাথধর্মে রূপান্তরিত হয়।’^{৬৮}

আজীবিক ধর্মের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের অনেক আচরণগত, সাধনপ্রণালীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য চোখে পড়ে। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের আগেই আজীবিক বা অচেলক সম্প্রদায়গুলির আবির্ভাব ঘটে। এমনকি বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের সময়েও মঙ্করী গোশাল নামে একজন সিদ্ধপুরুষ আজীবিক নামে অচেলক বা উলঙ্গ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু সম্প্রদায় গঠন করেন। কোশলদেশে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গোশালের বাবা-মা নখ বা মংখ নামক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক-পরিব্রাজিকা ছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে এদেশের অনেক ধর্মসম্প্রদায়

তাঁর চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত গোশালপন্থী আজীবিকদের সাধন পদ্ধতি ছিল। ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মতানুযায়ী আজীবিক সম্প্রদায় ও নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলের বিষয়গুলি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

- উভয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে তিননাথ বা ত্রিতীর্থঙ্কর গুরু বা সিদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়েছেন – আজীবিকরা নন্দবৎস, কৃষা সংকৃত্যায়ন এবং মঙ্করী গোশাল; অন্যদিকে নাথপন্থে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ।
- উভয় সম্প্রদায় নাচ ও গানকে আশ্রয় করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিল।
- তারা দুই সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন যে মানুষের স্তরে পৌঁছাতে একটি আত্মাকে চুরাশি লক্ষ পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।
- উভয়ই অনন্ত মানস বা সহস্রার পরে আত্মার উচ্চ শর্ত হিসেবে হঠযোগের মাধ্যমে পৌঁছাতে আগ্রহী, যেখানে প্রাণায়াম বা প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য।
- তারা দুই সম্প্রদায় চতুরঙ্গ সাধনার উপর দাঁড়িয়ে আছে।^{৬৯}

বিভিন্ন কারণে পূর্বভারতের একসময়ের প্রভাবশালী সম্প্রদায় আজীবিকরা অস্তিত্বের সংকটে ভুগছিল। বর্ণাশ্রমপন্থী মানুষেরা তাদের প্রতিকূল মতাবলম্বী এবং বিদ্বেষবশত হয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তারফলে পূর্বভারতের অধিকাংশ আজীবিক সম্প্রদায়ের মানুষ নবম-দশম শতাব্দীতে নাথসম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া মনে করেন—

তাঁহারা খৃষ্টীয় ১০ম কিংবা ১১শ শতাব্দীতে শৈব শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন।

সম্ভবত এই সময়েই প্রাচীন আজীবিক ধারা মৎস্যেন্দ্র প্রমুখ

নাথগুরুদিগের হস্তে এবং যোগীপাল, মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র রাজার
পৃষ্ঠপোষকতায় নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল।^{৭০}

নাথধর্মের সাধনাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত এবং বেদ, পুরাণ, যোগ, তন্ত্রের
এক অভিনব সমাবেশ হয়েছিল।^{৭১} ড. সুকুমার সেনের মতে মীননাথ-গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়
ছিল জ্ঞানান্বিত যোগমার্গাবলম্বী। জালন্ধরনাথ (হাড়িপা)-কানপার সম্প্রদায়ও যোগমার্গী ছিল
কিন্তু তা পুরোপুরি জ্ঞানান্বিত ছিল না, তাতে তান্ত্রিকসাধনা চলত। প্রথমটি অবধূত-যোগী
সম্প্রদায়, দ্বিতীয় কাপালিক যোগী-সম্প্রদায়। বাংলার নাথপন্থ সাহিত্যে মীনচৈতন্য কাহিনিতে
দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রকটিত হয়েছে এবং শেষে অবধূত-যোগীরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে।
তারপর অবধূত-যোগী ও কাপালিক-যোগী সম্প্রদায় মিলে গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই
নাথপন্থ।^{৭২}

মূলকথা হল নাথসংস্কৃতিতে পাশুপত, হঠ, লয়, তন্ত্র, কৌল, কাপালিক, কালামুখ,
লাকুলীশ ও ভৈরবধারার সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিক ধর্মও
প্রভাবিত করেছে। পাশুপত ধারার সবচেয়ে উপরে কৌলমত প্রাধান্য লাভ করে। তাই
কৌলমতকে অর্ধদ্রাব্যক মত বলা হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলমত ভোগমোক্ষ-প্রাপক মার্গ।
কিন্তু গোরক্ষনাথ ভোগসাধন মার্গকে গ্রহণ করেননি। সম্ভবত সেই কারণে মৎস্যেন্দ্রনাথের
দ্রাব্যককৌল পরবর্তীতে অর্ধদ্রাব্যক কৌলমতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া পুরনো অনেক শৈব
সম্প্রদায়কে গোরক্ষনাথ নাথপন্থে ফিরিয়ে এনেছেন। অভিনব গুপ্ত ‘তন্ত্রালোকে’ (১/২৫) গ্রন্থে
মৎস্যেন্দ্রনাথকে প্রভাবশালী সিদ্ধ হিসেবে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন—

‘রাগারুণং গ্রন্থিবিলাবকীর্ণং যো
জালমাতানবিতানবৃন্তি।

কলোন্মিতং বাহ্যপথে চকার তান মে

স মচ্ছন্দ বিভূঃ প্রসন্নঃ।।^{৭৩}

অভিনবগুপ্তের গুরুপরম্পরা এইরকম— মৎস্যেন্দ্রনাথ> সুমতিনাথ> সোমদেব> শম্ভুনাথ> অভিনবগুপ্ত।^{৭৪}

নাথসিদ্ধদের সিদ্ধির আরেকটি মাধ্যম হল ঔষধি; যেমন জড়িবি, খনিজপদার্থ, ভেষজ ইত্যাদি। আদিনাথ রচিত ‘খেচরীবিদ্যা’ গ্রন্থে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। (৪.১-৪) খেচরীবিদ্যা হল ‘মৎস্যেন্দ্রসংহিতা’-র পূর্ববর্তী সংস্করণের পরবর্তী সংযোজন।^{৭৫} হঠযোগ ব্রাহ্মণ্যযোগ ও তান্ত্রিকযোগ উভয়েরই উত্তরাধিকারী ছিল, কারণ এটি পরবর্তীতে কৌল-শৈববাদে বিকশিত হয়েছিল।^{৭৬} পূর্বভারতে কৌলধারা বিকাশের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতেও তা বিস্তার লাভ করে। মৎস্যেন্দ্রনাথ কৌলধারার পাশাপাশি বজ্রযানী বৌদ্ধধারার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।^{৭৭} তিনি (মৎস্যেন্দ্রনাথ) যোগিনী কৌলধারার প্রতিষ্ঠাতা। কৌলধারায় দুটি পথ-সহজসাধনা ও কুণ্ডলিনী সাধন।^{৭৮} কিন্তু নাথপন্থে সহজ-ভাবনা শৈবধারা থেকে এসেছে। নাথপন্থী যোগীরা সেকারণে বৌদ্ধ ভাবনাকে মানেন নি, সহজ-মত বরাবর শিব-শক্তির মিলন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য নাথেরা দেহস্থ শক্তি যা দেহস্থ মুদ্রা খেচরীর অর্থ উপলব্ধি করতে গ্রহণ করেছেন।^{৭৯} ‘মৎস্যেন্দ্রসংহিতা’-র উৎস দেবী কুজিকার ধর্ম, বিশেষ করে এটি দক্ষিণ ভারতীয় সম্ভব-ধারা। প্রথম দিকের নাথপন্থের সঙ্গে কুজিকামতের যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর, প্রারম্ভিক নাথপন্থ হল যোগিনী কৌলমত।^{৮০} ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা মুখ্যত কৌলাচারের উপাসনা। বালসুন্দরী হল ত্রিপুরাসুন্দরীর শিশুরূপ, এই দেবী হলেন দক্ষিণ ভারতীয় কৌল সংস্করণের দেবী। হিংলাজ দেবীও নাথযোগী সম্প্রদায়ে বালসুন্দরী দেবীর সঙ্গে যুক্ত।^{৮১} কল্যাণী মল্লিকও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে প্রাচীনকালে নাথধর্মীরা

‘কৌল’ নামেই পরিচিত ছিলেন। এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষার পরে ‘নাথ’ পদবি যোগ করা হয় বলে এঁরা ‘নাথযোগী সম্প্রদায়’ রূপে পরিচিত।^{৮২} বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে নাথপন্থের অধিক যোগাযোগ আছে, একথা সঙ্গত নয়। নাথমতে শিবশক্তির সামরস্য দ্বারা এবং বৌদ্ধসহজিয়ামতে শূন্যতা-করণার মিলনের দ্বারা চিত্তের সমতালাভই উদ্দেশ্য। তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ, তন্ত্রের আগম শ্রবণ করে মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগধর্ম শিক্ষাও প্রচার করেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ নিজেকে কৌল বলেছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত কৌলগ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্র নেই।^{৮৩} প্রবোধচন্দ্র বাগচীও নাথপন্থের উদ্ভবে বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করেননি—

But judging from the literary records and the legends and traditions still prevalent among the yogins of the Nath order it appears that the Nath cult has grown with a general air of Saivism.^{৮৪}

নাথ ‘হাড়মালা’ গ্রন্থে গৌরী শিবকে অমরত্ব লাভের উপায় জানতে চাইলে মহাদেব ব্রহ্মের স্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, নাড়ী ও বায়ুতত্ত্ব, জীবাত্তা, মন, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, চন্দ্র-সূর্য, ষট্চক্রভেদ, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, হংসতত্ত্ব, ওঁ-কার তত্ত্ব, নাদ-বিন্দুতত্ত্ব, নাথ-নিরঞ্জন স্বরূপ প্রভৃতি আলোচনা করেন। নাথধর্ম সাধনার একটা সামগ্রিক রূপ এখানে লক্ষ করা যায়।^{৮৫} পঞ্চম-কার যা কৌলক্রিয়া বিধি-বিধান, মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে প্রদান করেছিলেন তা মোক্ষমুক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলে যোগী ড. বিলাসনাথ উল্লেখ করেছেন।^{৮৬} কল্যাণী মল্লিক আরও বলেছেন—

The Natha Yogis were at one time all known as Kaulas, a special branch of the Tantriks, who were worshippers of the Goddess. Matsyendranath initiated Gorakhnath, Guru Gorakhnath initiated Jalandharnath. In a drama discovered

in Nepal on Gopichandra's renunciation, we find Jalandharnath telling Gopichandra that he was the king of Jalandhar and had given up his throne and seven hundred queens to become a yogi. Jalandhar later on became Gopichandra's guru.^{৮৭}

নাথপন্থের প্রাচীন ঐতিহ্য কৌলমার্গ থেকেই সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নাথযোগী পরম্পরা চলে আসছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে কুলাবধূত যোগী সৎপুরানন্দনাথ জানিয়েছেন যে নাথধারায় গৃহস্থ ও বজ্রব্রহ্মচারী হতে পারেন যদি তিনি শিবসংহিতায় উল্লিখিত সহজোলী যোগমুদ্রা দ্বারা মৈথুনে উর্ধ্বরেতা হতে পারেন। নবনাথদের মধ্যে কেবলমাত্র গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের মৈথুনসাধনাকে ত্যাগ করেছিলেন। তাই গোরক্ষনাথের ধারার দর্শনী নাথযোগীরা কৌপিনাদি বাহ্য ব্রহ্মচর্য রাখতে বাধ্য হন। নাথধারা বা কৌলধারা কোথাও বাহ্য ব্রহ্মচর্য স্বীকৃত নয়, নাথসিদ্ধকে বজ্রোলী মুদ্রা দ্বারা একক সাধনায় ব্রহ্মচর্য অথবা সহজোলী মুদ্রা দ্বারা যুগল সাধনায় বজ্রব্রহ্মচর্যই বিহিত আদেশ। যোগী যুগলসাধনা বা একক সাধনা যেকোন একটি সাধনা করেন। যুগলসাধনা সঙ্গীক বা শৈববিবাহে (মহানির্বাণ তন্ত্র নির্দেশিত) অথবা যোগিনী (ভৈরবী) বরণ করে সাধনা করতে পারেন। অবধূতগণের সন্তান ধারণেও নিষেধ নেই, কারণ উর্ধ্বরেতা সাধন যা অবধূতি নাড়ী খোলবার উপসাধনা বা প্রস্তুতি তা তার হয়ে গিয়েছে। যেমন – শিব, নিত্যানন্দ প্রমুখ। কৌলক্রম নাথসম্প্রদায়ের আবশ্যিক সাধনা। কৌলসাধনায় দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-শূন্য ক্রমে পাঁচটি স্তরের সাধনায় হঠ-ক্রিয়া-রাজ-সাম্রাজ্য-সহজ যোগসাধনার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে কাপালিক সাধনা বলা হয়েছে। তা কপাল বা মাথা বা মেধার যোগসাধনা। যোগিনীক্রম নাথক্রমেরই প্রকৃতিক্রম, উমানাথ (আইপন্থ), জয়ন্তীনাথ, ভানুমতী, লীলাবতী... এঁরা যোগিনীক্রম। নাথেরা বিবাহ করলেও তাঁদের গৃহস্থ বলা যায় না। কারণ তাঁরা যুগলসাধনায় উর্ধ্বরেতা শিবস্বরূপ বা সেই সাধনায় ব্রতী। শিবস্বরূপ হলেই তিনি

নাথ এবং জগৎকে আদেশ করতে পারেন। অবধূতগণ মৎস্যেন্দ্রনাথের মতো কৌলের কুল রাখতে সন্তান ধারণ করেছেন। তাঁদের সন্তানেরা গৃহস্থ হলেও তাঁরা নিজেদের নাথবংশ বলে পরিচয় দিতে ‘নাথ’ একটি পদবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাথসিদ্ধদের অধিকাংশই যুগল শিবস্বরূপ। মৎস্যেন্দ্রনাথ নিজেও লীলাবতীকে শক্তিরূপে বরণ করেছিলেন।^{৮৮} নাথ পরম্পরায় যোগীদের পাশাপাশি পরিবারভুক্ত ধর্মসাধকদের কথা বলা হয়েছে। ‘গোখবিজয়ে’ প্রথম বর্গের (সংসার বিরক্ত যোগীদের) আর ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ গ্রন্থে দ্বিতীয়-বর্গের (সংসারী নাথ যোগীদের) কাহিনি উপস্থিত।^{৮৯}

যোগসাধনায় যোগিনীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৌলমার্গে যোগীর চক্রসাধনায় যোগিনী অন্যতম সহযোগী। সেক্ষেত্রে যোগিনী একজন যোগীর মহিলা প্রতিকল্প। এই প্রক্রিয়ায় তিনিও কিছু যোগলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেন, তাই এই পথ অনুসরণকারী নারীও যোগিনী। মোগল এবং রাজপুত উভয় চিত্রকর্মে এইসব মানব যোগিনীকে প্রায়শই তপস্বী হিসেবে বা যোগীর আসনভঙ্গিতে উপবিষ্ট হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে যোগচর্চার মাধ্যমে যোগিনীরা অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেন যা প্রায়ই জাদুকরী অলৌকিক প্রকৃতির হয়।^{৯০} কৌলমার্গে উপাস্য দেবদেবী হলেন শিব ও শক্তি। কৌলধারার অন্তর্গত যোগিনী কৌলধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দেবীর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে চৌষটি যোগিনীর পূজো। চৌষটি যোগিনীর নামের মধ্যে শক্তিদেবীর বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্থানে মৎস্যেন্দ্রনাথের তারাদেবীর পূজো করার উল্লেখ রয়েছে। সে যাই হোক যোগিনী পূজোর বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত রহস্যময় ও গোপনীয়।^{৯১} খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর পূর্বেই যোগিনী কৌলধারা ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে সব জায়গায় পৌঁছে যায়। কামরূপ

এবং বাংলা যোগিনী কৌলধারার প্রধান কেন্দ্র ছিল।^{৯২} এইসময় পর্বে রচিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র স্কন্দপুরাণে চৌষটি যোগিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্য প্রমাণ করে যে সেই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের মানুষের মধ্যে যোগিনী কৌলধারা জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।^{৯৩} মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারার সঙ্গে কাপালিক ধারারও মিল রয়েছে।^{৯৪} ‘হাড়মালা’ আদি-বৈদিক যুগের মুনিধারার গুহসাধন পদ্ধতি ও দর্শন নির্ভর একটি গ্রন্থ। এখানে দ্বাদশ যোগিনীর নাম তাঁদের অনুচর দ্বাদশবৃত্তির নাম পাওয়া যায়। যোগিনীরা হলেন— মঙ্গলা, জাবালিকা, মেধা, শিবরূপিনী, শাকম্বরী, ভীমা, শান্তি, রুদ্ররূপিনী, অম্বিকা, শাকিনী, হাকিনী, ব্রহ্মাণী, ভারতী, চণ্ডিকা, কাকিনী ও বুদ্ধিরূপিনী প্রমুখ।^{৯৫} মৎস্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ‘হাড়মালা’ অনুসারে বলা যায় নাথপন্থ আদিতে কৌলধারা নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে গোরক্ষনাথের গুরু হিসেবে মৎস্যেন্দ্রনাথ যুক্ত হয়েছেন। তখন নাথ সিদ্ধকৌলধারা যোগিনী কৌলধারা বা সিদ্ধমত বা উত্তর কৌলধারায় পরিণত হয়েছে। সেখানে শক্তিদেবীরা প্রধান হয়ে উঠেছেন, শিবের ভূমিকা নিক্রিয়। নাথদের সাধনা তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরের বা রূপান্তরের সাধনা। তবে নাথসিদ্ধ মতের সঙ্গে রসেশ্বর সিদ্ধমতের কোনো পার্থক্য নেই। পূর্বকৌল নাথমত ক্রমশ সিদ্ধমত এবং রসায়ন মতে স্থাপিত হয়েছে। ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথমে সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত মার্গের সিদ্ধ ছিলেন। পরে কামরূপে বামমার্গের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যা যোগিনী কৌলজ্ঞানের সাধনা। এর আরও পরে প্রবীণ শিষ্য গোরক্ষনাথের প্রভাবে পুরনো সিদ্ধকৌলমতে সরে আসেন।^{৯৬} দ্বিবেদীর বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের পরম্পরা প্রাচীন কৌলপরম্পরা শেষে যোগিনী কৌলধারায় বিকশিত হয়েছে তা হল শাক্ত পরম্পরা।^{৯৭} আবার ‘যোগিসম্প্রদায়াবিস্তৃতি’ গ্রন্থের

রচয়িতা চন্দ্রনাথ যোগীর কথা থেকে জানা যায় বামমার্গের পরম্পরার মানুষেরা গোরক্ষনাথকে নিজেদের মার্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।^{৯৮} এই কারণে হয়ত এসব মানুষ গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে শাক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে সিদ্ধ কৌলমার্গ পরিবর্তন করে শেষে যোগিনী কৌলধারা প্রবর্তন করতে হয়। গোরক্ষনাথকে সিদ্ধ কৌলমার্গেই মৎস্যেন্দ্রনাথ দীক্ষা দিয়েছিলেন। কাশ্মীর শৈবমতের ধারায় তাঁর পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’, ‘মৎস্যেন্দ্র সংহিতা’ ইত্যাদি মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারার গ্রন্থ হলেও ‘অকুলবীর তন্ত্র’ পূর্বে পরিত্যক্ত পরে স্বীকৃত সিদ্ধধারার গ্রন্থ। এখান থেকে মনে হয় গোরক্ষনাথ যখন বিভিন্ন নাথমত পুনর্গঠন করে একই ছাতার নিচে আনার চেষ্টা করেছেন তখন কুল (শক্তি) নয়, অকুল (শিব) সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থাৎ যোগিনী কৌলধারা নাথপন্থে গ্রহীত হল না। গোরক্ষনাথের গোষ্ঠী নাথপন্থে প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠল। ফলে বাংলাভাষায় রচিত ‘গোরক্ষবিজয়’ ও ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ বা গান ইত্যাদি রচনায় গোরক্ষনাথীদের প্রভাব বেশি করে লক্ষ করা গেল। প্রবোধচন্দ্র বাগচী সেই কারণেই হয়ত বলেছেন প্রথম দিকের কিংবদন্তির কোথাও মৎস্যেন্দ্রনাথের চারিত্রিক স্থলনের পরিচয় পাওয়া যায় না—

In later legends there is an attempt everywhere to establish the superiority of Goraksanatha over his Guru by introducing the story according to which he rescued the latter from the hands of the women at Kamrupa.^{৯৯}

যোগিনী কৌলসাধনার কারণেই মৎস্যেন্দ্রনাথকে কদলীরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল। যোগিনী কৌলসাধনায় যুগলসাধনা সঙ্গীক বা শৈববিবাহ (মহানিব্বাণ তন্ত্র) অথবা যোগিনী (ভৈরবী) বরণ করে সাধনা স্বীকৃত রয়েছে। আজও বাংলায় মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী

কৌলধারা, কানুপানাথের কাপালিক ধারা (পা-পন্থ) ও নটেশ্বরী (অঘোর যোগী) পন্থের সাধনায় যুগল সাধনায় ভৈরবী (যোগিনী) সাধন লক্ষ করা যায়।

সুকুমার সেনের মতে নাথপন্থে মূলতত্ত্ব হচ্ছে বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, ভাণ্ডে-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন এবং আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে কালজয়। শেষে নাথযোগীগুরুরা অবধূতমাগী হলেন, কাপালিক-যোগী সাধকেরা সন্ন্যাসী ও গৃহস্থে পরিণত হলেন।^{১০০} নাথপন্থের সাধন পদ্ধতির মূলরূপ উপনিষদের যোগধারা এবং আগমধারায় নিহিত রয়েছে। যৌগিক প্রক্রিয়া তন্ত্রসম্মত রূপে মুনিপরম্পরা থেকে শ্রমণধারা ও আগমধারা রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের ব্রাত্যযোগীরা রুদ্র উপাসনা করতেন এবং তারা প্রাণায়াম ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়ার মহত্ব উল্লেখ করেছেন। নিজেদের সাধনা শক্তিতে তারা মৃত্যুকে জয় করে যজ্ঞাদি কর্মকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অরূপ-বস্তুর ধ্যান ও চিন্তায় নিরত থাকতেন।^{১০১} যোগসাধনার জন্য চিত্ত নির্মলতার বিধান অত্যন্ত যথাযথ রূপে নাথযোগে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উপনিষদ এবং ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’-কে মান্য করা হয়েছে। কঠোপনিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্থির ধারণায় হল যোগ।^{১০২} নাথযোগীদের শিব-শক্তি স্বরূপে যে সাধনা প্রচলিত রয়েছে তা বেদান্তে ব্রহ্ম-মায়া, সাংখ্যে প্রকৃতি-পুরুষ, বৈষ্ণবগমে নারায়ণ-লক্ষ্মী বা কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতা স্বরূপেও লক্ষ করা যায়। এইভাবে আমাদের পরমতত্ত্বের স্বরূপ দেখতে হয়, জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং তাকে লাভ করার জন্য সাধন ভাবনা উপনিষদের মধ্যেই রয়েছে; নাথযোগীরা তাকে সাধনার ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।^{১০৩} উপনিষদের ঋষিরা বললেন পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের মধ্যে আছে। বাইরে যাবার দরকার কি? যা বাইরে আছে তা সবই তোমার মধ্যে আছে।^{১০৪} এসব কথা বেদের প্রথম দিকে পাওয়া যায় না। মানুষের

মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। (অথর্ব ১০/৭/১৫) তপস্যা, শ্রদ্ধা, সাধনা সবই এই মানুষেরই মধ্যে। (অথর্ব ১০/৭/১) ঋক, যজু, সাম সবই এই মানুষের মধ্যে। (অথর্ব ১০/৭/২০) ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক সবই এই মানুষে। (অথর্ব ১০/৭/২২) ব্রহ্মও মানুষের মধ্যে আছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে— ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’। (৩/১৪/১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হল ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম। (২/৫/১৯) বেদের প্রথম দিকে দেবতাদের কথায় আছে। অথর্ববেদেই মানুষ ও পৃথিবীর দিকে সবাই দৃষ্টি ফেরালেন। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড জুড়ে ব্রাত্য-মানুষের জয়গান করা হয়েছে। অর্থাৎ ধার্মিক বলেই মানুষ শ্রদ্ধেয় নয়, মানুষ বলেই মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। কাজেই মনে হয় মানুষের ও জগতের মাহাত্ম্য বিষয়ক কথা বৈদিকদের নিজস্ব নয়। এদেশে এসে তাঁরা এইসব পেয়েছেন ও ক্রমে তা আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমে এসব কথা উপনিষদে স্থান পেল। এদেশের নাথ যোগপন্থে নিরঞ্জনপন্থে এগুলিই হল আসল কথা।^{১০৫} নাথযোগ সাহিত্যে সুষম্বেদ বা সূক্ষ্মবেদ সংজ্ঞাটি ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার বেদ সংজ্ঞাটিরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘গোরক্ষোপনিষদে’ বলা হয়েছে—

‘ঋক-যজু-সামাথর্ব এই চারি বেদ।
ব্রাহ্মণেরা পড়ে যাহা— হয় স্থূলবেদ।।
তাদের রহস্যতত্ত্ব— সূক্ষ্মবেদ খ্যাত।
প্রণব-আকার তত্ত্ব—তাই সূক্ষ্ম খ্যাত।।
সেই সূক্ষ্ম বেদপাঠী ছিল শ্রীমৎস্যেন্দ্র।
নাথপন্থে সূক্ষ্মবেদী যতেক যোগীন্দ্র।।’

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যুগেও অনেকে নিবিদ-মন্ত্র ধ্যানের মাধ্যমে দেবতার সাধনা করতেন— ‘শংসন্তি কেচিদ নিবিদো মনানঃ’ (৬/৬৭/১০)। নিবিদ-মন্ত্র অনুযায়ী সাধকদের বলা হত ‘ন-

বেদঃ', যার অর্থ বেদের গুঢ় রহস্যার্থবিদ। প্রাচীনযুগে ওঁ-কারই ছিল সর্বত্রাণকারক গায়ত্রী মন্ত্র। ঋগ্বেদে ওঁ-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

‘ঋচোঃ অক্ষরে পরমে ব্যোমন
যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যন্তন্নবেদ – কিম্‌চা করিষ্যতি
য ইত্ত্বিদ্বিস্তু ইমে সমাসতে।।’- ১/১৬৪/৩৯

যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—

‘পরম ব্যোমেতে যেই ঋকের অক্ষর—
বিশ্বদেবগণ যাতে সদা অধিষ্ঠিত।
সে অক্ষরতত্ত্ব নাহি জানে যেই জন
ঋক-মন্ত্র উচ্চারণে কি হইবে তাঁর?
যে জন জানেন তত্ত্ব সেই অক্ষরের –
প্রবেশি তাহাতে তিনি হন সমাহিত।।’

নাথযোগী সম্প্রদায়ে ওঁ-কারই মূল গায়ত্রী এবং একে তার বেদও বলা হয়। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে ঋক-যজু-সামাথর্ব এবং বেদাঙ্গাদি অপরাবিদ্যা, অন্যদিকে যে বিদ্যার সাহায্যে অক্ষরব্রহ্ম লাভ করা যায় তার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা(১/১/৫)। নাথযোগীদের প্রথম মানবগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ অসত্য মায়া-স্বরূপময় কালদণ্ড খণ্ডন করে মহাসত্য নির্গুণাতীত ব্রহ্মকে জেনেছিলেন—

আগৈ মৎস্যনাথ অসত্য মায়া স্বরূপময় কাল তাকো খণ্ডন কর
মহাসত্য তৈৎশোভত ভয়ো আন নির্গুণাতীত ব্রহ্মনাথ
তাকুং জানৈয়াতৈ আদি ব্রাহ্মণ সৃষ্টিবেদী।
গোরক্ষোপনিষদ, রাজস্থানি ভাষা।

এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নাথযোগীদের সূক্ষ্মবেদ বা সুষ্মবেদ আদি-বৈদিকযুগের নিবিদধারার বেদের গূঢ় রহস্যাবৃত এবং সাধনসঙ্কেতমূলক বেদ বা জ্ঞান। আবার নাথযোগীরা বলেন যে তাঁরা পরবর্তীকালের চার বর্ণাশ্রমের অতীত আদি একাশ্রমপন্থী অর্থাৎ অত্যাশ্রমী।^{১০৬}

বাংলায় মূলত উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ থেকে মীনচেতন ও গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনি ধর্মঠাকুরের পুরাণ কাহিনিতে মিশে গিয়েছে। দ্বিজলক্ষ্মণ ও সহদেব চক্রবর্তীর ‘অনিলপুরাণ’ গ্রন্থের প্রধান বিষয় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনি।^{১০৭} ‘অনিলপুরাণ’ ও ‘গোরক্ষবিজয়’-এ কাহিনির গানগুলি পূর্বাপর প্রচলিত এবং একই। পরবর্তীতে লিপিকর ও গায়কদের মুখে পরিবর্তন যা কিছু ঘটেছে।^{১০৮} মীন-গোরক্ষর গান কিংবা ময়নামতীর গান ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক গান করুণ রসের আবেদনে আর্ষভাষী গণ্ডী পেরিয়ে ভারতের সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কারণে পশ্চিমবঙ্গে নাথপন্থের কাহিনির জনপ্রিয়তা কমে আসে। সেসময় নাথপন্থের দু’জন সিদ্ধযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ বৈষ্ণব গ্রন্থ ‘ভক্তমাল’-র গাথায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন।^{১০৯} আর নাথপন্থের কাহিনি পশ্চিমবঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাহিনির সঙ্গে মিশে গেল। নাথ সম্প্রদায়ের প্রাচীন মঠ ভগলি জেলার মহানাদের জটেশ্বরনাথ মন্দিরের সামনের জায়গাকে আজও ‘জাততলা’ বলা হয়। স্বাভাবিক কারণে ধর্মের জাতের কথা মনে আসে। ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর ও নাথধর্মের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন বলে মনে হয়।^{১১০} পশ্চিমবঙ্গে নাথযোগী সম্প্রদায় ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সমন্বয় ঘটেছে। বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন যে ধর্মঠাকুর ক্রমে শিবে পরিণত হয়েছেন, তখন তার সন্ধিক্ষণে পঞ্চগনন্দের পূজোর প্রচলন ঘটে। এই পঞ্চগনন্দ পূজোর প্রচলন কেন্দ্র মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচীন

আদিগঙ্গার তীর পর্যন্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক গ্রামে নাথযোগীদের গৃহে পঞ্চগনন্দ প্রতিষ্ঠিত এবং দু-এক স্থানে তিনি আজও ধর্মরাজ নামে পঞ্চগনন্দের মূর্তিতে পূজিত হন। ধর্মঠাকুর থেকে শিব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরে পঞ্চগনন্দই ‘মিসিং লিঙ্ক’ মনে হয়।^{১১১} ড. পঞ্চগনন মণ্ডলও মনে করেন পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগীদের মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মপূজা-বিধানের প্রামাণ্য পুথিগুলি আমরা পশ্চিমবঙ্গের নাথযোগীদের বাড়ি থেকেই পেয়েছি। অনেক স্থলে নাথযোগীরা ধর্মঠাকুরের পূজা করেন বা করাইয়া থাকেন। কোনো কোনো স্থানে নাথযোগীদের গৃহদেবতা ধর্মরাজ।^{১১২} ধর্মপূজক নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি অনুসারে ধর্মঠাকুর হলেন শিবের পিতা। ধর্মরাজ স্বয়ংস্তু। কাহিনিটি নিম্নরূপ—

‘ধর্ম গুরুর প্রশাদে মহাদেব হৈলা শিষ্য।
ধর্মের মন্ত্রে শিবের চৈক্ষের উপদেশ।।
যেই মন্ত্র শুনি শিব ভক্তি জানাইলা।
অন্তরে থাকিআ ধর্মে বলিতে লাগিলা।।
শুন পুত্র ত্রিলোচন শুনয়ে শ্রবণে।
ব্রহ্মার বিষ্ণুর চৈক্ষু দান দেঅত আপনে।।
যেই মন্ত্র তুমারে শিকাইছি আমি।
সেই মন্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণুর চৈক্ষু দেঅ তুমি।।’^{১১৩}

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’, ময়ূরভট্টের ‘ধর্মমঙ্গল’ সহ বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলে এই উক্তির অল্পবিস্তর অদলবদল হয়েছে।^{১১৪} নাথসাহিত্যের মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের কদলীরাজ্যের ঘটনা সংক্রমিত হয়েছে কপূর যখন লাউসেনকে গোলাহাটের বর্ণনা দিয়েছেন—

‘এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।

নারী রাজ্য দারী তায় বৈসে ঐ পুরে।।’

কদলীরাজ্যে মীননাথকে রাণী মঙ্গলা ও অন্যান্য যোগিনীরা যেভাবে মোহজাল বিস্তার করে ব্রহ্মজ্ঞান বা মোহজ্ঞান নষ্ট করেছিলেন তেমনি সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যগ্রন্থে লাউসেনকে সুরীক্ষা কুট কৌশলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথকে যোগিনী কৌলসাধনার কারণে স্ত্রীরাজ্যে যেতে হয়েছিল। যোগিনী কৌলসাধনায় যুগলসাধনা স্বীকৃত। নাথসাহিত্যে যেমন দেবী পার্বতী গোরক্ষনাথকে ছলনা করে প্রণয় প্রার্থনা করেন তেমনি ‘অনিলপুরাণ’ গ্রন্থে দেবী পার্বতী মোহিনী রূপ ধারণ করে লাউসেনকে পরীক্ষা করেন। অর্থাৎ নাথসাহিত্যের গোরক্ষনাথ যেন ‘অনিলপুরাণ’-র কাহিনিতে এসে লাউসেন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ কদলীরাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মহানাদে যোগীরাজা হয়েছিলেন বলে কবি সহদেব চক্রবর্তী তাঁর ‘অনিলপুরাণ’ (সুকুমার সেন, ১৯৮৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

‘কদলী হইতে যত যুগীগণ

মহানাদে গিয়া যুগী দিল দরশন।

মহানাদে গিয়া মীন হৈল যুগীরাজা

শিব-ঠাওর দর্শি করে মহাদেবের পূজা।’

অনিলপুরাণ, পৃ. ৪৮

অন্যদিকে ধর্মঠাকুরের পূজোর প্রচলন প্রথম নাথসম্প্রদায়ের মঠ মহানাদে ঘটেছে বলে কবি যাদুনাথ তাঁর ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

‘মহানাদে আশীহাটা

উড়িয়ায় হাড়ি-ঝাঁটা

ধর্মঘরে বৈতরণী পার।’

ধর্মঠাকুর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছেন গোড়া থেকেই। তাতে ঘটেছে ব্রাহ্মণ্য হস্তাবলোপ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভাবিত করেছে, শৈব, শাক্ত সাধনার প্রাবল্যে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব পশ্চাদাপসারণ করেছে। কিন্তু ধর্মঠাকুর নড়েননি। তিনি নির্বিকারে সব আত্মসাৎ করে চলেছেন। পরে বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। ধর্মঠাকুরের উপর নবীন প্রলেপ পড়েছে। তন্ত্রের দর্শন পটভূমিতে ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে শামাঁধর্মের (Shamanistic) মিশ্রণ ঘটেছে। শামাঁধর্মের সঙ্গে নাথযোগীদেরও সম্পর্ক রয়েছে। তারফলে ‘মুণ্ডে আর হাড়ে’ মালা পরে নাথধর্মের শিবঠাকুর আর হাড় গোড় নৃমুণ্ড নিয়ে দেবী শামাঁ বসে গেলেন পূর্বভারতের গ্রামে গ্রামে। ‘মুণ্ডে আর হাড়ে’ নাথধর্মের বঙ্কনাল সাধনার পরম্পরা এখানে বরাবর তো ছিলই।^{১৫}

ড. সুকুমার সেন মনে করেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃত যে তিনটি শ্লোকে ‘হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ’ উল্লিখিত হয়েছে তাতে অর্বাচীন নাথপন্থের ও ধর্মপূজোর কোন কোন ছড়ার সঙ্গে গভীর ঐক্য চোখে পড়ে। ধর্মঠাকুরের ছড়া—

‘ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।’

নাথপন্থের ছড়া—

‘উড়্যা যায় পরম হংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন পুর।’^{১৬}

যোগধর্মের রূপক হিসেবে ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘গীতারম্ভ’ অংশ উল্লেখ করা যায়—

‘এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে।।
তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্মা দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংহার করহ অতঃপর।।

সৃষ্টিকর হৈল হর প্রভুর আজ্ঞায়।

জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায়।।^{১১৭}

আদিসৃষ্টিকর্তা শিব নাথযোগীদেরও সৃষ্টিতত্ত্বে স্বীকৃত। সশক্তিক শিবের প্রকাশ বিমর্শই সৃষ্টিমূল এটা কাশ্মীরি শৈবদ্বৈতবাদেরও ধারণা বটে। এখানে অশক্তিক শিবের আদিস্রষ্টা হিসেবে প্রকাশ নাথযোগীধর্মের সঙ্গে ধর্মকাল্টের দার্শনিক সম্পর্কের ইঙ্গিতবহ বলে অর্জুনদেব সেনশর্মা মনে করেছেন।^{১১৮} কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধকৌল ধারায় সশক্তিক শিবের সাধনা প্রচলিত ছিল, যার সঙ্গে কাশ্মীরি শৈবধারার মিল লক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে যোগিনী কৌলধারায় শিবকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করার কথা বলা হয়েছে। দেবব্রত সেনশর্মাও অনুরূপ ভাবনার কথা বলেছেন –

The manifestation of the world takes place as a result of co-operative activity of Bhairava and Bhairavi in which the latter plays dominant role. There Bhairavi or Divine Sakti is assigned somewhat higher status. The Uttara Kaulas gave the Divine Sakti dominant position in so far as the manifestation of the world is concerned, Siva playing only the passive role.^{১১৯}

স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে নাথ ও ধর্ম সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয়ের ধারায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয়। দেহাত্মবাদী যোগসাধনা আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই চলে আসছে। প্রাগাধুনিক যুগে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী ও নাথপন্থী শৈবদের হাতে যে বাংলা চর্যাপদ রচিত হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে আরও পরে নাথসাহিত্যের মধ্যেও দেহাত্মবাদী কায়াসাধনার কথা পাওয়া যায়। তবে নাথসাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে জীবনস্রোতকে রুদ্ধ করে চিরজীবী হওয়ার কথা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। এই দেহতত্ত্বমূলক সাধনা নাথপন্থ থেকে ধর্মসাহিত্য থেকে শুরু করে অন্য

ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য গ্রহণ করে। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মাঝখানে উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সমন্বয় বিধান ও উভয়ের সংমিশ্রণে পশ্চিমবঙ্গে নাথপন্থ ও সদ্ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সংঘাত-সমন্বয়ের মাধ্যমে নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতি আজও সজীব ও জীবন্ত রয়েছে।

নাথযোগীদের সঙ্গে সিদ্ধ, কৌল, কাপালিক, পাণ্ডপত ও অঘোরীধারার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, তার পর্যাপ্ত প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বৈষ্ণবদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তা কিন্তু নয়। বৈষ্ণবদের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সম্বন্ধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ‘ঘেরণ্ড সংহিতা’ নাথ-সম্প্রদায়ের হঠযোগ সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে দেখা যায় একসময় চণ্ড কাপালিক ঘেরণ্ডমুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁর কাছে ঘটস্থযোগ (হঠযোগ) শেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন—

‘একদা চণ্ড কাপালির্গত্বা ঘেরণ্ড কুট্টিমম।

প্রণম্য বিনয়াদভক্ত্যা ঘেরণ্ডং পরিপৃচ্ছতি।।’ ১/১

চণ্ড কাপালিরূবাচ

‘ঘটস্থযোগং যোগেশ তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম।

ইদানীং শ্রতুমিচ্ছামি যোগেশ্বর বদপ্রভো।।’- ১/২ ^{১২০}

ঘেরণ্ডমুনি স্বয়ং বাংলার বৈষ্ণব ছিলেন। এখান থেকে বোঝা যায় বাংলায় বৈষ্ণবধারায় যোগ প্রচলিত ছিল।

বৈষ্ণব কবি জয়দেব উদাসীন যোগী ছিলেন। কৌপিনধারী কানথার (কানফাটা) উদাসীন যোগী জয়দেব অজসা বা অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্লি গ্রামের বাইরে বটগাছের

নিচে বসে যোগসাধনায় রত ছিলেন। বিশ্বভারতীর ‘ভক্তমালা’ গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় (পুথিসংখ্যা ৫৬১৯)—

‘কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে।
জয়দেবের বাস সেথা গ্রামের বাহিরে।।
জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন।
বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন।।’

বর্তমান কেন্দুলি বা কেন্দুবিল্লি গ্রামের প্রান্তবাসী ছিলেন কবি জয়দেব।^{১১}

এদিকে জয়দেবের সঙ্গে নিজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহের জন্য প্রভু জগন্নাথের নির্দেশে বিষ্ণুশর্মা পায়ে হেঁটে কেন্দুলি গ্রামে পৌঁছে ধ্যানমগ্ন জয়দেবের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁকে প্রভু জগন্নাথের আদেশ বার্তা শোনাতে জয়দেব তাঁর কন্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণে সম্মত হলেন না—

‘শুনি জয়দেব কহে আমি কানথারি।
তোমার কন্যাকে আমি লইতে না পারি।।’^{১২}

কানথারি অর্থাৎ কানফাটা উদাসীন যোগী জয়দেব। নাথপন্থের গোরক্ষনাথী এই ধারায় কৌপিনাদি, ব্রহ্মচর্য বিহিত পদ্ধতি। শেষে পদ্মাবতী উদাসীন যোগী জয়দেবকে পার্থিব বস্তুর অসারতা ও কৃষ্ণভক্তির সারবস্তু সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ কথা বললে জয়দেব মুগ্ধ হলেন। পদ্মাবতীর তত্ত্বকথায় ‘বিন্দুরক্ষা’, যোগজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তির ইঙ্গিত পেয়ে তাঁদের উভয়ের মিলিত সাধনায় ‘গীতগোবিন্দ’ রচনার সূত্রপাত ঘটে। ইষ্টদেবতার কৃপায় ‘শ্রীগীতগোবিন্দ’ গ্রন্থের ‘দেহি পদপল্লবমুদারম’ শ্লোকটির কাহিনি ‘ভক্তমালা’ গ্রন্থের ভাষায় এইরকম—

‘জয়দেব মহা কবিরাজ মহাশয়। গীতগোবিন্দ তিহোঁ পূরণ না করয়।।

পুন কহে এই কথা কেমনে লেখিব। রাধাপদে কৃষ্ণ হস্ত কেমনে রাখিব।।

বিপরীত জয়দেবে না করে বর্ণন। কৃষ্ণ রাধার পদ ধরে এ বড় বিষম।।’

এই বিপরীত বা উল্টোসাধনা ভারতীয় নাথযোগ সাহিত্যে সুদীর্ঘকালের এক বিশিষ্ট যোগ-তান্ত্রিক দর্শন ধারা। উর্ধ্বরেতা সাধনায় রমণীকে জননীতে পরিবর্তনের সাধনা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও সারদা মাকে ষোড়শী পূজো করে এই মার্গের সাধনা করেছিলেন।^{১২৩} জয়দেবের জীবনে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করার কথায় যোগের আরেকটি তাৎপর্য কাজ করেছে। যোগধারায় গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী হচ্ছে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুমা। যোগী জয়দেব নিত্য তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রেচক, পূরক, কুম্ভক অভ্যাস করে আগমের আঠারো চক্র পার হয়ে সমাধি স্তরে পৌঁছাতে সাধনা করতেন। ‘গ্রন্থসাহিব’ গ্রন্থে সংকলিত জয়দেবের লেখা পদগুলিতে এই অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে—

‘বাণী জইদেও জিউ-কী (রাগ মারু)

সূর সত খোড়সা দত্তু কিয়া।

অবল বল তোড়িয়, অচল চল থপ্লিয়া,

অঘড় ঘড়িয়া, তহা আপিউ পিয়া।। ১।।

মন আদি গুণ আদি বখানিয়া

তেরি দুবিধা দৃষ্টি সম্মানিয়া।। রহাউ।।

অর্ধ-কৌ অরধিয়া, সরধি -কৌ সরধিয়া,

সলল-কৌ সললি সম্মানিয়ায়া।

বদতি জইদেও, জইদেব-কৌ রম্মিয়া,

ব্রহ্ম-নির্বাণ লিউয়া লীন পায়া।। ২।।’^{১২৪}

এমনকি অজয় নদীর তীরে কেঁদুলির কদম্বখণ্ডীর ঘাটে প্রাচীন বটগাছের নিচে ‘মকরণ’ সংক্রান্তিতে যোগীসম্প্রদায়ের হাড়িসিদ্ধগণের একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা সমাপ্ত

হয় তাঁদের আদিপুরুষ যোগী জয়দেবের স্মৃতি তর্পণ করার পরে।^{১২৫} ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নাথ শৈব-যোগধারা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ সহ প্রাচীন যুগের সাহিত্যধারায় যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন—

The above Vani or religious poem of Jayadeva in the vernacular is in the usual line of religious and devotional poetry of Yoga inspiration which characterised all Indian Schools of thought from the middle of the first millennium A. D. onwards, and it was particularly strong in the centuries immediately preceding following C. 1000 A. D. Their ring is that of the Old Bengali Caryapadas of later Mahayana Sahajya (Sahaja-yana) Buddhist inspiration on the one hand which were partly contemporaneous with Jayadeva of the Gita-Govinda, and on the other of the mystic poems attributed to the Saiva Yogic order of Gorakhnath and his school (12th-13th centuries) and also of Kabir and other early Sants who were bhagats (bhakts) or devotees of Bhakti school in their main affiliation, but were at the same time practisers of Yoga.^{১২৬}

নাথযোগীরা বিবাহ করলেও তাঁদের গৃহস্থ বলা যায় না, কারণ তাঁরা যুগলসাধনায় উর্ধ্বরেতা শিবস্বরূপ বা কৃষ্ণস্বরূপ। তা না হলে সে নাথ কি করে? তবে আমাদের মনে হয় জয়দেব মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলধারার সাধক ছিলেন। শামাঁধর্মের সঙ্গেও মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথী ধারায় বাহ্য ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় না। কৌলসাধনায় সাধক যুগলসাধনা সঙ্গীক অথবা যোগিনী (ভৈরবী) বরণ করে সাধনা করতে পারেন।

যোগী গোরক্ষনাথ তাঁর সমসাময়িককালে নাথপন্থে বিভিন্ন মত, ধর্মীয় ধারাকে সংগঠিত করার ভীষণ প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ প্রতিটি পন্থ বা ধারার মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। তারফলে তিনি শিবযোগীদের ১৮ পন্থ ও নিজের ১২ পন্থকে মিশিয়ে দিয়ে নাথপন্থকে

১২টি শাখা বা পন্থে বিভক্ত করেন। তখন অনেক পুরনো পন্থ বা শাখা নষ্ট করে দেওয়া হয়। ড. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন বর্তমানে নাথপন্থে শাক্তমত আছে, লাকুলীশ পাশুপত মতও আছে। বৈষ্ণব, যোগমার্গ ও বামমার্গ এবং কাপালিক মতও আছে।^{১২৭} বর্তমান ১২ পন্থের অন্তর্গত একটি অন্যতম পন্থ হল কপিলানী পন্থ। কপিলানী পন্থের সাধুরা বলেন তাঁদের সম্বন্ধ কপিলমুনির সঙ্গে। তাঁদের প্রধান স্থান গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমে। বাংলায় নাথ-সম্প্রদায়ের কপিলানী পন্থের ৪টি মঠ রয়েছে। তারমধ্যে একটি পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি গ্রামে অবস্থিত কপিলমুনি মঠ। এখানকার প্রাচীন মঠ ও মন্দির নদীতে মিশে গিয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কপিলানী পন্থের বাকি তিনটি নাথ-সম্প্রদায়ের মঠ হল দমদমের গোরক্ষবাণ্ডলী, হগলির মহানাদ, মেদিনীপুরের সিদ্ধিনাথ মঠ। সুন্দরবন অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চলেই মঠগুলি গড়ে উঠেছিল। আমার অন্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।^{১২৮} কপিলমুনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তা। সাংখ্য ও যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভাগবত-এ কপিলমুনি যোগ ও বৈরাগ্যের উপদেষ্টা হিসেবে প্রসিদ্ধ। সাংখ্য শাস্ত্রকে নিরীশ্বর যোগ বলে এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। এই মতাবলম্বীরা কপিলমুনি পন্থী, যাঁরা বৈষ্ণব-যোগী ছিলেন। গোরক্ষনাথের পন্থে এঁরা পরবর্তীতে মিশে যান।^{১২৯} অনেক আগে থেকেই বৈষ্ণবদের সঙ্গে নাথযোগীদের সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি ভক্তিভাবনা নাথপন্থকে প্রভাবিত করেছে। শেষে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ হয়ে উঠেছেন শ্রীনাথ। কৃষ্ণের আরেক নাম শ্রীনাথ। কারণ তিনি শ্রী বা রাধার স্বামী বা প্রভু। পাঞ্জাবের লুধিয়ানার নাথদ্বার মঠে গোরক্ষনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। বাংলায় মুসলমান শাসকদের আগমনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কারণে নাথপন্থের কাহিনির

জনপ্রিয়তা কমে আসে। সেই সময়ে নাথপন্থের দু'জন সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ বৈষ্ণব গ্রন্থ 'ভক্তমাল'-র গাথায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৩০} শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদী জীবনদর্শনের ফলে বাংলা, অসম, ওড়িশা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। জাতি গঠনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নাথযোগীগণ তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মে না মিশে বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় নিলেন।^{১৩১} অন্যদিকে ভবদেব থেকে রঘুনন্দন প্রভাবিত বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনবোধ যে গৃহস্থধর্মকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে তা স্মৃতি-তত্ত্বের মিলিত ব্রাহ্মণ্যধারা। তন্ত্রধারা দার্শনিক দৃষ্টিতে অদ্বৈত মুক্তির দিকে ঝুঁকছে, তখন বাঙালি জীবন হয়েছে নাথযোগী বা হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া। পরে তা সহজিয়া বৈষ্ণবধারায় বা বীরাচারে পরিবর্তন করে। মুখ্যত তা তন্ত্রবিগর্ভিত স্মার্তজীবন। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠীর উপাসকের তো কথায় নেই। নাথপন্থীযোগী বা ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাত্য আর্য বা অন্যান্য ধারার চিহ্ন থাকতে পারত— তাও উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে দ্রুত বিলীয়মান। নাথপন্থীদের ব্রাহ্মণত্ব দাবি ও ধর্মের গাজনের শিবের গাজনে রূপান্তর তারই ইঙ্গিতবহ। তাই আমরা দেখতে পাই বৈদিক যুগের মত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার পরবর্তীযুগে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সাধনধারা পরস্পর মিলে গিয়েছে। কপিল, কণাদ, গৌতম তর্কিক হয়েও বেদপন্থী সমাজে সর্বজনমান্য, বুদ্ধ অবৈদিক হয়েও সত্যকার বেদ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাশীল, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সবারই অধ্যাত্ম সাধনার একটা সাধারণ নাম 'ব্রহ্মচর্য'। আর এই 'ব্রহ্ম' কথাটির মধ্যে সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার সমগ্র ইতিহাসটি ধরা রয়েছে।^{১৩২} একইভাবে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবিতদের একটা বিরাট অংশ নাথপন্থে আশ্রয় লাভ করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার বলছেন— 'চন্দ্ররাজাদের অনেকেই 'পরমসৌগত' অর্থাৎ সুগত বা বুদ্ধের পরমভক্ত

বলা হয়েছে। তাঁদের শাসনাদি ও দান ভগবান বুদ্ধভট্টারককে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত হত। কিন্তু... চন্দ্রবংশের লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র শেষ নরপতিদ্বয় প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে করেছিলেন।... তাঁরা যথাক্রমে বিষ্ণুভট্টারক এবং শিবভট্টারককে উদ্দেশ্য করে শাসন দান করতেন, একথা তাঁদের ময়নামতী শাসন থেকে জানা গিয়েছে।^{১৩৩} ভারতীয় অধ্যাত্মরাজ্যে যোগমার্গ সর্ব সম্প্রদায় নির্বিশেষে আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষপ্রাপ্তির পথ হিসেবে স্বীকৃত। কি জ্ঞান, কি ভক্তি যে-কোনো মাগেই যোগশাস্ত্র বর্ণিত সাধনা ছাড়া চরম লক্ষ্য প্রাপ্তি সম্ভব নয়। যোগশাস্ত্রমতে দুটি ধারা- আগমিক ও নিগমিক ধারা। আগমিক বা তান্ত্রিক ধারাটি নাথপন্থের সিদ্ধদের অনুসৃত সিদ্ধামৃতমার্গ। মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথ শিবের কাছ থেকে যে যোগধর্ম লাভ করেছিলেন তা তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কুণ্ডলিনী, ষট্চক্র, নাড়ীতত্ত্ব, পিণ্ড, ষট্চক্রের অন্তর্গত বীজ, দেবতা, হংস, গুরুপাদুকা ইত্যাদির ধারণা এবং শরীরকে সাধনার উপযোগী সুস্থ সবল রাখার জন্য বিভিন্ন আসন, প্রাণায়াম, ষট্ক্রিয়া ইত্যাদি শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কার নাথ যোগধারার অবদান। প্রথমটি রাজযোগ, দ্বিতীয়টি হঠযোগ। আজও সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুর পূজোপাঠে ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়ামের মাধ্যমে নাথযোগমার্গের সিদ্ধান্ত মেনে চলা হয়। বাংলার শান্তসাধনায় ষট্চক্রসাধনা নাথমত থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আচার্য শঙ্কর যেমন ভারতবর্ষে অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তেমনি গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক যোগের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজ নিজ সম্প্রদায় ও মঠ। গৌড়ীয় পূজোবিধিতেও ভূতশুদ্ধির পথটি একটু ঘুরিয়ে আসে। লিঙ্গদেহকে বিনষ্ট করে পরমাত্মস্বরূপে বিলীন হওয়া নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক সাধনায় ‘ভূতশুদ্ধি’ অংশে নিজের ‘অন্তশ্চিন্তিত সাধকদেহ’-র কল্পনা করেন, ‘অঙ্গন্যাস’-এ কৃষ্ণের সঙ্গে

অঙ্গন্যস্ত হয় না, হয় ভগবান স্বরূপ কৃষ্ণের পরিবর্তে তাঁর কেশবাদি অবতারদের সঙ্গে এবং ধ্যানেও কৃষ্ণধ্যান হয় না,— হয় বৃন্দাবনে লীলাস্থলীতে গুরু আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার মনন।^{১৩৪} চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন বৈষ্ণব সদাচার পালন ও দীক্ষামন্ত্র জপ করলে ঈশ্বর সেবার অধিকার পাওয়া সম্ভব। তা ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থেই বলা হয়েছে—

‘অদ্বৈত বলয়ে— যদি ভক্তি বিলাইবা

স্ত্রী শূদ্র আদিত মূর্খে সে দিবা...

প্রভু বলে,— সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।’ (মধ্য/১০ম)

এইরকমভাবে সর্বসাধারণের বৈষ্ণব হওয়ার সুবিধা থাকায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের অনেকেই বাংলায় দলে দলে বৈষ্ণব হয়ে যান। অভিরাম দাসের ‘গোবিন্দবিজয়’ (১৯৬৯) গ্রন্থে যোগীদের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে যোগহারা হবার কথা বলা হয়েছে— ‘যোগী যোগহারা হইল মুরলীর গানে।’ বৈষ্ণবধর্ম প্রাণিত দেশে যোগীর ঐতিহ্যবাহী যোগধর্মের বিস্মরণের চিত্রও লক্ষ করা যায়। তখন কৃষ্ণের মধ্যেই যোগীরা সিদ্ধরূপ দর্শন করছেন— ‘যোগী সিদ্ধ মুনি দেখে যেন সিদ্ধরূপ।’ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কোথাও নাথযোগ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দ্বিক চিত্র নেই। বরং বৈষ্ণবধারা ধীরে ধীরে স্মার্ত ভুবনে প্রবেশ করছে। ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’ অভিজাত ধারার প্রতিস্পর্ধী অনভিজাত কিন্তু প্রায় বৈদিকধারা। ‘ধর্মপূজা পদ্ধতি’ও ব্রাহ্মণেরা লিখছেন। সন্ন্যাসব্রতে জাতিভেদ থাকে না, অথচ চৈত্রমাসে চড়ক অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসব্রতে সকলেই শিবগোত্র সমন্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠবর্ণ বিবেচিত হয়।^{১৩৫} এইসব সামাজিক ভাবনা থেকেই নাথেরা ব্রাহ্মণ্যধারায় প্রবেশ করছেন। অথচ যোগের পুরনো ভিত্তি থাকলে সমাজে সহজেই দাঁড়াতে পারতেন। ব্রাহ্মণ্যধারায় নাথদের যোগ, পূজোপদ্ধতি,

মনসা, চণ্ডী, ধর্মদেবতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু নাথযোগীদের প্রতি তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হল না। আর সময়ের ক্রমবিবর্তনের একপর্যায়ে এসে ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার গৃহস্থ নাথেরা পুরনো শৈবযোগধারার পাশাপাশি, ব্রাহ্মণ্য স্মার্তধারা ও বৈষ্ণবধারায় ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেল। রাজমোহন নাথ উল্লেখ করেছেন নাথযোগীরা নিজেদের আত্মপরিচয় দিতে বলেন— তাঁরা শিবপুত্র, এবং তাঁদের গোত্রও শিবগোত্র। নাথযোগীরা চতুর্বর্গাশ্রমীর মত মানবগুরু নামে গোত্র পরিচয় দেন না। কারণ যিনি মানবগুরু তিনিও তো শিব, আবার শিষ্যও নিজে শিব। বৈদিকযুগের আগ্নিরস সম্প্রদায়ের মত— দেববংশজ, দেবপুত্র (ঋগ্বেদ ১০/৬২/৪)। নাথযোগীদের মতে শিব হতেই যোগধর্মের প্রবর্তন হয়। ব্রাহ্মণ্যবিধানেও যোগচর্চা আছে, সেখানে বেদশাস্ত্রাদি আলোচনা শেষে আত্মজ্ঞান লাভ করার পর পুত্র-বিত্ত-লোক এষণাত্রয় ত্যাগ করে ভিক্ষাচর্যব্রত অবলম্বন করে মুনি হওয়ার বিধান (বৃহদারণ্যক ৩/৫/১)। কিন্তু নাথপন্থে বিধান হল শিব-দেবতার আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী-পুত্র সহ ঘরসংসার করে মহাযোগী হওয়া। মুণ্ডকোপনিষদেও প্রাচীনকালীন আত্মব্রন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরকম প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁরা ছিলেন যোগাচারবশত শুদ্ধসত্ত্ব যতি ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম; তাঁদের সন্তানও ছিল এবং সেই সন্তানেরা কাজেই ব্রহ্মবিৎ হত— ‘ন অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ভবতি’(৩/২/৯)।^{১৩৬} তবে তিনি গৃহস্থ নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে একথা বলেছেন বলেই মনে হয়। নাথযোগীরা ঋগ্বেদাগত আত্মবিস্মৃত এক ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়। ভারতের বর্ণবিভাগ মূলত চারটিই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বহু জাতি বিভাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবিজ্ঞান প্রসূত। বেদপাঠের অধিকারে; পূজো-অর্চনা, গুরুগিরি, সন্ন্যাসাশ্রম, যোগ-তপ চর্চার গুণকর্মে নাথযোগীরা ব্রাহ্মণবর্ণেরই অন্তর্গত। গুরুগিরিই নাথযোগীদের স্ববৃত্তি, তাঁদের ব্যবসা পরবৃত্তি।

ভিক্ষা যোগাচারের এক সংস্কারমূলক রীতি, বৃত্তি নয়। বর্ণবিভাগ সমাজের, সন্ন্যাসধর্মাচরণের নয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে নাথযোগীদের যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণবর্ণ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তা এই সমাজবহির্ভূত সন্ন্যাসধর্মের জন্যেই।^{১৩৭} স্বাভাবিক ভাবেই নাথযোগী-সন্ন্যাসীরা চতুর্বর্ণের উর্ধ্ব নাথ সম্প্রদায়কে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁরা চতুর্বর্ণাশ্রমীর বিভাজন মানেন না। তাঁরা চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে পরমাত্মায় স্থিত হওয়ার সাধনা করেন। অতিবর্ণাশ্রমী এই কৌল নাথসাধকেরাই অবধূত। দ্বিতীয়ত গোরক্ষনাথী যোগী, তাঁরা আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথ ধরে পরমশূন্যে স্থিত হওয়ার সাধনা করেন। তাঁরাও বর্ণাশ্রম অস্বীকার করেন। এই কারণে নাথসন্ন্যাসী যোগীরা জোর দিয়ে বলেন যে নাথসম্প্রদায় বর্ণপ্রথার বাইরে—

It is interesting to notice that there are also ascetic Nath, like Yogi Sivanath, a mahant from Orissa, who attempt to reconvert Vaisnava householder Yogis to 'Nath-ism' through satsangs (meetings) during which the peculiar identify of Nath in comparison to other Sampradayas is stressed. For this reason, Yogi Sivanath criticizes this Brahminization of Bengali Nath, emphasizing the fact that Nath is beyond the caste system.^{১৩৮}

গৃহস্থ নাথসম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পূর্ব স্মৃতি ছাড়া সংস্কৃতি-দর্শন তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন মঠে আজও নাথপন্থের সাধনধারা ও দর্শনের সনাতন ধারাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁদের শিষ্য গৃহস্থ নাথেরা অবশ্য নাথযোগী পরম্পরা, বিশেষত যোগপরম্পরা কিছুটা হলেও জীবন্ত রেখেছেন। একথা বলা যায় বাংলায় সন্ন্যাসী নাথযোগীরা পূর্বের গৌরব অব্যাহত ও প্রবহমান রাখতে পেরেছেন। তারফলে বাংলায় নাথপন্থের গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু নাথধর্মের সাহিত্য

ও যোগপরম্পরা মঠ থেকে গৃহস্থ নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, সেই বিষয়টি আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। স্বাভাবিক কারণে বর্তমানেও বাংলায় নাথপন্থের মঠ, মন্দিরকে কেন্দ্র করে লিখিত অগ্রস্থিত সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার বিস্তৃত অবকাশ রয়ে গিয়েছে বলা যায়। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অর্থে ‘নাথ’ নামের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। নাথ একটি Caste বা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্যবহার শুরু হয়েছে। তার কারণ বাংলার সমাজে উচ্চস্থান লাভের জন্য এক প্রবল সামাজিক আন্দোলন ১৮৭৩ খ্রি. নাথসম্প্রদায়ের মানুষ শুরু করেন।^{১৭৯} সর্বপ্রথম নৃতত্ত্ববিদ B. H. Hodgson ‘নাথপন্থ’ নামকরণ করেছিলেন। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা সমর্থন জানিয়েছিলেন-

Be that as it may, it was from the concept of Nathahood as embodied in the names of Matsyendranatha and his disciple Gorakshanatha that later researcher B. H. Hodgson and following him Mm. H. P. Shastri have named the new form of religious belief as Nathism or ‘Natha-pantha’. The worshipful deity of this sect is Lord Siva whom they call Adinath i.e. the first Natha. The Nathas therefore claim their descent from him and write their gotra name as Siva-gotra.^{১৮০}

উত্তরভারতে নাথযোগীরা ধর্মীয় সম্প্রদায় (Religious Sect) হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেও পূর্বভারতে বিশেষত বাংলায় বর্তমানে চতুর্ভর্গের ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় একটি সম্প্রদায়ে (caste) পরিণত হয়েছে। ড. কুণাল দেবনাথও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন—

Through examination of various primary and secondary historical sources, I have found that the debate over whether the Nath is a religious sect or a caste seems quite unresolvable as scholars have given forceful arguments both ways. Yet for the convenience of academic and religious arguments, I argue, based on my field surveys, that the vast

majority of the Naths in Bengal and Assam are a caste, not a religious sect.^{১৪১}

গোরক্ষনাথ শেষপর্যন্ত বিভিন্ন শৈব-শাক্তমতের পুনর্গঠন করেন। ‘নিত্যাঙ্ক-তিলকম্’ নামক তন্ত্র গ্রন্থে দেখা যায় প্রভাবশালী সিদ্ধযোগিনী বিমলাদেবী মৎস্যেন্দ্রনাথের মতের যোগিনী অর্থাৎ তাঁর শিষ্য ছিলেন।^{১৪২} কিন্তু পুনর্গঠনের পরে নাথসম্প্রদায়ে তিনি যোগমার্গে দীক্ষা নিয়ে গোরক্ষনাথের শিষ্য হয়ে গেলেন। বিমলাদেবী প্রবর্তিত আইপন্থ শাক্তমত হলেও সিদ্ধ যোগমার্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গোরক্ষপন্থ হয়ে গেল। মৎস্যেন্দ্রনাথের পরম্পরা গোরক্ষনাথের পরম্পরা থেকে আলাদা ছিল। পরবর্তীতে গোরক্ষনাথের শাখায় মিশে গেলেও পূর্বভারতে স্বতন্ত্র কিছু নাথকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথী ধারার সন্ন্যাসী এখনও লক্ষ করা যায়। ‘রাওয়াল’ শব্দ ‘লাকুল’ শব্দের রূপান্তর। লাকুলীশ মত পাশুপত ধারার উত্তরাধিকারী ছিল। পরিণতিতে গোরক্ষনাথ লাকুলীশ অবতার হয়ে গেলেন। জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদ কাপালিক ও বামমার্গের সিদ্ধ ছিলেন। জালন্ধরনাথের পা-পন্থ গোরক্ষনাথ নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত করলেও বামমার্গ বর্জন করেছেন। তবু পৃথকভাবে পশ্চিম ও পূর্বভারতে আজও কাপালিক ধারার সাধনা ও সাধু দেখা যায়। নাথ অঘোরী ধারায় কাপালিক সাধনার অনেক বৈশিষ্ট্য ও সাধনা সময়ের নিয়মে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ নাথপন্থে অনেক শাখা বা পন্থ রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধ কৌলমত, যোগিনী কৌলমত, গোরক্ষনাথের শৈব-যোগমত, আইপন্থ সহ অন্য আদিমত। এছাড়া জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথের বামমার্গ এবং লাকুলীশ মতও রয়েছে। এইভাবে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগধারা, পাশুপত, রসেশ্বর, কাশ্মীরি শৈবধারা নাথমতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারফলে এইসব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈদিক, অবৈদিক সাধনতত্ত্ব নাথসাধনায় মিলিত হয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি

বিভিন্ন ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতও নাথমতকে প্রভাবিত করেছে। তারফলে নাথসম্প্রদায় শৈবমত থেকে বিকশিত হলেও পরবর্তী সময়ে অনেক বৈদিক, অবৈদিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে যৌগিকমত হয়ে গিয়েছে। তবে গোরক্ষনাথও কম প্রভাবশালী ছিলেন তা নয়। তিনি নাথপন্থে পাশুপত ও আগমধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। পরবর্তী সময়ে গোরক্ষনাথকে নাথসম্প্রদায়ে শিবের অবতার রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন তিনি চারযুগে চার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথক অবতার রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। মূলত শঙ্করাচার্য কর্তৃক শৈব সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনের পর অবশিষ্ট শৈব-শাক্তমতের পুনঃসংগঠন করেন গোরক্ষনাথ। প্রারম্ভিককালে নাথপন্থী সাধুদের জন্য ‘সন্ন্যাসী’ শব্দ ব্যবহৃত হত। ‘অবধূত’ শব্দও শৈব কানফাটা নাথসন্ন্যাসীদের জন্য ব্যবহার হয়। শৈবসাধুদের সন্ন্যাসী বলা হয়, বৈষ্ণব সাধুদের বৈরাগী। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সাধুরা শৈব সন্ন্যাসী। বজ্রযান, কৌলমত, পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ, লাকুলীশ, জৈন, আজীবিক এবং নাথসম্প্রদায় কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবধারা নয়। সভ্যতার পরতে পরতে অনেক আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাথসম্প্রদায়ের পূর্ণতা ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নাথপন্থের দর্শন, তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমিতে না গেলে নাথপন্থের ক্রমবিবর্তন ধরা সহজ হবে না। বাস্তবিক নাথধর্ম সাধনার পরিধি অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যাপূর্ণ কাজ। এই কাজ করতে শুধু লিখিত সাহিত্যই যথেষ্ট নয়। লোককথা, মঠ-মন্দির, সন্ন্যাসীদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়, তাদের রীতিনীতি, আচার-বিচার, পূজো অনুষ্ঠানের জ্ঞান ভীষণ প্রয়োজন। বর্তমানে নাথসম্প্রদায়ে স্বীকৃত বারোটি সম্প্রদায় বা পন্থ রয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি শিব প্রবর্তিত, ছয়টি গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত পন্থ বা সম্প্রদায়। এছাড়া আরও বারো অথবা আঠারোটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি

গোরক্ষনাথ নষ্ট করে দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে শিবের আঠারোটি এবং গোরক্ষনাথের বারোটি পন্থ বা সম্প্রদায় ছিল। নাথসম্প্রদায়ের সব পন্থ বা সম্প্রদায়ের অতীতে হয়ত সাহিত্য ছিল। আমরা মূলত চারটি পন্থ বা সম্প্রদায়ের সাহিত্য বর্তমানে জীবন্ত হিসেবে খুঁজে পেয়েছি—মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলধারা, গোরক্ষনাথের শৈবযোগধারা, আদিনাথপন্থ এবং নটেশ্বরী বা নাথঅঘোরী ধারার সাহিত্য। গোরক্ষনাথের যোগধারাকে যে যে পুরনো পন্থ স্বীকার করে নিয়েছিল তাদেরকে নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত করা নেওয়া হয়েছে। অন্যদের অস্বীকার করা হয়। এইভাবে পুরনো অনেক পন্থ গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ে মিশে গিয়েছে। পুরনো অনেক পন্থ বা মতগুলিকে গোরক্ষনাথী ধারায় অস্বীকার করার কাহিনি ‘যোগীসম্প্রদায়াবিকৃতি’ গ্রন্থে (পৃ. ৪১৯-৪২০) আছে। বিশেষ করে গোরক্ষনাথ কর্তৃক বামমার্গ অস্বীকার করার কাহিনি সেখানে পাওয়া যাচ্ছে— ‘একবার বামমার্গের নাথসিদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ধবলগিরির কাছে এক সভায় মিলিত হয়ে গোরক্ষনাথকে আহ্বান জানান এবং বলেন কীভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়বে সেই বিষয়ে পরামর্শ চান। তখন গোরক্ষনাথ তাঁদের বলেন যে তিনি চাইবেন না সাধুদের দেখে গৃহস্থরা কুৎসিত পথে গমন করেন। সাধুদের জীবন দেখে গৃহস্থরা সৎপথে চলবেন এটাই হল রীতি। তখন বামমার্গের নাথসিদ্ধ সন্ন্যাসীরা যোগমার্গের পক্ষে থাকার গোরক্ষনাথের প্রস্তাব মানলেন না। গোরক্ষনাথও তাদের অস্বীকার করলেন।’^{৪০} পুরনো মতকে নিজের পন্থে স্বীকার না করার এটা একটি অন্যতম উদাহরণ। আবার পুরনো মতকে স্বীকার করে নেওয়ার উদাহরণও পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে গোরক্ষনাথ যখন কলকাতার গোরক্ষবাগুলী মন্দিরে অবস্থান করছিলেন তখন দেবী কালীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। দেবী কালী পরাজয় স্বীকার করেন। ফলে তাঁর সমস্ত শাক্ত শিষ্যরা গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তখন থেকে গোরক্ষমার্গে

কালীপূজোর প্রচলন হয়। এখন সারাভারতেই গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে কালীপূজা প্রচলিত আছে। একথা ‘যোগীসম্প্রদায়াবিস্তৃতি’ গ্রন্থে রয়েছে (পৃ.১৯৪-১৯৯)।^{১৪৪} এই ঘটনার সাদৃশ্য ‘মীনচেতন’ গ্রন্থেও পাওয়া যায়—

‘তালি মারি রহে নাথ দশমীর দুয়ার।
প্রকাশ না পায় দেবী ছটফটি সার।।
মহাদুক্ষ পাইয়া দেবী ডাকিয়া বলিল।
তুমি বড় সতীনাথ নিশ্চয় জানিল।।
সেইসে গোক্ষের তবে নিবন্ধ করিল।
কালি বলি এক মূর্তি রাড়াত রাখিল।।
গৌরী লৈয়া আইল নাথে শিবের সমাজ।
এথা দৈবে বিপরিত হইয়াছে কাজ।।’^{১৪৫}

এখানে দেখা যায় রাঢ়দেশে গিয়ে গোরক্ষনাথ কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করছেন। কালীঘাটের কালী কিনা আমাদের জানা নেই! তবে এখান থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, ‘এই যোগীই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বহুপূর্বে লিখিত হয়েছিল, লৌকিক প্রবাদ এই যে, গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। এই পুস্তক প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীকৃত করছে।’^{১৪৬} ড. পঞ্চানন মণ্ডলও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন, ‘গোখবিজয়ে’ গোখ কর্তৃক রাঢ়দেশে কালীস্থাপনার কথার সঙ্গে আদিগঙ্গার তীরস্থ কালীঘাটের কালীমূর্তি ও চৌরঙ্গী গ্রাম নিতান্ত সম্পর্কশূন্য নাও হতে পারে। সন্নিকটে ধর্মতলার অবস্থানও প্রণিধানযোগ্য বিষয়।’^{১৪৭} এখান থেকে আরেকটি বিষয়ও উঠে আসছে যে নাথপন্থ ধীরে ধীরে নিরাকার সাধনার পাশাপাশি সাকার সাধনাকেও গ্রহণ করছে। ভক্তিভাবের প্রভাবে নাথপন্থে এমনিতেই দুটি শাখার দেখা মেলে—এক নির্গুণ শাখা, দুই সগুণ শাখা। নির্গুণ শাখা বাস্তবে যোগের

পরিবর্তিত রূপ। ভক্তিধারার জল প্রথম যোগের ঘাট দিয়ে বয়ে গিয়েছে। গোরক্ষনাথ হঠযোগকে ঈশ্বর প্রণিধান করতে ব্যবহার করছেন। তারফলে ঈশ্বরবাদেরও নিশ্চিত ধারণা লাভ করা গেল।^{১৪৮} নাথযোগী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তাঁদের ঐতিহ্যের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও যোগসাধন ও শৈব উপাসনার ক্রমপ্রবহমান ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। নাথকৌল, গোরক্ষনাথী, আদিনাথপন্থ, কাপালিক ও নাথ অঘোরীধারা বাংলায় জীবন্ত এবং বর্তমানে সমানভাবে ধর্ম ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্র

১. নিবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; রাষ্ট্রীয় সংগোষ্ঠী, নাথপন্থ অউর ভক্তি আন্দোলন, পৃ. ৩৩।
২. *An Outline of the Religious Literature of India*, Pp.247-248.
৩. *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, p.218.
৪. *History of Saiva Cults in Northern India*, p.9.
৫. অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক, সুখময় ভট্টাচার্য (অনু.) পৃ. ২০১।
৬. Hirananda Sastri & Others (ed.), *Epigraphica Indica and Record of the Archeological Survey of India*. Vol. XXI, p.5.
৭. *History of Saiva cults in Northern India*, p.10.
৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯।
৯. গোরখবাণী, পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.), পৃ.৩৬।
১০. Kalyani Mallik, *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*, p. 36.
১১. মৈত্রী উপনিষদ, শ্রীরামতীর্থ (সম্পা.), পৃ. ৫২।
১২. *History of Saiva Cults in Northern India*, p. 22.
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
১৪. নাথ সম্প্রদায়, পৃ. ৭৭-৮১।
১৫. প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্, জয়দেব সিংহ (সম্পা.), পৃ. ১০২-১০৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬।
১৮. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায়, পৃ. ৬৭।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
২০. ভম্বরলাল যোশী, কাশ্মীর শৈবদর্শন অউর কামায়নী, পৃ. ১১।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
২২. *Matsyendra Samhita*, Debabrata Sensharma (ed.), Pp.7-8.
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২৪. *Tantraloka*, XXVII, Pp.166-167.
২৫. Ibid, p. 167.
২৬. K. C. Pandey, *Abhinavagupta A historical & Philosophical Study*, p. 548.
২৭. মৎস্যেন্দ্র সংহিতা, পৃ. ১৬।
২৮. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ২।
২৯. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*, পৃ. ৭৩।
৩০. পূর্বশ্চিম ভেদেন শৈলরাজাসুত নুমে।
আনন্দাবলিভেদেন প্রভুয়োগিকেন তু।।- পৃ. ৩।
৩১. *Kaulajnana-Nirnaya*, Prabodhchandra Bagchi (ed.), XXI Patala,
Verses 4-7.
৩২. প্রাগুক্ত, চতুর্দশ পটল, শ্লোক ৯৫-১০০।
৩৩. কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ, *বজ্রযান পরিচিতি*, পৃ. ৮; সাক্ষাৎকার, নাথসন্ন্যাসী, বয়স- ৬৩, ২২
ফেব্রুয়ারি'২৩, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।
৩৪. *গোরখবাণী*, শ্লোক ২০৩।
৩৫. গোপীনাথ কবিরাজ, *ভারতীয় সাধনার ধারা*, পৃ. ৯৮।
৩৬. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*, পৃ. ৬।
৩৭. *গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ*, পৃ. ১২৩।
৩৮. পরশুরাম চতুর্বেদী, *উত্তর ভারত কী সত্ত পরম্পরা*, পৃ. ২৫৫।
৩৯. *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, রসেশ্বর দর্শন প্রকরণ:
'রসস্য পারদত্ত্ব সংসার পরপ্রায়ণহেতুত্বেন।
নদুক্তম সংসারস্য পরম পারং দত্তোৎসৌপআরদস্মৃতঃ।'
৪০. 'চর্পিটিঃ কপিলী ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ।
এতেত্যন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবনুজ্ঞাচ্চরন্তি হি।।' - *সর্বদর্শন সংগ্রহ*, পৃ. ৮১।
৪১. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*, পৃ. ১০।
৪২. জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।
- *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, পৃ. ৪।
৪৩. *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, ৯ম খণ্ড, অঙ্ক ২, পৃ. ১০৮।

৪৪. *History of Saiva Cults in Northern India*, p.3.
৪৫. S. N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol.II, p.124.
৪৬. *History of Saiva Cults in Northern India*, p. 4.
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫।
৪৮. Md. Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, p. 63.
৪৯. কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, ভূমিকা পৃ. ২৮।
৫০. কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর, বর্ণন-রত্নাকর, পৃ. ৩১; শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী (সম্পা.), *সচিত্র হঠযোগ প্রদীপিকা*, পৃ. ২৩।
৫১. *নাথসিদ্ধচরিতামৃত*, রামলাল শ্রীবাস্তব (সম্পা.), পৃ. ১০২-১০৩।
৫২. গোপীনাথ কবিরাজ, *ভারতীয় সাধনার ধারা*, পৃ. ২০৮।
৫৩. জীবন নাথ, *রাজমোহন নাথ*, পৃ. ৬৬।
৫৪. রাজমোহন নাথ, *গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা*, পৃ. ১০।
৫৫. *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*, পৃ. ২৪।
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
৫৭. *নাথপন্থ অউর ভক্তি আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৫৯. Brian Houghton Hodgson, *Notice on Buddhist Symbols*, p. 394.
৬০. J. N. Farquhar, *An Outline of the Religious Literature of India*, p. 254.
৬১. কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, পৃ. ১৮৯।
৬২. *কল্যাণ-যোগাঙ্ক*, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৬৬২ বিক্রম, পৃ. ২৬০।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
৬৪. হরিভদ্র সূরি, *ষড়দর্শন সমুচ্চয়*, প্রস্তাবনা পৃ. ১৬।
৬৫. *কল্যাণ-যোগাঙ্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।
৬৭. *পাহাড় দোহা*, হীরলাল জৈন (সম্পা.), পদ-২১৯, ২২০।
৬৮. *চর্যাগীতির ভূমিকা*, পৃ. ৯০।
৬৯. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Pp. 200-201.

৭০. বেণীমাধব বড়ুয়া, *বঙ্গীয় যোগীসমাজের মর্মস্থল প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি*, পৃ. ২৯।
৭১. গুরুদাস ভট্টাচার্য, *বাংলা কাব্যে শিব*, পৃ. ৮১।
৭২. *বিচিত্র সাহিত্য* ১ম খণ্ড; *নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য*, পৃ. ২৪৪-৪৫।
৭৩. *তত্ত্বালোক*, সুখময় ভট্টাচার্য (অনূ.), শ্লোক. ১/৭, পৃ. ৩।
৭৪. প্রাগুক্ত, শ্লোক. ১/২১৩, পৃ. ৪৭।
৭৫. James Mallinson, *The Khecarividya of Adinatha*, Pp. 6-7.
৭৬. *The Power of the Nath Yogis: Yogis Charisma Political Influence and Social Authority*, Danieia Bevilacqua & Eloisa Stuparich (ed.), p. 35.
৭৭. *Kualajnana-Nirnaya of Matsyendranatha*, Michael Magee (Trans.), p.VIII.
৭৮. *অকুলবীর তন্ত্র-বি.*, শ্লোক. ৫৯-৬০।
৭৯. ধর্মবীর ভারতী, *সিদ্ধ সাহিত্য*, পৃ. ৩০৩।
৮০. Csaba Kiss, *The Yoga of the Matsyendra-Samhita*, Pp. 20-21.
৮১. Veronique Bouillier, *Monastic Wanderers Nath Yogi Ascetics in Modern South Asia*, p. 33.
৮২. কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, পৃ. ১।
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৮৪. *Obscure Religious Cults*. p. 226.
৮৫. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *নাথধর্ম ও সাহিত্য*, পৃ. প্রস্তাবনা ৭-খ।
৮৬. *শ্রীগোরক্ষ তন্ত্রম্*, পৃ. ৪।
৮৭. *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*, p. 5.
৮৮. সাক্ষাৎকার: কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ, নাথসন্ন্যাসী, বয়স ৬৩, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, তাং ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
৮৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি*, পৃ. ৩২০।
৯০. Vidya Dehejia, *Yogini Cult and Temples A Tantric Tradition*, p. 11.
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯০।

৯৫. হাড়মালা-ক পুঁথি, শ্লোক ৭৬-৮৭।
৯৬. নাথ সম্প্রদায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৯৯. *Kaulajnana-Nirnaya*, p. 18.
১০০. সুকুমার সেন, নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, পৃ. ২৪৫।
১০১. পরশুরাম চতুর্বেদী, উত্তর ভারত কী সন্ত পরম্পরা, পৃ. ৫৬-৫৭।
১০২. কঠোপনিষদ, ২/৩/১১।
১০৩. দিবাকর পাণ্ডে, গোরখনাথ এবং উনকী পরম্পরা কা সাহিত্য, পৃ. ৪।
১০৪. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৫/১০; ২/৫/১৪।
১০৫. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, পৃ. ৩৯-৪০।
১০৬. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২২২-২২৪।
১০৭. গোখবিজয়, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ৮৬।
১০৮. বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
১০৯. শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীভক্তমাল, পৃ. ১৫৭।
১১০. বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
১১১. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ. ৫২১।
১১২. গোখবিজয়, পৃ. ৫৩।
১১৩. অথ অনাদ্য চরিত্র, রাজমোহন নাথ (সম্পা.), নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ১৪।
১১৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস, মৌখিক সংস্কৃতিতে নাথ ধর্মসাধনা; বলরাম চক্রবর্তী (সম্পা.), শৈবনাথ যোগিধারা ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
১১৫. শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক বিরচিত ধর্মমঙ্গল (নিরঞ্জনমঙ্গল), সুমিত্রা কুণ্ডু (সম্পা.), পৃ. ৩৬-৩৭।
১১৬. বিচিত্র সাহিত্য প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০।
১১৭. শ্রীধর্মমঙ্গল, ঘনরাম রচনাবলী, মোহন পাল (সম্পা.), পৃ. ৮৬।
১১৮. অর্জুনদেব সেনশর্মা, হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ, পৃ. ১৩৩।
১১৯. মৎস্যেন্দ্র সংহিতা, পৃ. ১৪।

১২০. ঘেরণ্ড-সংহিতা, বিজ্ঞান স্বামী (সম্পা.), পৃ. ১।
১২১. গোখবিজয়, পৃ. ২৬২।
১২২. ঐ, পৃ. ২৬৩।
১২৩. ঐ, পৃ. ২৬৪-২৬৭।
১২৪. Suniti Kumar Chatterjee, *Jayadeva*, pp. 257-58.
১২৫. গোখবিজয়, পৃ. ২৭৭।
১২৬. *Jayadeva*, pp. 37-38.
১২৭. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *মধ্যকালীন ধর্ম সাধনা*, পৃ. ১৩৯।
১২৮. Partha Sarathi Nath, *Nath Pantha Shrines and perpetual Tradition in Bangladesh*, pp.194-96.
১২৯. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সিদ্ধোৎ কী রচনা*, পৃ. ২০।
১৩০. শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
১৩১. *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, পৃ. ১০৫।
১৩২. ঐ, পৃ. ৩০-৩২।
১৩৩. *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, পৃ. ১০৬।
১৩৪. শ্রীমদ্ রাধাবিনোদ গোস্বামী, *বৈষ্ণবচার পদ্ধতি নিত্যপূজা*, হিন্দুবাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ, পৃ. ১৭৪।
১৩৫. ঐ, পৃ. ১৩৪-৩৭
১৩৬. রাজমোহন নাথ, *গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা*, পৃ. ১৭।
১৩৭. জীবন নাথ, *মধ্যযুগে বাংলার সমাজবিন্যাসে নাথদের স্থান*, নাথবন্ধু পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, মহালয়া ১৩৯৫, পৃ. ৩৯।
১৩৮. *The Power of the Nath Yogis Yogic Charisma Political Influence and Social Authority*, p. 23.
১৩৯. ডিম্বরুধর নাথ, *অসমের নাথযোগীদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, হরকুমার নাথ (সম্পা.), *যুগবাণী* পত্রিকা, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৮২।
১৪০. D. Nath, *Religion and Social Formation: The Nath-Yogis of Assam -from Community to Caste*; D. Nath (ed.), *Religion and Society in North East India*, p. 312.

১৪১. *Caste, Marginalisation and Resistance: The Politics of Identity of the Naths (Yogis) of Bengal and Assam*, p. 46.

১৪২. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ১৫০।

১৪৩. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *আলোকপর্ব*, সন্ধ্যা চৌধুরী (অনূ.), পৃ. ৯৪।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

১৪৫. শ্যামদাস সেনের *মীনচেতন*, নলিনীকান্ত ভট্টশালী (সম্পা.), পৃ. ৬-৭।

১৪৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

১৪৭. *গোখবিজয়*, পৃ. ৪২।

১৪৮. কোমলসিংহ সোলংকী, *নাথপন্থ অউর নির্গুণ সন্তকাব্য*, পৃ. ১০১-১০২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন

নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন

২. ক. নাথসম্প্রদায়ের সাধন-বৈশিষ্ট্য

নাথপন্থে শিব-শক্তি হল পরমতত্ত্ব। পারমার্থিক স্তরে সংসারের সমস্ত বস্তুকে পাঞ্চভৌতিক মনে করা হয়। জীবাত্মা বা আত্মার জন্ম হয় না। মানুষ বা জীব বার বার জন্ম নেওয়ায় সে নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর বা শাস্বত। নাথপন্থে আত্মা সদজ্ঞান স্বরূপ শিব। জগতে শিব ভিন্ন সবকিছুই অজ্ঞান স্বরূপ। জগৎ প্রপঞ্চময়, তবু মূল সৃষ্টি শক্তির বাহ্যিক রূপান্তর মাত্র। একমাত্র শিব অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা। শক্তি শিবের সঙ্গে মিলিত হন। পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত থেকে নাথযোগীরা সৃষ্টি হন বলে মনে করেন—

‘পৃথ্বী জলং তথা বহির্বায়ুরাকাশমেব।

এতে সন্তানোদয়াস্ত সম্যগেব প্রকীর্তিতা।।’

নাথপন্থে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মান্য সিদ্ধান্ত বিশেষ। অবধূত মতই হল নাথমত। শ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি হল অবধূত মত। অবধূত সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ছিল।^২ নাথপন্থে যোগহীন জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ণ সাধনপথ।

নাথসম্প্রদায়ে তান্ত্রিকসাধনা:

ড. গোপীনাথ কবিরাজ নাথসম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীতে তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।^৩ নাথযোগীদের দৃষ্টিতে সৃষ্টির মূল হিসেবে অনামা বা শব্দব্রহ্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। শব্দব্রহ্মের অতীত স্থিতিকে পঁচিশ গুণযুক্ত ও পাঁচ-শক্তির সমন্বয় স্বরূপ ধরা হয়। এই শক্তি পঞ্চকের সমন্বয়ের অখণ্ড সৃষ্টি হল শিব। এর আর এক নাম ‘পরপিণ্ড’। এই শক্তির সঙ্গে নিজ শক্তিকে নিয়ে কুণ্ডলিনী নামক পাঁচ রকম শক্তির অবস্থান

ঘটে। নাথপন্থে প্রাচীন শক্তি প্রধান শৈবমতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ ভৈরবীর কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

অনাদি পিণ্ড থেকে ‘আদি পিণ্ড’-র উৎপত্তি ঘটেছে। আদিপিণ্ডেরই কাজ এটা। এরপর মহাসাকারপিণ্ড, সবার নীচে ‘প্রকৃতিপিণ্ড’। প্রকৃতিপিণ্ড পিণ্ডাত্মক নয়, তা হল শক্তিমত বা অনামা। নাথপন্থ শক্তিমত অনামা অনুযায়ী চলে। ‘নবচক্র’, ‘ষোড়শাধার’, ‘লক্ষ্যত্রয়’ এবং ‘ব্যোমপঞ্চক’ আগম সম্মত বিষয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই বিষয়গুলি নেই।

নাথপন্থে তান্ত্রিকমতের সঙ্গে কাশ্মীরি শৈবমতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কাশ্মীরি শৈবমতে তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরি শৈবমতের আচার্য অভিনবগুপ্ত শৈব তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি ‘তন্ত্রালোক’ গ্রন্থে মচ্ছন্দ-বিভুকে (মৎস্যেন্দ্রনাথ) শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।^৪ নাথধর্মে পাশুপত শৈবধারা এবং তন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থে যম এবং নিয়মকে দশাঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত তান্ত্রিক প্রভাব। প্রাণায়ামাদির নাথপন্থে প্রভাব লক্ষ করা যায়। ওঁ-কার সাধন, নাদানুসন্ধান, অজপা-জপ, ষট্চক্র সাধন, কুণ্ডলিনী যোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, তান্ত্রিক-যোগের প্রভাব নাথধর্মে পড়েছে। নাথসিদ্ধ পরম্পরায় ভোগের মাধ্যমে যোগের অস্তিত্ব মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌল পরম্পরায় থাকলেও কিন্তু গোরক্ষনাথ ভোগের মাধ্যমে যোগের দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করেননি। তবু তন্ত্রের যোগ ভোগবাদের কিছু কিছু বিষয় স্বীকৃত রয়েছে। বিন্দু সাধনায় বজ্রোলী, অমরোলী এবং সহজোলী মুদ্রা (তান্ত্রিক বিধান) নাথপন্থে স্বীকৃতি লাভ করেছে।^৫

নাথপন্থে পঞ্চতত্ত্ব-ধারণা, ষট্চক্র-সাধনা, কুণ্ডলিনী-যোগ, শিব-শক্তি সামরস্য, নাদ উপাসনা, নাদানুসন্ধান, শিবশক্তি যোগ, বজ্রদেহত্ব বা পঙ্কদেহ, প্রণব উপাসনা, সোহহং জপ, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ, শক্তিসাধনা, কৌলাচার, নাড়ীযোগ, শব্দব্রহ্মবাদ, প্রতীক-উপাসনা

ইত্যাদি স্বীকৃতি লাভ করেছে। নাথপন্থে শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের সমতুল্য শিবের অর্ধাঙ্গিনী শক্তি বা গৌরীর পূজা আজও প্রচলিত আছে। এই কারণে শিবের যোনিলিঙ্গ আরাধনা প্রচলিত হয়েছে। যোনি এবং লিঙ্গ তান্ত্রিক-আচার্যদের মতে শক্তি ও শক্তিমানের (পার্বতী এবং শিব) প্রতীক। ব্রিগস বলেছেন যে প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় যোগীরা তান্ত্রিক ক্রিয়ার অভ্যাস করেন।^৬ নাথযোগী সম্প্রদায়ে শক্তি উপাসনায় বাম এবং দক্ষিণ দুই মার্গেরই উপাসনা প্রচলিত আছে। তন্ত্র ও হঠযোগের সাধন প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে নাথধর্ম একসময় একটা বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ধর্মরূপে ভারতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।^৭

নাথধর্মের উদ্ভবে বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধধর্ম থেকে নাথপন্থের উদ্ভব ঘটেনি। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. সুশীলকুমার দে, ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনে করেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সাধনা থেকে নাথপন্থের উদ্ভব ঘটেছে।^৮ কিন্তু ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন শৈবধারা থেকেই নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে—

Judging from the literary records and the legends and traditions still prevalent among the yogins of the Nath order it appears that the Nath cult has grown with a general air of Saivism.^৯

ড.কল্যাণী মল্লিকও নাথ সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ থেকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে নাথধর্মের উদ্ভব বৌদ্ধধর্ম থেকে ঘটেনি বা নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি বলেছেন— ‘নাথদের মন্ত্র ‘শিব-গোরক্ষ’, তাঁহাদের তীর্থ শৈবতীর্থ, তাঁহারা শিবের ন্যায় কুণ্ডলধারী, তাহাদের কণ্ঠে যোনিলিঙ্গের প্রতীক ধারণবিধি, কোটেশ্বর তীর্থ হইতেও তাহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসেন এবং নিজেদেরকে শৈব বলিয়া পরিচয় দেন।’^{১০} ‘বৌদ্ধ সহজিয়া দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপনীত হইবার সাধনা করেন। নাথযোগীরা বলেন, ‘দ্বৈতং বাহ্যদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা’।^{১১} ‘এই তত্ত্বাভিত অবস্থা দ্বৈত

বা অদ্বৈত নহে, ইহা ‘দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ’ অবস্থা, এককথায় ‘ষাদৃশ এব তাদৃশ এব’ অবস্থা, ইহাই নাথমার্গের পরমপদ— ‘ন ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রা ন সুরপতি সুরা নৈব পৃথ্বী ন চাপো, নাগ্নির্বায়ুর্ন চ গগনতলং নো দিশো নৈব কালঃ।/নো বেদা নৈব প্রাণা ন চ রবিশশিনৌ বিধিনৈর্ব কল্পঃ, স্বজ্যোতিঃ সত্যমেকং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে।।’^{১২} ‘নাথগুরুকে ‘নাদকলাত্মনে’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুর ‘যুগনদ্ধ’ রূপ।’^{১৩} ‘হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের কোন কোন বিষয়ের ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত যুক্তমার্গ বিশেষ।’^{১৪}

নাথসম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের উপর তন্ত্রসাধনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে বিন্দু সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম যৌন মিলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও নাথসম্প্রদায়ের সাধনায় নারীর কোনো ভূমিকা নেই।^{১৫} নাথধর্ম শৈব-পাশুপত ধারার সঙ্গে তন্ত্র, যোগধারা, কাপালিকমত, সিদ্ধধারা ও যৌগিক রসায়নবিদ্যা মিলিত হয়ে এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন—

The Nath cult seems to represent a particular phase of the siddha cult of India. This Siddha cult of India is a very old religious cult of India its main emphasis on a psychochemical process of yoga, known as the Kaya-Sadhana.^{১৬}

গোরক্ষনাথের পূর্বকালে নাথপন্থীরা ‘কৌল’ নামেই পরিচিত ছিল। কিন্তু নাথসিদ্ধ যোগীদের দীক্ষান্তে নামের শেষে ‘নাথ’ শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে নাথসম্প্রদায় বা নাথযোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। তন্ত্রসাধনায় কৌলসাধনা প্রাচীন আমল থেকে চলে আসছে। এই কুলমার্গকে কোথাও কোথাও ‘অতিনয়’ বা ‘কালিনয়’ মার্গ বলা হয়েছে।

রহস্যবিদ জ্ঞানীব্যক্তিদের কাছে কুলমার্গ অর্ধদ্র্যাক্ষক-কৌলমত নামেও পরিচিত। ভৈরব, ভৈরবী, সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ এই মতের প্রবর্তক। নাথপন্থে যোগ পরম্পরায় মীননাথকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বলা হলেও তন্ত্রসাধনা বা কৌলধারায় মীনানন্দনাথ বলা হয়েছে।^{১৭} ‘তন্ত্রালোক’-র টীকায় মৎস্যেন্দ্রনাথকে তুরীয়নাথ নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অভিনব গুপ্ত ‘তন্ত্রালোক’ গ্রন্থে যে অর্ধদ্র্যাক্ষকমার্গ অথবা তুরীয় মার্গের উল্লেখ করেছেন, কারও কারও মতে এটা নাথমার্গেরই প্রাচীন রূপ। কোনও কোনও স্থানে এই মার্গকে অতিমার্গও বলা হয়েছে।^{১৮}

নাথযোগীরা জীবনুজ্জ্বল সাধনা করেন। তাঁরা মৃত্যুর মাধ্যমে মোক্ষলাভ বা দেহের বিনষ্টির সাধনায় বিশ্বাস করেন না। নাথসিদ্ধরা যোগের সাহায্যে অশুদ্ধ বা অপরিপক্ক দেহকে পক্কদেহ বা সিদ্ধদেহে পরিবর্তন করতে সাধনা করেন। যোগসাধনায় সিদ্ধ বা দিব্যদেহ লাভের পর শিবত্ব বা অমরত্বের সাধনা নাথপন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

‘ধ্যান করিলে সুস্থির হয় যে মতি।
সমাধি শরীরে সিদ্ধি হয়ত মোক্ষতি।।
যোগের ষড়ঙ্গ অঙ্গে যোগতি সার আমি।
সাবধানে সাধন করহ দেবী তুমি।।
যোগের ষড়ঙ্গ অঙ্গে জানিও স্থির রূপে।
বিস্তারিয়া কহি দেবী শুনহ স্বরূপে।।’^{১৯}

নাথপন্থে যোগসিদ্ধির ক্ষেত্রে শরীরে তেরোটি দ্বারের মধ্যে দশটিকে (প্রকট দশমী দ্বারে ব্রহ্মরন্ধ্রের সঙ্গে নবরন্ধ্র আছে) প্রকট এবং তিনটিকে গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন ধরা হয়। এছাড়া মানব দেহে নয়টি নাড়ি এবং বাহ্যন্তরটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। বাহ্যন্তর হাজার নাড়ী মনে করা হলেও শেষপর্যন্ত বাহ্যন্তরটিকে শ্রেষ্ঠ এবং দশ নাড়ীকে প্রধান বলে গণ্য করা হয়েছে। যে বাহ্যন্তরটি প্রকোষ্ঠ ও বাহ্যন্তরটি নাড়ী মানবদেহে আছে তারা শেষপর্যন্ত দশ নাড়ী রূপে

সুষুমা নাড়ীতে মিলিত হয়। সুষুমা-নাড়ী সব নাড়ীর মিলন স্থল। ব্রহ্মরত্ন ছাড়া অন্য নয়টি নাড়ীর নাম হল যথাক্রমে— ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুশা, কুহু এবং শজ্জিনী। প্রত্যেকটা ঘর বা প্রকোষ্ঠে পঞ্চাশ, (অর্থাৎ ষট্চক্রে সব মিলিত হলে পঞ্চাশ দল মনে করা হয়) পঁচিশ এবং পাঁচতত্ত্ব রূপ চোর অবস্থান করে। সিদ্ধযোগী যদি ষট্চক্রের জ্ঞান লাভ করে পঁচিশ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পঞ্চতত্ত্বকে অতিক্রম করতে পারেন তাহলে তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেন—

‘তীস পৌলি তেরহ প্রবাংগী, তীনি গুপ্ত দশ প্রকট জাংগীং।

নৌ নাটিকা কোটড়ী বহতরি, চোর পচাস পচীস পঞ্চ ঘরি।।’^{২০}

গোরক্ষনাথ শৈবমতে একজন পরিচিত সিদ্ধ, এছাড়া গোরক্ষনাথের রচনাবলী থেকেও সিদ্ধসম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।^{২১} কালামুখ সম্প্রদায় যোগবিদ্যার সাহায্যে নিগুণ সাধনা করতেন বলে শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে। কানুপানাথ বা কাহুপা এবং চপটিনাথের উপর কালামুখ সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। শেষে কালামুখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ নাথপন্থে এসেছেন বা মিশে গিয়েছেন। কিছুজন স্মার্ত আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে বীরশৈব পরম্পরা গ্রহণ করেছেন।^{২২} গোরক্ষনাথ ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে কাপালিক সম্প্রদায়ের বর্ণনা করেছেন।^{২৩} যদিও কোনও কোনও স্থানে কাপালিক সম্প্রদায়ের নিন্দাও নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। তবু অনুমান করা যায় যে কোন কোন বিষয়ে কাপালিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সম্পর্কও ছিল।^{২৪} কাপালিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিবশাসন ও সোমসিদ্ধান্তের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা শিবকে কাপালিক রূপে উপাসনা করেন। এঁদের সাধনায় কিছুটা উগ্রতা এসেছে। পরবর্তীকালে নাথপন্থের নটেশ্বরীপন্থ বা অঘোরীধারায় এঁরা মিশে গিয়েছেন। নাথ অঘোরীধারা কাপালিক-সম্প্রদায় জাত। মৈত্রী উপনিষদে সর্বপ্রথম কাপালিক সম্প্রদায়ের

বর্ণনা পাওয়া যায়।^{২৫} দক্ষিণভারতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘শ্রীশৈবপুরাণ’ নামে একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে, যেটা ‘মহর্ষি দুর্বাসা-ঋষ্যশৃঙ্গ সংবাদ’ নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে শিবের কপালের দক্ষিণভাগ থেকে যোগী-নাথের উৎপত্তি; তিনি শিবভক্ত কপাল-ক্ষত্র-কাপালিকদের অধিপতি। বাংলায় পৃথক ‘শিব-পুরাণ’ পুথি পাওয়া গেলেও তার বিষয়বস্তু যোগ-নিন্দুক ব্রহ্মাকে অপদস্থ করে যোগধর্মে দীক্ষিত করার কাহিনি স্থান লাভ করেছে। এইরকম কাহিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নাথযোগীদের মধ্যে কিছুটা ভিন্ন কাহিনিতে মুখে মুখে প্রচলিত আছে।^{২৬} আদিনাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ কামাচাররহিত কাপালিক মতকে প্রত্যেক মন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন—

‘প্রত্যেকং মন্ত্রশাস্ত্রঞ্চ কাপালিকমতানুগম।

কামাচারবিহীনন্তু কল্পয়াম্যহমাদরাত।।’^{২৭}

এছাড়া শিবপুরাণের বায়বীয়-সংহিতা, তান্ত্রিক সাহিত্য, ভবভূতির ‘মালতী মাধব’, রাজশেখর রচিত ‘কপূরমঞ্জরী’, কৃষ্ণ মিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ গ্রন্থে কাপালিক সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাপালিক মতে যোগের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এঁদের সাধনায় শিবশক্তির সামরস্য-র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নাড়ীশোধন, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, বায়ু-নিরোধ ইত্যাদি কাপালিক মতে স্বীকৃত তত্ত্ব। এমনকি হঠযোগ সাধনায় বজ্রোলী, সহজোলী, অমরোলী মুদ্রার বিকাশসাধন করা হয়। নাথসিদ্ধ জালন্ধরনাথ, কানুপানাথের উপর কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে বলে ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন।^{২৮} জালন্ধরনাথ ও কৃষ্ণপাদ বা কানুপানাথের রচনা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁরা কাপালিক ছিলেন।^{২৯} কৃষ্ণপাদ চর্যাপদের একটি পদে নিজেকে কাপালিক যোগী বলে উল্লেখ করেছেন—

‘আলো ডোষি তোএ সম করিবে ম সাজ।

নিঘিণ কহু কাপালি জোই লাগ।।’^{৩০}

তাদের অনেক লেখায় বজ্রযানীধারাও লক্ষ করা যায়। বর্তমানে পূর্বভারতে নাথ অঘোরীধারাতে কাপালিকসাধনা অংশত প্রচলিত আছে। রাজস্থানে নাথসম্প্রদায়ের ‘পাও পন্থে’ এবং জালন্ধরনাথ-রাজা গোপীচন্দ্রের কাহিনিতে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু ড. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন যে ভারতীয় সাহিত্যে কেবল শৈব কাপালিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বৌদ্ধ কাপালিক সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখযোগ্য বর্ণনা নেই। ‘মালতীমাধব’ নাটকে দেখা যায় সৌদামিনী নামক একজন বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রীপর্বতে কাপালিকসাধনা শিখতে গিয়েছিলেন, তখন শৈবকাপালিক সাধনা প্রচলিত ছিল।^{৩১} মনে হয় শুধু কাপালিক সাধনা প্রচলিত ছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাধনায় শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক সাধনার মধ্যে পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান চলত।^{৩২} যেহেতু জালন্ধরনাথ, কানুপানাথ কাপালিক ও বামমার্গের সিদ্ধ ছিলেন সেই কারণে গোরক্ষনাথী সম্প্রদায় তাঁদের মানতে চায়নি। অবশ্য জালন্ধরনাথের ‘পা’ পন্থ নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার নাম হয়েছে ‘পাও-পন্থ’ বা ‘পাগলপন্থ’। কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদ বামমার্গের সিদ্ধ ছিলেন। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, ‘কাহুপাদের ভণিতায় বারোটি চর্যাগীতি মিলিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগী-সিদ্ধ কানপার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে গুরু জালন্ধরির দোহাই রহিয়াছে, ‘সাধি করিব জালন্ধরি-পাএ’।’^{৩৩} এমনকি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে নাথ সম্প্রদায়ের নবনাথের নামের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে জালন্ধরনাথের নাম রয়েছে—

‘জালন্ধরো বসেত্রিত্যুমুক্তরাপথমশ্রিত।’^{৩৪}

গোরক্ষনাথ ‘পা-পন্থ’-কে নাথপন্থে গ্রহণ করলেও বামমার্গ বর্জন করেছেন। কিন্তু যোগিনী কৌলধারা এবং কাপালিক মতে বামমার্গের সাধনার অস্তিত্ব রয়েছে। তারফলে নাথপন্থে অংশত বামমার্গ গৃহীত হয়েছিল বলা যেতে পারে। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নাথমতও

গোরক্ষনাথের মতের ভাবনার অনেক অংশে বিপরীত। আসলে নাথপন্থে অনেক শাখা রয়েছে। জালন্ধরনাথ, কানুপানাথ বা কাহুপাদ কাপালিক ও বামমার্গের সিদ্ধ ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধ কৌলমত এবং সিদ্ধ যোগিনী কৌলমত প্রবর্তন করেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন শৈব যোগমার্গের প্রবর্তক। ‘আইপন্থ’ বা ‘আদিনাথপন্থ’ আবার আদিমত। লাকুলীশ মতও রয়েছে। এছাড়া পুরনো বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়কে গোরক্ষনাথ নাথপন্থে গ্রহণ করে নাথপন্থের পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১২ পন্থে বিভক্ত করেছেন। তারফলে কাপালিক বা কালামুখ সম্প্রদায়, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগ, কৌলধারা ইত্যাদি মত নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাথমত যৌগিক মতে পরিণত হয়েছে।

নাথপন্থের গ্রন্থে আদিনাথ শিবের শিষ্য বলা হয়েছে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও জালন্ধরনাথকে। অন্যদিকে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হলেন গোরক্ষনাথ এবং জালন্ধরনাথের শিষ্য হলেন বারোজন কাপালিক সিদ্ধ—

- ১.আদি ২.অনাদি ৩.কাল ৪.অতিকাল ৫.করাল ৬.বিকরাল
- ৭.মহাকাল ৮.কালভৈরবনাথ ৯.বটুকনাথ ১০.বীরনাথ ১১.ভূতনাথ
১২. শ্রীকৃষ্ণ।^{৩৫}

নাথপন্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নপন্থ ও মার্গের সমন্বয় ঘটেছে। নাথমত বিভিন্ন মত গ্রহণ করে নিজের মতো করে নিয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রথমে সিদ্ধমতের অনুসারী ছিলেন, পরে কৌলমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। কৌলমতে তিনি কামরূপে বামমার্গের সাধনা করতেন।^{৩৬} গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথের কদলীরাজ্যের রাজা হওয়া বা রমণী সংশ্রবের বিষয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয় না। শক্তিসাধনা বা বামমার্গের সাধনার কারণে তাঁকে হয়ত কদলীরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকের নাথসম্প্রদায়ের সাধনগ্রন্থ, কিংবদন্তি ও সাহিত্যে মৎস্যেন্দ্রনাথের চারিত্রিক স্থলনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় না। গোরক্ষনাথ উত্তরসাহিত্যে গোরক্ষনাথের শ্রেষ্ঠত্ব গুরুকেও

অতিক্রম করে গিয়েছে। নাথ সাহিত্যের কাহিনিতে দেখা যায় গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে কামরূপের নারীরাজ্য থেকে উদ্ধার করে আনছেন। গোরক্ষনাথ পরবর্তীসময়ে গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়ে উঠলে কদলী এপিসোড সংযোজিত হয়েছে বলে মনে হয়।^{৭৭} এমনকি গোরক্ষ-পূর্বযুগে নাথসাহিত্যে সিদ্ধহাড়ি বা জালন্ধরনাথের কাহিনি এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধকৌল ধারার কাহিনি প্রচলিত ছিল। পরে নাথপন্থে ‘পা-পন্থ’ গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রচলিত হলে তখন গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হলেন।^{৭৮} নাথপন্থে গোরক্ষনাথ ব্রহ্মচর্যনির্ভর যোগসাধনা প্রবর্তন করেন। সেক্ষেত্রে নাথপন্থে বামমার্গ পরিত্যক্ত হয়। ড. দ্বিবেদী সিদ্ধমার্গ ও সিদ্ধকৌল মার্গকে একই এবং একটিকে আরেকটির দ্বিতীয় পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন।^{৭৯} মৎস্যেন্দ্রনাথ যে সিদ্ধকৌলমত প্রবর্তন করেছিলেন তা গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষ সমন্বয়ের কারণে সিদ্ধযোগিনী কৌলমতে পরিণত হয়েছে। যোগিনী কৌলমত হল শাক্তমত, বৌদ্ধমত নয়।^{৮০} অন্যদিকে বামমার্গের মানুষ গোরক্ষনাথকেও তাঁদের সাধনায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলে ‘যোগীসম্প্রদায়াবিস্কৃতি’ গ্রন্থে চন্দ্রনাথ যোগীর কথায় স্পষ্ট হয়েছে। এই কারণে বামমার্গের মানুষ গোরক্ষনাথের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে শাক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন বলে ড. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় মনে করেছেন।^{৮১} মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়’ গ্রন্থে প্রাচীন কৌলধারার যে চর্চার কথা বলেছেন তা বামমার্গের সাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। গোরক্ষনাথের বামমার্গে আপত্তির কারণে মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধ কৌলমতকে সম্ভবত সিদ্ধ-যোগিনী কৌলধারায় পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ড. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় মনে করেন ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ প্রবর্তিত নাথমত বা প্রাচীন কৌলমত নাথসম্প্রদায়ে গৃহীত হয়নি। তাই মৎস্যেন্দ্রনাথ কৌলমতকে পরিবর্তন করে সিদ্ধযোগিনী কৌলধারায় পরিণত করেন।^{৮২} কিন্তু ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ

প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে শাক্তমতের অনুসারী হয়েছেন। সেজন্য পুনরায় গোরক্ষনাথকে শৈব সিদ্ধমতকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তার কারণ ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত যোগিনী কৌলমতের দ্যোতক, অন্যদিকে ‘অকুলবীর তন্ত্র’ গ্রন্থে কুল (শক্তি) নয়, পূর্বে পরিত্যক্ত অকুল (শিব) সাধনা গোরক্ষপন্থী সাধনায় স্বীকৃত হয়।^{৪৩} এই দৃষ্টিতে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ‘অকুলবীর-তন্ত্র’ গ্রন্থে অকুল (শিব) সাধনা প্রাধান্য লাভ করেছে।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং নেপালে আজও নাথপন্থে কৌলধারা ও বামমার্গের সাধনার অস্তিত্ব রয়েছে। উল্লেখ্য গোরক্ষনাথ কদলীরাজ্যের রাণীদের মোহ থেকে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করার পরে নাথমতে শৈব-শাক্ত মতের পুনর্গঠন করেন। তান্ত্রিক গ্রন্থ ‘নিত্যাহ্নিকতিলকম্’ থেকে জানা যায় যে সিদ্ধযোগিনী বিমলাদেবী মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন।^{৪৪} কিন্তু নাথমতের পুনর্গঠনের পরে তাঁকে গোরক্ষনাথের শিষ্য বলা হচ্ছে। যোগিনী বিমলাদেবীর ‘আইপন্থ’ নাম থেকে ড. দ্বিবেদী অনুমান করেছেন যে শাক্ত ‘আইপন্থ’ গোরক্ষনাথের যোগমার্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে শৈবযোগমার্গ হয়ে গিয়েছে। ‘আই’ শব্দের অর্থ মা। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যোগিনী কৌলমত প্রবর্তনের সময়ে বিমলা দেবী মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েছিলেন কিন্তু নাথমত সংগঠনের সময় গোরক্ষনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে নিলেন।^{৪৫} একইভাবে লাকুলীশ পাশুপত শৈবধারাও রাওয়ালপন্থী হয়ে গোরক্ষনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে গোরক্ষপন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। রাওয়াল, লাকুলীশ শব্দের রূপান্তর। এমনকি গোরক্ষনাথও লাকুলীশ অবতার হয়ে গেলেন।^{৪৬} নাথপন্থে বিভিন্ন শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে। সময়ের পথ ধরে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধমত প্রভৃতি নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন বৈদিক, অবৈদিক সাধনতত্ত্ব নাথপন্থে লক্ষ করা যায়। তারফলে বেদ ও তন্ত্রের বিভাজন করা যায় না। আগমিক সাধনধারা দেশকাল ভেদে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত,

বৈষ্ণব ইত্যাদি মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলস্বরূপ নাথপন্থ একটি যৌগিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।^{৪৭} ড. বেণীমাধব বড়ুয়া প্রাচীন আজীবিকধারা নাথপন্থে বিকশিত হওয়ার কথাও বলেছেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত নাথপন্থে প্রাচীন সিদ্ধমত ও রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সাধন প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এই কারণে তিনি বৌদ্ধ মতের প্রভাব খুঁজে পেতে হতাশ হয়েছেন। ড. দ্বিবেদী মনে করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে শাক্তমতে চলে আসেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ পূর্বযুগের সিদ্ধমত নাথপন্থের উৎসস্থল। কৌল মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য বিমলাদেবী শাক্ত আইপন্থী ছিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করলে তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য হয়ে যান। লাকুলীশ সম্প্রদায় রাওয়ালপন্থী হয়ে নাথপন্থে মিশে যায়। কাপালিক জালন্ধরনাথের ‘পা-পন্থ’ এবং কানুপানাথের বামমার্গের সাধনা অংশত স্বীকৃতি লাভ করে নাথপন্থে সংযুক্ত হয়। এইভাবে অনেক সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট হিসেবে নাথপন্থে রয়ে গেল।^{৪৮}

যোগসাধনানৈলী:

১. হঠযোগ সাধনা—

যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ সম্বন্ধ। যোগদর্শনে জীবাত্তা ও পরমাত্মার সম্বন্ধকে যোগ বলে। পতঞ্জলি ‘যোগসূত্র’ গ্রন্থে ‘চিত্তবৃত্তি-নিরোধ’ অর্থে যোগ শব্দের কথা বলেছেন— ‘যোগশ্চিত্তবৃত্তি- নিরোধঃ’। ‘যোগ-শিখোপনিষদ’-এ চারপ্রকার যোগের উল্লেখ করা হয়েছে— মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ এবং রাজযোগ। নাথপন্থের প্রধান সাধনপদ্ধতি হল হঠযোগ। পতঞ্জলি হঠযোগ ছাড়া রাজযোগের কথা বললেও হঠযোগ ভিন্ন রাজযোগ পদ্ধতি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। হঠযোগে প্রাণবায়ু নিরোধ হলে সিদ্ধ রাজযোগে চিত্তকে নিরোধ করতে পারেন। নাথপন্থে হঠযোগ ও রাজযোগকে আলাদা করে দেখা হয় না, একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ভাবা হয়। হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ পরস্পরকে

সাহায্য করে। গোরক্ষনাথ ‘গোরক্ষ-শতকম্’ গ্রন্থে ষড়ঙ্গযোগ এবং ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলেছেন।

হঠযোগে ‘হ’ এবং ‘ঠ’ বর্ণের অর্থের মধ্যেই হঠযোগ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়।

‘হ’ এবং ‘ঠ’ বিভিন্ন অর্থকে প্রকাশ করে—

হ + ঠ = সূর্য + চন্দ্র

হ+ ঠ = প্রাণ+ অপান

হ+ ঠ = দক্ষিণ + বাম

হ+ ঠ = যমুনা + গঙ্গা

হ + ঠ = পিঙ্গলা + ইড়া

হ+ ঠ = রজ + রেত

নাথসম্প্রদায় উক্ত সব অর্থের ব্যাখ্যাকে এক অর্থে ইড়া এবং পিঙ্গলার যোগ বলে উল্লেখ করেছেন। ইড়া এবং পিঙ্গলার প্রতীকাত্মক রূপকে কখনো কখনো চন্দ্র-সূর্য, বাম-দক্ষিণ, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি বলা হয়েছে। ইড়া-পিঙ্গলার যোগ অপান-প্রাণ, রেত-রজ যোগ হয়েছে। ইড়া-পিঙ্গলার যোগই হল হঠযোগ।

মানব শরীরে তিন প্রকার শক্তি আছে, যথা মন, বায়ু এবং শুক্র। এই তিন শক্তিকে লাভ করতে সিদ্ধ ইড়া এবং পিঙ্গলার যোগ বা হঠযোগ সাধনা করেন। এই তিন শক্তির সাধনায় কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটে। ‘গোরখবাণী’ গ্রন্থে মন, বায়ু এবং শুক্রকে সংযত করে ইড়া এবং পিঙ্গলার সংযোগে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের উল্লেখ করা রয়েছে—

‘অবধু হিরদৌ বসৌ মন নাভী বসৌ পবন।’^{৪৯}

হঠযোগ সাধনার কারণে মনের সংযম সাধন করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব শরীরে মন এক শক্তি রূপে নিহিত থাকে, যার স্থান হৃদয়ে। মনের স্বরূপ শূন্যের সমান হবে—

‘অবধু মন কা সুঁনি রূপ।’^{৫০}

মনের দুটি সত্তা- একটি সুচিন্তা, আরেকটি কুচিন্তা। সুচিন্তাযুক্ত মন কামনা-বাসনার বশীভূত হতে পারে না, সে গুরুশরণ গ্রহণ করে সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তমন যোগীকে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। মনের শক্তি সম্পর্কে যোগীর সম্যক জ্ঞান আবশ্যিক। মনের উপর সিদ্ধযোগী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারলে শরীর সতেজ নির্মল থাকে। মনে অমৃতময় কলসি থাকে। এই অমৃতরস সিদ্ধযোগী সন্ধান করতে পারলে মনে অলঙ্ক্য পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। মনের সংযম প্রক্রিয়ায় প্রাণবায়ু নিরোধ অতি আবশ্যিক। নাথযোগী গোপীচন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘মন পবনের সঙ্গে না করিল মেলা।
তকারণে পরমহংস উড়ি উড়ি গেলা।।
উড়ি উড়ি গেলা হংস নাহি গেলা দূর।
বাহুড়িয়া আইসে হংসা নিরঞ্জনের পুর।।
নিরঞ্জনের পুর বাছা হংসার বিহার।
জ্ঞান মহারস তাতে পবনের আহার।।’^{৫১}

যোগী মন ও বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে বিন্দু বা শুক্রকে উর্ধ্বগামী করেন এবং এই সাধনায় মন ও পবন (বায়ু) চঞ্চলতা মুক্ত হয়।

মেরুদণ্ডের মূলস্থানে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে যোনি স্থানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গের অবস্থান। একে পশ্চিমী-লিঙ্গ বলা হয়। এখানে পুরুষের বিন্দু বা শুক্র এবং নারীর রজঃ- স্থলনের পথ অবস্থিত। যেটা কামবিষহরণ এবং নিরঞ্জনের স্থান, এখানে বিন্দু- স্থলনের অবস্থা হলে পারিভাষিক ভাবে তাকে প্রলয়কাল বা বিষকাল বলে। এই দুই অবস্থায় যে আনন্দের উৎপত্তি ঘটে তা হননকারী। এই দুই অবস্থা অতিক্রম করে সিদ্ধযোগী সহজানন্দ স্তরে পৌঁছান। এই স্তরে সিদ্ধযোগী বিন্দু উর্ধ্বমুখী করে সহজসমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং মন ও প্রাণ স্থির হয়।^{৫২}

বিন্দুকে শুক্র, রস, মহারস, অমীরস, রতন, পারাষীর ইত্যাদি বলা হয়েছে। বিন্দুর স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখী। কিন্তু যোগীরা একে হঠযোগে উর্ধ্বমুখী করেন। বামমার্গের সিদ্ধরা বিন্দুকে ভোগ করেন কিন্তু যোগীসিদ্ধ তাকে যোগের বিষয় করে তোলেন। বিন্দু যোগ রূপের মাধ্যমে যোগী ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান—

‘ব্যদ হী জোগ ব্যদ হী ভোগ। ব্যদ হী হরে চৌসটি রোগ।।’

যা বিদ কা কোই জাগৌ ভেব। সো আপৌ করতা আপৌ দেব।।^{৫৩}
বামাচার সাধনায় বিন্দু ভোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও গোরক্ষনাথ বিন্দুসাধনায় বিন্দুধারণকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেছেন। বিন্দুর কারণে যোগীরা অমরত্ব অর্জন করেন—

‘জরণা জোগী জুগি জুগি জীবে ঝরণা মরি মরি জাএ।’^{৫৪}

গোরক্ষনাথ বলেছেন যে এইভাবে অধোগামী বিন্দুকে সাধক উর্ধ্বগামী করতে পারলে স্বয়ং বিষুও তার চরণধূলি গ্রহণ করেন—

‘উরধৌ জাতা অরধৌ ধরৌ, কাম দন্ধ যে জোগী করৌ।

তজে অল্যগন কাটে মায়া, তাকা বিসনু পষালে পায়া।।’^{৫৫}

মন, পবন ও বিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে শেষে ইড়া এবং পিঙ্গলার সংযোগ ঘটে। শরীরে সুষুমা, ইড়া এবং পিঙ্গলা তিন নাড়ি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নাড়ি। সুষুমা নাড়িকে ব্রহ্মনাড়িও বলে।^{৫৬} সিদ্ধযোগী মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ি থেকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুমা নাড়ি হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যান। ইড়া মেরুদণ্ডে সুষুমা নাড়ির বাঁয়ে থাকে, যা নাকের বাম ছিদ্রে মিলিত হয়। প্রাণবায়ুর সঞ্চালনার কারণে একে গঙ্গা বলা হয়েছে। পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের ডানদিকে থেকে ডান নাকে গিয়ে শেষ হয়। একে কালীগঙ্গা বা যমুনা বলা হয়। প্রাণ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে সিদ্ধ ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহ থেকে আলাদা করে সুষুমাকে উর্ধ্ব ওঠাতে

চেষ্টা করেন। ইড়া-পিঙ্গলাকে সুষুন্নার স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম যোগীকে স্বয়ং অলক্ষ্য বা বিজ্ঞানী (ব্রহ্ম) আখ্যা দেওয়া হয়—

‘ওলটিয়া পবন ষট্ বেধিয়া, তাতৌ লোহৌ সোষিয়া পাণী।

চন্দ সুর দোক্ত নিজ ধরি রায্যা, এসা অলষ বিনাণী।।’^{৫৭}

ইড়া পিঙ্গলাকে অবরুদ্ধ করে সুষুন্না নাড়ি পথে প্রাণবায়ুকে প্রবাহিত করলে কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন ঘটে। হঠযোগে কুণ্ডলিনী জাগরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেরুদণ্ড থেকে সোজা এসে পায়ু ও উপস্থের মাঝখানে এক স্বয়ম্ভু লিঙ্গ অবস্থান করে। যা একটি ত্রিকোণ চক্রে অবস্থিত, একে অগ্নিচক্র বলে। এখানে সর্পিণী আকারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করে। এই কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মদ্বার অবরুদ্ধ করে শুয়ে আছে। এই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত শিবের সঙ্গে সমরস সাধন যোগীর চরম লক্ষ্য।^{৫৮}

ষট্চক্রভেদ করে সিদ্ধযোগী কুণ্ডলিনীশক্তিকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যান এবং অমৃতরস পান করেন। ব্রহ্মরন্ধ্রে অমৃতরসকুণ্ড অবস্থিত, কিন্তু এর প্রাপ্তি হঠযোগ ও গুরু ছাড়া সম্ভব নয়। কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে যোগী কিছু বিশেষ শব্দ শুনতে পান। এই শব্দগুলোর জাগরণ আসলে গুরু উপদেশের কারণে ঘটে। গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘সবদ বিদৌ অবধু সবদ বিদৌ সবদে সীঝাত কায়া।

নিনাণবে রাজা মস্তক মুড়াইলে প্রজা কা অত ন পায়।।’^{৫৯}

প্রথমে সিদ্ধ যে শব্দগুলি শুনতে পান সেগুলি সমুদ্রগর্জন, মেঘগর্জন, বাজনার আওয়াজ। তারপর মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘন্টা, নূপুর, বংশী, বীণার শব্দ শুনতে পান। অন্তিম ধ্বনিগুলি সিদ্ধযোগীকে সহজসমাধি স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এইভাবে সিদ্ধযোগী ব্রহ্মানুভূতি, সহজানুভূতি ও আত্মানুভূতি বা অমৃতানন্দ প্রাপ্ত হন। এটাই সিদ্ধ যোগীদের চরম লক্ষ্য এবং হঠযোগের সর্বশেষ পর্যায়।^{৬০}

হঠযোগ সাধনার পাশাপাশি নাথযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন যোগসাধনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ‘শিবসংহিতা’-তে যোগের শৈলীর উপর ভিত্তি করে চারপ্রকার যোগসাধকের উল্লেখ রয়েছে—

১. মৃদুসাধক
২. মধ্য সাধক
৩. অধিমাত্র সাধক
৪. অধিমাত্রতম সাধক^{৬১}

এঁদের মধ্যে অধিমাত্রতম সাধক শ্রেষ্ঠ, তিনি ইহজাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন—

‘চতুর্থা সাধকৌ জ্যেয়ো মৃদু-মধ্যাধিমাত্রকঃ।

অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাকৌ লঙ্গনক্ষমঃ।।’^{৬২}

চারপ্রকার সাধক আবার চারপ্রকার যোগসাধন-শৈলী আলাদাভাবে বা একসঙ্গে অভ্যাস করেন। সাধকের ক্ষমতা অনুযায়ী যোগদীক্ষা হয়—

১. মন্ত্রযোগ— মন্ত্রযোগ ১২ বছর অভ্যাস করলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। দেবতার দিব্য, সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে একাত্মতা সাধনের ক্ষেত্রে মন্ত্রযোগের সম্বন্ধ রয়েছে। সাধক মন্ত্রজপের মাধ্যমে অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন হন। মন্ত্রশক্তির মাধ্যমে সিদ্ধ-মন্ত্রযোগী দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করে যোগবিভূতি প্রাপ্ত হন বলে মনে করা হয়। গোরক্ষনাথের দৃষ্টিতে—

‘যো মন্ত্রমূর্তিবশগঃ স তু মন্ত্রযোগঃ।’ (অমরৌঘ প্রবোধ)

মন্ত্রযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য চেতনসাধন। সিদ্ধমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, কোনো দেবদেবীর বীজমন্ত্র, গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র, প্রণব বা সোহহং মন্ত্র জপ করতে করতে চিত্তের লয় সাধন করাই হল মন্ত্রযোগ—

‘মন্ত্র জপাত্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।’

নাথযোগী সম্প্রদায়ে মন্ত্রযোগের আর একটি প্রক্রিয়া হল ‘নাদানুসন্ধান’। ‘নাদ’ পরমতত্ত্ব শিব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার নিত্য শব্দময়ী মূর্তি, সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির আদিম স্পন্দাত্মক প্রকাশ। বেদ, উপনিষদ এবং যোগশাস্ত্রে এই নাদকে প্রণব নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নাদের মূলস্বরূপ-ওঁম্। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে—

‘ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোক্ষার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঁম্-কার এব।
সর্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্ম।
অয়মাত্মাব্রহ্ম।’

অর্থাৎ ওঁম্-কার ছাড়া কোন কিছুই স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সবকিছুই এই ওঁম্-কার রূপী ব্রহ্ম। আত্মাও এই ওঁম্-কার রূপী ব্রহ্ম। ওঁম্-মন্ত্র অথবা গুরু প্রদত্ত কোন মন্ত্র অবলম্বন করে জাগতিক সমস্ত আসক্তি ও আকর্ষণ থেকে চিত্তের মুক্তিসাধন প্রয়োজন। মন্ত্রসাধককে সাধনা দ্বারা মন্ত্রকে, গুরু প্রদত্ত মন্ত্র বা নামকে, স্থূল প্রণবকে অনাহত স্বপ্রকাশ নিত্য নাদের স্তরে উন্নীত করতে হয়। নাদের মধ্যে পরমতত্ত্বের সম্যক জ্যোতির্ময় প্রকাশ অনুভব করতে হয় এবং পরমতত্ত্বকে সেই নাদের তথা নিজের ও বিশ্বপ্রপঞ্চের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে হয়। এর মাধ্যমেই জীবের শিবত্ব লাভ সম্ভব হয়।^{৬৩}

২. লয়যোগ- মধ্যম সাধক হঠযোগ সাধনার কারণে লয়যোগ শিক্ষা করেন। হঠযোগ সাধনার সময় লয়যোগ জানা আবশ্যিক। সাধক ধ্যেয় ব্রহ্মতে (লক্ষ্য) সর্বদা লীন থাকেন। চিত্তবাসনা, বিষয়শূন্য রাখা প্রয়োজন। বিষয়বাসনা থেকে চিত্ত নিজের লক্ষ্যে লয় হয়—

‘যচ্চিত্তসন্তন লয়ঃ স লয়ঃ প্রদীষ্টঃ।’ (অমরৌঘ প্রবোধ)

ঘেরণ্ড যোগী লয়যোগ সিদ্ধির চারটি পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন—

‘শাস্তব্য চৈব ভ্রামর্যা খেচর্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্বিধা।’^{৬৪}

সদাশিব লয়যোগের প্রবক্তা ছিলেন বলে ‘যোগতারাবলী’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। গৃহস্থ নাথযোগীদের পক্ষে লয়যোগ সাধনাই সহজতম এবং উৎকৃষ্ট। লয়যোগ সাধনে সহজে ও স্বল্পসময়ে ফল পাওয়া যায়।

৩. হঠযোগ – অধিমাত্র সাধক ৬ বছর পর্যন্ত সাধন করলে সিদ্ধি লাভ করেন বলে ধরা হয়। এই সাধকের হঠযোগ জানা আবশ্যিক। প্রাণবায়ু নিরোধ হলে চক্রে অনেকক্ষণ স্থির থাকে। তারপর সুষুন্না পথে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ, কুম্ভক মুদ্রার সাহায্যে প্রাণবায়ু উর্ধ্বমুখী করে শরীরে বায়ুক্রিয়া সঞ্চালন করার পদ্ধতি হল হঠযোগ—

‘যস্তু প্রভঞ্জন বিধানরতো হঠস্যঃ।’

গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত হঠযোগ কষ্টকর, গুরু নির্দেশে অনুশীলন সম্ভব হয়। মার্কণ্ডেয় মুনি প্রবর্তিত হঠযোগ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, যোগী গোরক্ষনাথ প্রমুখ যোগীগণ হঠযোগী বলে পরিচিত।

৪. রাজযোগ – রাজযোগে সাধক সমস্ত চিত্তবৃত্তি এবং সংস্কার নিরোধ করে নির্বীজ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই পর্যায়ে সাধকের আত্মা বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞাত হলে কৈবল্যালাভ করে। গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘যশ্চিত্তবৃত্তিরহিতঃ স তু রাজযোগঃ।’^{৬৫}

অর্থাৎ যোগসাধনায় বিভিন্ন শৈলীর দৃষ্টিতে এক ‘মহাযোগ’ চারভাগে বিভাজিত হয়েছে। গোরক্ষনাথ নিজেই বলেছেন—

‘লয়যোগো হঠশ্চৌব মন্ত্রযোগস্তৃতীয়কঃ।

চতুর্থো রাজযোগশ্চ দ্বিধাভাববিবর্জিতঃ।।’^{৬৬}

‘শিবসংহিতা’-তেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়—

‘মন্ত্রযোগো হঠশ্চৌব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।

চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ দ্বিধাভাববিবর্জিতঃ।।’^{৬৭}

এছাড়া ‘যোগশিখোপনিষদ’, ‘যোগতত্ত্বোপনিষদ’ আদি গ্রন্থে যোগশৈলীর একই দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে। যোগশিখোপনিষদের দৃষ্টিতে মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ এবং রাজযোগকে একই যোগ এবং অধিকমাত্রায় অগ্রসর হওয়ার যোগ বলে বলা হয়েছে। ‘বরাহোপনিষদ’ (৫/১০) এই যোগ-শৈলীগুলিকে ক্রমশ উত্তরোত্তর যোগভূমি প্রাপ্তির স্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজযোগ দ্বৈতাদ্বৈতভাব বিবর্জিত সমতত্ত্ব। রাজযোগ অন্য সব যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজযোগের প্রবক্তা ছিলেন সদাশিব স্বয়ং—

‘অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

সম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতম।।’^{৬৮}

রাজযোগ সিদ্ধদের মধ্যে যোগী দত্তাত্রেয়নাথ, যোগী গোরক্ষনাথ অন্যতম। যোগী দত্তাত্রেয়নাথের কাছে গোরক্ষনাথ যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। গোরক্ষনাথের সঙ্গে দত্তাত্রেয়নাথের সাক্ষাতের অনেক কাহিনি পশ্চিমভারতে প্রচলিত রয়েছে। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ এবং ভক্তিযোগের সমন্বয় করেই নাথসিদ্ধরা সাধনা করেন। তবে যোগহীন ভক্তি নয়, যোগযুক্ত ভক্তিই কাম্য।

নাথধর্মমত: যোগ ও জ্ঞান

নাথধর্মমতে যোগসাধন প্রণালীর মূলতত্ত্ব হচ্ছে ‘চিত্তশুদ্ধি’।^{৬৯} চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে কায়াশুদ্ধি ও সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি হলে তাতে পরম শিবের ছায়াপাতের কারণে জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য যে গুরু কৃপায় এই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি সম্ভব।^{৭০}

সিদ্ধযোগী সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলেন।^{৭১} এই নিয়মের ভেতরে আহার, নিদ্রা, স্ত্রী-সংসর্গ, বহ্নিসেবন, পর্যটন ইত্যাদি নিয়মের উল্লেখ রয়েছে।^{৭২} যোগশাস্ত্রমতে নাথযোগীদের মিতাহারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।^{৭৩} অতি-আহার, অতিনিদ্রা, অতিভাষণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যদিকে একাহারী বা অনাহারী হওয়াটাও

উচিত নয়।^{৭৪} যোগের কারণে সুস্থ এবং নীরোগ জীবনযাপন করে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। সেই কারণে যোগমার্গকে অন্যান্য সকল মার্গের থেকে শ্রেষ্ঠমার্গ বলা হয়েছে।^{৭৫} শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যোগসাধন ভীষণ কার্যকরী। যোগসাধনায় পার্থিব কামনা-বাসনার অবসান না ঘটলে সাধকের মনে ব্রহ্মভাবের সঞ্চারণ সম্ভব নয়।^{৭৬} যোগেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব।

মুক্তির জন্য যোগ এবং জ্ঞান উভয়ের প্রয়োজন। জ্ঞানহীন যোগ এবং যোগহীন জ্ঞান উভয়ে মুক্তিদানে অসমর্থ।^{৭৭} সেই কারণে নাথধর্মে জ্ঞানযুক্ত যোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। যোগহীন দেহ অপক্ক, ক্ষয়িষ্ণু এবং শোকতাপের অধীন। সেইজন্য সকল জ্ঞান, যোগদেহের মুক্তি দিতে পারে না। অন্যদিকে যোগযুক্ত দেহ পক্কদেহ। পক্কদেহ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে। জ্ঞান অর্থে সাধারণত শাস্ত্রের জ্ঞানকে বোঝায়। ‘মহাজ্ঞান’ হচ্ছে যোগযুক্ত জ্ঞান। নাথসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে এই জ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাথসম্প্রদায়ের গুরুর কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে শিষ্য ‘অষ্টপাশ’ ছিন্ন করতে পারলে ‘মহাজ্ঞান’-র উদ্ভব ঘটে। যোগদেহের জোরে ‘মহাজ্ঞান’ লাভ করা সম্ভব।^{৭৮}

যোগসিদ্ধি সকলে লাভ করতে পারেন না। এই সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। জ্ঞানযোগে মুক্তি লাভ করতে যোগের সাহায্যে সহজে মুক্তিলাভ সম্ভব বলেই যোগমার্গকে মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধনমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠমার্গ বলা হয়েছে।^{৭৯} নাথসাহিত্যসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে গোরক্ষনাথ ময়নামতীকে দীক্ষা দেওয়ার সময় মহাজ্ঞানই প্রদান করেছিলেন।^{৮০} ময়নামতীও মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর জীবনরক্ষা করার জন্য ‘মহাজ্ঞান’ গ্রহণ করতে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে জ্ঞান নিতে অস্বীকার করেছেন। শেষপর্যন্ত রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে।

নাথধর্মে গুরুবাদ:

নাথধর্মে গুরুর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। অবধূতরূপী গুরুকে নাথসম্প্রদায় পরমগুরু রূপে বিবেচনা করেন।^{৮১} এই গুরু বর্ণ-আশ্রম, পাপ-পুণ্য এবং ভোগ-ত্যাগের অতীত মহিমা অর্জন করেন। যিনি নিজের আত্ম-স্বরূপে পরমাত্মার অভেদানুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁকে অবধূত যোগী বলা হয়।^{৮২}

নাথধর্মে গুরুই একমাত্র কাণ্ডারী। গুরু ছাড়া নাথযোগ সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না।^{৮৩} শিবস্বরূপ নাথগুরু সকল ধরনের বিঘ্নবিনাশকারী। এমনকি ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’-গ্রন্থে গুরুকে ‘নাদবিন্দু কলাত্মনে’ বলা হয়েছে।^{৮৪} গুরুর চরণকমলে ধ্যানের মাধ্যমে সাধকের নিরঞ্জনপদ প্রাপ্তি ঘটে। গোরক্ষনাথ ‘গোরক্ষশতকম্’ গ্রন্থের শুরুতে গুরুবন্দনা করেছেন। ‘গুরু সাক্ষাৎ আদিনাথ স্বরূপ’ –এইভাবে পরিচালিত হয়ে তিনি মীননাথের চরণ বন্দনা করেছেন—

‘শ্রীগুরুম পরমানন্দম্ বন্দে সানন্দ বিগ্রহম্,
যস্য সান্নিধ্য মাত্রেন চিদানন্দায়তে তনুঃ।
যৎকাব্যক্ত গুণাধিকম্ তমনিসম্ শ্রীমীননাথম্ ভজে।’^{৮৫}

চৌরঙ্গীনাথের ‘প্রাণসংকলী’ গ্রন্থেও অনুরূপ ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—

‘প্রথমে প্রণামো গুরুকো পায়।
জিন মোহি আত্ম ব্রহ্মা লষণা।।
সদগুরু সবদ কহ্যা তৈ বুঝায়া।
তুহো লোক দীপকমণি সুঝায়া।।’^{৮৬}

নাথধর্মে গুরু থেকে শ্রেষ্ঠদেবতা আর কেউ নেই। নাথ গুরুগণ সর্ববিদ্যা বিশারদ, মহাতপস্বী এবং সকলের মন্ত্রদাতা।^{৮৭} এক্ষেত্রে সদগুরুর করুণা ভিন্ন সহজাবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।^{৮৮} সহজাবস্থা লাভই নাথযোগীর কাছে মোক্ষলাভ, পরম পুরুষার্থ বা নাথস্বরূপে অবস্থান।^{৮৯}

নাথপন্থে ওঁ-কার সাধনার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।^{৯০} এই সাধনতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং গুরু নির্ভর। সদগুরু বা অবধূতগুরু শিষ্যকে এই তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন।^{৯১} নাথধর্মে অসদগুরুর স্থান নেই। সেই কারণে নাথধর্মে মিথ্যাবাদী, জ্ঞানহীন গুরু ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।^{৯২} শ্রীমৎ পুষ্কর নাথজী বলেন—

দেখ বাবা, যোগে দীক্ষা দেওয়া শুধু কানে কানে বীজ মন্ত্র বলে দিলেই শেষ হয় না। এই যোগ হল প্রাণক্রিয়া। আমাদের দেহে এই প্রাণ ছাড়া আর সকল বস্তুই জড় ও পরিণামশীল। একমাত্র চেতন বস্তুরূপে আপাতত প্রাণকেই দেখতে পাওয়া যায়। জীবের চৈতন্য শক্তিরূপে আত্মা যখন জীবদেহে অবস্থান করেন, তখন এই আত্মার নাম হয় জীবাত্মা। তন্ত্রশাস্ত্রে একে বলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। পঞ্চপ্রাণ এই চেতন আত্মা থেকে জাত বলে এরাও চেতন। জন্মমৃত্যুহীন নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা আমি। আমি পচনশীল দেহ, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা নই। আমি জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিকারের অতীত। এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভ হলে বার বার দুঃখজনক জন্ম-মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একেই বলে মুক্তি। সুতরাং প্রাণকে আশ্রয় করে, আমিই যে চেতনময় আত্মা এই জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। গুরু কর্তৃক যোগে দীক্ষা দেওয়ার অর্থ হল, প্রাণক্রিয়া অবলম্বনে ধ্যান করার কৌশল ধরিয়ে দেওয়া। এই প্রাণক্রিয়া ধরার কৌশলকে যোগ বলে। গুরু কর্তৃক যোগে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে, প্রাণক্রিয়ার গতিবিধি ও চিত্তবৃত্তিসমূহের পরিচয় নিতে হয়। দেহের বিভিন্ন নাড়ির অবস্থান পঞ্চপ্রাণের স্বরূপ ও ক্রিয়াশীলতা এবং দেহে ষট্চক্র বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করলে যোগানুশীলন সহজ হয়।^{৯৩}

নাথযোগী সম্প্রদায়ে এমন একটি সিদ্ধমন্ত্র গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত আছে যার স্মরণ-মননে যোগার্থীর মনে শিব-শক্তি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে এবং জীবন ক্রমশ সিদ্ধির অভিমুখ লাভ করে। নাথসম্প্রদায়ে শিবমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র একই সূত্রে গাঁথা। শক্তিমন্ত্র অবলম্বনে সারা বিশ্বের মধ্যে শিবাভিন্না সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির পরিচয় ঘটে। অন্যদিকে শিবমন্ত্র অবলম্বনে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দময় পরমতত্ত্বের পরিচয় হয়।^{৯৪}

নাথধর্মে ওঁ-কার সাধনা:

নাথযোগী সম্প্রদায় ওঁ-কার উপাসনা করে। ওঁ অক্ষরের অর্থ পরমাত্মা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জগৎই ওঁ-কার। তিনকালের অতীত তত্ত্বকথা হল ওঁ-কার। যেখানে আত্মার তিনমাত্রার অর্থ (অ, ও এবং ম = ওঁ) ওঁ-কার। অ, ও এবং ম এই তিন মাত্রা হল তিন-চরণ। আর পরমাত্মার তিন চরণই ওঁ-কারের তিনমাত্রা। ওঁ-কার সাধনার কারণে নাথসন্ন্যাসীগণ নাদ-জনেউ এবং গৃহস্থরা যজ্ঞোপবীত সংস্কার মেনে চলেন। মন্ত্রদীক্ষার সময়ে এই নাদ-জনেউ এবং যজ্ঞোপবীত নাথসম্প্রদায়ের মানুষ ধারণ করেন। তাঁদের ধারণা নাদ-জনেউ বা যজ্ঞোপবীত সংস্কারের মাধ্যমে ওঁ-কার যুক্ত হয়—

‘গলে নাদ পুষ্পন কী মালা, রক্ষা করে

শ্রীশম্ভুজতী গুরু গোরক্ষনাথ জী ওয়ালা।’^{৯৫}

অর্থাৎ ওঁ-কার হল নাদ, ওঁ-কার নাথ, ওঁ-কার পুষ্প, ওঁ-কার গুরু, ওঁ-কার জ্ঞান, এবং ওঁ-কার হল মুক্তি। এসব বলার পরে গুরু গোরক্ষনাথকে ধ্যান করলে তিনি খুশি হন। এটাই নাথসিদ্ধ ওঁ-কার সিদ্ধি। নাথসিদ্ধ ওঁ-কার নাদ-ব্রহ্মের সাহায্যে শব্দ-ব্রহ্ম-যোগীতে পরিণত হন এবং কাল সম্পর্কে জ্ঞাত হন। তারপর অনাহত নাদময় সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে কাল বা সময়কে খণ্ডন করেন। একেই নাথসিদ্ধ বলেন—

‘নাদ বাজে, কাল ভাগে।’

তারফলে ওঁ-কার ত্রিগুণাত্মক সগুণ ব্রহ্ম স্বরূপ থেকে প্রণব নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়—

‘কানন কুন্ডল গল বিচ নাদ।

করো সিদ্ধ নাদ ওঁ-কার।।’^{৯৬}

ওঁ-কার এক অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন আনন্দ স্বরূপ এবং অমৃতলাভের মূলস্তোত্র। ওঁ-কার মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে প্রাণশক্তি বাড়ায় এবং সিদ্ধির জন্য শক্তি দান করে বলে সিদ্ধ গতিশীলতা প্রাপ্ত হন—

‘মঙ্গল্য পাবনং ধর্ম সর্বকামপ্রসাধনম্।

ওঁ-কারঃ পরমং ব্রহ্ম সর্বমন্ত্রেষু নায়কম্।।’^{৯৭}

তাই নাথসম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন ওঁ-কার প্রণব-মন্ত্র অগাধ শক্তিশালী। ওঁ-কার প্রণব সর্বব্যাপী, অনন্ত অপার তার ক্ষমতা। ওঁ-কারকে হংস এবং পরব্রহ্ম নামে জ্ঞানী মানুষ পূজো করেন এবং দিব্যশক্তি স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। গুরু ব্রহ্মার কৃপায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ওঁ-কার সাধনা সম্পর্কে বলেছিলেন—

‘অদৃষ্টবিগ্রহো দেবী ভাব-গ্রাহী মনোময়ঃ।

তস্যোঙ্কার স্মৃতি নাম তেনাহৃতঃ প্রসীদতি।।’

অর্থাৎ ‘ওঁ’ আবাহন করে ধ্যান সমাধিযোগে ঈশ্বর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। গোরক্ষনাথ বলেছেন যে বায়ু এবং অগ্নির সামরস্যই হল ওঁ-কার—

‘যকারো বায়ুবীজং স্যাৎ রকারো বহুবীজকম্।

তয়োৰভেদ ওঁকারশ্চিদাকারঃ প্রকীৰ্তিতঃ।।’^{৯৮}

নাথপন্থে স্বরোদয়-সাধনা স্বীকৃত রয়েছে। গোরক্ষনাথ বলেছেন যে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন খাওয়া উচিত এবং যতক্ষণ চাঁদ থাকে ততক্ষণই ঘুমানো উচিত। কিন্তু জল এই দুই সময়ে পান করা উচিত নয়। জীবিত (আত্মা) -র নীচে জড়শরীর থাকা উচিত।

অর্থাৎ জড় শরীরের উপযোগ আত্মলাভের জন্যে করা উচিত। কালদণ্ড খণ্ডন করে মৃত্যুঞ্জয় সাধনা নাথপন্থে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘সাম্প্রতং শ্রীতুমিচ্ছামি কালস্য বধঃনং শুভম্।’^{১৯৯}

অন্যদিকে জীবের হৃদয়স্থ প্রাণ বা স্পন্দন শক্তিই প্রাণ-অপানের নিয়ন্ত্রক হংস বা অজপা মন্ত্র।^{১০০} জীবমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে ‘হং-সঃ’ –এই মন্ত্র দিনরাত্রি জপ করছে। জীব আপনা-আপনি সর্বক্ষণ এই মন্ত্র জপ করছে বলে একে ‘গোরক্ষসংহিতা’-তে অজপা মন্ত্র বলা হয়েছে।^{১০১} ওঁ-কার সাধনায় ত্রিরত্নকে উপলব্ধি করা নিয়ম। এই ত্রিরত্ন হচ্ছে চিৎস্বরূপ ঈশ্বর বা পরম শিব, পরম শিবের সঙ্গে নিত্যযুক্ত চিৎশক্তি এবং বিন্দু, মহামায়া বা কুণ্ডলিনী।^{১০২} হংসমন্ত্র বা গায়ত্রীকে ‘অজপা-গায়ত্রী’ এবং প্রাণবিদ্যা বলা হয়েছে।^{১০৩} ‘হংস’ শব্দের বৈদিক অর্থ হল আদিত্য, সূর্য বা বিশ্বের অখণ্ড-জ্যোতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একে আত্মজ্যোতি বলে। এই প্রাণই সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম।^{১০৪} প্রণব নির্গুণ। ‘অ-উ-ম’-র তিন মাত্রাকে ধরা হয় নাদ, বিন্দু এবং শিবের পঞ্চমুখস্বরূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং শিব প্রণবের পঞ্চদেবতা।^{১০৫}

নাথধর্মে কায়াসাধনা:

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিশিষ্ট সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে কায়াসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে রসেশ্বর, বৌদ্ধ, জৈন, সহজিয়া সিদ্ধসম্প্রদায়ের মত নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেও একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যোগসাধনার ক্ষেত্রে কায়াসিদ্ধি প্রচলিত আছে।^{১০৬} ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থ অনুসারে রসায়নবিদ্যার সাহায্যে নাথসিদ্ধ কায়াসিদ্ধি সাধনা করেন।^{১০৭} রসায়নবিদ্যা সিদ্ধকে জড়দেহ ত্যাগ করে সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ লাভে সাহায্য করে।^{১০৮} সিদ্ধদেহকেই প্রণবদেহ বা মন্ত্রদেহ বলা হয়েছে। আসলে যোগদেহ, সিদ্ধদেহ, প্রণবদেহ, মন্ত্রদেহ, রসময় দেহ এবং বজ্রদেহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।^{১০৯} সিদ্ধদেহই

জ্যোতির্ময় দেহ। যোগসাধনার সাহায্যে নাথসিদ্ধ জড়দেহকে পুরুদেহে (বজ্রদেহ) রূপান্তরিত করেন। নাথসাহিত্যে কায়াসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়—

‘নাচন্ত যে গোর্থনাথ ঘাঘরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।’^{১১০}

বিন্দুরক্ষার কারণে পিণ্ড-ঐশ্বর্য লাভ নাথসম্প্রদায়ের সাধনার লক্ষ্য। মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ কথোপকথনে বিন্দুরক্ষার উল্লেখ রয়েছে। নাথপন্থে খেচরীমুদ্রার সাহায্যে সহস্রাতে ক্ষরিত অমৃত লাভের মাধ্যমে সিদ্ধযোগী পিণ্ড-ঐশ্বর্য লাভ করেন।^{১১১}

যোগশাস্ত্র মতে মানুষের নাভিকমলে সূর্য ও তালুস্থানে চন্দ্রের অবস্থান। চন্দ্র থেকে নির্গত হওয়া অমৃত সূর্য উর্ধ্বমুখী হয়ে গ্রাস করে।^{১১২} খেচরীমুদ্রার জন্যই অমৃত ক্ষরণ রোধ করা সম্ভব হয়।

উল্টোসাধনা:

নাথসম্প্রদায়ের কায়াসাধনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উল্টোসাধনা। উল্টোসাধনার অর্থ মৃত্যুপথে অগ্রসর না হয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হওয়ার সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধদেহে শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে উর্ধ্বমুখী করেন। তারফলে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়। কুম্ভক যোগের সাহায্যে ষট্চক্রভেদ করে সিদ্ধ উল্টো-সাধনার স্তরে সাফল্য অর্জন করেন। উল্টো-সাধনার উদ্দেশ্য হল মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করা। যোগশাস্ত্রমতে ‘খেচরী মুদ্রা’-কে উল্টো-সাধনা বলা হয়েছে। একে ‘বিপরীতকরণী মুদ্রা’ও বলা হয়।^{১১৩} উল্টোসাধনার সাহায্যে সিদ্ধ কালজয়ী ক্ষমতা লাভ করেন। নাথসাহিত্যে উল্টোসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়—

‘ষট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান।
মেরুমূলে বাহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা।।
বেংকা নালে সাধ গুরু না করিঅ হেলা।

উলটিয়া হৌক পুষ্প পুনি কর ধ্যায়ান।

বুজ বুজ যাএ গুরু তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান।।^{১১৪}

উল্টোসাধনা মানবদেহের সমগ্র দৈহিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক গতির বিপরীতে উর্ধ্বগতি প্রদান করে। তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে সিদ্ধ সাধনার মাধ্যমে দিব্যদেহ লাভ করে অমরত্ব অর্জন করেন।^{১১৫}

নাথসম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে শক্তি ও শিবের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যোগশাস্ত্র অনুযায়ী মানবদেহে সর্বমোট ছ’টি চক্রের সমষ্টি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আঞ্জাচক্র। অন্যদিকে সহস্রাতে শিবের স্থান অবস্থিত। এই চক্র মানবদেহের মাথায় অবস্থিত এবং সহস্র দলযুক্ত। শক্তিস্থান মূলাধারে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। সহস্রা এবং মূলাধার চক্রের সংযোগেই মানবদেহে সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। যোগের সাহায্যে এই শক্তিকে উর্ধ্বমুখী করে সহস্রাতে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়াই নাথসম্প্রদায়ের সাধনা। এই প্রক্রিয়ায় শিব-শক্তির মিলন ঘটানোর মাধ্যমে সিদ্ধ বা যোগী সামরস্য লাভ করেন। তখন সিদ্ধ বা যোগী যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ এবং প্রণবদেহের অধিকারী হন।

নাথধর্মে সিদ্ধমত:

নাথসম্প্রদায় সর্বভারতীয় সিদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা।^{১১৬} সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য অন্তরঙ্গ সাধনা। যোগের সাহায্যে সিদ্ধ অপক্ক দেহকে দণ্ড করে দেহস্থিত অমৃত পান করে সিদ্ধদেহ লাভ করাই তাঁদের সাধনা। যোগীরা অপক্ক দেহকে সাধনার মাধ্যমে যে স্তরে পৌঁছায় সেই স্তরকে পক্কদেহ, যোগদেহ, সিদ্ধদেহ, হংসদেহ এবং দিব্যদেহ বলে। ‘শিবসংহিতা’ তে কৈবল্যরূপ মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে সিদ্ধমার্গের প্রশংসা করা হয়েছে—

‘নানামার্গেস্তু দুষ্প্রাপ্যং কৈবলং পরমপদম্।

সিদ্ধমার্গেন লভ্যন্তে নান্যথা শিব ভাষিতম্।।’^{১১৭}

নাথসম্প্রদায়ের রসেশ্বর মতের অনুগামীরা রসসিদ্ধির সাধনালাভের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এঁরা যোগ এবং প্রাণায়ামাদির কঠোর সাধনপ্রণালী ত্যাগ করে রস (পারদ) প্রয়োগের মাধ্যমে দেহস্থৈর্য লাভের সাধনা করতেন। রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত নাথসিদ্ধগণ অনুরূপ সাধনায় গুরুত্ব দিতেন। রসসিদ্ধরা সিদ্ধদেহকে ‘রসময়ী তনু’ বলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত সিদ্ধমার্গ এবং নাথপন্থের শৈবতান্ত্রিক সাধনার কারণে নাথেরা তান্ত্রিক ব্রাহ্মণরূপে সমাজে পরিচিত হয়েছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণদেরও শক্তি এবং শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হয়ে নাথ উপাধি গ্রহণ করতে দেখা যায়। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র সাধনায় যোগীদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিস্মরণীয়—

‘মথিত্বা চতুরোবেদান্ সর্বশাস্ত্রানি চৈব হি।

সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তত্রংপিবন্তি পণ্ডিতাঃ।।’^{১১৮}

প্রাচীন রসমার্গেও (রসায়ন শাস্ত্র) ঐ একই ধারার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।^{১১৯} নাথসিদ্ধগণ মনে করেন বেদান্তশাস্ত্রের সাহায্যে দেহদোষ দূর হয় না। দেহ পরিশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস প্রয়োজন। যোগাভ্যাসের প্রধান বিষয় হল কুণ্ডলিনী জাগরণ। অর্থাৎ সিদ্ধধারায় কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে সাধনধারা প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের দেহে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র বা চক্র আছে সেগুলিকে কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে সমভাবে নিয়ে যান সিদ্ধ।

শূন্যবাদ:

যোগী গোরক্ষনাথ ‘আগমতত্ত্ব’কে শূন্য বলতে নিষেধ করেছেন—

‘বস তীন সুন্য, সুন্য ন বসতী’।

এই শূন্য অগম ও অগোচর। তাহলে গোরক্ষনাথ আগমতত্ত্বকে শূন্য বলে কোন বিষয়কে বলতে চেয়েছিলেন! হয়তো শূন্যত্ব কেবল অস্তিবোধক, যা অনির্বচনীয় অনুভূতি। ড.

পীতাম্বর দত্ত বড়খাল মনে করেন গোরক্ষনাথের উক্ত কথায় শূন্যত্বকে অস্বীকার করা হয় নি।^{১২০} (অর্থাৎ তাঁর মতানুসারে শূন্য ‘অস্তি’ ও ‘অনস্তি’(সৎ ও অসৎ) এবং তিনি সম্ভবত নাগার্জুনের মতকে অনুসরণ করেছেন। নাগার্জুন বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে অনাত্ম অনুভূতি স্থলে আত্ম অনুভূতি করেছেন। এই কারণে হয়ত আচার্য শঙ্কর ‘পদ্মপুরাণ’-এ ‘প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ’ মত বলেছেন।^{১২১} এমনকি ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থ অনুসারে নাথপন্থের প্রবর্তকদের মধ্যে নাগার্জুনকেও উল্লেখ করা হয়েছে—

‘নাগার্জুনো জড় ভরতো হরিচন্দ্রস্মৃতিয়কঃ।

সত্যনাথী ভীমনাথী চপটস্থতা।

অবদ্যশ্চৈব বৈরাগ্যঃ কল্পধারী জলধরঃ।

মার্গ প্রবর্তকা হোতে তদুচ্চমলয়ার্জুনঃ।’^{১২২}

বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের সময়ে বৌদ্ধসিদ্ধ অনেকেই নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য বৌদ্ধ শূন্যবাদকে নাথযোগীরা হিন্দু-ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদে পরিণত করে নিয়েছেন। নাথযোগীরা নাগার্জুনের শূন্যবাদী সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হয়ে বলতে চেয়েছেন ‘যা কিছু দেখা যায় সব শূন্য, আস্তিকতা-নাস্তিকতা দুই-ই ভুল ও মিথ্যা। পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ড, ইহলোক ও পরলোক, সূর্য ও চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কূর্ম ও শেষ, গুরু-শিষ্য, ব্যক্তি, জাতি, মন্দির, দেবতা, পূজা-অর্চনা, ভজন-স্মরণ সবই শূন্য। বলা-শোনা, বাদ-বিবাদ সব শূন্য। তত্ত্ব বলে কিছু নেই। শূন্যে ধ্যান শুরু করো। পাপ-পুণ্য কিছু জানি না।’^{১২৩}

নাথপন্থে ব্রহ্মরক্তের অর্থ বোঝাতে ‘শূন্য’ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে বলে মনে হয়। নাথ যোগীরা নাগার্জুনকে যোগী বলে মানেন। ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে তাঁকে ‘মহানাথ’ বলা হয়েছে—

‘নাগার্জুনো মহানাথঃ।’^{১২৪}

ব্রহ্মরক্ত অর্থে ‘শূন্য’ এবং ‘ভ্রমরগুফা’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ড. পীতাম্বর দত্ত বড়খাল নাগার্জুনের স্থলনিবাস সূক্ষ্ম-ব্রহ্মের প্রতীকে পরিণত হয়েছে বলে মনে করেন। তাকে ‘ভবর গুফা’ বা ‘ভ্রমর গুহা’ বলা হয়। যেটা হল শূন্য। চপটনাথ ও কাণেরী বা কানুপানাথ নাগার্জুনের উল্লেখ করেছেন—

‘পুছে কাণেরী নাগা অর জন।

ব্যণ্ড ছাড়ি প্রাণ কহাঁ সমাই।।

চরপট কহৈ সুনৌ হৌ নাগা অরজন সৌরান কী সহনাণী।

কাণেরী স্বসংমেব সিদ্ধ নাগার্জুন কে শিষ্য হৈ।।’

দুজন নাগার্জুনও থাকতে পারেন, একজন যিনি নিজের জীবৎকালে ‘বোধিসত্ত্ব-নাগার্জুন’ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি প্রায় একশো বছর জীবিত ছিলেন। অন্যদিকে ‘মহানাগ’ অর্থাৎ মহাপাপশূন্য = নাগার্জুন অর্থ পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়েছে।

যেমন মৎস্যেন্দ্রনাথের অর্থ হল—

‘মচ্ছাঃ পাশাঃ সমাখ্যাতাঃ চপলাশ্চিবৃত্তয়ঃ।

শছেদিতাস্তু যদা তেন মচ্ছন্দ স্তেত কীর্তিতঃ।।’

এবং

‘পাশখণ্ডন স্বভাবী মচ্ছন্দ এব।।’^{১২৫}

‘মৎস্য’ এবং ‘পাশ’ চঞ্চলমন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক। এর সারাংশ হল নাথপন্থী যোগীরা বৌদ্ধ শূন্যবাদের অনুগামী নয়। তাঁরা ভগবান আদিনাথ (শিব) ও আত্মাকে মানেন। বৌদ্ধরা নাস্তিক। অতএব বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও নাথপন্থের শূন্য একার্থক নয়। নাথপন্থে শূন্য শব্দের প্রচলন ও ব্যবহার ঘটেছে ব্রহ্মরক্ত, চিদাকাশ এবং অবাঙ্মানসগোচর অর্থে। নাথসম্প্রদায় অস্তিবাদী বা আস্তিক, কিন্তু চরমসত্যকে লাভ করতে ‘অস্তি- নাস্তি’র সীমা অতিক্রম করে সে যে স্তরে পৌঁছাতে চেষ্টা করে তাকে ‘শূন্য’ বলা হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের ‘হাড়মালা’ গ্রন্থেও শূন্যের অব্যক্ত ও অনির্দেশ্য সৃষ্টিশক্তির বিশালতাময় ভাবের উল্লেখ রয়েছে—

‘এই মন্ত্র জপিয়া দেবী নিরঞ্জন জান।
সূক্ষ্ম রূপে আছে সেই শূন্য অধিষ্ঠান।।
সূক্ষ্মরূপে নিরঞ্জন সেই নিরাকার।
তার রূপ নিরঞ্জন কেবল নৈরাকার।।
শূন্যরূপ শূন্যাকার কেবল শূন্যময়।
শূন্যরূপ নিরঞ্জন জানিবা নিশ্চয়।।
সাবধানে সাধনা দেবী করিবা নিত্য নিত্য।
যাবৎ শূন্যের মধ্যে লয় না হয় চিন্তা।।
শূন্যের মাঝেতে আত্মা জানিবা নিশ্চয়।
আপনারে আপনা জানিবা শূন্যময়।।
আপনারে শূন্য করি জানে যেই জন।
সেই সে পরমযোগী জানে ত্রিভুবন।।’^{১২৬}

নাথদর্শন মতে পরমপুরুষের পাঁচগুণ— অপর-পর, পরমপদ, শূন্য, নিরঞ্জন ও পরমাত্মা। শূন্য থেকে সত্ত্বাত্ম (মহতত্ত্ব) উৎপন্ন হয়। শূন্যেরও পাঁচগুণ—লীনতা, পূর্ণতা, উন্মী, লোলতা, মূর্ছতা।^{১২৭} এখানে শূন্য অর্থে শূন্য পরমপদ-অপর-পরের সমাবেশ। অপর-পর থেকে স্কুরতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং নাথপন্থের শূন্যতা সৃষ্টিক্রিয়ায় সর্বশক্তির পূর্ণতা— ‘পূর্ণমিদং পূর্ণমদং পূর্ণাং পূর্ণমবশিষ্যতে’-Undefined Infinity। এটাই নাথধর্মের গোড়ার কথা।^{১২৮}

হংসসাধনা:

মানবদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়রাজ্যে অনাহত পথে জীবমাত্রই শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ প্রাণ-অপানের আসা-যাওয়াতে উচ্চারিত মন্ত্রকে ‘হং-সঃ’ মন্ত্র বলে। প্রাণবায়ু ভেতরে এলে ‘সঃ’ ও অপানবায়ু বাইরে গেলে ‘হং’ মিলিত উভয় ‘হংসঃ’ এই মন্ত্র দুটি জপ না করলেও আপনাআপনি জপিত হতে থাকে—

‘হংকারেণ বহির্ঘাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হংসো হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ।।^{১২৯}

জীব হংস মন্ত্রটি সর্বদা জপ করছে। এর মধ্যে যখন ‘হং’ শব্দের উচ্চারণ হয় তখন জীব বহির্ভাগে প্রসারিত হয়। আবার ‘সঃ’ শব্দের যখন উচ্চারণ হয় সেই সময় পুনরায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই ‘হংসঃ’ মন্ত্রটিকে বিপর্যয় করলে ‘সোহহং’ মন্ত্রটি পাওয়া যায়। এই ‘সোহহং’ মন্ত্রের অর্থ-আমিই সেই। অর্থাৎ বাসনা বা বৃত্তি সম্বন্ধ যুক্ত প্রপঞ্চ স্বরূপে আগত আমিই সেই বিশ্বব্যাপী চেতনস্বরূপ পরমাত্মা বলে গোরক্ষনাথ নির্দেশ করেছেন। এই ‘হং-সঃ’ মন্ত্রই ‘মহামন্ত্র’ বা ‘অজপা গায়ত্রী’।^{১৩০}

বিনা জপ বা বিনা অভিপ্রায়ে আসা-যাওয়া করছে বলে এই হংস মন্ত্র সর্বদা অজপা-মন্ত্র বলে পরিচিত হয়েছে। গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।

তস্যাঃ স্মরণমাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।^{১৩১}

নাথযোগীগণ ‘অজপা গায়ত্রী’-র সর্বদা স্মরণ করতে করতে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই গায়ত্রী নাথযোগীদের মোক্ষদায়িনী। অজপা গায়ত্রী দ্বারা সবপাপ দূর হওয়ার পরে চিত্তশুদ্ধি হলে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে কৈবল্য লাভ হতে পারে। এই গায়ত্রীর মত বিদ্যা, এই গায়ত্রীর মত জপ, এই জ্ঞানের মত জ্ঞান কখনোই ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং কদাচিৎ হবেও না। এই গায়ত্রী পরম বিদ্যা, এর জ্ঞান অভ্যাস করতে পারলেই জীব ধন্য হতে পারে। এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়। এর দ্বারাই জীবন সঞ্চারিত হয়। এই কারণে অজপা গায়ত্রীকে প্রাণবিদ্যা বলে। এই মহাবিদ্যা যিনি জানেন তিনি বেদবেত্তা বলে পরিচিত হন। কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারাই অজপা গায়ত্রীর পরিপুষ্টি ঘটে—

‘কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিনী।

প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ ।।^{১৩২}

এই শব্দব্রহ্মের আরেক নাম প্রণব। মন্ত্রজপ করতে হলে বেদত্রয়ী সাধারণ বা বেদসার প্রণব (ওঁ) মন্ত্রই জপ করবে। যাবতীয় মন্ত্রই এই একাক্ষর প্রণব মন্ত্র থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই প্রণবই ব্রহ্ম, ইনিই পরমপদ বা পরমাত্মা। প্রণব শব্দরূপা বলে বেদাদিতে শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মধ্বনি নামে অভিহিত হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রজপ করলে একমাত্র প্রণব (ওঁ) মন্ত্রই জপ করা উচিত। ওঁ, ওঁ, ওঁ – এককভাবে অথবা অ+উ+ম— এই তিনটি মন্ত্রকে একক ধরে জপ করার কথা নাথপন্থে বলা হয়েছে।^{১৩৩} নাথপন্থের ‘অনাদ্য-চরিত্র’ গ্রন্থে অজপা-গায়ত্রীর উল্লেখ আছে—

‘অং ওঙ্কার দ্বনি জগৎ উৎপত্তি।
উচ নিচ নহে সেই ত্রিজগতের পতি।।
নিজ নাম ব্রহ্ম নাম শুন ত্রিলোচনে।
নাথ গুরুর ব্রহ্ম নাম- ‘হং-সঃ’ শুনহ শ্রবণে।।
হরের নিজনাম – শুনহ ‘স্ব্য-অং’।
হরির নিজনাম শুনহ কালি—অং ।।
শুন পুত্র ব্রহ্মভেদ কহিলাম তুমারে।
য়েতেক ব্রহ্মভেদি শাদিবা এ জগতে।।’^{১৩৪}

স্ব্য-অং=সোহং, অং= ওঁ, দ্বনি=ধ্বনি, কালি=কেবল। অশিক্ষিত যোগী সাধকের দর্শনজ্ঞান লক্ষ্য করার বিষয়। ওঁ-কার জগৎ সৃষ্টির মূল। হং-সঃ –অজপা গায়ত্রী, নাথগুরু—অলখ নিরঞ্জনের ব্রহ্মনাম। শিবমন্ত্র— সোহং, বিষ্ণুর মন্ত্র—অং (ওঁ)।

কুলকুণ্ডলিনী ও চক্রসাধনা:

যোগশাস্ত্রমতে যে শিবাশ্রিতা, শিবাভিন্না সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে অনাদি অনন্তকাল ধরে অভিব্যক্ত, লীলায়িত করছেন তিনিই সেই মহাশক্তি রূপে মানুষের ভেতরে নিদ্রিত অবস্থায় আছেন। এই মহাশক্তিকে নাথযোগীরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে থাকেন। বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্ববিলাসিনী মহাশক্তি নিজেকে সংকুচিত করে সাপের মত কুণ্ডলী

পাকিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। জীবজগতে সমস্ত জীবের মধ্যে তিনি এইভাবে থাকেন। তিনি সমষ্টি-জগতে, ব্যাষ্টিদেহে, পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে সমরূপে ও সম-অবস্থানে বিরাজ করেন। মানুষ সাধনার মাধ্যমে নিদ্রিত মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে সেই মহাশক্তির বিচিত্র ঐশ্বর্য অনুভব করতে পারেন। নাথযোগীদের চক্রসাধনা সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করারই সাধনা। তাঁরা দেহে ষট্চক্র বা অষ্টচক্র বা নবচক্র পরিকল্পনা করেন। মহাশক্তি নিম্নতর মূলাধার চক্রে ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁকে জাগিয়ে দেহের ভেতরে অবস্থিত সুষুপ্তাপথে স্তরে স্তরে ওঠাতে হবে। সহস্রাচক্রে পরম ব্যোমে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে। তখন কুল (শক্তি) ও অকুল (শিব) বিশ্বময়ী ও বিশ্বাতীত এক অখণ্ড অনুভূতিতে মিলিত হয়।^{১৩৫} তখন কুল অকুলকে আলিঙ্গন করেন। কুল ও অকুলের এই ঐক্যই পরম শিবের তাত্ত্বিক স্বরূপ—

‘অকুলং কুলমাধত্তে কুলং চাকুলমিচ্ছতি।

জলবুদ্বদবদন্যায়াদেকাকারঃ পরঃ শিবঃ।।’^{১৩৬}

কুল ও অকুল দুই-ই বস্তুত একই। অতএব অভিব্যক্তির পর কুল অকুলের সঙ্গে মিলে যায়। যোগপিপাসু ব্যক্তি হঠযোগের সাহায্যে কুলের (মহাশক্তি) সাধনা করেন। মহাশক্তিকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন এবং অকুলের সঙ্গে (বিশ্বাতীত পরম শিব) কুলকে মিলিত করে পরম আনন্দ অনুভব করেন। এইভাবে হঠযোগ রাজযোগে পরিণত হয়।

রাজযোগের সাধক ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অনুশীলনের মাধ্যমে সর্ববিধ চিত্তাবস্থা, সংস্কার ও ভেদবোধের উর্দ্ধে উঠে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। শিবের অনুভবের সঙ্গে তাঁর অনুভব এক হয়ে যায়। তিনি শিবস্বরূপতা লাভ করেন ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে পরিণত হন। অখণ্ড অনন্ত ‘দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত’ পূর্ণ জ্ঞান-আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর রাজত্ব করেন। হৃদয়ে গুণাতীত ভাবে ভাবিত হয়ে জগতে সমস্ত গুণ

নিয়ে খেলা করেন। নাথযোগীরা একে ‘অবধূত’ বলেন। অবধূত অবস্থা লাভই নাথযোগী সম্প্রদায়ের সাধনার আদর্শ। যাঁরা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হন তাঁরা মহাসিদ্ধ রূপে পূজিত হন।^{১৩৭}

নাথসিদ্ধগণ মনে করেন বেদান্তশাস্ত্র শোনা বা বিচারের মাধ্যমে দেহদোষ দূর হয় না। দেহ শোধনের জন্য যোগাভ্যাস প্রয়োজন। যোগের মূল স্তম্ভই কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থান। সাধকদের যাবতীয় সাধনা কুণ্ডলিনীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। জীবদেহে যে কয়টি শক্তিকেন্দ্র চক্র আছে সেগুলিকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তির মাধ্যমে সমভাবাপন্ন করতে হয়। শক্তি যতক্ষণ চক্রে অবস্থান করে ততক্ষণ তা পরাধীন ও সাধার থাকে। কিন্তু চক্রভেদের মাধ্যমে নিরালম্ব স্থানে পৌঁছালে পরম শিব-স্বরূপে অবস্থান করে। তখন সব চক্রই প্রাণহীন দেহের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাদের সত্তাও অব্যক্ত থাকে। বিন্দুর আত্মপ্রসারণে চক্রের উদ্ভব ঘটে উপসংহারে তাতেই সেই চক্র বিলীন হয়। চক্র বিলীন হলে দেবতাদেরও আর পৃথক সত্তা থাকে না। চরম অবস্থায় থাকে একমাত্র সেই মহাশক্তি যিনি পরমশিবের অঙ্কে অবস্থান করেন। নাথযোগীরা দেহমধ্যে বহু চক্রের সত্তা আবিষ্কার করেছেন। আধারাদি ছয়টি চক্র ছাড়া আরও অনেক চক্রের বিবরণ নাথসাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বাধিষ্ঠানের উর্দ্বো কটিস্থানে কুণ্ডলিনী চক্র, মণিপুরের উর্দ্বো গুণ্ডচক্র, আজ্ঞাচক্রের উপরে ললাটস্থানে চন্দ্রচক্র, মূর্ধস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তালুস্থানে তালুচক্র, তালুচক্রের উপরে ভ্রমরগুহাতে ব্রহ্মচক্র, ব্রহ্মচক্র অতিক্রম করে শিখাস্থানে অসংখ্য দলময় কোলহাট চক্র অবস্থান করে বলে নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব চক্রের মধ্যে তালুচক্র থেকে শ্বাস নিবৃত্ত হয়ে যায়, ব্রহ্মচক্রে স্থিতি হলে মহামৌন অবস্থার উপলব্ধি হয় এবং কোলহাটচক্রে অব্যক্ত শক্তির অবস্থান। এই পরমশূন্য স্থান একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্বো

অবস্থিত। এই শূন্যে প্রবেশ না করলে অনাবৃত ও মুক্তভাবের বোধ জাগ্রত হয় না। এই পরম অবস্থায় প্রবেশকে মুক্তি বা মোক্ষ বলে।^{১৩৮}

শক্তিযুক্ত হলে শিব সর্বসমর্থ হন। শক্তি বিনা তিনি কিছুই করতে পারেন না। অতএব স্বকীয় নিজ-শক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণ হল বিশ্বকে আভাসিত করা। এই কারণে পরাপর শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরকে অনন্তশক্তিমান বলা হয়। যেকারণে সকল বিশ্বের অধিষ্ঠাতাকে বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় বলা হয়। অতএব সিদ্ধযোগী পিণ্ডসিদ্ধ (কায়াসিদ্ধ) রূপে খ্যাত হন—

‘অতএবানন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ বিশ্বসংবিতস্বরূপী বিশ্বময়ী ভবতীতি প্রসিদ্ধম্।

সিদ্ধানাং চ পরাপরস্বরূপা কুণ্ডলিনী বর্ততে।

অতন্তে পিণ্ডসিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ।।’^{১৩৯}

কুণ্ডলিনী দুই প্রকার— ১. জাগ্রত (প্রবুদ্ধ) ২. সুপ্ত (অপ্রবুদ্ধ)। যদিও প্রত্যেক দেহপিণ্ডে কুণ্ডলিনী চেতনস্বরূপ তবুও যতক্ষণ না একে জাগ্রত না করা হয় ততক্ষণ সংসারী পুরুষেরা শোক, চিন্তা, মোহ ইত্যাদি ব্যাপারে সম্পৃক্ত থেকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মূলাধারে কুণ্ডলিনী অধোমুখী ও সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সহস্রদল পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী করে তুলতে পারলে যোগী মানসিক বিকার বা মোহমুক্ত হন। সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ কুণ্ডলিনী স্বরূপ। এই কারণে কুণ্ডলিনী বিরাজমান পরম সত্য হওয়ার জন্য বিমর্শ-রূপী বিদ্যা। কুণ্ডলিনীর সাধনা করলে আত্মস্বরূপের (অলখ নিরঞ্জন) সাক্ষাৎ যোগীদের কাছে সহজতর হয়ে যায়।^{১৪০}

অর্থাৎ নাথধর্ম নাথ-উপাধিবিশিষ্ট সিদ্ধযোগীদের দ্বারা প্রচারিত শৈব-যোগধর্মের একটি শাখা। এই ধর্মে শিব বা আদিনাথকে পরম পুরুষ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। শিবই নাথ সম্প্রদায়ের পরম আরাধ্য দেবতা। নাথধর্মে কায়াসাধনার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। হঠযোগের সাহায্যে শারীরিক এবং জৈবিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে যোগদেহ

বা সিদ্ধিদেহ লাভ করাই নাথসম্প্রদায়ের সাধনা। লিঙ্গ-উপাসনা এবং ব্রহ্মগায়ত্রী জপের ওপর নাথধর্ম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নাথধর্মে গায়ত্রী জপকে পরম পবিত্র এবং মোক্ষপ্রদ সাধনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নাথধর্মে গুরুর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। গুরু নির্দেশ ছাড়া নাথধর্মে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যোগসাধনার প্রাধান্যের কারণে নাথসম্প্রদায় যোগীরূপে সমাজে পরিচিত। নাথসম্প্রদায়ের মতে যোগের কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র

১. শ্যামাকান্ত দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায় এবং উসকী যৌগিক-তাত্ত্বিক সাধনায়েং*, পৃ. ৫।
২. গোপীনাথ কবিরাজ, *ভারতীয় সাধনার ধারা*, পৃ. ২০৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৪. অভিনবগুপ্ত, *তন্ত্রালোক*, শ্লোক. ৭/১।
৫. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *নাথধর্ম ও সাহিত্য*, পৃ. ৮৬-৮৭।
৬. G. W. Briggs, *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, p.274.
৭. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব*, পৃ. ৮৯।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
৯. *Obscure Religious Cults*, p. 226.
১০. কল্যাণী মল্লিক, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, পৃ. ১৭।
১১. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ. ৯৮।
১২. *গোরক্ষনাথ রচিত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*, স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী (সম্পা.), পৃ. ২১।
১৩. কল্যাণী মল্লিক, পৃ. ১৮।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।
১৫. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ২২।
১৬. *Obscure Religious Cults*, p. 198.
১৭. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কী পরিপ্রেক্ষ মেঁ (হিন্দি)*, পৃ. ৭৩।
১৮. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ. ২০৮।
১৯. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, পৃ. ২৮।
২০. যতীন্দ্রনাথ যোগী, *প্রাণসংকলী, গোরখ বাণী অউর গোরখ যোগ (হিন্দি)*, শ্লোক ৫, পৃ. ৮৭।
২১. *গোরক্ষবাণী* ৩৬।
২২. কে. আর. নজুগুন, *নাথ সম্প্রদায় উদ্ভব অউর বিকাশ*, পৃ. ৩৭।
২৩. *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*, পৃ. ৩৬।
২৪. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ. ২০৮।
২৫. *মৈত্রী উপনিষদ*, পৃ. ৫২।
২৬. রাজমোহন নাথ, *শিবপুরাণ; বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ৫৫।

২৭. মৎসেন্দ্রনাথ, শাবরচিন্তামণিঃ, শ্লোক ১১।
২৮. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায়, পৃ. ৬৭।
২৯. চর্যাগীতিকোষ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী (সম্পা.), পৃ. ১৫১-১৫২।
৩০. চর্যাপদ, পদ সংখ্যা ১০।
৩১. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ৮২।
৩২. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, পৃ. ৮৭-৮৮।
৩৩. সুকুমার সেন, নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।
৩৪. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায় কা বিস্তার, নাথ সম্প্রদায় বিবিধ আয়াম, উদয়প্রতাপ সিংহ (সম্পা.), পৃ. ২১।
৩৫. জীবন নাথ, ভূমিকা অংশ, হিরণ্য নাথ, উত্তর-পূর্ব ভারতের শৈব-নাথ সম্প্রদায়, পৃ. জ।
৩৬. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৩৭. কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী (সম্পা.), পৃ. ১৮।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৩৯. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায়, পৃ. ৫৯।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।
৪১. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, পৃ. ৮২।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৪৫. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ১৫৫।
৪৬. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, পৃ. ৮৪।
৪৭. বেণীমাধব বড়ুয়া, বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্মস্থল প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি, পৃ. ২৯।
৪৮. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, পৃ. ৮৮।
৪৯. মছীন্দ্র-গোরখবোধ, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), গোখবিজয়, পৃ. ১৮৯।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।
৫১. গুরুর মাহমুদের গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, আব্দুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), পৃ. ১৬৯।
৫২. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ১৩৯-১৪০।
৫৩. গোরখ-সবদী-গোরখবাণী, পীতাম্বর দত্ত বড়ুয়াল (সম্পা.), শ্লোক ১৪৮-১৪৯।
৫৪. গোরখ সবদী, শ্লোক ২৫২।

৫৫. গোরখ সবদী, শ্লোক ১৭।
৫৬. কমল সিংহ, গোরক্ষনাথ অউর ওনকা হিন্দী সাহিত্য, পৃ. ৬৭।
৫৭. গোরখ সবদী, শ্লোক ১০৫।
৫৮. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ২০।
৫৯. গোরখ সবদী, শ্লোক ১২৯।
৬০. কমল সিংহ, পৃ. ৬৮।
৬১. ভোলানাথ নাথ, ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয়, পৃ. ৮২।
৬২. শিবসংহিতা ৫/১০।
৬৩. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগিরাজ-গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৮-৬২।
৬৪. ঘেরঙসংহিতা ৭/৫।
৬৫. হঠযোগ প্রদীপিকা ৪.৩-৪.৭।
৬৬. অমরৌঘ প্রবোধ-৩।
৬৭. শিবসংহিতা ৫/১৪।
৬৮. কুলার্ণবতন্ত্র ৫/১/১১০।
৬৯. যোগবীজ, শ্লোক ৬৬।
৭০. 'আসির্বাদ করি গুরু মহাজ্ঞান দিল।
চারিযুগ অমর করিয়া মোরে গেল।।' -ময়নামতীর গান, পৃ. ১১৭।
৭১. সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি ৬/১।
৭২. প্রাগুক্ত ৬/১৫।
৭৩. গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃ. ৪৫।
৭৪. হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/১।
৭৫. 'নমঃ শিবায় গুরুবে নাদ-বিন্দু কলাত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ।।' -হঠযোগপ্রদীপিকা ৪/১।
৭৬. গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃ. ১৪
৭৭. দুর্লভা সহজাবস্থা সঙ্গুরু করুণাং বিনা। -হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/৫।
৭৮. 'পরমপুরুষার্থস্ত মুক্তিরক্তহ্যতস্তসা নিরূপতে।
অবধূতানাং যোগসাধনজং ফলম্।।' -গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃ. ১০।
৭৯. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
৮০. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ৩৩।

৮১. ‘জ্ঞানহীনো গুরুস্তজ্যো মিথ্যাবাদী বিড়ম্বকঃ।
সংবিশ্রান্তি ন জানতি পরেষাং স কৰোতি কিম্।।’ -সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি ৫/৭৬।
৮২. ‘আবর্তয়তি যঃ সম্যক স্বস্বমধ্যে স্বয়ং সদা।
সমত্বেন জগদ্ বেত্তি সোঅবধূতোৎভিধীয়তে।।’-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি ৬/১৫।
৮৩. ‘দুর্লভো বিষয়োত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভো সহজাবস্থা সদ্গুরু করুণাং বিনা।।’-হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/৫।
৮৪. ‘নমঃ শিবায় গুরুবে নাদ-বিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ।।’-হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/১।
৮৫. গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ১৪।
৮৬. গোরক্ষশতকম্, শ্লোক ১-২।
৮৭. প্রাণসংকলী, শ্লোক ১-২।
৮৮. ‘দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরু করুণাং বিনা।’-হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/৫।
৮৯. ‘পরমপুরুষার্থস্ত মুক্তিরুক্ত্যতস্তসা নিরূপত্যে
অবধূতানাং যোগসাধনজং ফলম্।।’ – গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ১০।
৯০. গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ৩৩।
৯১. ‘জ্ঞানহীনো গুরুস্তজ্যো মিথ্যাবাদী বিড়ম্বকঃ।
সংবিশ্রান্তি ন জানতি পরেষাং স কৰোতি কিম্।।- ‘সিদ্ধ- সিদ্ধান্ত- পদ্ধতি’ ৫/৭৬।
৯২. গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ৫৬।
৯৩. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, মহাযোগী শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও
উপদেশাবলী, পৃ. ৪২।
৯৪. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৩।
৯৫. গোরক্ষ-ভর্তৃহরি-গোপীচন্দ্রনাথ সংবাদ (হিন্দী), ৫/৩।
৯৬. প্রাগুক্ত ৭/৪।
৯৭. মৎস্যেন্দ্রনাথ, শাবরচিত্তামণিঃ, ২/১।
৯৮. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ৬/২।
৯৯. মৎস্যেন্দ্রনাথ, শাবরচিত্তামণিঃ, ৬/১৬।
১০০. ‘হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যতোমস্তং জীবো জর্পতি সর্বদা।।’-গোরক্ষ সংহিতা ১/৪২।
১০১. ‘অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।

অস্যা সংকল্পমাত্রেন সর্ব পাপৈ প্রমুচ্যতে।।- গোরক্ষ সংহিতা ১/৪৪।

এবং

‘দ্বিতীয়ে অজপা জান চারি বেদ সার।

সদায়ে জপে জীব খেমা নাই তার।।’- গোখবিজয়, পৃ. ১৯২

১০২. কল্যাণী মল্লিক, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ৪৭২।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

১০৪. ‘এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যং।’- ঐতরেয় উপনিষদ।

এবং

‘প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।

প্রাণেন ধার্যতে লোকাঃ সর্বং প্রাণময়ং জগত।।’-জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র।

এবং

‘অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথা পরে।’-শ্রীমদ্ভগবতগীতা ৪/২৯।

১০৫. গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ২৭।

১০৬. বিশুদ্ধচক্রের অধিষ্ঠাতা সদাশিব শাকিনীর সঙ্গে অর্ধনারীশ্বর রূপে বিরাজমান। শিব এবং মহালিঙ্গর শক্তিকে বিন্দু বলা হয়েছে। বিন্দুই উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

‘অক্ষোভ্য সর্বশক্তি নাম আত্মশক্ত্যানুরঞ্জিতঃ।’- কৌলজ্ঞাননির্ণয় ২০/২০।

১০৭. গোরক্ষ- সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ৪৫।

১০৮. ‘যোগদেহং সৃজত্যের কালমিত্যত্বরয়তম্।

হন্তি বৈষয়িকং দেহং তন্নাঃকহরীশ্বরঃ।।’-গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃ. ৫৩।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১১০. গোখবিজয়, পৃ. ৯৮।

১১১. ‘অভ্যাসেৎ খেচরীং অবদ যাবদ সাদযোগনিদ্রিতঃ।

সংপ্রাপ্তযোগনিদ্রস্য কলো নাস্তি কদাচন।।’-হঠযোগ প্রদীপিকা ৪/৪৯।

১১২. ‘নাভিমূলে বসেৎ সূর্য যদ পদ্মং সহস্রারংস্তালুমূলে চ চন্দ্রমা।

অমৃতং গ্রসতে সূর্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ।।’-গোরক্ষ সংহিতা ১/৮৫।

১১৩. ‘কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।

ক্রবোরস্তর্গতা দৃষ্টিমূর্ধা ভবতি খেচরী।।

কলাংপরাদ্ধুখীং কৃত্বা ত্রিপথে পরিয়োজয়েৎ।

সা ভবেৎ খেচরীমূদ্রা ব্যোমচক্রং তদুচ্যতে।।’-হঠযোগ প্রদীপিকা ৩/৯-১০।

১১৪. গোখবিজয়, পৃ. ১৪৭।
১১৫. ‘বধ্যতে ন স কালেন যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম।’- গোরক্ষ শতকম্, শ্লোক ৬৬।
১১৬. Obscure Religious Cults, p.192.
১১৭. শিবসংহিতা ৫/১২০।
১১৮. জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র; প্রফুল্লকুমার নাথ, অসমের নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, পৃ. ১১৩।
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
১২০. পীতাম্বর দত্ত বড়থাল, যোগপ্রবাহ, পৃ. ১৭৭।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।
১২২. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ১০৫-১০৬।
১২৩. শ্যামাকান্ত দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায় এবং উসকী যৌগিক তাত্ত্বিক সাধনা, পৃ. ২।
১২৪. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ১০৬।
১২৫. Journal of the Asiatic society of Bengal, Vol. XXVI, 1930, no.1, p.11
১২৬. দ্বিজ শত্রুঘ্নের অথ হাড়মালা, নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ৪২-৪৩।
১২৭. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, ১/১৭, ১৮, ২১।
১২৮. হাড়মালা ক-পুথি, রাজমোহন নাথ (সম্পা.), পৃ. ১২৯।
১২৯. গোরক্ষ সংহিতা, প্রসন্নকুমার কবিরত্ন (অনু.), শ্লোক ১/৩৬।
১৩০. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ৪৫৯।
১৩১. গোরক্ষ সংহিতা, শ্লোক ১/৩৮।
১৩২. প্রাগুক্ত, ১/৪০।
১৩৩. শ্রীমৎ পুষ্করনাথ যোগী, মহামন্ত্র উপাসনা, পৃ. ২৩।
১৩৪. শ্লোক ১০০-১০১।
১৩৫. শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ, পৃ. ৬৭-৬৮।
১৩৬. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ৪/১১।
১৩৭. শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ, পৃ. ৬৯-৭০।
১৩৮. ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃ. ১০৭-১০৮।
১৩৯. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, ৪/১৩।
১৪০. ঐ, ৪/২৪।

২. খ. নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক-পরিচয়

নাথসম্প্রদায় ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ধর্মসম্প্রদায়। সপ্তম শতকেই ভারতবর্ষে নাথধর্মের প্রসার ঘটে।^১ মধ্যযুগে নববৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আগে ভারতবর্ষের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নাথধর্ম প্রভূত উন্নতিসাধন করে। নাথধর্ম শৈবযোগ ধর্মের শাখা বিশেষ।^২ শৈবযোগীদের মধ্যে নাথযোগী ও সিদ্ধগণ সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে মহিমা ও প্রভাব অর্জন করে এসেছেন। শিব বা আদিনাথই নাথ সম্প্রদায়ের উপাস্য। তিনি অনাদি ও পরম ব্রহ্মস্বরূপ। নাথযোগীরা তাঁকে পরম ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।^৩ নাথদর্শনে শিব ও শক্তি অভিন্ন, নাথ-অবস্থা প্রাপ্তিই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা মানবদেহকে কেন্দ্র করে যোগমার্গে দেহাতীতের সাধনা করেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে এই সাধনায় নাথসিদ্ধ সিদ্ধি বা শিবত্ব অর্জন করেন এবং শিবাবতার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ‘স্কন্দ পুরাণে’ দেখা যায় বশিষ্ঠ মুনির নিয়ম অনুযায়ী অনাদি শিবলিঙ্গ আরাধনা করে শিবলিঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে।^৪ নাথসম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন শিব যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক। নাথ উপাধির যোগীরা শৈব যোগধর্ম প্রচার করেছিলেন বলে এই ধর্মকে নাথধর্ম বলা হয়। নাথধর্ম ১০০০-১২০০ বছর আগে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।^৫ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথপন্থাই নাথযোগীদের আদর্শ।

যোগধর্মে পরমাত্মার সাধনা স্বীকৃত রয়েছে। পরমাত্মা জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের নিয়ন্ত্রক। সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ পরমাত্মার কারণে উদ্ভব হয়েছে এবং শেষে পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যাবে। নাথযোগীরা এই পরমাত্মাকে ‘শিব’ বলেন।^৬ নাথধর্মে হঠযোগ সাধনার গুরুত্ব বেশি। যোগশাস্ত্রমতে ‘হ’ মানে সূর্য, ‘ঠ’ -র অর্থ চন্দ্র ; সূর্য ও চন্দ্রের সংযোগকেই হঠযোগ বলা হয়েছে।^৭ মন সমস্ত চিন্তামুক্ত হলে, মনে যে লয় অবস্থা

সৃষ্টি হয়, তাকেই যোগ বলে।^৮ বর্তমানে নাথযোগীদের মধ্যে দুটি শ্রেণি লক্ষ করা যায়— I) সন্ন্যাসী নাথযোগী, II) গৃহস্থ বা গৃহী নাথযোগী। বৈদিকযুগেও মানুষের দুটি শ্রেণি ছিল— মুনিধারা এবং ঋষিধারা। মুনিধারার দুই শাখা— মুনি ও গৃহস্থ। যোগপন্থী মুনিরা সদাশিবের আদর্শ নিয়েছিলেন। অন্য কোনো দেবতার সন্তান নেই, শিবের চার সন্তান। তিনি গৃহস্থ যোগী। সেইসূত্রে নাথযোগীদের দুইভাগ— গৃহস্থ নাথযোগী ও সন্ন্যাসী নাথযোগী—

‘নাথাদ দ্বিপ্রকারা সৃষ্টির্জাতা—নাদরূপা বিন্দুরূপা চ।

নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ।

নাদান্নবনাথা জাতাঃ, বিন্দুতঃ সদাশিবো ভৈরবো জাতঃ।।’^৯

হঠযোগের গভীর সাধনা নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগীরা হঠযোগে বিচক্ষণ বলে সমগ্রদেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁরা এই যোগের সাধনায় অনেক নতুন নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন এবং যোগশাস্ত্রের প্রভূত বিস্তার সাধন করেছেন। মানুষের ভেতরে কত শক্তি অন্তর্নিহিত, অথচ অনুশীলনের অভাবে প্রসুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়, তা তাঁরা হঠযোগ দ্বারা প্রদর্শন করেছেন। সাধারণ মানুষ যাঁকে অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক জ্ঞান আখ্যা প্রদান করে, তা বস্তুত মানুষের অননুশীলিত শক্তি ও জ্ঞান। যথোচিত অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সব শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ সম্পাদন করতে পারে। হঠযোগের সাধনায় বহুবিধ আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, বন্ধ, বেধ এবং ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করতে হয়।^{১০} সন্ন্যাসী নাথযোগী বা নাথসন্ন্যাসীরা মন্ত্র, লয়, হঠ ও রাজযোগ অভ্যাস করেন। তাঁরা সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত। গৃহস্থ নাথযোগীদেরও অনেকে যোগচর্চা করেন, মূলত মন্ত্রযোগ। অনেক গৃহস্থযোগী আবার মন্ত্র, লয়, হঠযোগ অনুশীলন করেন। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদের অনুরূপ দর্শন নাথপন্থের মূল বিষয়। নাথেরা পরমাত্মার স্থলে যোগেশ্বর শিবকে আশ্রয় করেছেন। তাঁরা জীব ও শিবের অর্থাৎ শিবশক্তির মিলনের সাধনা করেন। ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’, ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’, ‘ঘেরণ্ড

সংহিতা’, ‘যোগবীজ’, ‘শিবসংহিতা’, ‘দত্তাত্রেয় সংহিতা’, ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’, ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’, ‘মৎস্যেন্দ্র সংহিতা’, ‘শিবগীতা’ প্রভৃতি গ্রন্থে নাথযোগী সম্প্রদায়ের যোগধারা ও সিদ্ধপরম্পরার বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এইসপ্তদশের আধার স্বরূপ জীবাত্মাকে মূলাধার চক্রে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে একাত্মতার চিন্তা করে নাথসিদ্ধ অশ্বিনী মুদ্রাযোগে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, বিশুদ্ধ, অনাহত এবং আত্মা এই ছয়চক্র ভেদ করে ব্রহ্মরঞ্জে অবস্থিত সহস্রদল চক্রে পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হন। এটাই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা, শিব ও শক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ সাধন।^{১১} নাথযোগীগণ পুরুষ ও প্রকৃতির একীভূত অবস্থাকে ‘ব্রহ্ম’ বলে ভাবেন। ‘ব্রহ্ম’ নির্গুণ। কিন্তু নির্গুণের উপাসনা সম্ভব নয় বলে ব্রহ্মকে পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে কল্পনা করে দেহসাধনা বা যোগসাধনার ব্যবস্থা করেন নাথযোগীরা।^{১২} ‘গোরক্ষ বিজয়’, ‘ময়নামতীর গান’ বা ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’, ‘যোগীকাচ’, ‘যোগচিন্তামণি’, ‘হাড়মালা’, ‘যোগীরগান’ ‘গোরক্ষনাথের গান’, ‘যোগীনাটক’, ‘তনের বারমাসি’, ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’, ‘তিননাথের গান’, ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’ প্রভৃতি গ্রন্থে কায়সাধনা বা যোগসাধনার কথায় বলা হয়েছে। নাথপন্থ বা নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থ ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’-এ ‘নাথ’ শব্দের শব্দগত অর্থ ও দার্শনিক অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়—

‘নাকারো নাদরূপং চ থকারঃ স্থাপ্যতে সদা।

ভুবনত্রয়মৈবৈকঃ শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ততে।।’^{১৩}

এখানে ‘নাথ’ অনাদিস্বরূপ ও তিনভুবনের স্থিতির কারণ। ‘না’-এর অর্থ অনাদিস্বরূপ এবং ‘থ’-র অর্থ ভুবনত্রয়কে স্থাপন করে। অর্থাৎ ‘না’ ব্রহ্ম বা মোক্ষদানকারী এবং ‘থ’ অজ্ঞানতাকে দূর করে।^{১৪} নাথসম্প্রদায় যোগমার্গ, কানফাটা যোগী, দর্শনীযোগী, নাথযোগী,

সিদ্ধসম্প্রদায়, কাপালিক বা কালামুখ, অবধূতসম্প্রদায়, রসসিদ্ধ, নাথমত, নাথপন্থ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

নাথসিদ্ধরা চেতনায় বৈদিক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বাস্তবে ভীষণ উদার। তাঁরা প্রণব বা ওঁ-কার সাধনার ঔপনিষদিক যোগধারা গ্রহণ করেছিলেন। ঔপনিষদিক নাদসাধনা নাথপন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাথযোগীদের দীক্ষামন্ত্রের উৎস ‘শুক্লযজুর্বেদ’ (১৬/৪২)। নাথযোগীদের পরস্পর সাক্ষাৎদর্শনে অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের শব্দ ‘আদেশ’ উচ্চারণের উৎস ‘ছান্দোগ্য’ উপনিষদ (৬/১/১-৭)। গোরক্ষনাথ তাঁর ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে বলেছেন যে নাথযোগীরা এই ‘আদেশ’ শব্দের দ্বারা অভিবাদন প্রত্যভিবাদন করেন- ‘স যাতি আত্মানম্ ঐশ্বরম্’ (৫/৯৫)। বর্তমানে বাংলার নাথসম্প্রদায়ের মানুষ অনেকক্ষেত্রে আত্মবিস্মৃত ও স্বধর্মবিমুখ হলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র নাথযোগীদের মধ্যে ‘আদেশ’ শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের বাংলাকাব্য ‘ময়নামতীর গান’ ও নাথযোগীদের মুখে শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়—

‘কানফা দেখিল যদি যতি গোর্থনাথ।

আদেশ করিল শির্দা জোড় করি হাত।।’^{১৫}

‘শঙ্করভাষ্যে’ এই ‘আদেশ’-র অর্থ ‘পরং ব্রহ্ম’।^{১৬} যোগী গোরক্ষনাথ বলেছেন যে ‘আদেশ’ অভিবাদনে আত্মা, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একাত্মবোধ ঘটে-

‘আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।

ত্রয়াণামৈক্যসম্ভূতি ‘আদেশ’ ইতি কীর্তিতঃ।।’^{১৭}

আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা- এই তিন-শব্দ চিন্তা ও মননের মাধ্যমে জানা যায় যে তিনপদের একাত্মতায় উৎপত্তি, সম্ভূতির (অভিন্ন সত্তা) কারণে ‘আদেশ’ শব্দের প্রসিদ্ধি আছে-

‘আদেশ’ ইতি সদবাণীং সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়াপহাম।

যো যোগিনং প্রতিবদেত্ স যাত্মাণমৈশ্বরম্।।’^{১৮}

‘আদেশ’ পদ পরমাত্মার বাণী। এই সদ্বাণী উচ্চারণমাত্র মানুষের জরা-মরণ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক দ্বন্দ্ব নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ‘আদেশ’ পদের ব্যবহার করেন তিনি আত্মা এবং পরমাত্মার অভিন্ন রূপের তত্ত্ব জেনে যান।

নাথসিদ্ধ ও গৃহস্থরা অন্যরূপের সঙ্গে ঈশ্বর, শিব এবং শক্তি দুর্গার অন্যান্য রূপকে উপাসনা করেন। বর্তমানে অবশ্য নাথযোগীরা ভক্তিবাদী ধারাকে অবলম্বন করছেন অনেকে। তারফলে যোগসাধনার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মূর্তিপূজা বা সাকার সাধনা অনুসরণ করেন। শিবপরিবারের দেবতাদের পাশাপাশি অন্য দেবতারাও এখন তাঁদের আরাধ্য। সাধারণ ধর্মাচরণ বিধানে যোগী ভোগবিমুখ এবং ভোগী যোগবিমুখ। কিন্তু শিবের আদর্শ ভোগকে যোগে এবং যোগকে ভোগে পরিণত করে প্রকৃত মানব হিসেবে জীবনযাপন করা। ‘জীবন্যুক্তি’ কথার অর্থই হল পার্থিবচেতনা থেকে বিশ্বচেতনায় উন্নীত হওয়া। সেই কারণেই যোগীসিদ্ধ ময়নামতী তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে সিদ্ধযোগী জালন্ধরনাথের কাছে দীক্ষা দিয়ে যৌগিকবিধানে গার্হস্থ্য জীবনযাপনে উপযুক্ত করে তুলতে সন্ধ্যাসী করে পাঠিয়েছিলেন। নাথপন্থে বেদান্তের ন্যায় জগৎ মিথ্যা নয়,— জগৎ সত্যই। মানবদেহ পরমার্থ লাভের প্রকৃষ্ট উপাদান—Divine Life in a Divine Body এই তত্ত্ব অবগত হয়ে যোগের বিধানে দেহমনকে প্রস্তুত করে সংসারের মায়ামোহকে অতিক্রম করে জীবনযাপন করাই নাথ যোগধর্মের সাধনপন্থা। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কৌলপরম্পরা থেকে এই মতবাদ গৃহস্থনাথ, অঘোরী ও কাপালিকধারায় গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যোগী সন্ধ্যাসী হয়েও পত্নীসহ গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতে পারেন। তবে গোরক্ষনাথের ধারার সন্ধ্যাসীরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন। কৌল নাথযোগীর এই পন্থার উৎস নিহিত আছে ঋগ্বেদের অগস্ত্যসূত্রে (১/১৭৯)। মহামুনি পরমযোগী অগস্ত্য লোপামুদ্রার

সঙ্গে যৌগিক উপায়ে গার্হস্থ্য জীবনযাপন করেছিলেন। এমনকি তাঁর শিষ্য উগ্রস্বামি বহুপুত্র লাভ করেও কাম ও তপ দুই কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হন—

‘অগস্ত্যস্য স্বনমানঃ স্বনিদ্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ।

উভৌ বর্ণাবধিরুগ্রঃ পুষ্পোষ দেবেশ্বাশিষ্যো জগাম।’^{১৯}

এইরকম সাধনপন্থার উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদের বামদেব্য সামোপসনায় (২/১৩) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের সুপ্রজননবিদ্যা অধ্যায়ে (৬/৪) আছে। অর্থাৎ ভারতাত্মার মূর্ত-বার্তা অমরত্বলাভ বা জীবনমুক্তিবাদের তত্ত্বটি মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌল, গোরক্ষনাথী সম্প্রদায় এবং নাথসম্প্রদায়ের অন্য ধারার লোকগান ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে—

We shall see the enormous importance of the motif of immortality in the folk-lore and literatures of the Gorakhnathis and the Naths – an importance that leads us to believe that this particular motif (which continues and completes that of the jivan-mukta, the liberated while living) expresses the nostalgia of the whole Indian soul.^{২০}

তাই বলা যায় নাথসাধনা ও দার্শনিক চেতনা বৌদ্ধদের মত নয়। তাঁরা আত্মার তত্ত্বটিকে বিশ্বাস করেন, যেটা বৌদ্ধরা করেননি। তবু যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও যোগী গোরক্ষনাথের মতো নাথসিদ্ধরা বৌদ্ধদের অগ্রহণযোগ্য মনে করেননি, যেটা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায়গুলি করেছেন। নাথসিদ্ধরা বৌদ্ধমতাবলম্বীদের সঙ্গে লড়াইকে বেছে না নিয়ে সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ দর্শনের ২টি মূলতত্ত্ব (শূন্যতত্ত্ব, সহজ সাধনা) গ্রহণ করেছেন অবশ্য নিজস্ব ঔপনিষদিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ ও ‘অকুলবীরতন্ত্র’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনুসারে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী লুইপা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কেবল লুইপা নয় মৎস্যেন্দ্রনাথের সহজ সাধনাকে সমর্থন করেছেন। নাথসম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যেও বহু জায়গায় সহজ সাধনার উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য নাথসম্প্রদায়ের সহজসাধনা ও বৌদ্ধ

সহজিয়াদের সহজসাধনা মূলত একই। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথের সহজসাধনা হল শিব-শক্তির সংযোগ বা মিলন। যে জ্ঞান কেবল কৌলদের আছে, যাঁরা শৈবযোগী। অতএব নাথযোগীদের বৌদ্ধ মনে করা যুক্তিসংগত নয়।^{২১} নাথপন্থ বেদাগত কোন সন্দেহই নেই। বেদাগত নাথযোগদর্শনের ত্রিপাদ তত্ত্বটি হল- অলখ নিরঞ্জন (অলখ নাথ)- অনাদি নাথ - আদিনাথ। এক শিবেরই ‘তিন-নাথ’ অবস্থা। এটাই হচ্ছে নাথযোগ দর্শনের মূলকথা।^{২২} নাথতত্ত্বের এই দর্শন যাঁরা মানেন তাঁরাই নাথযোগী।

এবার কুলের কথায় আসা যাক। এর অর্থ কেবল বল্লালসেন প্রবর্তিত কৌলীন্য নয়, বংশ অর্থেই নাথপন্থে কুল ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণ্যবিধানে যোগীর কুল নেই; কিন্তু নাথযোগীর কুল আছে। এখানেই নাথপন্থের সঙ্গে অন্য যোগীপন্থের পার্থক্য। নাথযোগীরা বৈদিক আগ্নিরস সম্প্রদায়ের মতন দেববংশজ ও বৈদিক মুনিধারা দ্বারা সৃষ্ট সম্প্রদায়। ঋগ্বেদের ১০/৬২/৪ সূক্তে আগ্নিরস সম্প্রদায়ের অগ্নিরাদের বলা হয়েছে ‘দেবপুত্রা ঋষয়’ এবং ‘সুব্রহ্মণ্যমাগ্নিরসো’ দেববংশজ এবং ব্রহ্মতেজধারী। যোগাভ্যাস ছাড়া ব্রহ্মতেজ অধিকার কিছুতেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে নাথযোগীরাও ‘শিবপুত্রামুনয়’।^{২৩}

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ‘অথর্বাগ্নিরস’। অথর্ব ও আগ্নিরস দুটি শব্দের যোগে ‘অথর্বাগ্নিরস’ নামটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অথর্বসংহিতার ভৃগ্বাগ্নিরস (ভৃগু+আগ্নিরস) এবং ব্রহ্মবেদ নামেও দুটি নাম আছে। রথ (Rath), হুইটনী (Whitney) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে এই বেদে গৃহীত হয়েছে। ভিণ্টারনিংসের মতে এই সংহিতার দশভাগের সাতভাগ ঋক্‌মন্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। বেদের ‘অথর্বন’ নামক পুরোহিতই জরথুষ্ট্র ধর্মের বেদকল্প ‘জন্দ্ আবস্তা’ গ্রন্থের ‘অথ্রবন্’ পুরোহিত। পুরোহিতকে জন্দ্‌ভাষায় ‘পরোধাত’ বলে। অর্থ একই। অথর্ব শব্দটি সর্বপ্রথম অগ্নির পুরোহিত (fire-priest) বোঝাত। আবস্তায় অথ্রবন্ বলতে অগ্নিসংরক্ষক পুরোহিত

বোঝায়। প্রাচীন পারসিকদের মত পুরাকালে ভারতীয় আর্যরা অনির্বাণ অগ্নি রক্ষা করতেন। প্রতিটি ব্রাহ্মণের ঘরে তারজন্য একটি পবিত্র কক্ষ নির্দিষ্ট থাকত। পরবর্তীকালে এই কক্ষকে ‘অগ্নিশরণ’ বলা হত। এই অগ্নিপুরোহিত ভারতীয় অথর্বনকে ও জরাথুশ্ট্রীয় অথর্বনকে ইন্দ্রজালবিদ্যা পারদর্শী (magic-priest) বলে লোকে মনে করত এবং রিষ্টি শান্তি, ব্যাধিনিরাময়, অনাবৃষ্টি নিবারণ, পুত্রোষ্টি প্রভৃতি মাসুলিক কর্মে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত।^{২৪} নাথযোগী সম্প্রদায়ের মঠে সর্বদা বেদের ‘অগ্নিশরণ’ কক্ষের মত ‘ধুনিঘর’ এখনও লক্ষ করা যায়। এছাড়া বৃষ্টি আনয়ন, রোগব্যাধিনিরাময়ে যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা আধুনিককালেও নাথ সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে নাথযোগী সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের উৎস ধরা পড়ে মুনি বা যতিধারায়। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের সঙ্গে যতি আশ্রমও ছিল তার পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া না গেলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যাচ্ছে। ‘মুনি’ শব্দের মূলে মন্ ধাতু—মন্+ ই - ক। ‘মনাংসি ধুনিমুনিরিবঃ’ (ঋ. ৭/৫৬/৮)। এর অর্থ মননশীল সন্ন্যাসী, তাপস, মননহেতু সর্বজ্ঞ পরমাত্মা, মৌনব্রতী, বনবাসী ব্রাহ্মণ। আর ‘যতি’ শব্দের মূলে যন্ বা যত্ ধাতু— যন্ + ক্তিন; যত্ + ই—ক। অর্থ— মোক্ষার্থ যজ্ঞমান, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, শিব; উপরতি বা নিবৃতি ইত্যাদি। ঋগ্বেদের ১০/১৩৬ সূক্তে বাতরসন বংশীয় মুনিদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে নাথযোগীদের চিত্রই উল্লেখ করা হয়েছে, যা আগেই বলা হয়েছে।^{২৫}

নাথযোগীর সামাজিক অস্তিত্বের হারানো সূত্রের সন্ধানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুর সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ‘কুশব্রাহ্মণ’ প্রথা রয়েছে। এই প্রতীকটি গৃহীত হয়েছিল বাস্তব সত্য থেকে। বৈদিক যাগযজ্ঞে ৪ জন সম্পাদক গৃহীত হত—ঋত্বিক, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পদ দেওয়া হত আঙ্গিরস বংশের যোগসাধকদের।

এখন যোগসাধক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থলে কুশব্রাহ্মণ পুতুল তৈরি করে নেওয়া হয়। এই সূত্রে আদিব্রাহ্মণ যোগী জাতিকে নাথবংশ বলাই যায়।^{২৬}

নাথ সম্প্রদায়ের গোত্র-প্রবর দেখা যেতে পারে। গো-ত্রৈ + অক্ = গোত্র অর্থাৎ পৃথিবীরক্ষক। পূর্বপুরুষের নাম উচ্চারণ করে যে পৃথিবীতে ত্রাণ বা রক্ষা করে তাকেই গোত্র বলা হয়। কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য প্রমুখ চব্বিশ জন ঋষি ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবর্তক। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র-প্রবর পুরোহিতের গোত্র-প্রবর অনুসারে হয়। প্র— ব্ + অপ্= প্রবর। প্রবর শব্দের অর্থ প্রাবরণ, আচ্ছাদন ইত্যাদি। নাথযোগীর শিবগোত্র। প্রবর— শিব, অগ্নবৎ, শম্ভু, সরোজ ও ভূধর। এই পঞ্চপ্রবর পঞ্চতত্ত্বের (আকাশ, বায়ু, তেজ , অপ, ক্ষিতি) প্রতীক। শৈবযোগী নাথ সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলের শিবগোত্র ও পাঁচপ্রবর। নিম্নলিখিত তালিকা এইরকম—

ক্রম	প্রবর	বর্ণ	তত্ত্ব
১	শিব	হ	আকাশ
২	অগ্নবৎ	য	বায়ু
৩	শম্ভু	র	অগ্নি
৪	সরোজ	ব	অপ্
৫	ভূধর	ল	পৃথিবী

সৃষ্টিব্যঞ্জনার এই ক্রমবিকাশ ঋগ্বেদ সমর্থিত। বাংলা ব্যাকরণের প্রবচন ‘হ-য-ব-র-ল’, পাণিনির হ য ব রট্। মনে হয় নাথযোগের পঞ্চপ্রবর এই বর্ণবিন্যাস থেকে এসেছে। ‘র’ এবং ‘ব’-এর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে কেবলমাত্র। ইষ্টদেবতার নামে গোত্র পরিচয় অশাস্ত্রীয়

নয়। সমগোত্রে বিবাহও অশাস্ত্রীয় নয়। কারণ নাথযোগীর বংশনির্ণয়ে মানবগুরুর ভূমিকা নেই। যেসব গ্রন্থে স্ত্রীর ক্ষেত্রে কাশ্যপ গোত্র টেনে আনা হয়েছে তা ইতিহাসনির্ভর নয়। নাথযোগীসম্প্রদায়ে সমাজবিধানে গোত্রপরিচয়ে মানবঋষির পরিবর্তে দেবঋষির নামে গোত্র করা হয়েছে। এমনটা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।^{২৭}

আমেরিকার আদিবাসী, ছোটনাগপুরের কোল, ওঁরাও, মুণ্ডা জাতির গোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছে পশু-পাখির নাম অনুসারে। কিন্তু গ্রিসের জেনোস তথা গোত্রের সঙ্গে নাথজাতির মিল লক্ষ করা যায়। গ্রিসের বংশধারার মধ্যে প্রচলিত ছিল—

১. ঈশ্বরকেই তাঁরা তাঁদের আদিপুরুষ বলে মনে করতেন।
২. একই ঈশ্বরের সন্মানে সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব তাঁরা পালন করতেন।
৩. পুরোহিতগিরির অধিকার তাঁরা মানতেন।
৪. পুরুষধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণিত হত।
৫. গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করতেন।
৬. গোত্রপ্রধানদের নির্বাচিত ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা তাঁরা মান্য করতেন।^{২৮}

নাথযোগীদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে থাকতে পারে। সেই কারণে উপাস্য দেবতা শিবের নামে গোত্র প্রবর্তিত হয়েছে।

অন্যদিকে যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ তন্ত্রবিদ্যাকে নাথধর্মে গ্রহণ করেছেন। আজও আমরা দেখতে পাই বৈদিক সাধকগণ ‘ভৈরব’ ও ‘কালভৈরব’ সাধনা করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথপন্থে যোগসাধনার ধরন পরিবর্তন করে ভৈরবী চরিত্রকে ‘মা’ চরিত্রে পরিবর্তন করেছেন। তিনিও ‘নাথকৌল’। আদিনাথ বা শিবকে আজও ‘মহাকৌল’ হিসেবে দেখা হয়। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ভারতে কুল(শক্তি) বংশের অভিভাবক হিসেবে সম্মানিত হন।

সেই সূত্রে নাথেরা ‘কুলীন’ ব্রাহ্মণ বা যোগী ব্রাহ্মণ (দেবীমাতা শক্তির পূজারী) হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। বাংলায় কুল সাধনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত শক্তিপীঠগুলি গড়ে ওঠে। শক্তিপীঠ এবং ভৈরব-কালভৈরব মন্দিরগুলিতে তান্ত্রিক বা যৌগিক পদ্ধতিতে পূজো বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। নেপালে অধিকাংশ ভৈরব ও কালভৈরব মন্দিরের পুরোহিত বা মোহান্ত নাথ। নেপালের ড. ভোলানাথ যোগী জানালেন নাথ মোহান্ত ও যোগীদের যৌগিক পূজো পদ্ধতির স্থলে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যাগযজ্ঞপ্রধান ক্রিয়াকর্ম জায়গা করে নিলে নাথেরা সরে আসতে থাকেন। তাসত্ত্বেও কিছু মন্দিরে নাথ-যৌগিক পদ্ধতিতে পূজো-অর্চনা প্রচলিত রয়েছে।^{২৯} এইপ্রসঙ্গে নেপালের পাটন (ললিতপুর) মৎস্যেন্দ্রনাথ মন্দিরের প্রধান-ফটকে যে লেখাটি খোদিত আছে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘মৎস্যেন্দ্রং যোগিনো মুখ্যাঃ শাক্তাঃ শক্তিং বদন্তিয়ম্।

বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তস্মৈ নমো ব্রহ্মস্বরূপিণে।।’^{৩০}

অর্থাৎ যোগীশ্রেষ্ঠগণ যাকে মৎস্যেন্দ্র, শাক্তগণ শক্তি ও বৌদ্ধগণ লোকেশ্বর বলেন; সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার। নেপালের ভক্তপুর শিলালেখে বলা হয়েছে—

‘যং বিষ্ণুং প্রবদন্তি বৈষ্ণবগণাঃ শৈবাঃ শিবং শক্তিকাঃ।

শক্তিং ভাস্করভক্তিকা দিনমণিং ব্রহ্মস্বরূপং দ্বিজা।।

মৎস্যেন্দ্রং মুনয়ঃ বদন্তি সততং লোকেশ্বরং বুদ্ধকাঃ।

অন্যে তং করুণাময়ং প্রতিদিনং তন্নৌমি লোকেশ্বরম্।।’^{৩১}

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ যাকে বিষ্ণু, শৈবরা শিব, শাক্তরা শক্তি, সৌরগণ দিনমণি, দ্বিজগণ ব্রহ্মস্বরূপ, মুনিরা (যোগী) মৎস্যেন্দ্র, বৌদ্ধরা লোকেশ্বর এবং অন্যরা প্রতিদিন করুণাময় মনে করে সেই লোকেশ্বরকে প্রণাম করেন। ‘মৎস্যেন্দ্র পদ্যশতক’-এ একই কথার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়—

‘পরে বৌদ্ধমার্গেঃ পরে শ্রীতমার্গেঃ
পরে শৈবশাক্তাকবিনায়কাদ্যৈঃ ।
ভবন্তং ভজতে হন্যৈঃ কিন্তু তেষাং
প্রসাদং করোয্যেব মৎস্যেন্দ্রনাথ ॥’^{৩২}

অর্থাৎ বৌদ্ধ, শ্রীত, শৈব, শাক্ত, সৌর, বিনায়কবাদী সকলমার্গের ভক্তই তোমার ভজনা করে এবং তুমি সকলকেই অনুগ্রহ করে থাক। মৎস্যেন্দ্রনাথের স্তোত্রেও তাঁর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়—

‘লোকেশো লোকনাথঃ শিবসুত গিরিজাসুনা মৎস্যেন্দ্রনাথঃ ।
গৌরীপুত্র সরোজী স্করণহৃদয়ো রোগহা নিত্যনাথঃ ॥
অজী শান্তোহমিতাভ সুরমুনিমোহিতো ভাস্করঃ পদ্মপাণিঃ ।
কুর্যদার্যাবলোকেশ্বর ইতি বিদিতঃ সিদ্ধনাথঃ শিযোবঃ ॥’^{৩৩}

অর্থাৎ লোকেশ, লোকনাথ, শিবসুত, গিরিজাপুত্র মৎস্যেন্দ্রনাথ, গৌরীপুত্র, সরোজী, নিত্যনাথ, অজী, অমিতাভ, ভাস্কর, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ও সিদ্ধনাথ আমাদের মঙ্গল করুন। অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্মধারায় উদার, সমন্বয়পন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া মনে করেন, ‘ব্রাহ্মণ বেদবেদাঙ্গবিশারদ না হতে পারেন; ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, শাস্ত্র ও লোকাচার বিহিত ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য কুলাচার – এই ত্রিবিধ গুণ থাকলেই ব্রাহ্মণ মাত্রেই পুরোহিত শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন। মোটের উপর শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, মন্ত্রপাঠ ও মন্ত্রের উচ্চারণ এবং ব্রতপূজাদিতে ইষ্টদেবতার কাছে অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদানে একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারসম্ভূত এবং ব্রাহ্মণসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার আছে- এটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য শব্দের অর্থ। উপবীত গ্রহণের আগেও বঙ্গীয় যোগিসমাজের মধ্যে এরকম একটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থাকা খুবই সম্ভবপর। বঙ্গালচরিত থেকে যে সকল আভাষ পাওয়া যায় তাতে অবিশ্বাস করবার কারণ নেই যে খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থী যোগিসন্ন্যাসীরা রত্নজ ব্রাহ্মণরূপে গোড়, বঙ্গ

ও ত্রিকলিঙ্গে সমাদৃত হতেন,- তাঁদের দ্বারা পূজাকার্য সম্পাদন করতে পারলে সকলে চরিতার্থ বোধ করতেন। বৌদ্ধ, রামাং, ধর্ম প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের আদর্শ অবনত মস্তকে স্বীকার করেছিলেন। এমন একদিন গিয়েছে যখন বাংলা, বিহার, ওড়িশার জনসাধারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে এঁদের পূতকাহিনি শোনার জন্য আগ্রহী ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে ‘মঘা খমুজা’ নামে যে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেছি তাতে বছর গণনা ও সাধনার স্তর হিসেবে বৌদ্ধভিক্ষুদের শ্রেণিবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি যে এই শ্রেণিবিভাগের মধ্যে যোগী ও সিদ্ধদের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক স্থানে সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে পূর্ব থেকেই আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলের বৌদ্ধ সিদ্ধগণ নির্বিবাদে গোরক্ষনাথকে গুরু স্বীকার করতেন। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যেসকল সন্ন্যাসী আছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে গোরক্ষনাথের নামে মাথা নত করে থাকেন।^{১৩৪}

বৈদিক সমাজব্যবস্থার দুই শ্রেণি—যোগী সন্ন্যাসী ও ভোগী গৃহস্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গৃহস্থের বর্ণবিভাগ। অবশ্য গুণ ও কর্ম অনুসারে এই চতুর্বর্ণবিভাগের উদ্ভব। নাথযোগী প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত বলে পরবর্তী চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয়। বর্তমানে তাঁরা সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। নাথযোগীরা বৈদিক মুনিধারার অনুসরণকারী বলে গায়ত্রীসাধনা ও যোগাভ্যাস তাঁদের ধর্মের অঙ্গ। বৈদিক মুনিধারার মত তাঁরা বর্তমানে গোপালন, হলকর্ষণ, বস্ত্রবয়ন করেন। বেদ-অধ্যয়ন, দৈবকর্ম, দেবপূজা, গুরুগিরি, নাদ-পৈতে ধারণ তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড। আদিবৈদিক যুগের মুনিধারার আলোকেই নাথযোগী সমাজের আচার-আচরণ বিচার্য, পরবর্তীকালীন বর্ণবৈষম্যদুষ্ট দৃষ্টিতে নয়। বৈদিক আর্যমুনিধারায় সমাবিষ্ট বলেই নাথধর্মের বুনয়াদ শিথিল হয়ে যায়নি।^{১৩৫} মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ‘যোগবিষয়ঃ’ গ্রন্থে উল্লেখও করেছেন তিনি উমাশঙ্করের পুত্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠ-

‘উমাশঙ্কর পুত্রোহহং মীননাথো মুনিশ্বরঃ।

কথয়ামি বরং তত্ত্বং কুলাকুল বিরোধকম্।।’^{৩৬}

নাথসিদ্ধগণ প্রায়ই মুনি নামে কথিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের মুনিসূক্তে (১০/১৩৬) কেশীমুনির সঙ্গেও ঐদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কেশীদেবতাই জগতে ধারণ করে আছেন অগ্নি, জল এবং দ্যুলোক-ভূলোক। ড. জীবন নাথ মুনিসূক্তে সংসারত্যাগীদের নাথযোগী বলে উল্লেখ করেছেন। রুদ্রের সহচর হিসেবে এখানে কেশীমুনির অবস্থান। কেশীমুনি রুদ্রের সঙ্গে জলপানও করেন। তিনি ঋগ্বেদের মুনিসূক্ত বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে উল্লেখও করেছেন—

‘কেশীই দর্শনযোগ্য করেন বিশ্ব এনে আলোর ঢল।

ওদিকে বাতরসন মুনিরা ধারণ করেন পিঙ্গল মলিন বস্ত্র।

দেবত্ব লভে বায়ুর গতিতে হয় তাঁদের অনুগমন।

তপস্যারসের হয়ে তাঁরা উন্মত্তবৎ--

বায়ুর ‘পরে আরোহণ করলে

মানুষের চোখে ভাসে শুধুই শরীর।

মুনি যিনি, উড্ডীন হতে সক্ষম আকাশে;

সকল দেবতার প্রিয় বন্ধু তিনি।

মুনি হলে পরে বায়ুর সহচর-

সুকৃতির সখা তিনি।

মুনি হয়ে তিনি বায়ুপথের ঘোটক—

বায়ুর সহচর।

দেবতারাই পেতে চান তাঁকে।

পূবের আর পশ্চিমের সাগরে তাঁদের বাস।

আর কেশী বিহার করেন অঙ্গরা-গন্দর্বর বিচরণ স্থলে।

সকল জ্ঞাতব্য তাঁদের নখদর্পণে।

রুদ্রসনে কেশী একত্রে করলে জলপান

বায়ু স্বয়ং সেই জল করে আলোড়িত।^{১৭৭}

বাংলার সব অঞ্চলে না থাকলেও চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যাঁরা নাথযোগীদের পৌরোহিত্য করেন তাঁরা যোগী পুরোহিত বা যোগীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। যোগীদের মত তথাকথিত যোগী- ব্রাহ্মণদের অশৌচও দশদিন, দশকর্মানুষ্ঠান সামবেদ অনুসারে সম্পাদিত হয়। যোগীদের মত এদেরও শিবগোত্র। প্রাচীনেরা বলেন পূর্বে একজাতির এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান, খাওয়া-দাওয়া একসঙ্গেই চলত। যজমান-যোগী ও পুরোহিত-যোগী দুই নাম হলেও মূলে তাঁরা একজাতি। ব্রাহ্মণের যেমন স্বতন্ত্র পুরোহিত নেই, উপরন্তু ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের পুরোহিত, পূর্বোক্ত তিনজেলায় তেমনি যোগীদেরও স্বতন্ত্র পুরোহিত নেই; যোগীরাই যোগীদের পুরোহিত।^{১৭৮} প্রাচীন যোগপন্থীর বিধানমতে নাথেরা ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনাকারী আদি ব্রাহ্মণ। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের মতে বৈদিক ব্রাহ্মণের বিধান অনুযায়ী সাবিত্রী গায়ত্রীদীক্ষা ও উপবীত গ্রহণ করে নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত হয় এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁরা বর্ণবিভাগ মানেন না, নিজেদের যোগী বলে পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য সকলেরই সমান অধিকার আছে, সেইজন্য সকল যোগীই প্রকাশ্যে ওঁ-কার জপ করেন, সকলেই জ্ঞানচর্চা করেন এবং যোগসাধনা করেন।^{১৭৯} যিনি পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন তিনিই ধন্য—তাঁর জীবন সফল হয়েছে, তিনি মহামানব, তিনি ব্রাহ্মণ। আর যাঁর ভাগ্যে এই অক্ষর পুরুষের দর্শন লাভ ঘটে না, যিনি এই পুরুষকে না জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি হতভাগ্য, তিনি কৃপণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ তাই বলেছে—

‘যো বা এতদক্ষরম্ গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোহথ

যো এতদক্ষরম্ গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।’^{১৮০}

হিন্দুধর্মের বেদান্ত প্রচারিত ব্রহ্মতত্ত্বের এই অনুভব, এই সাক্ষাৎকার লাভ করবার জন্যই নাথযোগীদের যোগমার্গে সমস্ত প্রয়াস ও সাধনা। নাথযোগী সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ-নাথদের উপবীত সংস্কার মানেন না, তার পরিবর্তে নাদ-জনেউ দেওয়া হয়। নাথ যোগদীক্ষার আগে বর্ণব্যবস্থা থাকে, কিন্তু দীক্ষার পরে কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র এই ভেদাভেদ থাকে না। তখন তাঁদের একটিই পরিচয় তাঁরা প্রত্যেকেই ‘নাথ’। এমনকি যোগদীক্ষার পরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধনায় সমান অধিকার লাভ করেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ‘শাবরমন্ত্র’ অনুযায়ী তাঁরা শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ পালন করেন। ‘শাবরমন্ত্র’-কে তান্ত্রিকমন্ত্রের চেয়ে অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয়।^{৪১}

ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিতে তান্ত্রিক সাধনা বর্তমান ছিল। তান্ত্রিক সাধনা এতটা ব্যাপক ও প্রবল হয়েছিল যে তাতে বৈদিক, অবৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন সব সম্প্রদায় তন্ত্রনির্ভর সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতাগণ, যন্ত্রবিধান, মন্ত্রসাধনা, আচারবিধান তথা হঠযোগ সাধনার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।^{৪২} ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্রমবিকাশের স্তরে তিন অবস্থাকে মানা হয়। যার প্রথম অবস্থা জ্ঞানসাধনা, দ্বিতীয়ত কর্মসাধনা, তৃতীয়ত ভক্তিসাধনা। এই তিন সাধনায় ক্রমশ জ্ঞান, সংবেদন, সংকল্প এই তিন মৌলিক প্রবৃত্তির সম্বন্ধ রয়েছে। ধীরে ধীরে ভারতীয় সাধনধারা প্রভাবিত হয়ে লোকজীবন অগ্রসর হয়েছে। মধ্যযুগের এই ভাবধারা নাথপন্থকেও প্রভাবিত করেছে।^{৪৩}

শিবশক্তির সাধনা নাথসম্প্রদায়ের প্রধান উপাসনা। তারফলে সিদ্ধ বা সাধক রোগ, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে পারেন। ব্রহ্মচর্য পালন ও যোগাভ্যাস করে নাথসিদ্ধরা এই সিদ্ধদেহ লাভ করেন। ‘শ্বেতাস্থতর উপনিষদ’-এ বলা হয়েছে—

‘ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।

প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ।।^{৪৪}

এটাই মহাজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা চরম সিদ্ধি যা নাথযোগীরা অনুসরণ করেন। কিন্তু নাথধর্মে গোরক্ষনাথী ধারায় পঞ্চ-মকার, মুদ্রাসাধন আদি গুহ্য তান্ত্রিক সাধনা অভীষ্ট নয়। মৎস্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে কৌলসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌলসাধনায় বামমার্গ এবং কৌলাচার প্রভাবিত করেছে। তারফলে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর অনেক ভিন্নতা চোখে পড়ে। গোরক্ষনাথ তাঁর যোগসাধনায় ব্রহ্মচর্যকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে নারীযোগী বা যোগিনীর সমন্বয়ে যুগল সাধনার পূর্ণতাকে ত্যাগ করেছেন। এই কারণেই পঞ্চ-মকার, পঞ্চ-পবিত্র, শিবাম্বু, মুদ্রাসাধন, আভিচারিক ষট্‌কর্ম, বাহ্যচার মৎস্যেন্দ্রনাথ ধারার বিপরীতে গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত যোগধারায় পরিত্যাগ করা হয়েছে। পুরনো নাথধর্ম হল কৌল, শাক্ত, ত্রিক এবং সিদ্ধধারা। বর্তমানে যে নাথধারা দেখা যায়, তা হল গোরক্ষনাথী ধারা। বাম, দক্ষিণ এবং কৌলমার্গ একই সময়ে বর্তমান ছিল। এই নামগুলি সবই শক্তিকর্ম উপাসনা থেকে এসেছে, এর অর্থ তারা সবই কৌলমার্গের উপাসক এবং শিব, ভৈরব ও শক্তি পূজা করেন। বিগত ৩০০-৪০০ বছরে নাথদের ঐতিহ্য ও সাধনপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ অধিকাংশ নাথ বৈষ্ণব ও নাথধারার বিপরীতধারায় চলে গিয়েছেন। কৌলও বাহ্যিকভাবে বৈষ্ণব। কিন্তু সেই সম্প্রদায় বৈষ্ণব নয়, প্রকৃতিগতভাবে তাঁরা নাথ। তাঁদের আরাধ্য তিনজন দেবতা— শিব, শক্তি ও নারায়ণ। ‘গীতগোবিন্দ’ রচয়িতা কবি জয়দেবও বৈষ্ণব-নাথ ছিলেন। তিনি ভেতরে শাক্ত, বাইরে শৈব এবং সমাজের মধ্যে বৈষ্ণব ছিলেন। এমনকি পাশুপত কৌলধারাও নাথপন্থে এখনও বর্তমান। গিরনারের নাথযোগী অবন্তিকানাথ পাশুপত কৌলধারায় দীক্ষিত এমন একজন নাথযোগী সন্ন্যাসী। তিনি জানান এখনও পাশুপত কৌলধারা নেপাল, কাশ্মীর, মধ্য ও পশ্চিমভারতে প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা প্রাচীন

শিব-শক্তির উপাসনা করেন। নবনাথ বা নয়নাথ পাশুপত কৌলধারায় পৃথক সিদ্ধরা, তাঁদের ‘অষ্টাঙ্গ’ বলা হয়। এঁদের ধর্মধারায় ন’দিনে সপ্তাহ, ন’দিনের নাম ন’জন পৃথক ‘নাথ’-সিদ্ধের নামে হয়েছে।^{৪৫}

নাথসাধনায় তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে নাথযোগীর দৃষ্টিতে সৃষ্টির মূল হিসেবে অনামা বা শব্দব্রহ্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। শব্দব্রহ্মের অতীত স্থিতিকে পাঁচিশ গুণযুক্ত পাঁচ শক্তির সমন্বয় রূপে ধরা হয়। এই শক্তিপঞ্চকের সমন্বয়ে অখণ্ড দৃষ্টি হল ‘শিব’। এর আর এক নাম ‘পরপিণ্ড’। এই শক্তির সঙ্গে নিজশক্তিকে নিয়ে কুণ্ডলিনী নামক পাঁচরকম শক্তির অবস্থান ঘটে। নাথমতে প্রাচীন শক্তিপ্রধান শৈবমতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ ভৈরবীর কাছ থেকে মহাজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন—

‘মুলাংগুষ্ঠনখণ্ডাৎ এতে তত্ত্বসত্ত্বতি ।
অষ্টাদশাবিধং দেবি জ্ঞানঞ্চ কুলগোচরে ॥
কথিতং সৃষ্টিসংযোগং যথা তথা ন ভৈরবি ।
কিমন্যং পৃচ্ছসে নাথ সুগোপ্যং প্রকটীকৃতম্ ॥’^{৪৬}

নিরীশ্বরবাদীদের কাছে প্রমাণস্বরূপ নাথযোগ যে ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার পরিচয় হিসেবে ‘আগমসংহিতা’ গ্রন্থে যোগীর উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে—

‘ঈশ্বরাদুদ্ভবো যোগী রুদ্রা একাদশৈব চ ।
প্রধানশ্চ মহাযোগী পুত্রশ্চ বিন্দুনাথকঃ ॥
তস্য পুত্র আইনাথো রুদ্রকুল-প্রকাশকঃ ।
সিদ্ধায়ে গোরক্ষনাথশ্চ মীননাথস্তথোত্তমঃ ॥’^{৪৭}

ঈশ্বর থেকেই একাদশ রুদ্রের উদ্ভব। এঁদের প্রধান মহাযোগী। তাঁর ছেলে বিন্দুনাথ। তাঁর ছেলে আদিনাথ—যিনি রুদ্রকুলের প্রকাশক। রুদ্র যে একাদশ দেবতা, ‘মৎসপুরাণ’ মতে তাঁরা হলেন অজপদ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, কপালী, ভীম, পিঙ্গল, বিলোহিত, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড

ও ভব। মহাভারতমতে ব্রহ্মার মানসপুত্র স্থাণু থেকে রুদ্রগণের উৎপত্তি। শিবের অষ্টমূর্তির প্রথমটি হল রুদ্র। এঁরা শিবেরই অবতার এবং শঙ্কর এঁদের অধিদেবতা। ‘শ্রীমদ্ভগবতগীতা’য় আছে—‘রুদ্রাণাং শঙ্করচাম্মি’ (১০/২৩)। অথর্বশিরস্ উপনিষদে রুদ্রের প্রতি দেবতার প্রার্থনায় বলা হয়েছে তিনি এক রুদ্র, তিনি ঈশান, তিনি ভগবান, তিনি মহেশ্বর, তিনি মহাদেব। রুদ্র শব্দের অর্থ বোঝাতে বলা হয়েছে তিনি এক রুদ্র, যাঁর দ্বিতীয় নেই—যিনি ঈশ্বরত্ব অবলম্বন করে স্বেচ্ছিতকর্মে যুক্ত থেকে ঈশ্বর হয়ে প্রতি জীবের মনে অবস্থান করেন। তিনি আবার সৃষ্টিকালে বিশ্ব সৃষ্টি করে স্থিতিকালে বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। রুদ্রের ব্যাপকত্ব বোঝাতে তাঁর প্রার্থনায় রুদ্রের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়েছে অথর্ববেদে—

‘যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অঙ্গু য ওষধীষু।

যো রুদ্রো বিশ্বা ভুবনাহবিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু।।’^{৪৮}

অর্থাৎ রুদ্রগণ যদি শিবেরই অবতার হন তাহলে নাথযোগীদের শৈব জেনেও আলাদা করে রুদ্রজ বলার সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। যেখানে ঈশ্বরই পরম যোগী, তপস্বী; সেখানে জ্ঞানীরও অধিক প্রশংসনীয় যোগী। ‘অনাদ্য-চরিত্র’ গ্রন্থেই নাথযোগীর উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

‘দেবির অঙ্গে লাগি শিবের বির্য টলিলা।

সেইখানে কুলনাথ তথ্যে জন্মিলা।।

শিব পরশনে চিওঁ কল্লিলা পার্কতি।

জনি বির্য্য শ্রবিতে জন্মিলা বিন্দুবতি।।

ধ্যান করিয়া শিবে আজ্ঞা পাইলা।

কুলনাথ স্থানে বিন্দুবতি শমর্পিলা।।

জুগ আ ধর্ম সকল বুজাইলা।

কুলনাথরে শিবগোত্র নাথ পৌদ্যত দিলা।।’^{৪৯}

অর্থাৎ কৌল পরিচয়ে নাথযোগীর শিবগোত্রই প্রথম ও শেষ পরিচয়।

সিন্ধুসভ্যতার যুগে যোগের সন্ধান পাওয়া গেলেও নাথযোগীদের অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে সিন্ধুউপত্যকাবাসী ‘বিষাণিনঃ শিবাসঃ’ (৭/১৮/৭) অর্থাৎ বিষাণ(শৃঙ্গ)-ধারী শিবজাতির উল্লেখ আছে, যাঁরা দীক্ষান্তে দেহে পশুশিং ধারণ করতেন (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩/২/১/৩১) তাঁদের বংশধরেরাই আধুনিক যুগের দীক্ষান্তে শিঙ্গী-নাদ-ধারণকারী শিবযোগী নাথসম্প্রদায়।^{৫০} বেদে বিষাণিন শিবাস, মৎস্য, তুর্বস, বৈকর্ণ, ব্রাত্য আদি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ সহ চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা রথ, কৃশ, নাদমান এবং সুশিপ্র। এঁদের মধ্যে নাদমানরাই আনুমানিক বর্তমানের নাথ। আর্যদের ভাবনায় জাতপাতের সূত্রপাত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাঁরা স্থানীয় দাসাধ্যানি জাতিকে ‘বর্ণনাং গৃহামধকঃ’ করে রেখেছিল। তবে ঋগ্বেদে ‘নাথ’ শব্দটি স্বামী অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। রামচন্দ্রের সময়ে ‘রামায়ণ-এ’ ব্রাহ্মণ, তাপস ও শ্রমণদের সঙ্গে নাথের সন্ধান মেলে। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ১৪.২ শ্লোকে নাথ, ব্রাহ্মণ, তাপসাদির একপংক্তি ভোজনের চিত্র রয়েছে। বেদের চতুর্বর্ণ বিভাগের পর শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ‘মহাভারত’-এ গুণকর্ম বিভাগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চতুর্বর্ণ সৃষ্টির কথা পাই। এই মহাকাব্যে বলা হয়েছে যোগী না হলে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদিতম গ্রন্থ ‘চর্যাপদ’-এ ‘নাথ’ শব্দটি ‘নাতা’-তে রূপান্তরিত হয়ে সদগুরু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।^{৫১} কৃষ্ণাচার্যের ‘দোহাকোষ’-এ সহজসিদ্ধির ‘নাতা’, ‘নথু’, নাথপন্থে সংস্কৃত আকারে ‘নাথ’ হয়েছে।^{৫২} নাথযোগীরা নিম্নবর্ণের হলে ‘সদগুরু’ না বলে ডোম, শবর, চণ্ডাল, ধীবর, গুপ্তি, ধুনুরী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের সহগামী হিসেবে পাওয়া যেত।^{৫৩} খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে ব্যাবিলনবাসী বার্দেসানেস ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ-যোগীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমনকি সপ্তম শতকের শেষদিকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কশিপাতে

মাথায় ছাইমাখা মাথায় হাড়ের মালা জড়ানো শৈবযোগী দেখেছিলেন।^{৫৪} ‘গোখবিজয়’ কাব্যেও আদিনাথ শিবকে অনুরূপ সাজে দেখতে পাওয়া যায়—

‘মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।

ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলিছালা।।’^{৫৫}

কাজেকর্মে জাতিত্বের দোহাই ছিল না, কারণ হিউয়েন-সাঙ অনেক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। জৈনধর্মের বেশি সমাদর ছিল না। শুধু উত্তর-বিহার, উত্তর-বাংলা ও সমতটে তার কিছু প্রভাব ছিল। প্রথমে মৌর্যযুগে ও পরে গুপ্তযুগে পশ্চিম থেকে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ এসে প্রধানত উত্তর-বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও যে তাঁদের বৌদ্ধ বা জৈনদের থেকে বেশি ছিল তা নয়। শৈব নাথধর্মী ও বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যায় বেশি।^{৫৬} যতিরা যে অত্যন্ত প্রাচীনকালের যোগ-সাধক ছিল— ঋগ্বেদে তাদের উল্লেখ থেকে একথা সহজেই অনুমিত হয়। তার মধ্যে একটি ঋকের(৮/৩/৯) সাক্ষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঋকে উল্লিখিত ‘যতিভ্যঃ’ শব্দের সায়েন দুটি বিকল্প ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে সমগ্র ঋকের অর্থ হয়: ‘হে বীর্যযুক্ত ইন্দ্র, তোমার নিকট আমি পূর্ব-যুগের প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক অন্ন যাচঞা করছি। যতিদের কাছ থেকে ভৃগুদিগের ধন প্রদান করে তার দ্বারা কণ্ঠের পুত্রকে রক্ষা কর।’ সায়েনের প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে ‘যতিভ্যঃ’-র অর্থ হল, ‘কর্মসু উপরতেভ্যঃ অযষ্ট্ভ্যঃ জনেভ্যঃ সকাশাং’ – কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন যজ্ঞবিহীন জনগণের কাছ থেকে। বিকল্প ব্যাখ্যা অনুসারে ইন্দ্র যতিদের উদ্দেশ্যে ভৃগুকে ধন প্রদান করছেন। মুণ্ডক উপনিষদে যতিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ’ (৩/২/৬) এবং তাঁরা ‘ক্ষীণদোষাঃ’, সম্যক জ্ঞানযুক্ত ও ব্রহ্মচর্য-সম্পন্ন (৩/১/৫)। ‘শ্রীমদ্ভগবতগীতা’-য় বলা হয়েছে যতিরা ‘প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ’ (৪/২৮-২৯); তাঁরা কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত ও

সংযতচিত্ত (৫/২৬), তাঁরা যোগ-ধারণা-সম্পন্ন (৮/১১-১২)। অতএব যোগসাধনার প্রধান লক্ষণগুলি যতিদের মধ্যে দেখা যায় (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩/৩/৭/৩, ২/৫/১/১)। যতিরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের অনুগামী ছিল না। তাঁরা সিদ্ধ-উপত্যকার আর্য-পূর্ব জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন। ইন্দের যতি হত্যা কাহিনিতে সম্ভবত ইতিহাস-আভাসিত যুগে স্থানীয় পুরোহিত-শ্রেণির সঙ্গে আগন্তুক ঋষিদের সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগ এবং যোগীদের বিরুদ্ধে বৈদিক ঋষিদের প্রাচীন বিরূপতা থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে বৈদিক ঐতিহ্যে যোগ-সাধনার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।^{৫৭} যতিদের উপর ইন্দের নিষ্ঠুরতার কারণ প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন—

The only possible answer to this question is, that Yatis were not originally priests of the Vedic cult like the Bhrigus and the Kanvas, but of non-Vedic rites practised by the indigenous pre-Aryan population of the Indus Valley. In the legend of the slaughter of the Yatis by Indra we probably hear an echo of the conflict between the native priesthood and the intruding Rishis in the proto-historic period. If this interpretation of the legend is correct. It may be asked, what was the religious or magico-religious practice of the Yatis? In classical Sanskrit Yati denotes an ascetic. The term is derived from the root yat, to strive, to exert oneself, and is also connected with the root yam, to restrain, to subdue, to control. As applied to a priest, etymologically Yati can only mean a person engaged in religious exercise such as tapas, austerities and yoga... The marble statuettes of Mahenjo-daro with head, neck and body quite erect and half-shut eyes fixed on the tip of the nose has the exact posture of one engaged in practising Yoga. I therefore propose to recognise in these statuettes the images of the Yatis of the proto-historic and pre-historic Indus Valley intended either for worship or as votive offerings. Like the Rishis of the pre-Rigvedic and early Rigvedic period, these Yatis, who practised Yoga, were also primarily magicians.^{৫৮}

যোগ ও যোগীদের প্রতি বৈদিক ঋষিদের মত বিরূপতা চৈতন্যোত্তরকালেও লক্ষ করা যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীতে নুলো পঞ্চগনন তাঁর কারিকায় লিখছেন—

‘তত্ত্বজ্ঞান ত্যাজি যুগী ইন্দ্রিয় নিরত ।
অশেষ পাতকে পাপী মনে অসংযত ॥
তাই কেহ যুগীর দ্বিজত্ব নাহি গণে ।
কাণফট ওড়ং ঘটু কাণিপাদিজনে ॥’^{৫৯}

উক্ত কারিকা থেকেও বোঝা যায় যোগীরা দ্বিজই ছিল, আদিবৈদিকযুগের পুরোহিত শ্রেণি। পাশাপাশি এটাও অনুমান করা যায় যোগীদের উপর বিদ্বেষভাব ধারাবাহিকভাবে চলছিল। অথচ ১৯০১ সালে জনগণনার পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি হাজারে কায়স্থদের গড়ে ২৭১ জনের ১জনের নিন্দনীয় জীবিকা। যোগীর ৩৭৪ জনের ১জন এবং ৪১২ জন ব্রাহ্মণের ১জনের ঘৃণ্য বৃত্তি।^{৬০}

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারের সময়কালেও যোগীদের উপর অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে ওড়িয়া ভাষায় রচিত কবি অচ্যুতানন্দ দাসের ‘শূন্যসংহিতায়’—

‘নাগান্তক বেদান্তক যোগান্তক যেতে ।
নানা প্রতিবিধিরে কহিলে তোষচিতে ॥
গোরক্ষ নাথক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা ।
মল্লিকা নাথক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥
লোহিদাস, কপিলক সাংখী মন্ত্র যেতে ।
কহিলে যে হেমন্তে সে হোইলে গুপ্তে ॥’^{৬১}

শৈব-শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, তন্ত্রের সঙ্গে পুরাণের, জ্ঞান ও যোগের সঙ্গে ভক্তির বিবাদ এবং যোগীর পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বুদ্ধকে অবতার-রূপে গ্রহণ করলেও, বৈষ্ণবরা কখনো বৌদ্ধধর্মের নামে পূজা মানেন নি। অন্যদিকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা নাথসিদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম

প্রভাবিত শৈব-শাক্তধর্মকে ‘পাষণ্ড’ মতবাদরূপে বিচার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মকে মেনে নেন।^{৬২} আবার সপ্তম শতক বা তার কিছু আগে থেকেই পুরাণগুলিতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান জুড়ে দেওয়া শুরু হয়। এ সবই অবশ্য ব্রাহ্মণ্য প্রচারের চেষ্টা, সে চেষ্টায় স্মার্ত পণ্ডিতেরা ছিলেন অগ্রণী। তবে ব্রাহ্মণ্যকে চিরদিনই বৈদিকধর্মের নীচেই স্থান দেওয়া হত। ‘বৃহদ্রম পুরাণ’, ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’, ও ‘বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণের’ যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা বাঙালি স্মার্ত পণ্ডিতদেরই কীর্তি। বাংলার চাতুর্বর্ণ সমাজের ছবি পাওয়া যায় শুধু এ তিনখানা পুরাণেই; অন্যান্য দিক থেকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক তথ্যের কোনো সন্ধান এখনো মেলেনি। সব পুরাণেই গার্হস্থ্যধর্মকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে, সন্ন্যাসকে নয়। সন্ন্যাসীকে স্মৃতির বিধান দেওয়া বৃথা।^{৬৩} ‘মনুসংহিতা’ বেদ ও স্মৃতির বিধান অনুসারে চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ্যশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। কারণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন আশ্রমকে শিক্ষাদানের দ্বারা গৃহস্থ্যই পোষণ করে থাকেন—

‘সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।

গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি।।

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।

তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্।।’^{৬৪}

নাথধর্ম হল সন্ন্যাসপ্রধান ধর্ম, স্বাভাবিকভাবে স্মার্তরা তাকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। এই কারণেই সম্ভবত নাথযোগীধারার সঙ্গে দেবী মনসারও দূরত্ব বাড়তে থাকে। নাথযোগী মিথের আদিপর্বে মনসার সঙ্গে গভীর যোগ ছিল। এমনকি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময়ে যোগিনীর বেশ ধরে এবং লখিন্দরকেও যোগীর বেশ ধারণ করায়— তখন মনে হতে থাকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নাথপন্থী যোগীদের যে একটি বিপুল অংশ গার্হস্থ্যধর্মে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তার

ছিল ইতিহাস এই অংশটুকুর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই ইতিহাসকে একটু পিছোনোও চলে বলে অর্জুনদেব সেনশর্মা মনে করেন।^{৬৫}

সেক্ষেত্রে তিনি সংসারত্যাগী সাধকের গৃহসংসারে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি হিসেবে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ থেকে অংশটুকু উল্লেখ করেছেন—

‘যাইতে বাপের দেশ হৈয়া যোগিনী বেশ
লখিন্দর যোগী তার সাথে।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে যোগী হৈয়া দুইজনে
মায়ারূপে থাল কৈল হাতে।।
চৌদ্দডিঙ্গা ঘাটে থুইয়া যোগী যোগিনী হৈয়া
চলিল বেহুলা লখিন্দর।।
রূপে যিনি তিলোত্তমা রক্ত বস্ত্রেতে রামা
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর।।
গলায় রত্নাক্ষ মাল স্কন্ধে বুলী হাতে থাল
লখিন্দর চলে আগে।।^{৬৬}

কিন্তু ‘গোরক্ষবাণী’তে রয়েছে—

‘মাতা হমারী মনসা বোলিয়ে,
পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার।
গুরু হামারে অতীত বোলিয়ে,
জিনি কিয়া পিণ্ডকা উধার।’

অর্থাৎ যোগীর উৎপত্তি অনাদি থেকে। প্রকৃতি বা মায়া তার মা, নিরঞ্জন নিরাকার পরম চৈতন্য তার বাবা। শরীর ও আত্মার এই ভেদজ্ঞান সে পেয়েছে গুরু কৃপায়। যোগী পিণ্ডে বা দেহে ব্রহ্মাণ্ডের খবর জেনেছে এবং জীবনুজ্জি লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ‘অনাদ্য-চরিত্র’ গ্রন্থে লক্ষ করা যায়—

‘আশন করিয়া তবে ছায়া নিরক্ষিলা।
ছায়ামায়া দেখি ধরিতে না পারিলা।।

হাতের অং-হনে আদিশক্তি নিকলিলা ।

মায়া মনস্মাকার হেতু কাকেতুকা নাম থৈলা ।।

দেবিরে দেখিআ যনাদ্য ধরিলা তরিতে ।

মনস্মাকার দেখিআ দেবি না পাইলা ছলিতে ।।’^{৬৭}

মনস্মাকার, মনস্মাকার -র অর্থ মনসা আকার। গোরক্ষবিজয়ে শুধু ‘ছায়া আকার’ বলা হয়েছে। ‘কাকেতুকা’ মূলে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মনসার অপর নাম কেতকা। মনস্মা, মনস্মা মনসাবাচক শব্দ হওয়ায় কাকেতুকার স্থানে কেতকা হওয়াই উচিত। ড. সুকুমার সেনও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।^{৬৮} নাথদর্শন মতে অনাদির ‘উন্মুখ মাত্রাণ পরাশক্তি এবং স্পন্দন মাত্রাণ অপরাশক্তি উৎপন্ন’ হয়।^{৬৯}

‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’ই একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন যেখানে আমরা প্রথম চতুর্বর্ণ সমেত মোট ৫৯ টি বর্ণ-শঙ্কর জাতির সন্ধান পাই।^{৭০} এখানে যোগীদের পদবী ‘নাথ’-র উল্লেখ নেই। তবে যোগীদের সাধনার কথা আছে যে তারা ধ্যানযোগে নিরাকার পরাৎপর ব্রহ্মকে লাভ করেন—

‘যোগিগণ ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রপাতে ।

নিরাকার পরাৎপরে পায় আভাসেতে ।।’^{৭১}

যোগসাধনার কারণেই যে যোগীরা যোগী উপাধি পান একথার উল্লেখ রয়েছে এখানে—

‘ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি ।

নিজ জ্ঞানে ক্রমে পান বিবিধ উপাধি ।।’^{৭২}

তাসত্ত্বেও জাতের তালিকায় যোগীর উল্লেখ নেই। নাথযোগীরা যদি বর্ণ-শঙ্কর জাতি হতেন তাহলে উক্ত ৫৯টি জাতির তালিকায় ‘নাথ’ উপাধি থাকত। যদিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের জন্মগত জাতপাতের বিভাজন একেবারেই কল্পনাপ্রসূত বিষয়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যগ্রন্থে ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, নাপিত ইত্যাদি জাতি সম্প্রদায়ের কথা রয়েছে। যোগীর উল্লেখ রয়েছে আলাদাভাবে, তাঁরা হাতে খপ্পর নিয়ে ভিক্ষা করেন—

‘হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।’^{৭৩}

এই ভিক্ষা তাঁদের জীবিকা নয়, ‘যোগীভিক্ষা’ আচার-সংস্কারজাত একপ্রকার রীতি। নাথযোগী নিন্দনীয় নিম্নবর্ণ হলে কৃষ্ণ যোগী হয়ে ‘আক্ষে নিরঞ্জন কায়’^{৭৪} বলতেন না, রাধাও যোগধ্যান ইত্যাদি অনুশীলন করে যোগিনী হতে চাইতেন না—

‘তোক্ষে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।

থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ।।’^{৭৫}

সমাজজীবনে নাথযোগীদের স্থান নির্ণয়ে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখানে ১৮টি জাতির সঙ্গে যোগী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্মিন্দরের বিয়েতে উপহার হিসেবে ব্রাহ্মণেরা সোনা-রূপো এবং যোগীরা পেলেন কড়ি—

‘ভাট বিপ্রগণ আসিল বিস্তর।

সকলেরে পরিতোষ করে সদাগর।।

ভট্টাচার্য্যেরে দিলা রজত-কাঞ্চন।

চক্রবর্তীরা পাইল ইহার নিয়ম।।

অতি সামান্য পাইল কড়ি চারি পণ।

যোগী দেশান্তরে ছিল যত যত জন।।’^{৭৬}

ষোড়শ শতাব্দীতে দ্বিজমাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ গ্রন্থে সর্বপ্রথম যোগীদের ‘নাথ’ উপাধি পাওয়া যায়—

‘কা’স্ত নানা জাতি আইসে ঘোষ বোস মিত্র বৈসে

গুহ গুপ্ত আর বৈসে ধর।

সিংহ দাস নাগ নাথ তারা বৈসে শতে শত

দত্ত সেন আর বৈসে কর।।’^{৭৭}

এর আগে সম্প্রদায় হিসেবে নাথদের উল্লেখ পাই নি। অনুমান করা যায় এই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে গৃহস্থ যোগীরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। এর আগে সর্বত্র সন্ন্যাসী যোগীর কথা আছে। অবশ্য মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনীকৌলধারা থেকেই সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নাথধারা সমান্তরালভাবে চলে আসছে। বৃন্দাবনদাসের ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় নাথযোগীরা শিবগীত গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান—

‘একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় – গায় শিবের কথন।।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ।।
শঙ্করের গুণ গুনি প্রভু বিশ্বস্তর।
হইলা শঙ্করমূর্তি দিব্য জটধর।।
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল।।’^{৭৮}

গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীতে গোরক্ষযোগীদের শিঙাধ্বনি উল্লেখ করছেন—

‘গোরখ জাগাই/ শিঙাধ্বনি শুনইতে/ জটীলা ভিখ আনি দেই/
মৌনি যোগেশ্বর/মাথ হিলাইত/তবহিঁ ভীখ নাহি লেই।’^{৭৯}

অভিরামের ‘গোবিন্দবিজয়’ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, স্বেচ্ছ, কিরাত, যোগী, সিদ্ধ, মুনি, ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে যোগীদের যোগহারা হওয়ার প্রসঙ্গ এখানে রয়েছে—

যোগী যোগহারা হইল মুরলীর গানে।^{৮০}

দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেনের রাজত্বকালে গোপালভট্ট রচিত ‘বল্লালচরিত’ গ্রন্থে যোগীজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেসময়ে যোগী পীতাম্বরনাথ নাথসম্প্রদায়ের মঠ হুগলির মহানাদের শিবমন্দিরের পূজারী অথবা মোহান্ত ছিলেন। তখন অবশ্য যোগীরা প্রভাবশালী ছিল বলেই মনে হয়—

‘এতস্মিনন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ।

বভুব ভৈরবাবশ্চ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাম্।।’^{৮১}

ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁর সেনাপতি শাহ সুফি নাথ সম্প্রদায়ের মঠ ভূগলির মহানাদ আক্রমণ করলে মঠটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি অনুতপ্ত হন এবং মহানাদ মঠের জন্য ৪০০ একর নিষ্কর জমি উপহার দেন। এই সময়ে জগন্মোহন নামে পাটনার একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় বাংলার রাজাদের বিবরণ লিখে গিয়েছেন। গ্রন্থখানা এখন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। (Catalogue Sanskrit Manuscripts Government Collection, P.51)—

“অথ মানাত দেশ বিবরণম্”

‘যোগিজাতিগৃহেজাতো ভাগ্যবান সর্বলক্ষণঃ।

মহেন্দ্র নারায়ণ নৃপো মানাত নগরে পুরা।।

মুক্তিকাময় দুর্গস্তু মর্যাদাভিঃ সমন্বিতম্।

স্থাপিতা বেণুবৃক্ষাস্তু দুর্গমধ্যে পুরানুপৈঃ।।

প্রাচীন রাজবাটী চ বর্ততে ভগ্নবাটিকা।

রাজবাট্যাঃ পার্শ্ববর্তি-বহবো যোগিজাতয়ঃ।।

মানাত বিখ্যাতো রাঢ়দেশেষু।।’

যোগীরাজা মহেন্দ্রনারায়ণ নাথের সময়ে মহানাদের জটেশ্বরনাথ শিবমন্দির নাথপন্থী সন্ন্যাসীদের হাতে অর্পিত হয়েছিল মহানাদের পুরনো নথিতে লেখা আছে। এমনকি জাহাঙ্গীরের সময়ে মহানাদ অঞ্চলে যোগীজাতির বসবাস ছিল সরকারি ক্যাটালগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।^{৮২} বাংলাসাহিত্যে নাথপন্থী রচনা হচ্ছে মীনচেতন-গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্র গাথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনি ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কাহিনির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। দ্বিজ লক্ষণ ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীন-গোরক্ষ কাহিনি প্রধান

স্থান গ্রহণ করেছে। কদলীরাজ্য থেকে প্রত্যাগমনকালে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ মহানাদে যোগীরাজা হয়েছিলেন বলে সহদেব চক্রবর্তী তাঁর ‘অনিলপুরাণ’ (সুকুমার সেন, ১৯৮৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

‘কদলী হইতে যত যুগীগণ,
মহানাদে গিয়া যুগী দিল দরশন।
মহানাদে গিয়া মীন হৈল যুগীরাজা,
শিব-ঠাওর দর্শি করে মহাদেবের পূজা।’^{৮৩}

অনিলপুরাণ ও গোরক্ষবিজয়ে বর্ণিত কাহিনির মূলস্থানীয় ছড়াগুলি পূর্বাপর প্রচলিত ও একই। পরবর্তীতে লিপিকর ও গায়কদের মুখে পরিবর্তন যা কিছু ঘটেছে।^{৮৪} যাদবনাথ বা যাদুনাথের ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ সপ্তদশ শতকে রচিত ধর্মসাহিত্য গ্রন্থে নাথপন্থ ও ধর্মপন্থের সমন্বয়ের একই চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের পূজোর প্রচলন সর্বপ্রথম মহানাদে ঘটেছে বলে কবি যাদুনাথ তাঁর ‘শ্রীধর্মপুরাণ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

‘মহানাদে আশীহাটা উড়িয়ায় হাড়ি-ঝাঁটা
ধর্মঘরে বৈতরণী পার।’^{৮৫}

ধর্মঠাকুরের পুরাণকথা এবং নাথ নিরঞ্জন সৃষ্টিবর্ণনাও একই। তারফলে পশ্চিমবঙ্গে নাথ ও ধর্মসম্প্রদায়ের মিলন ও সমন্বয় ঘটেছে। ড. পঞ্চগনন মণ্ডল বলেছেন ধর্মপূজা-বিধানের পুথিগুলি তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের নাথযোগীদের বাড়ি থেকেই পেয়েছেন। অনেকস্থানে নাথযোগীরা ধর্মঠাকুরের পূজো করেন এবং করিয়ে থাকেন। ধর্মপূজোয় আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ এবং চৌরঙ্গীনাথের উদ্দেশ্যে ফুল দেওয়া হয়। সিদ্ধ-যোগিনীরাও যথাযথ সম্মান লাভ করেন। ধর্মঠাকুরের পূজোয় ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান হয়। তাতে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে জীবাত্মাকে স্থাপন করার যৌগিক পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। ন্যাস-প্রাণায়ামাদি তো আছেই।^{৮৬} ড. সুকুমার সেনের মতে নাথপন্থীদের ঐতিহ্যে ধর্ম আছেন

‘নিরঞ্জন’ নামে, আর কেতকাও আছেন তবে তার নাম কেতকা নয়, মনসা।^{৮৭} তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে অদ্বৈতচরণ দেবনাথ সঙ্কলিত ‘দেলপূজার পাঁচালী’-তে দেখা যায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুরোধে শিব দেলপূজা করেছিলেন। দেলপূজার স্থানে পাট-পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এ পাট ধর্মের পাট—

‘ব্রহ্মা বিষ্ণু হরষিত কহে ত্রিলোচনে।

পূজা কর ধর্মদেবে প্রচার কারণে।।’

ধর্মের পূজোর জন্য দেউল তোলা হল—

‘সুবর্ণের কলস মুকুতার ঝারা।

দেউল নির্মাণ হৈল অক্ষয়-বট তলা।।’

দেউল গড়া শেষ হলে—

‘শূন্যে থাকি বলেন ধর্মরায় শুন মহেশ্বর।

মালধের সৃষ্টি কর থাকুক সয়াল।।’

ধর্মরাজদেবতা, গ্রাম-রাজদেবতা। ঐতিহাসিক দলিলে রাজদেবতা ধর্মের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রপট্টানুশাসনে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। এই অনুশাসন আরম্ভ হয়েছে ধর্মের বন্দনা করে—

‘...কনাথঃ যঃ পুং সাং স্কৃতকর্মফলহেতুঃ।

সত্যতপোময়মূর্তি লৌকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ।।’

‘যিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের ফলহেতু, সত্য এবং তপস্যা যাঁর মূর্তি, ইহলোক পরলোকের যিনি উপায়, সেই (ত্রিলোক) নাথধর্ম (জয়যুক্ত হোন)।’^{৮৮}

কোনো কোনো ধর্মপুরাণে সৃষ্টির উপক্রমে নীল ও অনিলের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিজ লক্ষ্মণের মতে নীল-অনিলের সংযোগে শূন্যবিস্বরূপী আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে ধর্মকাহিনির সঙ্গে নাথতত্ত্বের সন্ধি হয়েছে। তাই এখানে—

‘মন হব অনিল পবন হব নীল।

শূন্যভরে করতার সৃজিল শরীর।।’

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের স্বধা-প্রযতির সঙ্গেও নীল-অনিলের মিল রয়েছে। নীল= নীর=
কামিন্যাঘট, অনিল= নিরঞ্জন।^{৮৯}

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র রায় ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থে ৫৬ জাতির উল্লেখ
করেছেন, সেখানে যোগীজাতিও রয়েছে—

‘কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।

বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি

গোয়ালা তামুলী তিলি তাঁতী মালাকার।

নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।।

আগরি প্রভৃতি আর নাগরি যতেক।

যুগি চাসাধোবা চাষাকৈবর্ত অনেক।।’^{৯০}

দীর্ঘ ৪০০ বছর (১৩-১৬ শতক) নাথ ও সুফি সাহিত্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে। নাথসিদ্ধ
ও যোগীদের প্রজ্ঞার প্রভাব সুফিদের উপর লক্ষিত হয় একটি নাথপন্থের হঠযোগীর
তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থে (‘অমৃতকুণ্ড’)। আলিমর্দান খলজির সময়ে লক্ষ্মীতির ইমাম ও প্রধান
কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী এই গ্রন্থটিকে বাঙালি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কামরূপের যোগীর বা
ভোজর ব্রাহ্মণ বা বজ্রব্রহ্মর (১২০৯-১৭) সাহায্যে আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ
করেন। এই গ্রন্থের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে বিখ্যাত শত্রুরী সন্ত শেখ মহম্মদ ঘোস
(১৫০০-১৫৬৩) এর পুনরায় অনুবাদ করেন। এই ‘অমৃতকুণ্ড’ গ্রন্থটি ১৫-১৮ শতকে
বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন যোগতন্ত্র বিষয়-জিজ্ঞাসু সুফি কবিগণ। পরবর্তীকালে
মুসলমানদের মধ্যেও নাথসিদ্ধভক্তের অভাব ছিল না। তাঁরা মৎস্যেন্দ্রকে ‘মহম্মদ-
মহম্মদলি’-তে ও আরও পরে ‘মোচরা পীরে’ পরিণত করেন। একজন প্রখ্যাত সুফিসাধক
শেখ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মতে গোরক্ষনাথ মানব ছিলেন না, ছিলেন পরব্রহ্ম
(Absolute Being), আদর্শ (Perfect) পুরুষ, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব (Oneness)

উপলব্ধি করেছেন। মুসলমান বিজয়ের সময়ে একজন হিন্দুর সম্পর্কে এক মুসলমানের এইরূপ ধারণা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। প্রখ্যাত চিন্তি ফিরদৌসী ও শত্রী সুফিগণ নাথযোগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের ভাষণ শুনতেন ও ভাবের আদানপ্রদান করতেন।^{৯১} এর কারণ বৈদান্তিক যেখানে অনবরত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, আবার একদল যেখানে কর্মফল নির্ণয়ে পরিশ্রান্ত, আবার যখন কেউ কেউ হোম এবং যজ্ঞের মধ্যে পরিভ্রাণ খুঁজছেন, আবার কেউ কেউ যেখানে দুঃখ মোচনের জন্য তীর্থে তীর্থে পুণ্য সঞ্চয়ে ব্যাকুল, তখন সিদ্ধমতের মধ্যেই নিশ্চিন্ততা আসতে পারে বলে নাথপন্থীরা দাবি করেন। সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, বিপাকে ও অভীক্ষায়, গ্লানি ও উপভোগে যে বোধকে নির্মাণ করেছে সে-বোধ তাদের জীবন চেতনা থেকেই উদ্ভূত বোধ, কোন প্রকার আরোপিত বোধ নয়।^{৯২} ড. জীবন নাথ তাঁর ‘নাথযোগ এবং মধ্যযুগের বাঙলা কবিগান’ নিবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর দু’জন নাথযোগী কবিওয়ালা গোরক্ষনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর কবিগান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।^{৯৩}

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহিরাগত মুসলমান আক্রমণ ও ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসনের কারণে নাথসম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে বাংলায় গৃহস্থ নাথযোগীর সংখ্যা কমে যায়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে নাথসম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দ্বিক চিত্র দেখা যায় না এমন নয়। হলায়ুধ মিশ্রের ‘সেখ শুভোদয়া’ গ্রন্থে কানফাটা নাথযোগীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথনে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ ও যোগীর বিরোধ ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি বলা চলে—

Then Gango the play-actor with folded palms said, “O! brahmans there are all great ones (here). Now from among (them)...

Then the brahman (said), “O great one, I can tell. And I can cite the scripture if no one is displeased...”

All others said, “So be it.” But the Yogi did not agree.

The Sheikh asked the brahman, “Why don’t you name the Yogi. For seven hundred years he lived (buried) underground. Why no importance is given to (this feat)?

Then the Yogi said, “Brahmans hate us. For that reason they have no regard for me.”

...Then the sheikh made him stop. The Yogi was depressed (and he commented). “(Our) rivalry with you is eternal.”^{৯৪}

এই কারণেই অর্জুনদেব সেনশর্মা মনে করেছেন ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি-শাসিত সমাজের চোখে নাথেরা সেনবংশের আগে থেকেই অবজ্ঞেয় ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনের সময়েই কঠোরতর ব্রাহ্মণশাসন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নতুন করে চণ্ডী, মনসাকে স্মৃতিসংহিতায় তুলে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করে। স্মার্তশাসন সন্ন্যাসবিরোধী হলেও বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চনদের প্রতি স্মার্ত মনোভাব কখনোই যোগীদের প্রতি মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নাথযোগীদের প্রতি বিরাগ অন্যদিকে মনসা-চণ্ডীর প্রতি অনুরাগ মুসলিম রাজত্বে চণ্ডী-মনসাকেন্দ্রিক মঙ্গলসাহিত্য বিকাশের যোগাযোগের ইতিহাসকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে।^{৯৫} তিনি অবশ্য নাথযোগীদের স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্যধারায় গৃহীত না হওয়ার কারণ হিসেবে নাথসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসধারা ও খাদ্যাভ্যাসকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছেন। কিন্তু তার উত্তরে বলা যায় নাথসম্প্রদায়ে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলধারা থেকেই যুগলসাধনাধারা প্রচলিত রয়েছে। নাথপন্থে গৃহস্থ ও বজ্রব্রহ্মচারী হতে পারেন অর্থাৎ তিনি যদি ‘শিবসংহিতা’ উল্লিখিত সহজোলা যোগমুদ্রার দ্বারা মৈথুনে উর্ধ্বরেতা হতে পারেন। অবধূতগণের সন্তানধারণেও নিষেধ নেই। কারণ উর্ধ্বরেতা সাধন অবধূতি নাড়ি খোলার উপসাধনা বা প্রস্তুতি। উদাহরণ শিব, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ। কৌলক্রম নাথসম্প্রদায়ের আবশ্যিক সাধনা। কৌলের কুল রাখতেই অনেকে অবধূত মৎস্যেন্দ্রনাথের মত সন্তান ধারণ করেছেন। ৮৪

নাথসিদ্ধদের মধ্যে অধিকাংশই যুগল শিবস্বরূপ। যোগিনীক্রম নাথক্রমেরই প্রকৃতিক্রম।^{৯৬} অর্থাৎ নাথসম্প্রদায়ে গুরু থেকেই সন্ন্যাসী ও গৃহস্থধারা সমান্তরালভাবে চলে আসছে। অন্যদিকে নাথপন্থের ১২ পন্থের অন্যতম পন্থ আইপন্থ বা আদিনাথপন্থেও গৃহস্থ পরম্পরা ছিল। এই পন্থের প্রবর্তক ছিলেন বিমলা শক্তি, তাঁকে নাথপন্থে ‘আই’ বা মা বলা হয়। বিমলামাতার দুই সন্তান হলেন যোগী ভুসকাই নাথ ও কনকাই নাথ। বিমলামাতার যোগসিদ্ধপীঠ ছিল পূর্ববঙ্গের নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ‘যোগীরঘোপা’ মঠে। এখনো এখানে ভগ্নপ্রায় বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে বিমলামাতার পৃথক মন্দির রয়েছে।^{৯৭} গোরক্ষনাথ পুরনো সিদ্ধ-পরম্পরা অনুসারে পাঁচপ্রকার গুরুকুল-সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। যোগজ্ঞানের মহাপোদেশক সিদ্ধগুরুদের সন্তান (বংশ) হিসেবে পরম্পরা নির্ণয় করা হয়েছে। সেখানে প্রথম পরম্পরাই হল আই-পরম্পরা। আইনাথের সঙ্গে উদয়নাথ পার্বতীর সম্বন্ধ রয়েছে। আই শিষ্যদের আই-সন্তান বলা হয়।^{৯৮} গোরক্ষনাথ ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে গৃহস্থ যোগী সম্পর্কেও বলেছেন—

‘গৃহিণী পূর্ণতা নিত্য গেহং ব্যোম সদাচলম্।

যন্তয়া নিবসত্যত্র গৃহস্থঃ সোভিধীয়তে।।’^{৯৯}

অর্থাৎ অবধূত যোগী গৃহহীন, পুণ্যাত্মা বা যোগসাধনায় যখন নিত্য যুক্ত থাকেন তখন তাঁকে ‘গৃহস্থ’ বলা হয়। অথও ব্রহ্মস্বরূপে তাঁর চিরসঙ্গিনী গৃহধর্মিণী হন। সর্বব্যাপক, শূন্য (আকাশ) তাঁদের চির-নিবাসস্থল হয়। অথবা তিনি ব্রহ্মে স্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। অনেকে মনে করেন নাথপন্থে শিবযোগীদের প্রাচীন পরম্পরা আদিনাথ পরম্পরা। আদিনাথ থেকে নাগার্জুন নাথ পর্যন্ত এই পরম্পরা ছিল, তারপর নবনাথ পরম্পরা শুরু হয়েছে।^{১০০} অন্যদিকে নাথসন্ন্যাসীদের খাদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাঁরা ‘গোরক্ষসংহিতা’ উল্লিখিত খাদ্যতালিকা মেনে চলেন। সেখানে যোগীদের রুচিশীল আহারের দীর্ঘ ও বিস্তৃত পরিচয়

যায়।^{১০১} নাথসম্প্রদায়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত আছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা শুদ্ধমার্গী তাঁরা নিরামিষভোজী এবং সাত্ত্বিকাচারে চলেন। যাঁরা অঘোরমার্গী তাঁদের জন্য খাদ্যাভ্যাসের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই, তাঁরা যখন যে সাধনা করেন সেই অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেন। তবে উভয়মার্গে পেঁয়াজ ও রসুনকে আমিষ খাবারের মধ্যে ধরা হয় না। এছাড়া নাথযোগীদের সমাধি প্রথার কারণে স্মার্ত-ব্রাহ্মণরা তাদের গ্রহণ করেননি বলে হলায়ুধ মিশ্র ‘সেখশুভোদয়া’ গ্রন্থে যোগীর কথোপকথনে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নাথেরা আদিবৈদিকযুগের মুনিধারার বলে সমাধিস্থ করেন। যোগমতে মুনিধারার মানুষের চরম মৃত্যু নেই। সেইজন্য মৃতকে দাহের প্রশ্ন ওঠে না। নাথসাহিত্যে ‘গোপীচন্দ্রের গান’-এ অবশ্য নাথযোগীর অগ্নিদাহ প্রথার প্রসঙ্গ রয়েছে। রাজমোহন নাথ লিখিত ‘নাথধর্মে বেদতত্ত্ব’ নামক একটি নিবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। সেখানে ‘বেদমালা’ নামে একটি পুঁথি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কাছাড়ে ২৫০-৩০০ বছর আগে নাথযোগীদের মধ্যে বেদের নানা তত্ত্বালোচনা চলত। যোগিতত্ত্বকলামতে নাথদের মধ্যে ছ’প্রকার বেদের প্রচলন ছিল—সামবেদ, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, নিল, অনিল ও সারবেদ। এই ষড়্বেদের তত্ত্বজ্ঞানেই যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করত।^{১০২} আহমেদ শরীফের মতে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজাত। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে ‘হুঙ্কার’ তথা ‘ওঁ-কার’ মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার গুরু হলেও, কুলবৃক্ষ ‘বকুল’, আভরণ ‘রত্নাক্ষ’, ও কানে ‘কড়ি’, অস্ত্রিক-দ্রাবিড়ের বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। গোরক্ষনাথ ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক, গোরক্ষনাথবাদিরাই নাথপন্থী। আর জালন্ধরনাথ ও কাহুপার

সম্প্রদায় বামাচারী-কাপালিক সম্প্রদায়। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। পা-পন্থী জালন্ধরনাথের লোকেরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষকামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোটচীনার প্রভাবে ‘নাথ’ হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন।^{১০০} গোরক্ষনাথ তাঁর ‘গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে নবনাথ সিদ্ধদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, উদয়নাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কূর্মনাথ, ভবনার্জিনাথ এবং গোরক্ষনাথ। তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁরা ঈশ্বরসন্তান, শিবাবতার, ব্রাহ্মণ, সূক্ষ্মবেদী, অদ্বৈত থেকে পরে, অলখ-নিরঞ্জন, সদানন্দ দেবতা, অনাহত-শৃঙ্গী এবং তাঁদের খেচরীমুদ্রা রূপ ছিল।^{১০৪} ‘নাথসূত্র’-তে বলা হয়েছে—

‘আচারে ব্রহ্ম বিচারে যোগিতি।

ব্রাহ্মণ আগত্যাচারং প্রবর্তিতবান্।

যোগী চাগত্য বিচারং প্রবর্তিতবান্।

যাবদ্ ব্রাহ্মণ আচারদ্বিচারং প্রাপ্ত স্তাবদ্যোগী ব্রহ্মপ্রাপ্ত ইতি।^{১০৫}

অর্থাৎ আচার-পালনে ব্রাহ্মণ এবং বিচারে (স্বরূপচিন্তা) যোগীর প্রাধান্য রয়েছে। ব্রাহ্মণ মূল-আচারের প্রবর্তন করেছেন অন্যদিকে যোগী মূল-বিচারের মহত্ত্ব দিয়েছেন। যখন ব্রাহ্মণ আচার পালন করতে করতে বিচার প্রাপ্ত হয়ে স্বরূপ-চিন্তায় তৎপর হন ততক্ষণে যোগী ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়ে যান।

গোরক্ষনাথের আবির্ভাব যে সময়ে, সেসময় ভারতীয় সাধনার মধ্যে এক বিরাত ওঠানামা চলছিল। একদিকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রবেশ শুরু হয়েছিল, আর অন্যদিকে বৌদ্ধসাধনা ক্রমশ মন্ত্রতন্ত্র, বাড়ফুঁকের দিকে চলে যাচ্ছিল। তবুও বৌদ্ধ, শৈব, শাক্তদের এক বিরাত অংশের মানুষ ব্রাহ্মণ ও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করতেন। এদের

পরবর্তী অনুগামীরা তাদের মার্গকে বেদসম্মত বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। এই সময়ে আবার অনেক শৈব এবং শাক্ত সম্প্রদায় ছিল যারা বেদাচারকে অত্যন্ত নিম্নমানের বস্তু বলে মনে করত এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করত। হিউয়েন সাঙের যাত্রাবিবরণে শৈব পাণ্ডপতদের বারো বার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। বাণভট্ট তাঁর ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থে পাণ্ডপত মতের আলোচনা করেছেন, আবার শঙ্করাচার্য তাঁর ‘শারীরকভাষ্য’(২/২/৩৭) এই মতকে খণ্ডন করেছেন। লিঙ্গপুরাণে পাণ্ডপত মতকে তিন প্রকারের বলা হয়েছে—বৈদিক, তান্ত্রিক এবং মিশ্র। বামনপুরাণে শৈবপাণ্ডপত, কালামুখ এবং কাপালিকদের উল্লেখ আছে। অনুশ্রুতি অনুসারে ২৮ শৈব আগম এবং ১৭০ উপআগম ছিল। এই আগমগুলিকে নিগম (অর্থাৎ বেদ)-র সমান বলে স্বীকার করা হয়েছে। কাশ্মীরের শৈবদর্শন এই আগমগুলির দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে নিগমের অর্থ বেদ বলে মানা হয় না। তান্ত্রিক ও যোগীরা তো উল্টো বা বিপরীত কথা বলতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এই ধরনের উল্টো বক্তব্যগুলির প্রচলিত নাম ছিল ‘সন্ধ্যাভাষা’। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রমাণ অনুসারে একথা মেনে নেওয়া যায় যে বেদ ও উপনিষদগুলির মধ্যেও এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা সন্ধ্যাভাষার মতই। ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যমত প্রবল হতে থাকে, ইসলামের আগমনে সমস্ত দেশ দুটি মাত্র প্রতিস্পর্ধী ধার্মিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন অধিকাংশ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ও বেদপ্রধান হিন্দুসমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিছু সম্প্রদায় মুসলমানও হয়ে যায়। দশম-একাদশ শতাব্দীর পরে ক্রমশ বেদের বাইরের সম্প্রদায়গুলি নিজেদের বেদ-অনুযায়ী সিদ্ধ করতে চেষ্টা করতে থাকে। শৈব ও শাক্তগণ উভয়েই এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিছু কিছু সম্প্রদায় এত বেশি বেদবিরোধী ছিল যে, সেই মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা কোনমতেই সম্ভব হয় না এবং তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যায়। গোরক্ষনাথ তাঁর যোগমার্গে এই

ধরনের অনেক মতের মিলন সাধন করেন। জালন্ধরনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণপাদ বা কানুপানাথের অনেক গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় তাঁরা বেদকে মানতেন না। এঁদের সকলের শিষ্য ও অনুগামীরা ভারতের ধর্মসাধনার এই বিক্ষুব্ধ যুগে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু যাদের আচরণ ও বিচারে অধিক পার্থক্য ছিল তাদের তিনি স্বীকার করেননি। শিব দ্বারা প্রবর্তিত যে সম্প্রদায়গুলিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেগুলি অত্যন্ত পুরাতন সম্প্রদায়। যে-সব শৈব ও শাক্তমার্গ বেদানুযায়ী ছিল তারা ব্রাহ্মণ প্রধান হিন্দু সমাজে মিশে গেল এবং নিজেদের বেদ অনুযায়ী সিদ্ধ করতে ব্যস্ত হল। গোরক্ষনাথ সম্ভবত এদের দুটি প্রধান দলে পেয়েছিলেন— ১. যারা যোগমার্গের অনুগামী ছিল কিন্তু শৈব বা শাক্ত ছিল না। ২. যারা শিব বা শক্তির উপাসক ছিল এবং শৈবাগমের অনুসারী ছিল, কিন্তু যোগমার্গের থেকে অনেকটা দূরে ছিল। এইভাবে দুই প্রকারের মার্গ থেকেই বহু সম্প্রদায় এসে গেল, যারা গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী হলেও এদেরকেও গোরক্ষপন্থী বলেই মানা হল। ধীরে ধীরে পরম্পরাগুলিও লুপ্ত হয়ে গেল, তখন সেই পুরনো সম্প্রদায়গুলির মূল প্রবর্তকদেরও গোরক্ষনাথের শিষ্য বলে ভাবা হতে থাকল। বিশেষত মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে নাথ এবং নিরঞ্জন পন্থ এইরকম টালমাটাল পরিস্থিতিতে নতুন পরিবেশের অনুকূলভাবে নিজেদের গঠন করতে থাকে। কোথাও তারা বৈষ্ণবরূপ গ্রহণ করে, অথবা কোথাও শৈবরূপ।^{১০৬} কিন্তু বাংলার নাথপন্থীযোগী বা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাত্য আর্থধারার চিহ্ন থাকতে পারার কথা থাকলেও তা উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকে। নাথপন্থীদের ব্রাহ্মণত্বের দাবি এবং ধর্মের গাজনের শিবের গাজনে রূপান্তর তারই ইঙ্গিত বহন করছে।^{১০৭} এই পর্বেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটল না। ১৯১১ খ্রি. সেন্সাসে বিভিন্ন জাতের আইনগত অযোগ্যতা

(disabilities) নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। সেখানে যোগীজাতির বিশেষত্ব সম্পর্কে বলা হয়—

১. তারা ব্রাহ্মণের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে (deny the supremacy of the Brahmins),
২. সৎব্রাহ্মণ তাদের কুলগুরু হয় না (are not served by good Brahmins as family priests),
৩. তারা পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণকে আদৌ ডাকে না (have no Brahman priests at all),
৪. তারা মৃতদেহ মাটিতে সমাধিস্থ করে (bury their dead), ইত্যাদি।^{১০৮}

ব্রাহ্মণ জাতির সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে যে হিন্দু তাদের হাসিমুখে ব্রাহ্মণ অভ্যর্থনা জানাবে এমন উদারতা আশা করা যায় না। প্রথম কারণটি থেকেই যোগীদের সমস্ত দুর্গতি শুরু— এ নিয়ে দ্বিমত হবার কথা নয়। তাসত্ত্বেও নাথসম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ্যধারার কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না—

It is significant that it was not the Brahman priests who either refused to officiate at the ritual functions of the Nath people here, or were not in use, but the Nathas themselves who, as a result of the imposition of the Bengal system on them during the colonial period through the *Assam-Banga Yogi Sammilani*, had abolished the Brahmin or *varna*-priesthood in preference to engaging their community priests.^{১০৯}

অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—

Nathism gradually developed its distinctive character, and the transition seems to have been over by 13th century. The followers of Nathism, in course of time, lost their monastic character and were affiliated to Hindu society as a separate caste.^{১১০}

যোগীরা বুদ্ধের অনুগামী ছিল ভেবে ব্রাহ্মণরা মনে করত যে তারা ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অস্বীকার করছে। বুদ্ধের অনুসারী ভেবে ব্রাহ্মণরা যোগীদের সঙ্গে বিরোধের অবস্থান নিয়েছিলেন। বুদ্ধের অনুসারীকে ব্রাহ্মণ কেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এটা তারা ভাবতে পারেননি।^{১১১} গেইটের সেন্সাস রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—

They were possibly Buddhists. If so, their degraded position might easily be due to their having remained with that faith after the general population had reverted to Hinduism.^{১১২}

অর্থাৎ হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ব্রাহ্মণের শংসাপত্র বা কৃপাদৃষ্টি ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেও দরকার ছিল। তাসত্ত্বেও আজও নাথসম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অস্বীকার করে আদিবৈদিক যুগের পুরোহিত শ্রেণি হিসেবে নিজেদের পূজো-অর্চনা নিজেরাই করে থাকে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমীর কতকগুলি সামাজিক আচার-আচরণের প্রাবল্য ও যৌক্তিকতা লক্ষ করে নাথযোগী সম্প্রদায় তাদের সমাজব্যবস্থাকে সচল রাখতে দশবিধ-সংস্কারের কতকগুলি বিধান গ্রহণ করেছে। যেমন— দেবদেবীর পূজো, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের কয়েকজনকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করা। পশ্চিম ও উত্তরভারতে এইরূপ পৌরোহিত্য কাজে যুক্ত নাথযোগীকে ‘জঙ্গম’ বলা হয়। সমাজব্যবস্থাকে অচলাবস্থায় না রেখে যথাসম্ভব সচল রাখার কাজই তারা করে চলেছেন। সুতরাং আদিবৈদিকযুগের মুনিধারার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে তবেই নাথযোগীর সামাজিক স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব হবে।^{১১৩} তবে নাথকৌল সন্ন্যাসীরা নিজেদের বৈদিক বলতে দ্বিধাবোধ করেন। স্মার্তকৌল কথাটি তাঁদের কাছে সোনার পাথরবাটির মত ব্যাপার। নাথ-অঘোরী শৈবকৌল সম্প্রদায়। কৌলরা পঞ্চকুলের সাধনা করেন। তন্ত্রে ৩৬টি তত্ত্ব আছে, যেগুলি যোগধারার সঙ্গে যুক্ত বিষয়। এইসময়ে নাথসাধন-ক্রমের সঙ্গে

যোগযোগ না থাকার কারণে গৃহস্থ নাথেদের একটা অংশ ব্রাহ্মণ্য বা বৈষ্ণবধারাকে আশ্রয় করে সামাজিক অস্তিত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের সঙ্গে নাথ দর্শনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। নাথযোগী অস্তিবাদি, বৌদ্ধ নাস্তিবাদি। নাথযোগী মনে করে শূন্য থেকেই সত্তা বা বোধজ্ঞান উৎপন্ন হয়—

‘শূন্যাৎ সত্তামাত্রমুৎপন্নম্।’^{১১৪}

আবার শূন্য পঞ্চগুণাত্মক—

‘নীলতা, পূর্ণতা, উন্মী, লোলতা, মূর্ছতা।’^{১১৫}

গ্রাম্য নাথসাধকও বলেছেন—

‘নাই দিবা নাই রাত্রি নাই রবি শশী।

তিমির-ভঞ্জন রূপ নাথ অবিনাশী।।’^{১১৬}

অর্থাৎ বৌদ্ধ যাকে বলেছে সর্বহীন, শূন্য, নাথ তাকে বলেছে সর্বময় পূর্ণ। আবার নাথযোগীগণ মনে করেন বিন্দু থেকে সৃষ্ট জীবের প্রাণ স্থূলদেহ ত্যাগ করে পুনরায় বিন্দুতে মিশে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার ক্রিয়া শুরু করে। তার মধ্যে কোন থেমে যাওয়ার ভাব আসে না। এই অবস্থারই নাম ‘নাথ’ অবস্থা। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই সে ‘নাথ’। এই সম্পর্কে গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘মরৌরে যোগী – মরণা হৈ মিঠা,

তিস্ মরণী মরৌ জিস্ গোরখ দিঠা।

জীবিত মরিয়া মরি জীয়াবা,

অমী মহারস ভরি ভরি পিয়াবা।।’^{১১৭}

আবার—

‘মরণ মিঠা রে যোগি! মর-মর-মর।

যে মরণ মরিয়া গোর্খ অজর, অমর।।’^{১১৮}

অর্থাৎ প্রাণবায়ু চলতে থাকলে মনের বৃত্তিগুলিও চলতে থাকে। আর প্রাণবায়ু স্থির হয়ে গেলে মানসিকবৃত্তি প্রবাহও স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন সাধকযোগী সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন।

সমাধিতে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দেহ নিথর নিষ্পন্দ ও স্থির হয়ে থাকে। জীবনের কোনও লক্ষণও থাকে না। তাকেই যোগী গোরক্ষনাথ বলেছেন মরণ। এ মরণ বড় মিঠা। বাইরে বেঁচে থাকার সমস্ত লক্ষ্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। অথচ সিদ্ধযোগীর অন্তর্জগৎ চিরজাগ্রত থাকে। সেখানে সিদ্ধযোগী মহানন্দে নিমগ্ন থাকেন। আত্মজ্ঞানস্বরূপ অমৃতপান করে সিদ্ধযোগী অমরত্ব লাভ করেন। এই অমরত্বের স্বাদ পেয়ে সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথ সমাধিরূপ মরণের এতটা প্রশংসা করেছেন।

বৈদিক আর্থভাবনায় দু’টি চিন্তাধারা এখানে কাজ করেছে—একটি পুনর্জন্ম রোধ করা, অপরটি মৃত্যুকে রোধ করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া। পরেরটি নাথ সম্প্রদায়ের যোগধারার সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনমুক্তিবাদ। কঠোপনিষদে নচিকেতা সজ্ঞানে যমরাজের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুরোধ-বিদ্যা লাভ করেছিলেন—

‘মৃত্যুপ্রোক্তাং বিদ্যাং যোগবিধিং চ কৃৎসন্ম
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূৎ বিমৃত্যুঃ।’^{১১৯}

কঠোপনিষদের কথায় গোরক্ষনাথের উপরোক্ত বাণীতে স্পষ্ট হয়েছে। একই ভাবনার পরিচয় মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের দোহাতেও লক্ষ করা যায়—

‘কমল বিকশিল কহি হ ন জোমরা।
কমলমধু পিবি ধোকে না ভোমরা।।’^{১২০}

ভর্তৃহরিনাথের শবদীতেও একই কথার প্রতিধ্বনি ঘটেছে—

‘প্রথম বৈরী অহঙ্কার পুষ্প বৈরী ভোমরা।
রাজা ভর্তৃহরি বলে পিণ্ডবৈরী জোমরা।।’^{১২১}

অন্যদিকে রাণী ময়নামতী সশরীরে যমরাজের বাড়িতে গিয়ে স্বামী রাজা মাণিকচন্দ্রের প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং যমরাজকে পর্যদস্ত করেন। তখন শিব তাঁকে বলেন—

‘শিব বলে শোন মএনা বাক্য আমার ন্যাও।

তুমি জ্যামন আইছ আমার জমপুরিক নাগিয়া।

এই মত নরলোকে আসিবে সাজিয়া।

আপনা আপনি জিউ নি জাইবে ফিরিয়া।^{১২২}

এই কথার মধ্যেও বেদ-উপনিষদ এবং নাথধর্মের ধর্মসাধন তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব নাথধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ বা অহিন্দু নয়, হিন্দুধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিই ছিল বলা যায়। ড. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় মনে করেন একাদশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক শৈবসাধনা ও বৌদ্ধসাধনার মধ্যে সাধনবিষয়ে পর্যাপ্ত আদানপ্রদান চলত। অদ্বয়বজ্রের সংগ্রহ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৌদ্ধরা হিন্দুতান্ত্রিক বা শৈবদের সাধনাপ্রণালী ও শব্দাবলী গ্রহণ করেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ থেকে বোঝা যায় যে শৈবতান্ত্রিকরাও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনপ্রণালী ও শব্দাবলী গ্রহণ করেছে। গোরক্ষনাথ অপেক্ষা মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌল সাধনপ্রণালী বৌদ্ধরা অধিক গ্রহণ করেছে। কৌলসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধনার বেশি মিল রয়েছে।^{১২৩} অন্যদিকে অতুল সুর মনে করেন প্রাক্-আর্য ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। এসব ধর্মের লোকেদের অধিকাংশই পরে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী হয়ে গিয়েছিল।^{১২৪} এর কারণ স্বরূপ বলা যায় বুদ্ধদেবের দুঃখবাদে ক্লান্ত হয়ে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে উপনিষদের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

নাথসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য পন্থবিভাগ। অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী ‘নাথ-যোগ’ গ্রন্থের (১৯৬৮ খ্রি.) ১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন শঙ্করাচার্যকৃত সন্ন্যাসীর যেমন ১০ শাখা তেমনি গোরক্ষপন্থী যোগীর ১২ শাখা। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে পন্থ বিভাগ প্রচলিত ছিল। খ্রি. প্রথম শতকে উদ্ভূত লাকুলীশ পাণ্ডপত শৈবধারা ৫৫০-৯০০ খ্রি. মধ্যে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে। লাকুলীশের চারশিষ্য- কুশিক, গর্গ, কৌরিশ ও মিত্রের নামে চার শৈবসম্প্রদায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মৎস্যেন্দ্রনাথ

‘শাবরচিত্তামণিঃ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তিনি গৌড়, কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও গুজর দেশের ৫ রাজাকে শিষ্য করেন। ‘কদলী-মঞ্জুনাথ-মাহাত্ম্য’ গ্রন্থ অনুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর বারোপুত্রকে বারোটি রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেইসূত্রে মৎস্যেন্দ্রনাথই নাথ সম্প্রদায়ের বারোপুত্রের সৃষ্টি করেছেন বলা যায়।^{১২৫} ‘শাবরচিত্তামণিঃ’ গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথ ১৮ জন সিদ্ধগুরু ও ১০ জন কৌলসিদ্ধর নাম উল্লেখ করেছেন-

সিদ্ধগুরু:

১. শ্রীবিশ্বপাদ, ২. শ্রীবিচিত্রপাদ, ৩. শ্রীশ্বেতপাদ, ৪. শ্রীভট্টপাদ, ৫. শ্রীমচ্ছেন্দ্রপাদ ৬. শ্রীবৃহিষপাদ ৭. শ্রীবিদ্যাপাদ ৮. শ্রীশবরপাদ ৯. শ্রীমহেন্দ্রপাদ ১০. শ্রীচন্দ্রপাদ ১১. শ্রীহিড়িম্বপাদ ১২. শ্রীসমুদ্রপাদ ১৩. শ্রীলবণপাদ ১৪. শ্রীদুম্বরপাদ ১৫. শ্রীদেবপাদ ১৬. শ্রীধীবরপাদ ১৭. শ্রীসিংহাসনপাদ ১৮. শ্রীওগিনীপাদ।

কৌলগুরু:

১. মৃষিপাদ, ২. অপতারপাদ, ৩. সূর্যপাদ, ৪. দ্যুতিপাদ, ৫. ওমপাদ ৬. ব্যাঘ্রপাদ, ৭. হরিণিপাদ, ৮. পঞ্চশিখিপাদ, ৯. কোমলপাদ, ১০. লম্বোদরাপাদ।^{১২৬}

‘নিত্যাহ্নিকতিলকম্’ গ্রন্থে ২৬ নাথসিদ্ধের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা সকলেই কৌলসিদ্ধ। তাই মনে হয় নাথযোগীরা ১৮+১০ অর্থাৎ ২৮ পক্ষে বিভক্ত ছিলো।^{১২৭} ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নাথ সম্প্রদায়ের যে মত উল্লেখ রয়েছে তাকে ‘নাথোক্ত’ অর্থাৎ নাথদ্বারা কথিত বলা হয়েছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক প্রচলিত শব্দ হল সিদ্ধমত (গোরক্ষ - সিদ্ধান্ত- সংগ্রহ, পৃ. ১২), সিদ্ধমার্গ (যোগবীজ), যোগমার্গ (গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ২১), যোগ সম্প্রদায় (ঐ, পৃ. ৫৯), অবধূতমত (ঐ, পৃ. ১৯), অবধূত সম্প্রদায় (ঐ, পৃ. ৫৬) ইত্যাদি। এই মতে যোগমত, যোগ সম্প্রদায়ের নাম তো সার্থক। কারণ এর প্রধান ধর্মই হল যোগাভ্যাস।^{১২৮}

শুরুতে নাথপন্থে ১৮ পন্থ বা শাখা ছিল। তখন তাঁরা ‘শিবযোগী’ বলে পরিচিত ছিলেন। গোরক্ষনাথ নাথসম্প্রদায়কে ২ শাখায় এবং ১২ পন্থে বিভক্ত করেন। প্রথম ৬ পন্থ শিবযোগী ও দ্বিতীয় ৬ পন্থ গোরক্ষযোগী। পুনর্গঠিত ১২ সম্প্রদায় এই প্রকার—

ক্রমিক সংখ্যা	যোগেশ্বর শিব প্রবর্তিত ৬ পন্থ	গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত ৬ পন্থ
১	কণ্ঠরনাথ (কচ্ছ ভুজ)	হেঠনাথ
২	পাগলনাথ (পেশোয়ার) আইপন্থ	চোলীনাথ
৩	রাওল (আফগানিস্তান)	কপিলানী চাঁদনাথ
৪	বৈরাগপন্থ (মারওড়ার)	রতননাথ বা বৈরাগ্যপন্থ
৫	পা বা পাওপন্থ (জয়পুর)	বন (মারওয়ার)
৬	রামপন্থ বা পঙ্খ।	ধ্বজপন্থ

এসব শাখার অনেক উপশাখাও রয়েছে। বারোপন্থের বাইরে এমন এমন সম্প্রদায় রয়েছে যেগুলির সঙ্গে এই ছয়পন্থের কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায় না। আবার গোরক্ষনাথের দ্বারা ভেঙে দেওয়া কিছু পন্থের লোকেরা শিব বা গোরক্ষনাথের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্কে জড়িত রয়েছে।

কিন্তু বারোপন্থের বাইরেও অনেক পন্থ আছে। বর্তমানে বারোপন্থ বলতে বোঝানো হয়— ১) সত্যনাথ, ২) ধর্মনাথ (ধরমনাথ), ৩) দরিয়ানাথ বা নটেশ্বরী, ৪) আইপন্থ, ৫) কপিলানী, ৬) গঙ্গানাথ, ৭) মান্নাথী পন্থ, ৮) রাওয়াল বা নাগনাথ ৯) পা বা পাও পন্থ, ১০) পাগলপন্থ, ১১) বৈরাগ্ বা ভর্তৃহরিনাথ ও ১২) রামনাথ।

সংখ্যা	নাম	প্রবর্তক	স্থান	প্রদেশ	বিশেষত্ব
১	সত্যনাথী	সত্যনাথ	পাতাল ভূবনেশ্বর	ওড়িশা	সত্যনাথ স্বয়ং ব্রহ্মা।

২	ধর্মনাথী	ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির	দুহ্লুদেলক	নেপাল	--
৩	রামপন্থ	শ্রীরামচন্দ্র	পঞ্চরা	গোরখপুর ইউ পি	--
৪	নটেশ্বরী বা দরিয়াপন্থ	লক্ষ্মণ	গোরখটিলা	ঝিলম পাঞ্জাব	নটেশ্বরী বা দরিয়াপন্থ
৫	কন্থড়	গণেশ	মানফরা	কচ্ছ গুজরাট	--
৬	কপিলানী	কপিলমুনি	গঙ্গাসাগর	পশ্চিমবঙ্গ	দমদম গোরক্ষবংশী
৭	বৈরাগপন্থ	ভর্তৃহরি	রতদোণ্ডা	আজমের রাজস্থান	--
৮	মাননাথী	গোপীচন্দ্র	অজ্ঞাত	--	যোধপুর মহামন্দির
৯	আইপন্থ	যোগিনী বিমলা	যোগীগুফা	নওগাঁ বাংলাদেশ	--
১০	পাগলপন্থ	চৌরঙ্গীনাথ	অবোহর	পাঞ্জাব	--
১১	ধ্বজপন্থ	হনুমান	--	--	--
১২	গঙ্গানাথী	পিতামহ ভীষ্ম	জখবার	গুরুদাসপুর পাঞ্জাব	--

শঙ্করাচার্যের বহুপূর্বে পন্থবিভাগ ও গুরুপরম্পরা লাকুলীশ ও পাশুপত শৈবধারায় প্রচলিত ছিল। গোরক্ষপুরে শোনা যায় পরম্পরা অনুযায়ী ৪ নং নটেশ্বরীপন্থ, ৫ কন্থড়, ৮ মননাথী, ৯ আইপন্থ, ১০ পাগলপন্থ। উপরের নামগুলি বিবেচনা করার সময় দুটি তালিকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল একটি শাখা হলে দ্বিতীয়টি অনুসরণকারী শাখা। ১৩ নং গুরুত্বপূর্ণ পন্থ হল কানিফানাথ বা কানুপানাথের পন্থ।^{১৩১} এখন রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে পাও পন্থ অর্থাৎ জালন্ধরনাথ এবং গোপীচন্দ্রনাথের পরম্পরার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমে পা-পন্থ নামে এই পন্থ পরিচিত ছিল এবং নাথপন্থ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। জালন্ধরনাথের পা-পন্থ, মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌল এবং গোরক্ষনাথের পরম্পরা আলাদা ছিল। জালন্ধরনাথ অঘোর, মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ কানফাটা ছিলেন। বর্তমানে জালন্ধরনাথের সম্প্রদায় গোরক্ষনাথ দ্বারা প্রবর্তিত পাওনাথী শাখার অন্তর্গত। কিন্তু কানিফানাথ বা কানুপানাথের সম্প্রদায় জালন্ধরনাথের সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে

এবং এঁরা নিজেদের গোপীচন্দ্রনাথের অনুবর্তী ভাবেন। তবে কানিফানাথ বা কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদের সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে বামমার্গের সম্বন্ধ রয়েছে। নাথপন্থে এর বাইরেও অতিরিক্ত অনেক পন্থ রয়েছে। কিন্তু যেগুলির সঙ্গে বড়ো শাখার তেমন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এর বাইরে নাথপন্থে যে পন্থ বা শাখাগুলি রয়েছে—

১. কায়িকনাথী ২. পায়লনাথী ৩. উদয়নাথী ৪. আরয়পন্থী ৫. ফীলনাথী ৬. চপটনাথী ৭. গৈনী বা গহিনীনাথী ৮. নিরঞ্জননাথ ৯. বরংযোগী ১০. পা-পন্থ ১১. কামভজ ১২. কাষায় ১৩. অর্ধনারী ১৪. নায়রী ১৫. অমরনাথ ১৬. কুস্তীদাস ১৭. তারকনাথ ১৮. অমাপন্থী ১৯. ভূগনাথ ইত্যাদি উপশাখা ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।^{১৩২}

অতিপ্রাচীন যুগে নাথযোগীরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। একদলে ১২ এবং অন্যদলে ১৮ শাখা বা পন্থ অর্থাৎ মোট ৩০ পন্থ বা শাখা ছিল। এখনও দক্ষিণভারতে— ১২-১৮ দলিচা, ১২-১৮ কটপুজো, ১২-১৮র ৬/৬ পঞ্চ, প্রমুখ ১২-১৮র ১-১ মোহান্ত কথা প্রচলিত আছে। তারমধ্যে ১৮ পন্থীরা শিবযোগী এবং ১২ পন্থীরা গোরখ-যোগী বলে পরিচিত ছিলেন। ঋগ্বেদে দীক্ষাকালীন শিঙ্গীধারী শিবযোগীদের (বিষাণিনঃ শিবাসঃ—৭/১৮) উল্লেখ আছে। কালক্রমে শিবযোগীদের ছয় এবং গোরক্ষযোগীদের ছয় পন্থ সম্মিলিত হয়ে বারপন্থের সৃষ্টি হয়। শিবযোগীদের লুপ্ত বারপন্থের কয়েকটি পন্থ নতুন বারপন্থে মিলিত না হয়ে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখেন। রতননাথ নামে একজন সিদ্ধযোগী কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পাঞ্জাব অঞ্চলে মুসলমানদের যোগধর্মে দীক্ষা দিয়ে নাথপন্থ ভুক্ত করেছিলেন। এঁদের আধাপন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়, এঁরা রতননাথপন্থী। এই হিসেবে নাথদের সাড়ে বার-পন্থ।^{১৩৩}

জি. ডব্লু. ব্রিগস তাঁর গ্রন্থে বারপন্থের দুটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। প্রথম তালিকাটি নিম্নরূপ—

১. কহুড়নাথ ২. পাগলনাথ ৩. রাবলনাথ ৪. পঙ্কনাথ ৫. বাণনাথ ৬. গোপালনাথ ৭. হেটনাথ ৮. কলিনাথ (আইপন্থ) ৯. বৈরাগনাথ (ভর্তৃহরিনাথ) ১০. পাবনাথ ১১. চান্দনাথ ১২. ধৈর্যনাথ।^{১৩৪}

দ্বিতীয় তালিকাটি এইরকম—

১. সৎনাথ ২. রামনাথ ৩. ধর্মনাথ ৪. লক্ষ্মণনাথ ৫. ধৈর্যনাথ ৬. গঙ্গানাথ ৭. বৈরাগ বা ভর্তৃহরিনাথ ৮. রাবলনাথ বা নাগনাথ ৯. জালন্ধরীনাথ ১০. আইনাথ ১১. কপিলানী ১২. ধ্বজনাথ ১৩. কানিপা।^{১৩৫}

নাথপন্থের ‘অথ বারপন্থ’-র পুথি অনুসারে শ্রীহট্ট (পূর্ববঙ্গ) জেলায় নাথসম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত বারপন্থ প্রচলিত ছিল—

১. আদিনাথ ২. পাগলনাথ ৩. গোরক্ষনাথ ৪. খাপরনাথ ৫. সৎনাথ ৬. বালানাথ ৭. গলেনাথ ৮. বিরূপাক্ষনাথ ৯. ভৈরঙ্গনাথ ১০. আইনাথ ১১. খেচরনাথ ১২. রামচন্দ্রনাথ।^{১৩৬}
অসমের কাছাড় জেলায় প্রচলিত নাথসম্প্রদায়ের বারপন্থের নামের তালিকা রাজমোহন নাথ উল্লেখ করেছেন—

১. আদিনাথ ২. মীননাথ ৩. গোরক্ষনাথ ৪. খাপরনাথ ৫. সৎনাথ ৬. বালকনাথ ৭. গোলকনাথ (গলেনাথ) ৮. বিরূপাক্ষনাথ ৯. ভর্তৃহরিনাথ ১০. আইনাথ ১১. খেচরনাথ ১২. রামচন্দ্রনাথ।^{১৩৭}

নাথপন্থে তিননাথ, নবনাথ বা নয়নাথ, চৌষট্টি-যোগিনী ও চুরাশিসিদ্ধ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—

তিননাথ:

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ।

নবনাথ বা নয়নাথ:

গোরক্ষনাথ তাঁর ‘গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থে নবনাথ বা নয়নাথের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন-

- ১) আদিনাথ,
- ২) মৎস্যেন্দ্রনাথ,
- ৩) উদয়নাথ,
- ৪) দণ্ডনাথ,
- ৫) সত্যনাথ,
- ৬) সন্তোষনাথ,
- ৭) কূর্মনাথ,
- ৮) ভবনার্জিনাথ এবং
- ৯) গোরক্ষনাথ।^{১৩৮}

নাথসম্প্রদায়ের ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থে নাথপন্থের বহু সিদ্ধযোগীর নাম পাওয়া যায়। নাথসম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেন এই সিদ্ধযোগীরা আজও জীবিত আছেন। তাঁরা কালদণ্ড খণ্ডন করতে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছেন। হঠযোগ-প্রদীপিকা অনুসারে তাঁদের নাম হল যথাক্রমে—

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্তুনভৈরব, সিদ্ধবোধ, কণ্ঠহীননাথ, কোরটকনাথ, সুরানন্দ সিদ্ধপাদ, চপটিনাথ, কাণেরীনাথ, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জননাথ, কাপালিনাথ, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়নাথ, অক্ষয়নাথ, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলিনাথ, টিপ্পিনীনাথ, ভল্লরিনাথ, নাগবোধ এবং চণ্ডকাপালিক। এইসব নামের বিভিন্ন অনুশ্রুতি লক্ষ করা যায়। কিছু নাম তান্ত্রিক, কিছু যোগী এবং কিছু নির্গুণসত্ত্ব পরম্পরায় যুক্ত। কিছুজনের সহজযানী এবং বজ্রযানী সিদ্ধদের সঙ্গে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়।^{১৩৯} ‘মহার্গব তন্ত্র’ গ্রন্থে নবনাথদের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন

ন্যাসের বিধান রয়েছে। এরপর নবনাথদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কাপালিকদের বারোজন শিষ্যের আলোচনা প্রথমে করে শেষে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’-র সিদ্ধযোগীদের সঙ্গে অভিন্ন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত নবনাথসিদ্ধরা হলেন—

১. গোরক্ষনাথ,
২. জালন্ধরনাথ,
৩. নাগার্জুন,
৪. সহস্রার্জুন,
৫. দত্তাত্রেয়,
৬. দেবদত্ত,
৭. জড়ভরত,
৮. আদিনাথ,
৯. মৎস্যেন্দ্রনাথ।^{১৪০}

‘যোগিসম্প্রদায়বিষ্কৃতি’ গ্রন্থে বলা হয়েছে নবনারায়ণ নবনাথ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু এটা এখানে লেখা নেই নারায়ণ কোন রূপ ধারণ করেছিলেন। এটাও উল্লেখ নেই গোরক্ষনাথের অবতার কোনো নারায়ণ নিয়েছেন কিনা। স্বয়ং ভগবান মহাদেব নাথরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু যোগী চন্দ্রনাথ লিখেছেন শিবই গোরক্ষনাথকে নবনাথ রূপে আবির্ভূত হতে সাহায্য করেছেন। সেখানে নবনাথের তালিকায় গোরক্ষনাথের নাম নেই। যাঁরা নারায়ণ অবতার রূপ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

সংখ্যা	নারায়ণ অবতার	নাথসিদ্ধ-এর নাম
১	কবিনারায়ণ	মৎস্যেন্দ্রনাথ
২	করভাজননারায়ণ	গহিনীনাথ
৩	অন্তরীক্ষনারায়ণ	জ্বালেন্দ্রনাথ(জালন্ধরনাথ)

৪	প্রবুদ্ধনারায়ণ	করণিপানাথ(কানুপানাথ)
৫	আবির্হোত্রনারায়ণ	নাগনাথ
৬	পিপ্পলায়ননারায়ণ	চপটিনাথ (চপটি)
৭	চমসনারায়ণ	রেবননাথ
৮	হরিনারায়ণ	ভর্তৃনাথ(ভর্তৃহরিনাথ)
৯	দ্রুমিলনারায়ণ	গোপীচন্দ্রনাথ।

১৪১

‘সুধাকর চন্দ্রিকা’ গ্রন্থ অনুসারে নবনাথ-সিদ্ধ হলেন—

১. একনাথ
২. আদিনাথ
৩. মৎস্যেন্দ্রনাথ
৪. উদয়নাথ
৫. দণ্ডনাথ
৬. সত্যনাথ
৭. সন্তোষনাথ
৮. কূর্মনাথ
৯. জালন্ধরনাথ।^{১৪২}

নেপালের পরম্পরায় একেবারে ভিন্ন নাম নবনাথের তালিকায় গণ্য করা হয়েছে—

১. প্রকাশ
২. বিমর্শ
৩. আনন্দ
৪. জ্ঞান
৫. সত্য
৬. পূর্ণ
৭. স্বভা

৮. প্রতিভা

৯. সুভগ^{১৪০}

রাজস্থানের যোধপুর থেকে হস্তলিখিত পুথিতে নবনাথের যে তালিকা পাওয়া গিয়েছে তা হল—

১. মৎস্যেন্দ্রনাথ

২. গোরক্ষনাথ

৩. তিরপটনাথ

৪. চিরপটনাথ

৫. চৌরঙ্গীনাথ

৬. বালকনাথ

৭. পৃথিনাথ

৮. চাণকনাথ

৯. দেবলনাথ।^{১৪৪}

উপরের নবনাথ তালিকায় রাজস্থানের নাথ পরম্পরায় জালন্ধরনাথ এবং ‘সুধাকর চন্দ্রিকা’য় গোরক্ষনাথের উল্লেখ নেই। ভিন্ন ভিন্ন পরম্পরা সূচি থেকে মনে হয় বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সিদ্ধদের তৎপরতা ও কার্যধারার উপর ভিত্তি করে সেসব অঞ্চলে নবনাথের সূচি তৈরি হয়েছে। এইসব তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে সাধারণ নাম হল— আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, জালন্ধরনাথ এবং গোরক্ষনাথ। তান্ত্রিকসিদ্ধ ও বজ্রযানী-সহজযানী তিব্বতী পরম্পরায়ও এই নামগুলি লক্ষ করা যায়। ‘ললিতা সহস্র নাম’-এ তিনপ্রকার গুরুর কথা বলা হয়েছে— দিব্য, সিদ্ধ ও মানবগুরু। (পৃ.১২) ‘তারারহস্য’ তে দু’প্রকার গুরুর উল্লেখ আছে— দিব্য ও মানবগুরু। প্রথম শ্রেণিতে চার এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে আটজন গুরু আছেন। মানব দিব্যগুরু হলেন—

১. উর্দ্ধকেশানন্দনাথ

২. ব্যোমকেশানন্দনাথ

৩. নীলকণ্ঠানন্দনাথ

৪. বৃষধ্বজানন্দনাথ।

মানবগুরুগণ হলেন—

১. বশিষ্ঠ

২. মীননাথ

৩. হরিনাথ

৪. কুলেশ্বর

৫. বিরূপাক্ষ

৬. মহেশ্বর

৭. সুখ

৮. পারিজাত।

কেবল মীননাথ নাথপন্থে পরিচিত নাম। অন্যান্য তন্ত্রে যে মানবগুরুদের নামের উল্লেখ

রয়েছে তাঁদের অনেকেই নাথসিদ্ধ।

‘কৌলাবলী তন্ত্র’ মতে ১২ মানবগুরু আছেন—

১. বিমল

২. কৃশর

৩. ভীমসেন

৪. মীন

৫. গোরক্ষ

৬. ভোজদেব

৭. মূলদেব

৮. রক্তিদেব

৯. বিপ্লেশ্বর

১০. হুতাসন

১১. সমরানন্দ

১২. সন্তোষ।

‘শ্যামারহস্য’ গ্রন্থেও প্রায় একইপ্রকার নামই দেখা যায়—

১. বিমল
২. কৃশর
৩. ভীমসেন
৪. সুধাকর
৫. মীন
৬. গোরক্ষ
৭. ভোজদেব
৮. প্রজাপতি
৯. কুলদেব
১০. বৃন্তিদেব
১১. বিশ্বেশ্বর
১২. হ্তাসন
১৩. সন্তোষ
১৪. সমানন্দ ^{১৪৫}

জি. ডব্লু. ব্রিগস-র মতে নবনাথ-সিদ্ধগণ হলেন—

১. আদিনাথ
২. শৈলনাথ
৩. সন্তোষনাথ
৪. অচল অচম্বনাথ
৫. গজবলী গজকস্থানাথ
৬. প্রজানাথ অথবা উদয়নাথ
৭. মৎস্যেন্দ্রনাথ
৮. গোরক্ষনাথ
৯. চৌরঙ্গীনাথ ^{১৪৬}

‘স্কন্দপুরাণ’ মতে নবনাথসিদ্ধ হলেন—

১. আদিনাথ
২. ভবনাথ
৩. সত্যনাথ
৪. সন্তোষনাথ
৫. মৎস্যেন্দ্রনাথ
৬. কূর্মনাথ
৭. গোপীনাথ
৮. গোরক্ষনাথ
৯. অজ্ঞাত^{১৪৭}

‘ভরদ্বাজ সংহিতা’ অনুসারে নবনাথসিদ্ধ হলেন—

১. আদিনাথ
২. কণ্ডলনাথ
৩. চৌরঙ্গীনাথ
৪. গোরক্ষনাথ
৫. রাওয়ালনাথ
৬. অনঙ্গনাথ
৭. জালন্ধরনাথ
৮. ভুজঙ্গনাথ
৯. অরুণাচলনাথ।^{১৪৮}

যোগী ড. বিলাস নাথ ‘শ্রীনাথরহস্য’ গ্রন্থে যাঁরা নবনাথ বা নয়নাথ হিসেবে বর্তমানে

নাথপন্থে পূজিত হন তাঁদের নামের তালিকা উল্লেখ করেছেন নবনাথ আবাহনমন্ত্রে—

১. যোগী আদিনাথ (শিব)
২. যোগী উদয়নাথ (পার্বতী)
৩. যোগী সত্যনাথ (ব্রহ্মা)

৪. যোগী সন্তোষনাথ (বিষ্ণু)
৫. যোগী অচম্ভেনাথ (আকাশ)
৬. যোগী গজকম্ভুড়নাথ (গণেশ)
৭. যোগী চৌরঙ্গীনাথ (চন্দ্র)
৮. যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ (মায়াস্বরূপ)
৯. যোগী গোরক্ষনাথ। (শিবস্বরূপ)^{১৪৯}

উপরে উল্লিখিত তালিকা থেকে বোঝা যায় গ্রন্থকারগণ নবনাথের নাম ও তালিকা নিয়ে একমত নন। পরশুরাম চতুর্বেদী নবনাথের এরকম ৩০টি তালিকা উল্লেখ করেছেন।^{১৫০} তাঁর মতে নবনাথসিদ্ধ হলেন— ১. মৎস্যেন্দ্রনাথ, ২. গোরক্ষনাথ, ৩. জালন্ধরনাথ ৪. চৌরঙ্গীনাথ ৫. কানিপনাথ ৬. চর্পাটিনাথ ৭. ভর্তৃহরিনাথ ৮. কম্ভুড়িনাথ ৯. গহিনীনাথ।^{১৫১} তিনি মনে করেন ‘নবনাথ’ ও ‘চৌরাশি সিদ্ধ’ শব্দের ব্যবহার ১৩৫০ খ্রি. আগে থেকেই চলে আসছে।^{১৫২} সম্ভবত নবনাথ থেকেই নাথসম্প্রদায়ে গৃহস্থধারা স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীতে আগমের কারণে বিবাহ এসেছে।

তবে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ সব তালিকাতেই আছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ কোথাও মীননাথ, গোরক্ষনাথ একনাথ এবং চৌরঙ্গীনাথ কূর্মনাথ হয়েছেন। নাথ সম্প্রদায়ের মৌখিক পরম্পরা এবং নাথ সন্ন্যাসীদের পরম্পরায় যোগী ড. বিলাসনাথের ‘শ্রীনাথরহস্য’ গ্রন্থে প্রাপ্ত তালিকায় প্রচলিত আছে।

৬৪ যোগিনী:

সাধারণভাবে যোগিনী বলতে বোঝায় যোগীর প্রতিরূপ একজন নারীযোগী। একজন যোগী যোগধারার পথ অনুসরণ করে নিজের দেহ ও মনের উপর প্রভুত্ব অর্জন করেন আধ্যাত্মিক ও যোগলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে। সেরকমভাবে একজন নারীও অনুরূপ পথ অনুসরণ করে যোগিনী হন। মোগল ও রাজপুত অঙ্কনশৈলীতে এরকম নারী যোগী বা যোগিনীদের

প্রতিকৃতি লক্ষ করা যায়।^{১৫৩} অন্যদিকে কৌলমার্গে তান্ত্রিকসাধনার চক্রপুজোতে যুগলসাধনায় পুরুষ এবং নারী যোগী উর্ধ্বরেতা শিবস্বরূপ বা সেই সাধনায় ব্রতী হন। কৌলসাধনায় সহজোলী মুদ্রা দ্বারা যুগল সাধনার মাধ্যমে বজ্রব্রহ্মচর্যই বিহিত আদেশ।^{১৫৪} সিদ্ধ কৌলধারা, তন্ত্র ও বজ্রসাধনার সমন্বয়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগিনী কৌলধারা সৃষ্টি করেন। যোগিনী কৌলের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেবীর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে চৌষটি যোগিনীর পূজা। চৌষটি যোগিনীর নামের ভেতর শক্তিদেবীর প্রধান প্রধান নাম পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্থানে মৎস্যেন্দ্রনাথের তারাদেবীকে পূজা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যাই হোক যোগিনী পূজোর বৈশিষ্ট্য হল ভীষণ রহস্যময় এবং গোপনীয়।^{১৫৫} মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়’ গ্রন্থে আটজন মাতৃদেবীর উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন- ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কুমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, বজ্রহস্তা, যোগেশ্বরী এবং অঘোরেশী। এই আটজন দেবী অষ্টশক্তি পারণত হয়ে ৬৪ যোগিনী সৃষ্টি করেন—

‘ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।

বারাহী বজ্রহস্তা চ তথা যোগেশ্বরীতি চ।।

অঘোরেশী চ বিখ্যাতা মাতর্যা ব্যাপকাঃ স্মৃতাঃ।

তথান্যা দ্বারপালিন্যা তৈস্তু সংব্যাপিতঞ্জগত্।।’^{১৫৬}

অন্যদিকে ‘মৎস্যেন্দ্রসংহিতা’-গ্রন্থের অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠানের কোনটিতেই মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা করা হয় না। পরিবর্তে সাতজন নাথের একটি দল রয়েছে যাঁরা সাতজন যোগিনীর সঙ্গে যুগলসাধনায় যুক্ত এবং দীক্ষাক্রমে যোগিনীকে সাধনার অংশ হিসেবে পূজা করা হয়। এঁরা হলেন ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, যক্ষিনী।^{১৫৭} কিন্তু বিদ্যা দেহেজাই মনে করেন যোগিনী হলেন আটজন। এঁরা হলেন— ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, যাকিনী বা যক্ষিনী এবং কুসুম। এই ৮ যোগিনী ৮ দেবতার ৮ স্তরে ৬৪ যোগিনী রূপে পূজিত হন।^{১৫৮} আসলে নাথসম্প্রদায়ে

নবীকরণ হলে নবনাথ এলেন। নাথযোগীরা নাস্তিবাদ (নিহিলিজম) মানেন না। তাঁরা সর্বাঙ্গক অস্তিবাদি। তাঁদের ধারণা দেহের মধ্যেই পাঁচ আমির লড়াই চলে। দেহের আমি কামচন্দ্র—মনে গিয়ে ভাবচন্দ্র—তারপর জ্ঞানচন্দ্র—ধ্যানচন্দ্র—শূন্যচন্দ্রে লয় বা অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বা নির্বিকল্প সমাধি বা তেরপ্রহর অন্ধকার। কপালের ৮ স্তরে ৮ দেবী ৬৪ যোগিনী হল। ৫১ পীঠ বাদ দিয়ে ১৩ প্রহর বা কালী বা ত্রয়োদশী বা কালীর ১৩ প্রকার পুজোর পাত্র ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। অর্থাৎ ৫১ শ্রীবিদ্যা ও ১৩ কালীবিদ্যার সংযোগেই ৬৪ যোগিনীক্রম গঠনের কথা বলা হয়েছে। ৬৪ যোগিনী বা ডাকিনী আসলে ৬৪ রঙের দেবতা। নাথপন্থের সাধনার ক্রমপর্যায় বা স্তর।^{১৫৯} এই প্রসঙ্গে যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর অন্যতম ভক্ত সাধক বাসুদেব বলেছেন— ‘দেহ হল মন্দির, আর সেই মন্দিরের সহস্রদলে রয়েছেন স্বয়ং মহাদেব। আজ্ঞাচক্রে রয়েছেন ‘মা’ মহামায়া (ইষ্টদেব বা দেবী) কণ্ঠে রয়েছেন মা শাকিনী দেবী ও হৃদে আছে মা কাকিনী দেবী, মণিপুর বা নাভিমূলে মা লাকিনী দেবী, ব্রহ্মদ্বারে স্বাধিষ্ঠানে মা জলাধিপতি ও গুহ্যদ্বারে লিঙ্গমূলে রয়েছেন মা ডাকিনী দেবী তবে আর কোন মন্দিরে গিয়ে পূজো দিতে চাও হে, দেহের অভ্যন্তরে দেবদেবীকে তোমার পুষ্পাঞ্জলি দাও। তাঁরাই গ্রহণ করবেন। তুমিই তোমার ভগবান হে।’^{১৬০}

মৎস্যেন্দ্রনাথকে সমাজ ও সময়ের অবস্থার কারণে বিশেষত গৃহস্থকে সঠিক পথের দিশা দিতে একক সাধনা ত্যাগ করতে হয়। গৃহস্থকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতে তিনি যোগিনীকৌল সাধনায় যুগলসাধনাক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। গোরক্ষনাথ তাঁর প্রবর্তিত সাধনাধারায় এককসাধনা অর্থাৎ ব্রহ্মসাধনা রেখে দিলেন।

৮৪ নাথসিদ্ধ:

চতুর্দশ শতকের কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর মৈথিলি গ্রন্থ ‘বর্ণরত্নাকর’-এ ৭৬ জন নাথসিদ্ধের নাম উল্লেখ করেছেন।^{১৬১} রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বতী বৌদ্ধসিদ্ধ পরম্পরা অনুসারে ৮৪ সিদ্ধের তালিকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জাতি, দেশ, সমকালীন রাজাদের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ড. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ‘নাথ সম্প্রদায়’ গ্রন্থে ৮৪ নাথসিদ্ধ তালিকায় ১৩৭ জন নাথসিদ্ধের উল্লেখ করেছেন।^{১৬২} এখানে আর সেসব তালিকা পুনরায় উল্লেখ না করে যোগী ড. বিলাসনাথ ‘শ্রীনাথরহস্য’ গ্রন্থে ৮৪ নাথসিদ্ধদেরও যে তালিকা উল্লেখ করেছেন ৮৪ নাথসিদ্ধ আবাহনমন্ত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে—

১. কপিলনাথ ২. সনকনাথ ৩. লঙ্কানাথ (রাবণ) ৪. সনাতননাথ ৫. ভর্তৃহরিনাথ (বিচারনাথ) ৬. চক্রনাথ ৭. নরমাইনাথ ৮. রতননাথ ৯. শৃঙ্গেরীনাথ (গোপীচন্দ্রনাথ) ১০. সনন্দননাথ ১১. নিবৃত্তিনাথ ১২. সনৎকুমার ১৩. জালেন্দ্রনাথ (জালন্ধরনাথ) ১৪. সারখাতাইনাথ ১৫. ব্রহ্মানাথ ১৬. প্রভুদেবনাথ ১৭. কনকাইনাথ ১৮. ধুন্ধকারনাথ ১৯. নারদনাথ ২০. মঞ্জুনাথ ২১. মনসানাথ ২২. বীরনাথ ২৩. শূতাইনাথ ২৪. নাগার্জুননাথ ২৫. ভূসকাইনাথ ২৬. মদ্রনাথ ২৭. গহিণীনাথ ২৮. ভূচরনাথ ২৯. জম্বনাথ ৩০. বক্রনাথ ৩১. চপটনাথ ৩২. বিলেশয়নাথ ৩৩. কানিপানাথ (কৃষ্ণনাথ) ৩৪. বীরবন্ধনাথ ৩৫. জ্ঞানেশ্বরনাথ ৩৬. তারানাথ ৩৭. সুরানন্দনাথ ৩৮. সিদ্ধবুদ্ধনাথ ৩৯. ভগাইনাথ ৪০. পিপ্পলনাথ ৪১. চন্দ্রনাথ ৪২. ভদ্রনাথ ৪৩. একনাথ ৪৪. মাণিকনাথ ৪৫. গেহল্লারাওয়ালনাথ ৪৬. কায় (কায়া) নাথ ৪৭. মস্তনাথ ৪৮. যাজ্ঞবল্ক্যনাথ ৪৯. গোরনাথ ৫০. টিণ্ডিনীনাথ ৫১. দয়ানাথ ৫২. হবাইনাথ ৫৩. দরিয়ানাথ ৫৪. খেচরনাথ ৫৫. ঘোড়াচোলিপানাথ ৫৬. সহজাঙ্গীনাথ ৫৭. সুকদেনাথ ৫৮. অঘোরনাথ ৫৯. দেবনাথ ৬০. প্রকাশনাথ ৬১. কোরটনাথ ৬২. বালকনাথ ৬৩. বালগুন্দাইনাথ ৬৪. শবরনাথ ৬৫. বিরূপাক্ষনাথ ৬৬.

মল্লিকানাথ ৬৭. গোপালনাথ ৬৮. লখাইনাথ ৬৯. অল্লমনাথ ৭০. সিদ্ধপাদনাথ ৭১. অড়বঙ্গনাথ ৭২. গৌরবনাথ ৭৩. ধীরনাথ ৭৪. সাহিরোবানাথ ৭৫. প্রৌঢ়নাথ ৭৬. গরীবনাথ ৭৭. কালনাথ ৭৮. ধর্মনাথ ৭৯. মেরুনাথ ৮০. সিদ্ধাসননাথ ৮১. সুরতনাথ ৮২. মার্কেণ্ডেয়নাথ ৮৩. মীননাথ ৮৪. কাকচণ্ডীনাথ।^{১৬৩}

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড:

গৃহস্থ নাথযোগীরা সামবেদী। তাঁদের সমস্ত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সামবেদের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যজুর্বেদের প্রচলন নেই তা নয়। কিন্তু সামবেদ ব্যবহারই এঁদের কৌলিক রীতি।^{১৬৪} সমস্ত বেদই প্রাচীনকালের মুনিগণের যোগসাধনার লব্ধ জ্ঞান। সেজন্য নাথেরা বেদেরই সাধক। কিন্তু দেবতাবাদী, যাগযজ্ঞকারী বৈদিকগণ বেদের যৌগিক ব্যাখ্যা ত্যাগ করে বাহ্যিক অর্থ প্রচার করে গিয়েছেন। যৌগিকবিধানে সামবেদের কল্পিত সোম পান করা যায় বলে নাথযোগীর সুষোম্মাবেদ ও যাজ্ঞিকের সামবেদ এক পর্যায়ে পড়ে। সেইজন্য নাথযোগীরা যাজ্ঞিকের বেদবিভাগ মতে সামবেদকেই মানে। নাথযোগীর যোগসাধনার অর্থই হল—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ উপলব্ধি করা। এইভাবে যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, লাভ করেন ও জানতে পারেন তিনিই ব্রাহ্মণ।^{১৬৫} ‘মুণ্ডক’ উপনিষদে বলা হয়েছে নিয়ম অনুসারে যোগসাধনাকারী ব্যক্তিই ব্রহ্মকে জানতে পারেন এবং তারফলে তিনি ব্রহ্মতুল্য হতে পারেন। তাঁর কুলে অব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করেন না—

‘স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ন অস্য অব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।’^{১৬৬}

যোগিতন্ত্রকলামতে নাথদের মধ্যে ছ’প্রকার বেদের প্রচলন ছিল— সামবেদ, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, নিলবেদ, অনিলবেদ ও সারবেদ। এই ষড়্বেদের তত্ত্বজ্ঞানেই যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব

নির্ভর করত।^{১৬৭} প্রাচীনযুগে ওঁ-কারই ছিল গায়ত্রীমন্ত্র, সর্বত্রাণকারক। ঋগ্বেদে ওঁ-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

‘ঋচোঃ অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যন্তনবেদ—কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।’^{১৬৮}

নাথসম্প্রদায়ে ওঁ-কারই মূল গায়ত্রী এবং একে ‘তার’ বেদও বলা হয়। অন্যদিকে নাথযোগীরা খেচরীমুদ্রার সাহায্যে সহস্রার অন্তর্গত সোমচক্র থেকে ক্ষরিত সোমরস পান করতে পারেন। এই সোমরস পান করলেই অজর-অমর হওয়া যায়। এই সোমরস-যজ্ঞের বিধান, সূক্ষ্মবেদের বিধান। এই সূক্ষ্মবেদকে পঞ্চমবেদও বলা হয়। নাথযোগ সাহিত্যে সূক্ষ্মবেদ বা সুষম্বেদ কথাটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ‘গোরক্ষোপনিষদ’-এ বলা হয়েছে—

‘ঋক্-যজু-সামাথর্ব এই চারি বেদ
ব্রাহ্মণেরা পড়ে যাহা - হয় স্থূলবেদ।
তাদের রহস্যতত্ত্ব— সূক্ষ্মবেদ খ্যাত—
প্রণব-আকার তত্ত্ব - তাই সূক্ষ্মখ্যাত।
সেই সূক্ষ্ম বেদপাঠী ছিল শ্রীমৎস্যেন্দ্র
নাথ-পন্থে সূক্ষ্মবেদী যতেক যোগীন্দ্র।।’

নাথযোগীদের সূক্ষ্মবেদ বা সুষম্বেদ আদিবৈদিকযুগের নিবিদ্-ধারার বেদের গূঢ়-রহস্যার্থসূচক এবং সাধন-সঙ্কেতমূলক বেদ বা জ্ঞান। নাথযোগীরা বলেন এটা তাঁদের সঙ্কেতশাস্ত্র বা শূন্যশাস্ত্র। আবার নাথযোগীরা বলেন তাঁরা পরবর্তীকালের চার-বর্ণাশ্রমের অতীত আদি একাশ্রমপন্থী অর্থাৎ অত্যাশ্রমী।^{১৬৯}

পৌরোহিত্য:

নাথযোগী সম্প্রদায়ে স্বজাতীয় পুরোহিতরাই সমস্ত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করেন। এই পুরোহিতরা সাধারণত ‘যোগীর ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত। এঁরা শিবগোত্রের এবং নাথ-উপাধিবিশিষ্ট, যোগী।^{১৭০} সর্বত্র উপযুক্ত নাথযোগী পুরোহিত না পাওয়া যাওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও এখন নাথসম্প্রদায়ে পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন।

জীবিকা:

নাথযোগী সম্প্রদায়ের কৌলিক বৃত্তি হচ্ছে গুরুগিরি। বর্তমানে নাথসাধুরা গুরুগিরি করেন। কিন্তু বঙ্কাল সেনের রাজত্বকালে তাঁর রোষানলে পড়ে নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন।^{১৭১} তাই প্রাচীনকালে জীবিকা নির্বাহের জন্য নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ দুটি পেশা বা বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমটি কৃষি, দ্বিতীয়টি বয়ন। এই বৃত্তি দুটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল, যোগসাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। কৃষিতে আছে প্রাণের যোগ, প্রাণ ঢেলে যত্ন না করলে প্রাণের বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এটা যোগাঙ্গ, প্রাণপ্রতিষ্ঠার একপ্রকার সহজ অনুশীলনও বটে। তাছাড়া কৃষি সৎ ও সাত্ত্বিক বৃত্তি। বয়নও অনুরূপ বৃত্তি। অস্তিরচিত্ত হলে বয়ন কাজ করা যায় না। শিল্পীকে হতে হয় ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু ক্রোধহীন ও নীরবকর্মি। এছাড়া বয়নবৃত্তি সাত্ত্বিক ও যোগসাধনার সহায়ক।^{১৭২} অন্যদিকে যোগীর গান বোলান-এ সুতোকাটার পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—

‘তাঁতেতে ফুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাড়ে,

কিসে শুদ্ধ হল্যে ভক্ত্যা মাড় কর্যা কান্ধে।

পার্বতী কাটিল সূতা বিশ্বকর্ম্মার নিৰ্ম্মাণ,

তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজা করি নিরঞ্জন।’^{১৭৩}

‘গোরক্ষবিজয়’ গ্রন্থে যোগিনীদের পাটের কাপড় পরিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়—

‘লোকের পিঙ্কন পাটের পছড়া।’^{১৭৪}

এছাড়া গুরুকে উদ্ধার করতে গোরক্ষনাথ যখন কদলীরাজ্যে প্রবেশ করেন তখন জনৈক যোগিনীর কথায় সুতো কেটে তাঁতবস্ত্র বয়নের প্রসঙ্গ এসেছে—

‘আম্বারে কাটিমু সূতি তুম্বি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।’^{১৭৫}

তবে বর্তমানে নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ অফিসের বিভিন্ন চাকরিসহ নানান পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

নাথযোগীদের পালনীয় দশবিধ-সংস্কার:

পূর্বভারতের গৃহস্থনাথধারা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারা ও শিবযোগী আদিনাথ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলা যায়। গোরক্ষনাথ নাথসম্প্রদায়ের শিবযোগী ১৮ পন্থ এবং গোরক্ষনাথের নিজ সৃষ্ট ১২ পন্থ মিশিয়ে দিয়ে উভয়পন্থের ৬ শাখা নিয়ে নাথপন্থের পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন ১২ পন্থ সৃষ্টি করেন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পন্থ পুনর্গঠনের সময় শিবযোগী আদিনাথ সম্প্রদায় বাদ পড়ে যায়। তাসত্ত্বেও অসম, বাংলায় এখনও গৃহস্থ নাথদের মধ্যে আদিনাথ সম্প্রদায়ের পূজোবিধি, সংস্কার ইত্যাদি রয়ে গিয়েছে। অসমের বরাক উপত্যকায় কাছাড় নরসিংহপুর শালগঙ্গারপার শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর যোগাশ্রম মঠ আদিনাথ সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন মঠ সেই ঐতিহ্য আজও বহন করছে। আদিনাথ সম্প্রদায়ের গৃহস্থনাথযোগীগণ মনে করেন তাঁরা পরমাত্মা শিবের বিন্দুতে জাত বলে শিবগোত্রীয় যোগী সম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তি আছে শিবের বিন্দুতে জাত সর্বপ্রথম মানবদেহধারী পুরুষ বিন্দুনাথের অষ্টমবর্ষে উপনয়নের সময় স্বয়ং শিব জ্যোতির্ময় দেহে আবির্ভূত হয়ে উপস্থিত রাজা ও ব্যক্তিবর্গকে অবগত করান—

আমার বংশধরগণ আমারই নামানুসারে শিবগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু
যোগী নামে বিশ্বে সর্বাধিক দেবদুর্লভ খ্যাতি ও যশ লাভ করে
শ্রেষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।^{১৭৬}

কিন্তু কালক্রমে তাঁদের বংশধরেরা যোগভ্রষ্ট হয়ে গেলে ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত
নাম ভক্তিবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোগীগণ যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার ত্যাগ
করে বৈষ্ণবাচারে অভ্যস্ত হতে থাকেন। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই নাথযোগীরা স্বগোত্র
পুরোহিত নিয়োগ করে পূজো-পার্বণ, বিয়ে, শ্রাদ্ধাদি ইত্যাদি সামাজিক সংস্কার সুসম্পন্ন
করে আসছেন। তারা অন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যাজন গ্রহণ করেন না। কারণ নাথযোগীরা
বিশ্বের মূলীভূত সত্য, এক পরমাত্মার উপাসক ও একেশ্বর অদ্বৈতবাদের সমর্থক। সুতরাং
বেদোক্ত বহুদেবতা এবং মন্ত্রের মাধ্যমে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও দশবিধ সংস্কার থেকে
একমাত্র সত্য পরমাত্মার আরাধনা এবং বেদের সমস্ত মন্ত্রের মূলসত্তাকে আত্মার স্বরূপ
প্রণবমন্ত্রকে শ্রেয় মনে করেন। হিরণ্ময় নাথ মনে করেন নাথপন্থীগণ যাগযজ্ঞ বা
ব্যাপকহারে পূজো না করলেও তাঁরা গভীর জ্ঞানদীপ্ত সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এঁরা
ঈশ্বরবাদী। তাঁদের ঈশ্বর পরমব্রহ্ম বা পরমপুরুষ।^{১৭৭} গৃহস্থ নাথযোগীর প্রণব-জপ,
অজপা-গায়ত্রী সাধনা ও যোগাভ্যাস ধর্মের অঙ্গ। তাঁরা বেদ অধ্যয়ন, দৈবকর্ম, দেবপূজা,
গুরুগিরি করেন। আবার যোগবিধানে নাদ-উপবীত ধারণ করেও গোপালন, হলকর্ষণ,
বস্ত্রবয়ন করেন। ব্রাহ্মণ্যবর্ণাশ্রমীদের কাছে এসব কাজ অশাস্ত্রীয় ও নিন্দনীয়। কিন্তু
আদিবৈদিকযুগের স্মৃতির বলে নাথযোগী গৃহস্থরা ব্রাহ্মণ্যবর্ণাশ্রমীর এরূপ দৃষ্টিকে
অযৌক্তিক মনে করে উপেক্ষা করেছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমীর বেশকিছু সামাজিক
আচার-সংস্কারের যৌক্তিকতা লক্ষ করে দশবিধ-সংস্কারের কতগুলি বিধান গ্রহণ
করেছে।^{১৭৮}

তারফলে দশবিধ-সংস্কার বিবাহ, পূজো, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কার ধীরে ধীরে নাথসম্প্রদায়ে পালন শুরু হয়। দশবিধ সংস্কারগুলি হল—

১. গর্ভধান, ২. পুংসবন, ৩. সীমন্তোন্নয়ন, ৪. পঞ্চামৃত ও সাধভক্ষণ, ৫. জাতকর্ম ও নামকরণ, ৬. অন্নপ্রাশন, ৭. চূড়াকরণ, ৮. উপনয়ন, ৯. সমাবর্তন এবং ১০. বিবাহ।

১. গর্ভধান:

নাথযোগীরা আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগক্রিয়ায় ছোটবেলা থেকেই সাধারণভাবে অভ্যস্ত হন। সেইকারণে কুলধর্ম যোগ ও নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ইত্যাদি শুদ্ধমন ও দেহে পালন করেন। সদাচার থেকে সৎপুত্র ও কন্যার জন্ম হয় বলে তারা মনে করেন। নির্ধারিত দিনে সংযত মনে শুদ্ধ আহার গ্রহণ করে সূর্যাস্তের আগে স্বামী-স্ত্রী স্নান করে নতুন কাপড় পরেন। তারা যুগলে মিলে সন্ধ্যায় কুলদেবতা এবং গুরুকে পূজো করেন এবং ধ্যানে নিমগ্ন হন। ধ্যানে নিমগ্ন অবস্থায় গোত্রপতি ও গুরুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয়। ধ্যান শেষে স্বামী-স্ত্রী ফল আহার করেন ও নাথপন্থের সদ্গ্রন্থ পাঠ করেন। তারপর রাতে প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে বিছানা গ্রহণ করে ইষ্টদেব ও গুরুর ধ্যানে চিত্তচাক্ষুণ্য দূর হলে নাদাশ্রয় করে গর্ভধান সংস্কার সম্পন্ন করার কথা বলা আছে। শেষে গুরু ও নাদময়ী মহামায়ার স্তব করে নিদ্রা শুভপ্রদ। উল্লেখ্য নাথযোগীদের কুলদেবতা শিব।

২. পুংসবন:

নাথসম্প্রদায়ে তৃতীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠান পালিত হয়। যোগাচারমতে শুভদিন দেখে সন্ধ্যার আগে গর্ভধারিণী স্নান সেরে নতুন কাপড় পরেন এবং স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে কুলদেবতা এবং গুরুপূজো সম্পন্ন করে ধ্যানে বসবেন। তারপর যজ্ঞ নির্মাণ করে ১০৮টি বেলপাতা ঘিয়ে ধৌত করে প্রণব মন্ত্রে হোম-যজ্ঞ সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। হোমযজ্ঞ শেষে ধ্যানপূর্বক অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৩. সীমন্তোন্নয়ন:

গর্ভাধানের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার পালিত হয়। হোমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুরু ও শেষ হয়। পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র সহ অনন্তকোটি দেবতার তুষ্টিবিধানে বিভিন্ন মন্ত্রপাঠের নিয়ম রয়েছে। শুভদিনে গর্ভধারিণী ও তার স্বামী পূর্বের মত সন্ধ্যার পরে স্নান করে ইষ্টদেবতা আদিনাথ শিবের ঘট স্থাপন করে পঞ্চ উপাচারে কুলদেবতা এবং গুরুপূজা শুরু হয়। পূর্বের মত যজ্ঞের আয়োজন করে শেষে ইষ্টদেব ও গুরুকে ভোগ প্রদান করে গর্ভধারিণী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সংকল্প মন্ত্রঃ অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে অমুক দেবীর
মঙ্গলের জন্য হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করতে সঙ্কল্প গ্রহণ করছি। হে
পরমপিতা সঙ্কল্প যেন সিদ্ধ হয়।

৪. পঞ্চগম্বত ও সাধভক্ষণ:

দই, দুধ, ঘি, মধু ও শর্করা –এই পাঁচ প্রকার দ্রব্যের মিশ্রণকে পঞ্চগম্বত বলে। যোগাচারে পঞ্চগম্বত ও সাধভক্ষণের বিধান হল নবম মাসে জ্যোতিষ মতে শুভদিন ঠিক করে উভয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। গর্ভধারিণী স্নান করে নতুনবস্ত্র পরিধান করেন। তাকে কোমল আসনে বসান হয়। মাস্তুলিক প্রদীপ, ধূপ ও ধুনো তার সামনে জ্বালিয়ে রাখা হয়। সঙ্গে তামারপাত্রে পঞ্চগম্বত থাকে। ঘটিতে জল, তুলসীপাতা, বেলপাতা, দুর্বা, ফুল ও চন্দন দিয়ে হাতজোড় করে উভয় হাতের আঙুলের অগ্রভাগ জলে স্পর্শ করে গর্ভধারিণীকে প্রণব উদগীত করতে হয়। প্রণব শুদ্ধ জল দিয়ে তিনি সমস্ত উপাচার শুদ্ধ করে নেবেন। শেষে পঞ্চগম্বত খাওয়ার মন্ত্র উচ্চারণ—

‘ওঁ পিব পঞ্চগম্বতং দেবী যতন্তং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুং বংশধরং পুত্রং জনয়ঃ সুরতে।।’

সবশেষে যোগীগণ কুলপতি শিবের মূর্তি স্থাপন করে অথবা আদিনাথের ঘট স্থাপন করে পঞ্চোপচারে পূজা শেষ করেন। সাধভক্ষণের জন্য যে সমস্ত নৈবেদ্য আয়োজন করা হয় তা সবই ইষ্টদেবতা ও গুরুকে উৎসর্গ করে বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন মহিলারা গর্ভধারিণীর খাবারের পাত্রে একে একে তুলে দিয়ে সাধভক্ষণ করান।

৫. জাতকর্ম ও নামকরণ:

বর্তমানে বাড়িতে সন্তান-প্রসবের বিষয়টি প্রায় না থাকায় প্রথাটি নেই বললেই চলে। সুতরাং জাতকর্ম ও নিষ্ক্রমণ পালন করা সম্ভব হয় না। তবে শিশু জন্মানোর তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে স্নান করানোর পর শিশুকে সাদা জামাকাপড় পরিয়ে পিতা নবজাতককে বাইরে বের করে চন্দ্রদর্শন করান। শেষে মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে শিশুকে ঘর থেকে বাইরে আনার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়।

বেদ অনুযায়ী শিশুজন্মের ষষ্ঠদিনে কেশ ছেদন করে স্নান করান হয়। প্রসূতিকে নখ কেটে স্নান করতে হয়। সন্ধ্যাকাল পার হলে ষষ্ঠীর ঘট স্থাপন করে পঞ্চোপচার পূজা সম্পন্ন হলে আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে নিজেদের পছন্দমত ছ'টি নাম কাগজে লিখে তার উপর ছ'টি প্রদীপ সমপরিমাণে তেল বা ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। শেষপর্যন্ত যে প্রদীপটি জ্বলে তার নীচে যে নামটি থাকে তা দিয়েই জাতকের নামকরণ করা হয়।

৬. অন্নপ্রাশন:

পূর্ববর্তী সংস্কারগুলির মত বাড়িতে ইষ্টদেবতা আদিনাথের ঘট বা মহাদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করে পঞ্চ উপাচারে অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে গোত্রপতি শিবের পূজা উদযাপন করা হয়। সঙ্গে জাতকের মা-বাবার দীক্ষাগুরুর প্রতিকৃতি স্থাপন করেও যথাবিহিত পূজা করে নেওয়ার বিধান রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে নান্দীমুখের মুখ্য উদ্দেশ্য ইষ্টদেব ও পিতৃগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করা। আদিনাথ বা গুরুর প্রতিকৃতির সামনে অন্নপ্রাশনের সমস্ত ভোগ

রাখা হয়। হোম-যজ্ঞ শেষে ধ্যানের আয়োজন হয়। শেষে উপস্থিত মানুষ, গুরু নিজের হাতে সমবেত প্রণব উদ্গীরণের মাধ্যমে মিস্টান্ন জাতকের মুখে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করলে অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হয়।

৭. চূড়াকরণ, ৮. উপনয়ন, ৯. সমাবর্তন:

বর্তমানে তিনটি কর্ম চূড়াকরণ, সমাবর্তনসহ উপনয়ন ও দীক্ষাদান কর্ম একই দিনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। কেশচ্ছেদন, আভ্যুদায়িক সন্ন্যাস সম্পূর্ণ করে যোগাচারে উপনয়ন ও দীক্ষাদান পূর্ণ করে দিনের শেষে সমাবর্তন করানো হয়। জ্যোতিষমতে দিনক্ষণ নির্ধারণ করে সমবেত উপনয়নও নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত হয়েছে। তবে সমস্ত ধর্মীয় বা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সামবেদের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। ‘আগমসংহিতা’ গ্রন্থে নাথযোগীদের উপনয়নে যজ্ঞসূত্র এবং যোগপটু দুই ব্যবস্থার কথায় বলা হয়েছে—

‘যজ্ঞসূত্রং বিভূতিঞ্চ শিবপূজনসেবচ।

রক্তবস্ত্র পরিধানমাসনং কুণ্ডলং তথা।।’— শ্লোক ৩৬

এবং

‘ত্রিদণ্ডং যোগপটুঞ্চ তথা বিধারয়েৎ।’— শ্লোক ৩৪

১০. বিবাহ:

বিবাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। যেমন—

ক) পাকাদেখা বা বাক্যদান, খ) মঙ্গলাচরণ, গ) অধিবাস, ঘ) নান্দীমুখ, ঙ) বরণ, চ) দধিমঙ্গল, ছ) সপ্তপ্রদক্ষিণ ও মালাদান, জ) দান, ঝ) বাসি-বিবাহ, ঞ) বরের বাড়িতে চতুর্থমঙ্গল, ট) চতুর্থমঙ্গলের রাতে সদ্য দ্বিরাগমন, ঠ) ঘাটস্নান, ড) দ্বিরাগমন।

নাথসম্প্রদায়ের মানুষ নান্দীমুখ বা আভ্যুদায়িক কাজকর্ম নাথ-পুরোহিত ডেকে সম্পন্ন করেন। যোগমতে বরকর্তা বা কন্যাদাতা সমস্ত উপাচার সাজিয়ে প্রণব মন্ত্রে

নিজেই স্নান শেষে শুদ্ধবস্ত্র পরে বন্দনা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নিতে পারেন ধ্যানের মাধ্যমে। সূচনায় আদিনাথের ঘট স্থাপন করে প্রণব মন্ত্রে জল শোধন করে নিতে হয়। ঐ জলে সমস্ত উপাচার শুদ্ধ করে নিয়ে মানস পূজায় আহবান ও সঙ্কল্প করতে হয়। তারপর ঐ ধ্যানেই পঞ্চদেব-দেবী ও অন্যান্য দেবদেবীকে স্মরণ করে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। নাথযোগীদের মুনি-ঋষির পরিবর্তে তিননাথের (আদিনাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথ) অর্চনা করলেই চলে। অবশেষে পরলোক গত পিতৃ-পূর্বপুরুষদের আহবান পূর্বক বন্দনা-অর্চনা, মানসপূজা শেষে পুষ্পাঞ্জলি দানের মাধ্যমে আভ্যুদায়িক বা নান্দীমুখ শেষ হয়। নাথযোগী পুরোহিত নিলে তিনি এইসমস্ত কাজ যোগমতে সম্পন্ন করবেন।

নাথযোগীগণ নিরাকার একেশ্বরবাদী। যোগসাধনায় শব্দব্রহ্ম উপলব্ধি করে তার সাহায্যে জীবাত্তার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সাধনই যোগের লক্ষ্য। সুতরাং সাধন সময়ে আত্মার নাদ ও জ্যোতি শক্তি ছাড়া অন্য কোন দেবতার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না বলে বহু দেবতার অর্চনা না করে যোগে আশ্রিত ব্যক্তিগণ একমাত্র পরমাত্মা স্বরূপ আদিনাথের ঘটে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় বলে নাথযোগীরা বিশ্বাস করেন।^{১৭৯}

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধিপ্রথা:

নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সমাধিপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশেষত শহরাঞ্চলে স্থানগত সমস্যার কারণে দাহসংস্কার প্রথাও প্রচলিত রয়েছে। মৃতদেহ সমাধিপ্রথা বেদেও সমর্থন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০/১৫/১১ শ্লোক এবং ১০/১৮/৮ থেকে ১৩ শ্লোকে এবং অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডে মৃতদেহের মৃতসমাধি দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাথযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘খেচরী মুদ্রা’-র বিশেষ প্রচলন ছিল। খেচরী মুদ্রা যোগে মাটির

নীচে যোগীরা অনেকদিন জীবিত অবস্থায় থাকতে পারেন – সেই সূত্রে নাথ সম্প্রদায়ে সমাধিপ্রথা প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়।

নাথপন্থে জীবাত্মা-পরমাত্মার একতা জ্ঞানকে সমাধি বলা হয়েছে। যোগী গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘উভয়োরাহ্মনোরেকঃ সমাধিশ্চ বিধীয়তে।

যথা সংক্ষীয়তে প্রাণো মনসশ্চ বিলীয়তে।।’^{১৮০}

সমাধি অভ্যাস করতে করতে পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন কেবল এক আত্মা প্রকাশ পায়। অবধূত যোগী দত্তাত্রেয় বলেছেন নিগুণ ধ্যানসম্পন্ন ব্যক্তি সমাধিযোগ অভ্যাস করবেন—

‘নিগুণ ধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিপঞ্চ সমভ্যসেৎ।

বায়ু নিরুদ্য মেধাবী জীবনুক্তো ভবেৎ ধ্রুবম্।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ।।’—দত্তাত্রেয় সংহিতা।

কুম্ভকের মাধ্যমে বায়ু রোধ করলে সিদ্ধ জীবনুক্ত হন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। তাছাড়া কেবল একাগ্রচিত্ত হলেই সমাধি হয় না। তাই যোগবাশিষ্ঠে বলা হয়েছে—

‘প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন চ তুষ্ণীমবস্থিতিঃ।’^{১৮১}

সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি। অন্যদিকে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অবসান হলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্বিকল্প সমাধি। অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে ‘আমি’ জ্ঞান থাকে। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে ‘আমি’ জ্ঞানের

অবসান ঘটে। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে – ‘সমাধি ব্রহ্মাণি স্থিতিঃ’।^{১৮২}

বৈদিক সাহিত্যে ‘অবাঙ্মনসোহগোচরঃ’ ‘অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্’ ইত্যাদি সংজ্ঞা দিয়ে ব্রহ্মের তত্ত্বাতীত অবস্থার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে নাথদর্শনের মিল রয়েছে। নাথদর্শনেও পরম চৈতন্য সত্তার কোন নামকরণ করা সম্ভব হয় নি। তাই তিনি ‘অনামা’ নামে অভিহিত। নাথপন্থে বলা হয়েছে—

‘যদা নাস্তি স্বয়ং কর্তা কারণং চ কুলাকুলম্।

অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম ‘অনামা’ বিদ্যতে তদা।।’

এটা ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণের অতীত অবস্থা। সুতরাং নাথদর্শন একটি অদ্বয় তত্ত্ব। এটা ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের অতীত ‘তত্ত্বাতীত’ অবস্থা। নাথতন্ত্রে বলা হয়েছে ‘তত্ত্বাতীতো নিরঞ্জনঃ’। এই অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে পাই শিব ও শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিকে। নাথপন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই চিৎশক্তিসম্পন্ন এবং পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি নিত্য সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতিকে কিছুতেই পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতির প্রসার ভাবই সৃষ্টি এবং সংকোচ ভাবই প্রলয়। যোগসাধনার সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিষ্ক্রিয় করে মনের লয় সাধন ও প্রাণের ক্ষয় সাধন করতে পারলে প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়ে যান এবং সমাধিযোগেই তা সম্ভব বলে নাথযোগীরা মনে করেন।

রাজা বল্লাল সেন বাংলা থেকে যোগীদের বিতাড়িত করলে তারা পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন নতুন নতুন এলাকায় যোগীসম্প্রদায় নিজ নিজ যোগাচার সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে পারেন নি। যোগাচারের সঙ্গে তারা কিছু কিছু বৈষম্যবাদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে নাথযোগীকুলের কুলধর্মের যারা রক্ষক ও প্রচারক ছিলেন তারাও বেদ বহির্ভূত দীক্ষাদান

করতে আরম্ভ করেন যার ফলে যোগীসমাজে যোগাচারের স্থানে বৈষ্ণবোচার অঞ্চলগতভাবে প্রাধান্য লাভ করে।^{১৮৩} যোগাচারী সাধক যোগীকে দেহত্যাগের পর অথবা নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যোগাসনে সমাধিপ্রথা প্রচলিত আছে। শবাসন ও যোগাসন উভয়প্রথায় সমাধিদান নাথসমাজে লক্ষ করা যায়। সামবেদীয় রীতি অনুসারে দক্ষিণ শিয়রে সমাধি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৃতের মুখ উত্তরদিকে থাকবে। আবার ‘শিবপুরাণ’ অনুসারে যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্বদিকে মুখ করে পশ্চিম শিয়রে সমাধিব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থা গৃহস্থ নাথদের জন্য নয়, কেবল নাথযোগী সন্ন্যাসীর জন্য।^{১৮৪}

সমাধিপ্রথার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সমাধির নির্বাচিত স্থানে প্রথমে চারটে কড়ি বা পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে ধরিত্রীমাতার কাছে ভূমি প্রার্থনা করে নেওয়া হয়। তারপর মৃতের পুত্র বা শ্রদ্ধাদানকারী এক-কোদাল মাটি প্রথমে আলাদা করে কেটে রেখে তারপর সমাধি খনন করা হয়। যোগাসনের সমাধি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রথমে চার হাত পরিমাণে হবে। তারপর আনুমানিক দেড়হাত খননের পর উভয়দিকে আধহাত ছেড়ে গোফা (গুহা) খনন করা হয়। ততটুকু খোঁড়া দরকার হয় যাতে শবদেহ কোনও পিঁড়িতে বসালে তার মাথার উপর বাঁশের যে আচ্ছাদন দেওয়া হবে তাকে যেন স্পর্শ না করে। তারপর সমাধিতে কাঠের প্রশস্ত পিঁড়ির উপর পদ্মাসনে বসিয়ে অথবা কুশাসন বা নববস্ত্রের উপর যোগাসনে শবদেহ স্থাপন করতে হয়। এরপর ঘিয়ের সাহায্যে মশাল জ্বালিয়ে মৃতের পুত্র সাতবার শবদেহে ঘোরানোর পর মশালে প্রজ্জ্বলিত আগুন শবদেহের নাক স্পর্শ করানোর পর তা নির্বাপিত করবে। শেষে প্রথমবার কোদালে উত্তিত মাটি পুত্র বা পুত্রগণ এবং উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ও সমাজের লোকজন নিজেদের হাতে ‘জী ওঁ স্বামী’ বলে সমাধিতে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর মাথা স্পর্শ না করে এমনভাবে শবদেহের উপর বাঁশের আস্তরণ বা বাঁশের চাটাই বা পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং উপরে মাটি ফেলে ঢেকে দেওয়া হয়।

এমনকি মাটিতে জল মিশিয়ে শক্ত করে বেশ কয়েকটি আবরণে গেঁথে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মৃতের পরিবার। কেউ কেউ সমাধির উপর ইটের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে দেন। যেখানে পাকা সমাধি সৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা যায় না সেখানে শিয়াল-কুকুর প্রভৃতি জন্তুর থেকে সমাধি রক্ষার জন্য সমাধির চারধারে বাঁশের বেড়া করে দেওয়া হয়। এছাড়া সমাধির সামনের দিকে একটি তুলসী গাছ ও পেছনের দিকে একটি মাটির পাত্র পুতে রাখা হয়। সর্বশেষে প্রণব উদ্গীত করে সদ্য প্রয়াত অমুক নাথের মোক্ষধাম প্রাপ্তি হোক জয়ধ্বনি দিয়ে সমাধি পর্ব শেষ হয়।^{১৮৫}

নাথযোগী সম্প্রদায়ের কোনো মৃত ব্যক্তি সত্যিই মৃত না সমাধিস্থ (ধ্যানস্থ) না জানায় ‘দাহসংস্কার’ করা হত না বা হয় না। সমাধিস্থ করার প্রথায় বংশপরম্পরায় গৃহস্থ নাথযোগীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত হয়ে আসছে। সমাধিপ্রথা প্রাক-বৈদিক প্রথা। এটা অহিন্দুদের মত শায়িত অবস্থায় সমাহিত বা কবরস্থ নয়। হঠযোগী নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে খেচরী মুদ্রার বিশেষ প্রচলন থাকার কারণে সমাধিপ্রথা প্রচলিত হয়।^{১৮৬} নাথসম্প্রদায়ের প্রথম গুরু আদিনাথ মাতা পার্বতীকে কায়াসাধনা প্রসঙ্গে খেচরীমন্ত্রের কথা বলেছেন। এই সাধনাকেই খেচরীমুদ্রা বলা হয়েছে—

‘ঈশ্বর উবাচ

অথ দেবি প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং খেচরিসংজিতাম্।

য়য়া বিজাতয়া চ স্যাল্লোকে স্মিন্নজরামরঃ।।

মৃত্যুব্যাধিজরাগ্রস্তং দৃষ্ট্বা বিশ্বমিদং প্রিয়ে।

বুদ্ধিং দৃঢ়তরাং কৃত্বা খেচরীং তু সমাশ্রয়েত্।।

জরামৃত্যুগদদ্বীং যঃ খেচরীং বেত্তি ভূতলে।

গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব তদভ্যাসপ্রয়োগতঃ।।

তং দেবি সর্বভাবেন গুরুং নত্বা সমাশ্রয়েত্।

দুর্লভা খেচরীবিদ্যা তদভ্যাসশ্চ দুর্লভঃ।।’ -খেচরীবিদ্যা, (শ্লোক ১-৪)^{১৮৭}

বলাবাহুল্য খেচরীমুদ্রার সাহায্যে যে সমাধি অবস্থা লাভ হয় তা নিদ্রার মতই দৈহিক সমাধি। এটা মনোজয় বা আত্মোপলব্ধির সমাধি নয়। নাথযোগীদের আরেকটি বিশেষ আবিষ্কার বজ্রোলি বা অম্বোলি মুদ্রা। মৎস্যেন্দ্রনাথই এই মুদ্রাটি আবিষ্কার করেন। এই মুদ্রাটি বিবাহিত দম্পতিদের জন্য। এই মুদ্রার সাহায্যে গৃহস্থ নাথযোগীরা ভোগাসক্তি জয় করে সমাধি অবস্থা লাভ করতে পারেন। এই মুদ্রার সাধনপ্রণালী নাথসিদ্ধরা সাক্ষ্যভাষায় নানাভাবে প্রকাশ করেছেন—

‘সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
সাপ না গিলিবে তায়,
অমিয় সাগরে সিয়ান করিবি
কেশ না ভিজিবে তায়।

... ..

দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিত্তে
যাইলে প্রমাদ হবে...’

দক্ষিণ দেশ অর্থ পিজলা নাড়ি, পিজলা নাড়ির শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যুগল সাধনা করবে না। এই সাধনপ্রণালী আয়ত্ত্ব করতেই মৎস্যেন্দ্রনাথকে কদলীরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছিল।^{১৮৮}

নাথযোগীদের সমাধিপ্রথা বেদ অনুমোদিত।^{১৮৯} নাথযোগী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সমাধিস্থ করাটা একপ্রকার নিয়ম—

‘যোগদেহং ভস্মং কৃত্বা স যোগী নরকং ব্রজেৎ।
সিদ্ধদেহং ভস্মং কৃত্বা মমস্বরির জায়তে।’^{১৯০}

উল্লেখ্য নাথসম্প্রদায়ের সমাধিপ্রথা বেদ অনুমোদিত। বৈদিক যুগে সমাধিপ্রথার পরিচয় পাওয়া যায়।^{১৯১} যোগী সুন্দরনাথ গৃহস্থ নাথযোগীদের উদ্দেশ্যে বলতেন—

‘জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই তিনটি সাধন করে সমাধি লাভ করতে হয়। যোগ শব্দের অর্থ নামসাধন ও গুরুমূর্তি ধ্যান। ধ্যানের অর্থ হরিমূর্তি বা গুরুমূর্তি দর্শন। শুধু ধ্যানস্থ অবস্থায় হরিমূর্তি দেখা যায়। তখন আর কিছু দেখা যায় না। সেই অবস্থায় নিজের মূর্তিও হরিমূর্তিতে মিশে যায়। এটাই দিব্যদর্শন।’^{১৯২} যোগী শান্তিনাথ সমাধি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

To me Samadhi was now essentially nothing but the complete withdrawal of the consciousness from all objects, a perfectly vacant and actionless state of the consciousness. It is certainly a state of perfect calmness and tranquility, perfect stillness and silence, without any positive enjoyment or experience.^{১৯৩}

সম্+আ+ধা+ই = সমাধি। মূল অর্থ সমাধান, বিশেষ অর্থ— পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ। ‘শ্রীমদ্ভগবতগীতা’ ২/৫৪ শ্লোকে যখন পাই ‘কা ভাষা, সমাধিস্থস্য কেশব’ তখন ‘সমাধি’ যোগের বিশেষ অবস্থারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের ‘পাতঞ্জল যোগদর্শন’-র ৫১ সূত্র এই সমাধির বিশদতা। আরবি কবর, ফারসি গোর, ইংরেজি burial, cremation, funeral সমার্থক। কিন্তু ‘সমাধি’-র কোনো বিকল্প নেই।^{১৯৪} বর্তমানেও নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাধি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ১২৯৬ খ্রি. মহারাষ্ট্রের আলান্দিতে হয় জ্ঞানেশ্বরনাথের সমাধি।^{১৯৫} ১৯১৭ খ্রি. ২১ মার্চ যোগী গম্ভীরনাথ যোগাসনে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হন।^{১৯৬} যোগী পুষ্করনাথ ২৩মে ১৯৭৪ খ্রি. জীবভাব ত্যাগ করে ব্রহ্মলীন হন।^{১৯৭} যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী ১৯৮০ খ্রি. ৬ জানুয়ারী রবিবার কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে দুপুর ১-১০ মি. কলকাতায় মহাসমাধি গ্রহণ করে ব্রহ্মলীন হন। তাঁর পার্শ্ব শরীর বালুরঘাট যোগীরাজ শ্রীশ্রী অঘোরীবাবা আশ্রমে সমাধিস্থ করা হয়।^{১৯৮} মহাসমাধির সেই দিনটিকে স্মরণ করে সাধক বাসুদেব লিখলেন—

প্রশান্ত মুখমণ্ডল। হাতে ডমরু-ত্রিশূল আর মুখে বম্-বম্-বম্ হারে
রে... রে... রে..... বলতে বলতে যাত্রা করলেন পরমলোকে। ঐ
দিনটাই তো ৬ই জানুয়ারি— আমরা মর্ত্যবাসীরা তাঁর সেই পবিত্র
শোভাযাত্রাকে স্মরণ করে আজও অশ্রু বিসর্জন করছি।— আজও
সেই শূন্যতার মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা বাবা কই, বাবা কই। কই
প্রভু, কই ভৈরব।^{১৯৯}

ডা. রামনাথ অঘোরীর শিষ্য যোগী শক্তিনাথ ১১৮ বছর বয়সে অসমের বড়পাথর যোগাশ্রম
মঠে ২ জুলাই ২০২১ মহাসমাধি গ্রহণ করেন। যোগী শ্রীমৎ রাজচরণনাথ ১২ অক্টোবর
২০১৯ কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরায় মহাসমাধি গ্রহণ করে ব্রহ্মলীন হন। অর্থাৎ
সমাধি, কবর ও মমি এক নয়। সংস্কার ও সংস্কৃতিগত কারণে অর্থেরও পার্থক্য রয়েছে।
সমাধিতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ প্রকটিত, প্রাণের নিঃশেষ অবস্থা নয়। বেদে যা ছিল ‘নিখনন’
তা যোগের সান্নিধ্যে হল ‘সমাধি’। যোগমতে মুনিধারার মানুষের চরম মৃত্যু নেই। মুনিধারা
যোগবাদী-গীতার যোগকর্মসু কৌশলম্ (২/৫০)। নাথসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের
কথাও তাই—‘কর্মকুরঙ্গ সমাধি কপাট’। বেদে পরমাত্মা পুরুষ, উপনিষদে ব্রহ্ম এবং
পতঞ্জলির ‘যোগসূত্র’-তে ঈশ্বর-দর্শন (১/২৪)। সেইজন্য মৃতদেহকে পোড়ানোর প্রথা ওঠে
না—

It was natural not to commit to fire the bodies of those
who had gained liberation, whose souls were already
identified with God.^{২০০}

কীথ মনে করেন—

The custom of burying ascetics and yogins, instead of
burning their corpse, is quite old in India.^{২০১}

অবশ্য নাথযোগ সাহিত্যে (আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান) অগ্নিসংস্কারের
পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাছাড়া শহরাঞ্চলে জায়গার অভাবে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে
নাথসম্প্রদায়ে শবদাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছে।

শ্রাদ্ধক্রিয়া:

হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত নাথযোগী সম্প্রদায়ে পুরুষের রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিদের দেহান্ত হলে তিনরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করতে হয়। তারপর যোগাচারী যোগীদের ভোজদানের পর সন্ধ্যায় হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পিতামাতা, গুরু সমাধি গ্রহণ করে ব্রহ্মলীন হলে দশদিন দশরাত্রি অশৌচ পালন করে একাদশতম দিনে ভোজ্য দান করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। পরে সন্ধ্যায় হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করে ধ্যানশেষে প্রসাদ গ্রহণ করে অনুষ্ঠান শেষ হয়। তারমাঝে কাকবলি নামে বেদবিধি সম্মত অনুষ্ঠান দশদিন ধরে চলতে থাকে। নাথযোগীগণ মৃতব্যক্তির সমাধি দেওয়ার পর স্নান সেরে উত্তরীয় ধারণ করে স্বগৃহে ফিরে এসে প্রথম শিবলিঙ্গে জলদান করেন। তারপর হবিষ্যন্নের ব্যবস্থা করেন। প্রচলিত মতে চতুর্দশান্তির আগে পর্যন্ত শ্রাদ্ধাধিকারীগণকে দুধ, কলা, সাগু ও অন্যান্য হবিষ্যদ্রব্য গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত আছে। ঐ সময়ে একটি কলাগাছের খোলে অথবা পেতলের থালায় শ্রাদ্ধাধিকারী হবিষ্যের কিয়দংশ বাড়ির উত্তর বা পূর্বদিকে রেখে কাক এবং সদ্য দেহত্যাগী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। চতুর্থ দিনে পিণ্ডদান শেষে অবশিষ্ট অন্ন উপরোক্ত মতে শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তির দিনে অন্ন রান্না করে দুধ-কলা সহ গ্রহণ করবেন। অশৌচের দশম দিনে শিবলিঙ্গে জলদান শেষে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভোজ্য ও পানীয়ের একটা অংশ নিয়ে দেহভাব জনিত ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। পরে মাথা মুগুন করে উত্তরীয় বস্ত্র জলের ঘাটে ত্যাগ করে পুরোহিতের সাহায্যে পিণ্ডদানের কাজ সম্পন্ন করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। অস্থায়ী শিবলিঙ্গ, তুলসীগাছ ও বাঁশের বেড়াসহ সমস্ত জিনিস তুলে নিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হয়- এটাই নিয়ম বা সংস্কার হিসেবে প্রচলিত ব্যবস্থা। এগারোতম দিনে শ্রাদ্ধের কাজ শুরু করার আগে তিল-কাঞ্চন দান করে স্নান শেষে নতুন

কাপড় পরে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ অশৌচ মুক্ত হন। পুরোহিত গোত্রপতি শিব, দীক্ষাগুরুর প্রতিকৃতি ও আদিনাথ শিবের ঘট স্থাপন করে পঞ্চপচারে পূজা দিয়ে সমবেত লোকজন প্রারম্ভিক ধ্যানে বসেন। গুরুবন্দনা ও পাঁচবার প্রণব উদ্গীত করে ধ্যান শুরু এবং ধ্যানশেষে আবার পাঁচবার প্রণব দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। পাশাপাশি গীতাপাঠ ও ভাস্য চলে। আদ্যশ্রাদ্ধ ও গীতাপাঠ শেষ হলে পুরোহিত ও শ্রাদ্ধাধিকারীগণ যজ্ঞকুণ্ডের পাশে উপবেশন করেন। শ্রাদ্ধাধিকারীগণের সঙ্গে সমবেত আত্মীয়-পরিজন প্রজ্জ্বলিত হোমান্নিতে ঘিয়ে সিদ্ধ বেলপাতা অর্পণ করবেন। পরলোকগত ব্যক্তির সদৃশতার জন্য সমবেত প্রণব উদ্গীতে যোগদান করে পরমাত্মা শিবের উদ্দেশ্যে সকলে প্রার্থনা জানান। সামবেদ অনুসারে যোগাচারী নাথযোগীদের এগারো দিনে সমস্ত শ্রাদ্ধাদিকর্ম সম্পূর্ণ হয়।^{২০২} নাথসম্প্রদায়ের ‘অনাদ্য-চরিত্র’ গ্রন্থেও দশদিন অশৌচ পালন করে একাদশতম দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে—

‘দশ দিন হবিশ করিলা এই প্রকিতে।
একাদশিতে শ্রাদ্ধ আরম্ভিলা শেইমতে।।
তবে হরে ধ্যান আরম্ভিলা শেইমতে।
নাথের কৃপা হৈল আইলা শাক্ষাতে।।’^{২০৩}

দীক্ষা:

নাথযোগীরা বারো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে নাথসন্ন্যাসী গুরুর কাছে শিবমন্ত্র বা গোরক্ষমন্ত্র বা কৌলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নাথধর্ম অবলম্বন করে। নাথধর্মে দীক্ষিত বা স্নাত হওয়ার মাধ্যমে নাথযোগীরা ‘নাথ’ রূপে পরিচিত হয়। যোগের ব্যবহারিক মন্ত্র বা মন্ত্রযোগে দীক্ষিত হলেই এঁরা(গৃহস্থ) ‘নাথ’। নাথধর্মে নারীরাও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। গুরুদীক্ষার অর্থ গুরুর গোত্রে প্রবেশ করা। নাথধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় বিভূতিস্নান

অপরিহার্য। বিভূতিমানের অর্থ হল নাথযোগীরা সহিষ্ণু এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবে। নাথপন্থে দীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

‘দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।’

অর্থাৎ যার সাহায্যে সাধকের সমস্ত প্রকার পাপক্ষয় হয় এবং জ্ঞান ও মুক্তি সম্ভব হয়ে ওঠে, তাকেই দীক্ষা বলা হয়েছে।^{২০৪}

নাথযোগী সম্প্রদায়ে শিবমন্ত্রে দীক্ষার সঙ্গে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাও প্রচলিত আছে। শিব ও শক্তি তত্ত্বত অভিন্ন—

‘শিবস্যাত্মন্তরে শক্তিঃ শক্তেরাত্মন্তরে শিবঃ।

অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।।’

অর্থাৎ শিবের অভ্যন্তরে শক্তি এবং শক্তির অভ্যন্তরে শিব, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই, যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় কোন ভেদ নেই। একই সচ্চিদানন্দময়, পরমতত্ত্বের ত্রিয়াতীত, গুণাতীত পরিণাম-রহিত আত্মস্বরূপ সমাহিত স্বভাবের নাম ‘শিব’ এবং সেই তত্ত্বের সক্রিয় সগুণ পরিণামী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিলাসী ভাবের নাম ‘শক্তি’।^{২০৫}

নাথসম্প্রদায়ের ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ গ্রন্থে দীক্ষা গ্রহণের সময় মস্তকমুণ্ডনের উল্লেখ পাওয়া যায়—

‘মস্তক মুণ্ডয়া কর্ণে ছিদ্র দিয়া ধরিব যোগীর বেশ।

কহে জালন্ধরী লব সঙ্গে করি আজি যাহ নিজ বাস।।’

নাথপন্থে ৩ শ্রেণির সাধু বা সন্ন্যাসী যোগী বর্তমান—

১. অবলম্বী বা সাথী যোগী,

২. অঘোর বা অঘোরপীর যোগী,

৩. দর্শনী বা অবধূত যোগী।

১. অবলম্বী বা সাথী যোগী: এই শ্রেণির যোগীরা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এঁদের তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলা যেতে পারে। নাথসাধু গুরুর কাছে প্রথমে তাঁরা নাথমন্ত্রে দীক্ষা লাভ

করেন। এইশ্রেণির নাথযোগীদের ‘নাথজীর নাতি’ বলা হয়। এঁরা নাথপন্থের গুরুকে গ্রহণ করেছেন এবং যোগ অনুশীলনের উপদেশ মেনে চলেন।

২. অঘোর বা অঘোরপীর যোগী: অঘোরপীর যোগীরা নিজেরাই গুরু নির্বাচন করেন। গুরু তাঁদের নিজস্ব পন্থ বা মার্গদর্শন সম্বন্ধে অবগত করান। একে চটিদীক্ষা বলা হয়। চটিদীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে নাথপরম্পরা অনুসারে নামকরণ করেন। নাথপন্থের বিভিন্নধারা সম্পর্কে শিষ্যযোগী গুরুর কাছে অবহিত হন। যোগী নির্দিষ্ট পোষাক পরা গুরু করেন। রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন। নাদী হাতে রাখেন, এটা নাথধর্মের প্রধান অঙ্গ। নাথপন্থে তাঁর নির্দিষ্ট পরিচিতি লাভ হয়। তিনসুতোর (উর্ণনির্মিত) উপবীত ধারণ করেন। নাদী উর্ণসুতোতে বাঁধা থাকে, একে নাদ-জনেউ বা নাদ-উপবীত বলা হয়। মানুষের দেহের ৭২০০০ নাড়ির মধ্যে মুখ্য নাড়ি ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ির প্রতীক হিসেবে নাদ-জনেউকে মান্য করা হয়। নাদীর আওয়াজ ব্রহ্মার প্রতীক বলে নাথপন্থে গণ্য হয়ে আসছে। নাথযোগী ৩ বার নাদী বা শিঙা বাজিয়ে গুরু ও দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করেন। নাদ অনুসন্ধানের সময় নাথযোগী অনাহত-চক্রকে নাদ শোনান। শেষে তিনি নিজগুরু ও ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন। অঘোরযোগী হিসেবে দর্শনযোগীর অর্ধেক আচার-রীতি পালন হয়ে যায়। উল্লেখ্য নাথপন্থে আলাদা করে কোনো অঘোরী ধারা নেই বলে যোগী আকাশনাথ জানালেন। অঘোর গুরুদীক্ষার একটা পর্যায় অর্থাৎ প্রথম পর্যায়। গুরু মহা অঘোর, তাই তিনি অঘোরী। যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী যেমন গুরু, তাই তাঁকে অঘোরী বলা হয়েছে। এছাড়া ‘পীর’ অর্থে পীড়া বা রোগব্যাদি হরণ করেন যিনি এই অর্থে বোঝান হয়েছে।^{২০৬} যোগী অবন্তিকানাথ জানান সাধারণত নাথমঠের প্রধান বা মোহান্তদের সম্মান অর্থে ‘পীর’-যোগী বলা হয়।^{২০৭}

৩. **দর্শনী বা অবধূতযোগী:** দর্শনী যোগীর দীক্ষাকে চিরা বা কানফাটা বা কর্ণছেদন দীক্ষা বলা হয়। নাথপন্থে এই দীক্ষাকে প্রধান বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের কানের মধ্যে ছিদ্র করে মাটির বড় কুণ্ডল পরিয়ে দেন। কুণ্ডলকে যোগদণ্ড বা মুদ্রা বলা হয়। কর্ণছেদনের ফলে যোগী দিব্যভাব অনুভব করেন। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের ধারায় চিরাদীক্ষা প্রচলিত আছে। কানফাটা হলে যোগী সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন বলে মনে করা হয়। কর্ণছেদন বা চিরাদীক্ষার পর শিষ্যকে পূর্ণ ‘নাথ’ বা অবধূত বলা হয়। অঘোরযোগী থেকে দর্শনীযোগীর মর্যাদা বেশি বলে মান্য দেওয়া হয়। দর্শনীযোগীকে নাথসম্প্রদায়ে পূর্ণসন্ন্যাসী বলে গণ্য করা হয়।

নাথযোগী সাধু বা সন্ন্যাসীদের **পঞ্চগুরু** অর্থাৎ **পাঁচপ্রকারের দীক্ষাগুরু** থাকেন। পাঁচপ্রকার দীক্ষা সংস্কারের আকারে বিদ্যমান রয়েছে এবং এটা বৈদিকধর্ম সংস্কারের অনুরূপ পদ্ধতি। নাথপন্থের এই সংস্কারগুলি এই বিষয়টিকে ইঙ্গিত করছে যে নবাগত-যোগী যোগসাধনার পথ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—

১. **লংগোট গুরু:** নাথপন্থে লংগোট গুরু লংগোটের ব্যবহার শেখান এবং ব্যাখ্যা করেন কীভাবে যৌনশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। লংগোট বা কৌপীন ব্রহ্মচর্যপালন, ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত। লংগোট শুধু একটি পোষাক নয়, এটা একটি বিশেষ ধরনের শক্তি যাকে যৌনাস্রবের উপর স্থাপন করে সুষুমা বরাবর উপরের দিকে উত্থাপন করে বেঁধে রাখা হয়। লংগোট বা কৌপীন দীক্ষার সঙ্গে একটি মন্ত্রও দেওয়া হয়। লংগোট গুরুকে বানা-গুরু বা ভগবা গুরু বা ভেস গুরুও বলা হয়। তিনি শিষ্যকে ভগবা বা গেরুয়া বস্ত্র বা ভেস পরিয়ে দেন বলে এরমকম নামকরণ হয়েছে।

২. চিরাগুরু: চিরাগুরু তাঁর শিষ্যের কানের মধ্যভাগে কিছুটা অংশ কেটে অন্তঃস্থ ঈড়া-পিঙ্গলাকে সুষুম্নার সঙ্গে যুক্ত করে সহস্রচক্রকে সক্রিয় করে দেন। গুরু শিষ্যকে কানের ছিদ্রে কুণ্ডল পরিয়ে দেন। এই পরম্পরাটিকে ‘যোগদণ্ড’ (অগ্নিপরীক্ষা) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিষ্য অতীতের যাবতীয় নেতিবাচক কর্ম থেকে শুদ্ধ হয়ে যান বলে মনে করা হয়। কানের মাঝখানে ছিদ্র অংশে গুরু শিষ্যকে মাটি বা গুপ্তারের সিং নির্মিত কুণ্ডল পরান। এইসময় শিষ্য নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেন না। এমনকি নিদ্রা ও চোয়াল নাড়াতে কষ্ট হয়। যোগীকে তখন তরল আহার দেওয়া হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষত নিরাময় হয়। এইসময় যোগী নিদ্রা, আহার ইত্যাদি প্রবৃত্তি কাটিয়ে গোরক্ষনাথের ধ্যানে মগ্ন থেকে তাঁর কৃপালাভ করেন। তিনি শিবস্বরূপ সম্পর্কে অবগত হন।

৩. বিভূতি বা বভূত বা ভস্মীগুরু: বভূত বা বিভূতি শব্দের অর্থ ভস্ম। পবিত্র ধূনির(যজ্ঞকুণ্ড) ভস্ম মাথা, হাত ও গায়ে মাখেন নাথযোগী সাধুরা। ভস্ম লেপন করতে কেবল তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা আঙুলের ব্যবহার করা হয়। বিভূতি বা বভূত যে সাধু দীক্ষার সময়ে গায়ে লেপন করে দেন তিনিই হলেন বিভূতি বা বভূতগুরু। মূলত শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাধুরা গায়ের লোমকূপগুলি ভস্ম দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে শীতে আত্মরক্ষা করেন। বিভূতি এক পবিত্র বস্তু যা গুরু বিতরণ করেন। বিভূতি ত্রিপুরা রূপেও ব্যবহার করা হয়।

৪. চোটিগুরু: চোটিগুরু আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যের মাথার কিছুটা চুল কেটে শিষ্যকে সাধুর প্রতীক গেরুয়া রঙের বস্ত্র প্রদান করেন (গোরক্ষনাথী গেরুয়া, কৌল লাল, নাথ-অঘোরী কালো বস্ত্র) এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নাথসম্প্রদায়ের শিষ্যকে আত্মনিয়ন্ত্রণ রাখার শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে বলেন।

৫.উপদেশী গুরু: নাথপন্থে চিরাদীক্ষা ছাড়া উপদেশী দীক্ষাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নাথপন্থে প্রচলিত কিংবদন্তি আছে যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আদিনাথ শিবের কাছ থেকে নির্দেশ (উপদেশ) লাভ করেছিলেন। তিনি মাছের পেট থেকে এই জ্ঞান বা উপদেশ লাভ করেন। আদিনাথ-শিব মূলত পার্বতীকে (উদয়নাথ) এই জ্ঞান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ এই জ্ঞান শুনেনি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শক্তি উপাসনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ এইরকমই নির্দেশ বা উপদেশী হয়েছিলেন। তাই মৎস্যেন্দ্রনাথ সকল কৌলের গুরু হিসেবে সম্মানিত হন এবং তিনি মাতৃদেবীর উপাসনা করতেন। নাথপন্থে বিশ্বাস করা হয় উপদেশী দীক্ষামাতা পার্বতী বা শক্তিদেবী উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হন। এই পরম্পরা আজও শ্রীবিদ্যা, কৌল ও নাথ-অঘোরী পরম্পরায় বিদ্যমান। শ্রীবিদ্যায় দেবী বালা যেমন আরাধ্য তেমনি নাথপন্থে দেবী যোগমায়া বালাসুন্দরীকে আরাধনা করা হয়। তিনি সংসারে জীবের মূর্ততার কারণ, তিনি আত্মাকেও সংসার থেকে বের হতে সাহায্য করেন। ‘বাল’-র অর্থ ব্রহ্মচারী, যেমন যোগী গোরক্ষনাথও ব্রহ্মচারী। দেবী বালাসুন্দরী হলেন কুমারী। শুধুমাত্র যোগীরাই এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন যারা অনুভূতির শুদ্ধতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সাধনপ্রক্রিয়া অন্যান্য উগ্র তান্ত্রিক সম্প্রদায় থেকে নাথসম্প্রদায়ের আলাদা, যেখানে অবাধে পঞ্চ-ম-কার সাধনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

নাথসম্প্রদায়ে পঞ্চগুরুর বাইরে আরও একপ্রকার গুরু রয়েছেন, তিনি হলেন ‘করাত গুরু’। তিনি দর্শনী-যোগী শিষ্যকে চিরা দেওয়ার দীক্ষা দেন। তখন দর্শনী যোগী করাত গুরুর দীক্ষাক্রমে অন্যকে চিরা বা দর্শনী বা মুদ্রা দেওয়ার অধিকার লাভ করেন।

গুরুর শিষ্যের চুলকাটা, লংগোট ধারণ, বিভূতি ধারণ, ভগবা বা গেরুয়া কাপড় পরিধান, নাদ বাজানো, খপ্পর গ্রহণ, তুম্বা বা কমণ্ডলু, বাঘ অথবা মৃগছাল পরিধান, চিমটা

অথবা ত্রিশূলের পৃথক মন্ত্র গুরু শিষ্যকে জানিয়ে দেন। এসব মন্ত্রের উল্লেখ নাথ সম্প্রদায়ের ‘শাবর চিন্তামণিঃ’, ‘অথ গোরক্ষনাথ অবতার কথা’, ‘শ্রীনাথ রহস্য’ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে।^{২০৮}

বর্ণব্যবস্থা:

নাথযোগী সম্প্রদায়ের ‘যোগীসম্প্রদায়াবিকৃতি’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে মনু অনুসারে যদিও ক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী হওয়ার বিধান রয়েছে তবু মনুর নির্দেশ সর্বত্র নিয়মাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ এই নিয়মে বলা নেই মানুষের তিন আশ্রমের পরে সন্ন্যাসী হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু মানুষ এতটাই বিষয়াসক্ত যে তিন আশ্রমে থেকেও তাঁদের মধ্যে এই চেতনা নেই যে ভগবানের প্রিয় হতে হবে। কিন্তু যখন তাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমে আসেন তখন তাঁদের বিষয়াসক্তি ত্যাগ করতে হয়। যাঁরা বিষয়-লোলুপ নন তাঁরা সবসময় ঈশ্বরের কৃপা পেতে উদগ্রীব থাকেন। এরকম মানুষ যেকোনো সময় সন্ন্যাসী হতে পারেন। মনুর নির্দেশে বলা হয়েছে—‘যদহরেব বিরজেতদহরেব প্রব্রজেদ্ বনাদগৃহাদ্বা’। এসব শ্রুতিবাক্য নাথযোগী সমাজের ধর্মশাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসীর বহির্ভূত। তাঁরা সিদ্ধাতীত যোগোপায় দ্বারা ব্রহ্মাদি প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।^{২০৯} ১৯০১ খ্রি. জনগণনা অনুসারে দেখা যায় সব শ্রেণির মানুষ নাথসম্প্রদায়ে রয়েছেন। নাথসম্প্রদায়ে কঠোর বর্ণবিভাজনের নিয়ম কোনদিন ছিল না। বরং সমাজের কঠোর ব্যবস্থায় পীড়িত ও তিরস্কৃত মানুষেরা নাথপন্থে আশ্রয় পেয়েছেন। তবু নাথসম্প্রদায়ের জীবনপদ্ধতি, সাধনাপদ্ধতি তথা দর্শন সম্পূর্ণ আর্থভাবধারা উদ্ভূত।^{২১০}

নাথযোগীদের ‘সুষম্বেদ’ পুথিতে বিভিন্ন বেদের দেবতা নির্ণয় করা হয়েছে— ঋগবেদ-ব্রহ্মা, যজুর্বেদ-বিষ্ণু, সামবেদ-শিব, অথর্ববেদ-অনাদিধর্ম, অনিলবেদ-পার্বতী, সূক্ষ্মবেদ-শ্রীনাথ যতি। আবার দেহের বিভিন্ন অংশে বেদের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

কর্ণে- ঋগ্বেদ, নাসিকাতে-যজু, মুখে-সাম, চোখে-অথর্ব, লিঙ্গে-অনিলবেদ, ব্রহ্মতালুতে-সূক্ষ্মবেদ। গ্রাম্য নাথযোগীরা তাঁদের পুথিগুলিতে বেদ সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম বিচার করেছেন তা উপনিষদের গুহ্য আলোচনারই পরিচয়বাহী। তাই যোগীসমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে—

‘ক্রিয়াকাণ্ডী বলে যোগী বেদ নাহি মানে।

যোগী বলে ক্রিয়াকাণ্ডী বেদ নাহি জানে।।’

বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণেরা পরাকবৃত্ত, বেদের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ করেন। যোগী তা করেন না। যোগীর দৃষ্টি বেদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম-গূঢ় তত্ত্বের প্রতি। তিনি অন্তরাবৃত্তচক্ষুঃ। বেদের মুনিধারা ও ঋষিধারার এইখানেই দ্বন্দ্ব। উভয়েই আর্য এবং বৈদিক, মতদ্বৈধতা শুধু বেদের আচরণে।^{২১১} জি. ডব্লু. ব্রিগস বলেছেন—

Yogis are casteless. Within the order there are no caste restrictions upon eating, drinking and smoking. But Hindu and Musalman Yogis do not eat together, the former refusing to eat with the latter. Although women of all panths eat together.^{২১২}

ড. কল্যাণী মল্লিক মনে করেন নাথযোগীদের মধ্যে জাতিভেদ নেই কিন্তু শ্রেণিভেদ আছে।^{২১৩}

নাথযোগীরা ব্রাহ্মণের বর্ণ হলে বেদের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ‘নাথ’ শব্দটির এতবার ব্যবহার হত না। তাছাড়া শব্দটির অর্থেরও কোন অবনমন ঘটে নি; ঈশ্বর, স্বামী, প্রভু, অধিপতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বেদপাঠের অধিকারে, পুজোচনা, গুরুগিরি, সন্ন্যাস-আশ্রম, যোগ-তপ চর্চার গুণকর্মে নাথযোগীরা ব্রাহ্মণবর্ণেরই অন্তর্গত। গুরুগিরি নাথযোগীদের স্ববৃত্তি, তাঁদের ব্যবসা পরবৃত্তি। যোগীভিক্ষা যোগাচারের এক সংস্কারমূলক রীতি, বৃত্তি নয়। বর্ণবিভাগ সমাজের, সন্ন্যাসধর্মাচরণের জন্য নয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে নাথযোগীদের কিছুক্ষেত্রে যে ব্রাহ্মণবর্ণ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে তা

সমাজবহির্ভূত নাথ-সন্ন্যাসধর্মের জন্যই। মধ্যযুগের সাহিত্যিকগণ যেভাবে নাথযোগীদের বন্দনা করেছেন তা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য করেননি। সন্ন্যাসী নাথযোগীর উপস্থিতি ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যে দেখা গিয়েছে। তবে ব্রাহ্মণ হিসেবে নয়, যোগী হিসেবেই নাথসম্প্রদায়ের খ্যাতি সর্বত্র লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ময়নামতীর গানের ভূমিকা, পৃ. ৭।
২. কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ১৯৫।
৩. ‘আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবনুজ্ঞো ন সংশয়।’
৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ১৬৬।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
৬. ত্বমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম, ত্বম দেবতানাং পরমং দেবম।-রাজমোহন নাথ, নাথযোগীতত্ত্ব, পৃ. ২১।
৭. হঠযোগ প্রদীপিকা ১/৬৮।
৮. যোগবীজ, শ্লোক ৮৩।
৯. গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃ. ৫৯।
১০. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ, পৃ. ৬৩-৬৪।
১১. মনীন্দ্রমোহন বসু, চর্যাপদ, পৃ. ৬৪।
১২. ঋক্বেদ ১/৩৫/৬, অথর্ববেদ ১০/৭/২২।
১৩. গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, পৃ. ২৫।
১৪. গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ, পৃ. ১।
১৫. জীবন নাথ, ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা, পৃ. ১১৬।
১৬. সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী (সম্পা.), শ্লোক ৬/৯৪।
১৭. সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, ৬/৯৪।
১৮. প্রাগুক্ত, ৬/৯৫।
১৯. ঋগ্বেদ ১/১৭৯/৬।
২০. Yoga- Mircea Eliade- Bollingen Series LVI, pp.302-303; রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান, পৃ. ৪৫-৪৬।
২১. সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, পৃ. ২৩।
২২. জীবন নাথ, ভূমিকা পৃ. ৬; উত্তর-পূর্ব ভারতের শৈবনাথ-সম্প্রদায়।
২৩. প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. ৮।
২৪. যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, পৃ. ৫০।
২৫. জীবননাথ, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. ঘ।

২৬. প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. ৬।
২৭. প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. চ-ছ।
২৮. প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. এ৩।
২৯. সাক্ষাৎকার, ভোলানাথ যোগী, লেখক ও গবেষক, নেপাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।
৩০. ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয়, পৃ. ১০৮।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
৩৪. বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি, পৃ. ১৫-১৮।
৩৫. জীবন নাথ, রাজমোহন নাথ, পৃ. ৬৮।
৩৬. Kalyani Mallik, Siddha- Siddhanta- Paddhati and Other Works of the Natha Yogis, Yoga Visaya, Sloka 13-14.
৩৭. জীবন নাথ, রাজমোহন নাথ, পৃ. ১২৮।
৩৮. বঙ্গচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, নাথবন্ধু হরিমোহন, পৃ. ১৩১-১৩২।
৩৯. রাজমোহন নাথ, নাথযোগীতত্ত্ব, পৃ. ৭।
৪০. নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ভারতের অধ্যাত্মবাদ, পৃ. ১৭।
৪১. সাক্ষাৎকার, রুদ্রনাথ যোগী, নাথসন্ন্যাসী, হুগলি, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০।
৪২. বেদপ্রকাশ জুনেজা, রাজস্থানের নাথসাহিত্য, পৃ. ৩৬; কমলকিশোর সাংখলা, রাজস্থানের নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ. ১৮।
৪৩. কমল সিংহ সোলংকী, নাথপন্থ অউর উসকা প্রভাব, পৃ. ১২৫।
৪৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২/১২।
৪৫. সাক্ষাৎকার, অবন্তিকানাথ যোগী, নাথসন্ন্যাসী, গির্গার গুজরাট, জুন ২০২২।
৪৬. মৎস্যেন্দ্রনাথ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ১/১-২।
৪৭. আগমসংহিতা, শ্লোক ৩১-৩২।
৪৮. ভরতচন্দ্র ভট্টাচার্য শিরোমণি, যোগিসংস্কার-ব্যবস্থা ও আগম সংহিতা, পৃ. ২১।
৪৯. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুথি, পৃ. ২৭।
৫০. রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা, পৃ. ১৫।
৫১. জীবন নাথ, মধ্যযুগে বাংলার সমাজবিন্যাসে নাথের স্থান, নাথবন্ধু পত্রিকা, দেবনাথ নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ (সম্পা.), পুজো সংখ্যা ১৩৯৫, পৃ. ২২।

৫২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।
৫৩. মধ্যযুগের সমাজবিন্যাসে নাথদের স্থান, পৃ. ২১-২২।
৫৪. *গোখবিজয়*, পৃ. ১৭।
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
৫৬. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, পৃ. ১৩।
৫৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন আদিপর্ব*, পৃ. ৯৭-৯৯।
৫৮. Chanda SPCIV (MASI 41) 33; ভারতীয় দর্শন আদিপর্ব, পৃ. ৯৮।
৫৯. ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়, পৃ. ৩৭।
৬০. Gait: Census of India, 1901; শিপ্রা বিশ্বাস, *অন্বেষণ বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২।
৬১. ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়, পৃ. ৩৮।
৬২. বল্লালসেনের *দানসাগর*, ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ৬-৭; অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৪২।
৬৩. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০৪-১০৫।
৬৪. *হিন্দুশাস্ত্র*, রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), পৃ. ৩৪-৩৫।
৬৫. অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, পৃ. ৩০-৩১।
৬৬. পৃ. ১৩৪।
৬৭. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ৭।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
৬৯. *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি* ১/৬-৭।
৭০. *শ্রীশ্রীরক্ষবৈবর্তপুরাণ*, সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), পৃ. ৬২-৬৫।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
৭৩. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* বংশীখণ্ড, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বল্লভ (সম্পা.), পৃ. ১২৫।
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
৭৬. *পদ্মাপুরাণ*, ১৩৩৫, পৃ. ১৭০।
৭৭. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ৬৫।
৭৮. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), *মধ্যখণ্ড*, পৃ. ১৫৭।

৭৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃ. ৬৭২।
৮০. *গোবিন্দবিজয়*, ১৯৬৯, পৃ. ২৬৮।
৮১. *বল্লালচরিত*, শশিভূষণ ভট্টাচার্য (অনূ.), উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১১।
৮২. প্রভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৮৫।
৮৩. *অনিলপুরাণ*, পৃ. ৪৮।
৮৪. *বিচিত্র সাহিত্য* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।
৮৫. পৃ. ৪০।
৮৬. *গোখবিজয়*, পৃ. ৫৩।
৮৭. *প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-দেবতা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
৯০. *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩।
৯১. জগদীশ নারায়ণ সরকার, *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, পৃ. ৮৬-৮৮।
৯২. সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, পৃ. ৩৮০।
৯৩. জীবন নাথ, *নাথবন্ধু পত্রিকা*, পৃ. ৩৮।
৯৪. *Sekasubhodaya of Halayudha Misra*, Sukumar Sen (ed.), pp. 226-227.
৯৫. *হিন্দুবাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, পৃ. ১১০-১১১।
৯৬. সাক্ষাৎকার: সৎপুরানন্দনাথ যোগী, নাথসন্ন্যাসী, কালিম্পং, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।
৯৭. Partha Sarathi Nath, *Nath Pantha Shrines and perpetual Tradition in Bangladesh*, pp.205-209.
৯৮. *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি* ৫/৪৬।
৯৯. প্রাগুক্ত, ৬/৩৫।
১০০. সাক্ষাৎকার: সৎপুরানন্দনাথ যোগী, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।
১০১. প্রসন্নকুমার কবিরত্ন (অনূ.), *গোরক্ষসংহিতা*, পৃ. ৫৭-৬০।
১০২. জীবন নাথ, *রাজমোহন নাথ*, পৃ. ৫৪।
১০৩. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, পৃ. ৭৯-৮৩।
১০৪. *গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ*, পৃ. ৯৮।
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
১০৬. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *আলোকপর্ব*, সন্ধ্যা চৌধুরী (অনূ.), পৃ. ৮৯-৯৫।

১০৭. হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ, পৃ. ৩০।
১০৮. O' Malley, *Census of India*, 1911, Vol. 5, pp. 232-233.
১০৯. *Religion and Society in North East India*, D. Nath (ed.), p.332.
১১০. R. C. Majumdar, *The History of Bengal*, Vol.1, p.423.
১১১. অশ্বেষণ বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৬৩।
১১২. Gait, *Census of India*, 1901, Vol. 6, p.381.
১১৩. রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান, পৃ. ৪৮-৫০।
১১৪. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, ১/১৫।
১১৫. প্রাণ্ডক্ত, ১/১৮।
১১৬. নিগমসংক-দুর্গামঙ্গলগান, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, নাথধর্ম ও সাহিত্য, পৃ. ৪৫।
১১৭. Osho, *Maro He Jogi Maro*, p. 6.
১১৮. গোরক্ষবাণী, ১ম খণ্ড, শ্লোক ২৬।
১১৯. কঠোপনিষদ ২/৩/১৮।
১২০. মীননাথ, পরদর্শন; রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান, পৃ. ৩৮।
১২১. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮।
১২২. গোপীচন্দ্রের গান, আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ২৩।
১২৩. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় পরিপ্রেক্ষে মৈ, পৃ. ২৪।
১২৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ৫০-৫২; আর. এম দেবনাথ, বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন, পৃ. ৩৭।
১২৫. মৎস্যেন্দ্রনাথ, শাবরচিত্তামণিঃ, শ্লোক ১/৮-৯।
১২৬. কৌলজ্ঞাননির্ণয়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী (সম্পা.), পৃ. ১৯।
১২৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৮-৭২।
১২৮. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথসম্প্রদায়, পৃ. ১।
১২৯. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ, পৃ. ৫০-৫১।
১৩০. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নাথ সম্প্রদায়, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২।
১৩১. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩।
১৩২. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪।
১৩৩. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২৩১-২৩২।
১৩৪. G. W. Briggs, *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, p. 63.

১৩৫. *ibid*, pp. 63-69.
১৩৬. শ্লোক ১-১২।
১৩৭. বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২৩৩।
১৩৮. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ. ৯৮।
১৩৯. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ২৫।
১৪০. পৃ. ৪, ঐ, পৃ. ২৫।
১৪১. চন্দ্রনাথ যোগী, *যোগিসম্প্রদায়াবিস্তৃতি*, পৃ. ৩; *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ২৬।
১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
১৪৩. *Catalogue of Nepal*, Vol. 2, p. 149.
১৪৪. *নবনাথ্যে রা নাম*, পুঁথি সংখ্যা ১৩৭৭০, রাজ্য প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান যোধপুর, রাজস্থান ১৮৬১ বি.; কমলকিশোর সাংখলা, *রাজস্থানের নাথ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৪।
১৪৫. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ২৭-২৮।
১৪৬. G. W. Briggs, p. 33.
১৪৭. Yogi Hukam Singh Tanwar, *Nath Sampraday (Itihas evm Darshan)*, p. 103.
১৪৮. *ibid*, p.103.
১৪৯. *শ্রীনাথরহস্য*, পৃ. ৪৭।
১৫০. বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ২, পৃ. ১০৮।
১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।
১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২।
১৫৩. Vidya Dehejia, *Yogini Cult and Temples A Tantric Tradition*, p. 11.
১৫৪. সাক্ষাৎকার, সৎপুরানন্দনাথ যোগী।
১৫৫. ডম্বরুধর নাথ, *অসমের নাথযোগীসকলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, হরকুমার নাথ (সম্পাদ.), *যুগবাণী পত্রিকা*, নভেম্বর ২০১৭, হোজাই অসম, পৃ. ৭৮।
১৫৬. অষ্টম পটল, শ্লোক ২৭-২৮।
১৫৭. Csaba Kiss, *The Yoga of the Matsyendra Samhita*, p. 67 & 138.
১৫৮. Vidya Dehejia, p. 45.
১৫৯. সাক্ষাৎকার, সৎপুরানন্দনাথ যোগী।
১৬০. সাধক বাসুদেব, *ম*, পৃ. ৩৭।
১৬১. *Varna-Ratnakara*, Suniti Kumar Chatterji (ed.), p. 57-58.

১৬২. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ৩৩-৩৫।
১৬৩. *শ্রীনাথরহস্য*, পৃ. ৬৪-৮০।
১৬৪. প্রফুল্লকুমার নাথ, *অসমের নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি*, পৃ. ৮০।
১৬৫. রাজমোহন নাথ, *নাথযোগীতত্ত্ব*, পৃ. ৭-১৩।
১৬৬. মুণ্ডক উপনিষদ, ৩/২/৯।
১৬৭. জীবন নাথ, *রাজমোহন নাথ*, পৃ. ৫৪।
১৬৮. ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৩৯।
১৬৯. বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২২২-২২৫।
১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
১৭১. প্রফুল্লকুমার নাথ, পৃ. ৮৮।
১৭২. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, *মহাযোগী শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও উপদেশাবলী*, পৃ. ৪।
১৭৩. গোখবিজয়, পৃ. ৫৪।
১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
১৭৬. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, *যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার*, পৃ. ১।
১৭৭. হিরণ্ময় নাথ, *উত্তরপূর্ব ভারতের শৈব-নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ১২৫।
১৭৮. রাজমোহন নাথ, *গোপীচন্দ্রের গান*, পৃ. ৪৮-৪৯।
১৭৯. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, *যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার*, পৃ. ৪-১৯।
১৮০. *গোরক্ষসংহিতা*, ৩/৩১।
১৮১. গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, *যোগসোপান*, পৃ. ৭৮।
১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১৮৩. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, *যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার*, পৃ. ১৯-২০।
১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।
১৮৬. হিরণ্ময় নাথ, *উত্তরপূর্ব ভারতের শৈব-নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ৮৮।
১৮৭. James Mallinson, *The Khecarividya of Adinatha*, p. 67.
১৮৮. হরেকৃষ্ণ দে, *আত্মারাম শ্রীশ্রীবাবা সুন্দরনাথ*, পৃ. ভূমিকা- ৬।
১৮৯. ঋগ্বেদ ৭/৬/১০, অথর্ব ১৮/২/৪৯, ১৮/২/৩৪।

১৯০. আগম- সংহিতা, শ্লোক- ১২৫।
১৯১. প্রফুল্লকুমার নাথ, পৃ. ৮৩।
১৯২. আত্মারাম শ্রীশ্রীবাবা সুন্দরনাথ, পৃ. ৬৫।
১৯৩. Sadhu Santinatha, *Experience of a Truth Seeker*, Vol.1, p.525.
১৯৪. জীবন নাথ, ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা, পৃ. ১২৭।
১৯৫. S. A. Dake, *Gnyaneshwar the Great*, p. 66.
১৯৬. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগীরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ, পৃ. ১৮০-১৮১।
১৯৭. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, মহাযোগী শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও উপদেশাবলী, পৃ. ৩।
১৯৮. সাক্ষাৎকার, বলাই চক্রবর্তী, যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর শিষ্য, নরেন্দ্রপুর, ১৪ নভেম্বর ২০২১।
১৯৯. আদেশ পত্রিকা, পৃ. ৫।
২০০. Yoga by M. E., p. 422; রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা, পৃ. ২৭।
২০১. A. B. Keith, *Religion and Philosophy*, 1925, p. 417.
২০২. যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার, পৃ. ২৫-২৭।
২০৩. শ্লোক ২৩৩; বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ৪৩।
২০৪. প্রফুল্লকুমার নাথ, পৃ. ৮২।
২০৫. শ্রীশ্রীযোগীরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ, পৃ. ৫১।
২০৬. সাক্ষাৎকার, যোগী আকাশনাথ, নাথসন্ন্যাসী হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ২০২৪।
২০৭. সাক্ষাৎকার, যোগী অবন্তিকানাথ, নাথসন্ন্যাসী গির্গার গুজরাট, ৩০ আগস্ট ২০১৯।
২০৮. সাক্ষাৎকার I) যোগী শিবনাথ, মোহান্ত কেয়ারব্যাঙ্ক মঠ, কটক, ওড়িশা; ৬মে ২০২৪।
- II) যোগী শনিনাথ, নাথসন্ন্যাসী কলকাতা, ৭মে ২০২৪।
২০৯. চন্দ্রনাথ যোগী, যোগীসম্প্রদায়বিষ্কৃতি, পৃ.৪৩৫-৪৩৬।
২১০. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায়কে পরিপ্রেক্ষে মৈ, পৃ. ৫৮।
২১১. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭।
২১২. G. W. Briggs, p. 27.
- ২১৩ ভারতীয় সাধনা, পৃ. ৯২।

২. গ. নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-জীবন

জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ বিকাশে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি নাথসম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি। বিশেষত নাথসম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিচয়ই নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবন। সংস্কৃতি একটি গতিশীল বিষয়। তাই একজন মানুষ তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করে তোলার সুযোগ লাভ করেন। নাথসম্প্রদায়ের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পোশাক, ধর্মবিশ্বাস, জীবন ইত্যাদি বিশেষত্ব সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে—

লিঙ্গ উপাসনা:

নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হল তারা শৈবযোগী। তারা তাদের সাধনা, পূজো-অর্চনায় চিরকাল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শিব উপাসনার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এসেছেন। যোনিলিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ তাদের আরাধ্য।

নাথদর্শনের গোড়ার কথা—‘যত্র জীব-তথা যত্র সৃষ্টি তত্র শিব’। ব্রহ্মাও সৃষ্টিতে ভূভূবর্দী সপ্ত প্রকাশ (রোচ=লোক), সুতরাং শিবেরও সপ্ত স্তর। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে পিণ্ডে; তাই সপ্তলোকের প্রতীক হিসেবে মানবদেহে সপ্তচক্র অবস্থিত। প্রত্যেক চক্রে আবার এক এক শিবের অবস্থান। মূলাধারে- স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা শিব, স্বাধিষ্ঠানে- বিষ্ণুশিব, মণিপুরে- রুদ্রশিব, অনাহতে- ঈশান বা ঈশ্বর শিব, বিশুদ্ধে- সদাশিব, আঞ্জায়- পরশিব এবং সহস্রারে- পরম শিব। সপ্তলোককে প্রধান তিনভাগে বিভক্ত করে— নিম্নত্রিলোকী, মধ্যত্রিলোকী ও উর্ধ্বত্রিলোকী ভাবে বিবেচনা করা হয়। চক্রগুলিকেও সেইভাবে—মূলাধার – স্বাধিষ্ঠান -মণিপুর- নিম্নত্রিলোকী অধিষ্ঠাতা-ব্রহ্মাশিব, জগৎ ব্যাপার সম্পর্কিত-আদিনাথ

শিব, মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধে—বিষ্ণুশিব; রক্ষা ব্যাপার সম্পর্কিত-অনাদিনাথ এবং বিশুদ্ধ-আজ্ঞা-সহস্রারে-উর্ধ্বত্রিলোকী- রুদ্রশিব বা অলকনাথ অবস্থান করেন।^১

শিব পাতঞ্জল দর্শন, ঈশ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ মতে গুরু। ঋগ্বেদে ‘বিষাণিনঃ শিবাসঃ’ অর্থাৎ বিষাণধারী শিবজাতির উল্লেখ আছে। তাঁদের বংশধরেরাই দীক্ষান্তে শিঙ্গী-নাদ ধারণকারী নাথযোগী সম্প্রদায়। যজমান বন্দনীয় জনকে বলেন-‘ওঁ নমঃ শিবায়’ এবং গুরুজন যজমানকে প্রত্যভিবাদনে বলেন ‘শিবায় নমঃ’। তখন গুরু-শিষ্য একাকার হয়ে যান। নাথযোগীর প্রাথমিক দীক্ষামন্ত্র ‘ওঁ নমঃ শিবায়’। সৃষ্টির মূলীভূত কারণ শিব। আবার শিব থেকেই সর্বজ্ঞান প্রসূত। যজুর্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে শিব নাথযোগে আসেন। সৃষ্টিকালীন অবস্থায় শিব-শক্তি তথা পুরুষ-প্রকৃতি সামরস্য অবস্থায় থাকেন। সৃষ্টিহেতু শক্তি বিমর্শা হন। নাথযোগে এরই নাম কুলকুণ্ডলিনীকে অকুল শিবের সঙ্গে যুক্ত করা।^২ যোগী শক্তিনাথ মনে করেন আদিতে নিরাকার নাথ-নিরঞ্জন নাথযোগীগণের উপাস্য হলেও কালক্রমে সাধারণের উপাসনার সুবিধার্থে যোনি-লিঙ্গের উপাসনা প্রবর্তিত হয়। বাণলিঙ্গ তাঁদের সদারাধ্য—

‘বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগনাম যোগসাধনে।

কৌলিকানং কুলাচার পশু নাম শত্রু নিগ্রহে।।’^৩

মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ গ্রন্থের তৃতীয় পটলে উল্লেখ করেছেন কুল (শক্তি) এমন একটি অবস্থা যেখানে মন এবং দৃষ্টি একাত্মতা লাভ করে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বাতন্ত্র্য হারায়, নিজ-শক্তি ‘জীব’-র সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে এবং দৃষ্টিকল্পনার সঙ্গে বিষয়ীভূত হয়ে যায়। দেহের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে সহস্রা-পদম। এটি স্বাধীন, সর্বব্যাপী এবং অপবিত্রতা মুক্ত। সবকিছু তার ইচ্ছায় উৎপন্ন হয় এবং সবকিছু তার সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে এটি লিঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে—

‘সৃষ্টিসংহারকর্তারং তল্লিঙ্গং সিদ্ধপূজিতম্।
স্মুরন্তন্ নির্মলনিত্যং অপ্রমেয়ং সদৌদিতম্।।
জ্বলন্তং উক্সদৃশং বিন্দুতেজো নভস্তলে।
এতল্লিঙ্গবরং জাত্বা দৃষ্ট্বা মোক্ষস্য ভাজনঃ।।’^৪

এই লিঙ্গ সৃষ্টি ও ধ্বংসের কর্তা; তা নিত্যশুদ্ধ, নিত্য বর্তমান, অপরিমেয় এবং আকাশের নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে। এটাই মানসলিঙ্গ—

‘অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়েন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
তৃতীয়ন্ত দয়াপুষ্পং ভাবপুষ্পচতুর্থম্।।
পঞ্চমন্ত ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ক্রোধবিনির্জিতম্।
সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্ত জ্ঞানপুষ্পন্ত অষ্টমম্।।
এতত্ পুষ্পবিধিং জাত্বা অর্চয়েল্লিঙ্গমানসম্।’^৫

তন্ত্রে সপ্তাচারের উর্ধ্বে, সপ্তপাতালের উর্ধ্বে, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরের উর্ধ্বে, যোগীর সংসপ্তকের উর্ধ্বে লিঙ্গের স্থান। তার প্রতীকও এই লিঙ্গ। শুদ্ধভাবে লিঙ্গ অহম্ সত্তার প্রতীক।

লিঙ্গ সৃষ্টির প্রতীক। নাথযোগীদের মতে ব্রহ্মই মানবদেহে লিঙ্গরূপে অবস্থান করছে। এই লিঙ্গকে আবৃত করে শক্তি কুণ্ডলীকৃত সাপের মত জীবদেহ রক্ষা করে চলেছে।^৬ নাথযোগীরা প্রাণ-অপানের আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়ন্ত্রক পরমাত্মা শিবকে চিহ্ন বা প্রতীক লিঙ্গ হিসেবে জ্ঞান করে পূজো করে আসছে। বিভিন্ন পুরাণে তার পরিচয় পাওয়া যায়।^৭

যোগপন্থী ও জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসীগণ অধিকাংশ স্থলে শৈব হয়ে থাকেন। ত্যাগ, যোগ ও জ্ঞান—শৈবধর্মে এই তিনটিই নিত্যযুক্ত। একদিকে শিব যেমন বৈরাগী, জ্ঞানী ও যোগীর আরাধ্য অন্যদিকে তিনি আবার সর্বসাধারণের আরাধ্য।^৮

নাথধর্মে ঈশ্বর:

নাথধর্মে মূর্তিপূজা ছিল না, লিঙ্গপূজা রয়েছে। নাথধর্মের প্রধান বিশেষত্ব হল তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে অজর অমর হয়ে ‘অজপা গায়ত্রী’ মন্ত্রের সাহায্যে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা।^{১৭} যোগের সাহায্যে আনন্দ-স্বরূপকে জানলে আর কিছু জানার বাকি থাকে না। নাথসিদ্ধরা যোগসাধনায় পার্থিব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন।^{১৮} ড. সুকুমার সেনের মতে নাথসম্প্রদায় নিরীশ্বরবাদী।^{১৯} কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় নাথধর্ম সেশ্বরবাদী। নাথধর্মে শিবকেই ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।^{২০} আদিনাথ শিবই হঠযোগের প্রধান উপদেষ্টা।^{২১} নাথ সম্প্রদায়ের ঈশ্বরতত্ত্বে অষ্টমূর্তির কল্পনা করা হয়েছে।^{২২} গোরক্ষনাথের মতে যিনি ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য আদি সমন্বিত তিনিই ঈশ্বর বা নাথস্বরূপ। নাথেই মুক্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। নাথ সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম নির্গুণ-সগুণের অতীত, সর্বব্যাপক। সর্বদেবতার মধ্যে শিব উত্তম, নাথ শিবের উত্তম।^{২৩} ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থে নাথ ব্রহ্মস্বরূপ নিরঞ্জন শিবকেই নমস্কার জানানো হয়েছে।^{২৪} গোরক্ষনাথের যোগ মনের সাধনপ্রণালী, পূজাবিধান যেখানে শারীরিক ও মানসিক সংযম দুইই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোরক্ষনাথী সম্প্রদায় মূলত শৈব। শিব ও শক্তির সম্পূর্ণ সত্তার একমাত্র কারণ তথা জীবনের পরিণতির কথা ভেবে তাঁদের পূজা করা হয়। গোরক্ষনাথ সেই কারণে দেশের সর্বত্র শিব-কালীর মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন।^{২৫}

নাথযোগীর বেশভূষা:

নাথযোগীগণ শৃঙ্গী, মেখলা, মুদ্রা, শেলী, ঝোলা, কুণ্ডল, ত্রিশূল, ডম্বরু, চিমটা, খপ্পর, বিভূতি, নাদজনেউ বা নাদ-উপবীত ইত্যাদি ধারণ করেন। যোগীর গান গাওয়ার সময় সারঙ্গী অথবা গোপীযন্ত্র ব্যবহার করেন। যোগী সৎপুরানন্দনাথ একতারা ব্যবহার করেন যোগীর গান গাইতে, পাঁশকুড়া সিদ্ধিনাথ মঠের যোগী সীতারামনাথ আবার হারমোনিয়াম

বাজিয়ে যোগীর গান করেন। নাথযোগী গৃহস্থ রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরেন, পূজো-ধ্যান যোগচর্চার সময় গেরুয়া বা লাল বস্ত্র পরিধান করেন। গায়ে উত্তরীয় বা শিব মহামন্ত্র নামাবলী পরেন। এছাড়া নাথযোগী সন্ন্যাসীদের নরাস্ত্রির মালা, বাঘছাল, রুদ্রাক্ষের মালা, ঠুমরি, পুতি বা ক্রিস্টালের মালা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

নাথযোগী গৃহস্থ অনুষ্ঠানের সময় এবং সন্ন্যাসী সবসময় শরীরে ধুনির ভস্ম বা বিভূতি লেপন করেন। হৃদয়, বাহুমূল ও কপালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। নাথ অঘোরী সন্ন্যাসীরা কালো রঙের বস্ত্র পরেন, নাথকৌল লাল এবং গোরক্ষনাথীরা গেরুয়া কাপড় ব্যবহার করেন। তবে সাধন প্রক্রিয়া অনুযায়ী বস্ত্রের রঙ পরিবর্তিত হতে পারে। নাথযোগীর সাজ-পোশাকের বর্ণনা ‘অথ গোরক্ষগীতা’ গ্রন্থে পাওয়া যায়—

‘স্বরূপধারী—ত্রিশূলধারী – স্মরি তোমারি নামং।

ত্রিশূলধারী সিঙ্গা স্মরণং অনন্তগুণ অনন্তসিদ্ধাচরণং ।।

অনন্ত রূপং শ্রীভগবানং পরমেশ্বরং।

শিরেতে পত্র কান্ধেতে ত্রিশূলং

হস্তে কঙ্কন-চন্দ্রং কর্ণে কুণ্ডলং

পিন্ধনে কপিনং বুকতে ছেলীয়ং।।’^{১৮}

নাথযোগীদের ভূষণ হিসেবে নাদ, মুদ্রা, সেলী, বুলি, আশা, আধারী, বাটোয়া, কস্থা, বাঘছাল, বিভূতি-পুটিকা, মতংগা, মেখলা, নাগনী, নাগফণী, গোরখধাক্কা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় ‘অথ কুলাঞ্জিপট’ পুথিতে। এইসব ভূষণ শিবের ভূষণ বলে নাথসম্প্রদায়ে বিবেচিত হয়। যেমন—

‘গোরক্ষনাথ— কাহাকে কৌপিন কাহাকি ধাগা, কৌপিন পৈরে কোন্ কোন্ নাগা।

মীননাথ— নেত্কি কৌপিন, পত্রকি ধাগা, কৌপিন পৈরে অবধূত নাগা।

গোরক্ষ— কেসি বাঘাস্বর কেসি রঙ্গ, কেসি বাঘাস্বর তোমারি সঙ্গ।

কেসি বাঘাস্বর চারি হাত পাও, কেসি বাঘাস্বর কাড়ে রাও।।

- মীন— খাখেরি বাঘাম্বর খাখেরি রঙ্গ, খাখেরি বাঘাম্বর আমারি সঙ্গ।
খাখেরি বাঘাম্বর চারি হাত পাও, জীবধারী বাঘাম্বর কাড়ে রাও।।
- গোরক্ষ— কাহাকি কারণ ভয় ছলী, কাহে কারণ ভাৰ্য্য।
কাহে কারণ ভয় দেবী, কাহে কারণ কালিকা।।
- মীন— জন্ম কারণ ভয় ছলী, ভোগ কারণ ভাৰ্য্য।
পূজা কারণ ভয় দেবী, -- অন্তকালেষু কালিকা।।
- গোরক্ষ— কোন্ সে দিয়ে দণ্ড কমণ্ডলু, কোন্ সে দিয়ে ঝারি।
কোন্ সে দিয়ে ভণ্ডবা বস্ত্র, আপে ব্রহ্মচারী।।
- মীন— ব্রহ্মা দিয়ে দণ্ড কমণ্ডলু, বিষ্ণু দিয়ে ঝারি।
শিব দিয়েছে ভণ্ডবা বস্ত্র—আপে ব্রহ্মচারী।।”^{১৯}

নাথযোগীদের রুদ্রাক্ষের মালাতে সাধারণত ৩২, ৬৪, ৮৪ এবং ১০৮ সংখ্যক রুদ্রাক্ষ থাকে। রুদ্রাক্ষকে রুদ্র অথবা শিবের চোখ মনে করা হয়। রুদ্রাক্ষ এক বা একাধিক মুখবিশিষ্ট হয়। রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ লাল অথবা গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করা ব্রহ্মচার্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়।^{২০} নাথযোগীর বেশভূষার বর্ণনা কবি দৌলত কাজীর ‘সতীময়না-লোরচন্দ্রানী’ কাব্যগ্রন্থেও পাওয়া যায়—

‘কোথা হন্তে এক যুগী মিলিল আসিয়া
না নড়ে না চলে যুগী যেহেন স্থাবর।
জটাধারী ব্যাঘ্রচর্ম বিভূতি ভূষণ
কণ্ঠে রুদ্র মালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন।’^{২১}

আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যগ্রন্থে নাথযোগীর বেশভূষার বর্ণনা জীবন্ত ও বাস্তবোচিত হয়েছে বলা যেতে পারে—

‘শিবে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর
কক্ষে শিঙ্গা ডম্বরু ত্রিশূল লৈয়া কর।
মেখলী ধাক্কারী রুদ্রাক্ষের জপমালা
কাস্তা চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা।

চকমক পাষণ আর পদেত পাওবি
হস্তেতে দ্বাদশ লৈল বটুবা ধাক্কাবী।
উড়িয়ান বন্ধ কটি, পৈবন কৌপীন
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন।’^{২২}

ড. কল্যাণী মল্লিক উল্লেখ করেছেন নাথযোগীরা কানের উপাস্থি ভেদ করে ধাতু বা গণ্ডারের শিং নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করে অন্য যোগীদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। কর্ণভেদের মাধ্যমে যোগজ সিদ্ধিলাভ ও পরমাত্মা দর্শন হয় বলে কুণ্ডলের অপর নাম দর্শনী। কুণ্ডল ছাড়া হাতে পেতলের বলয়, গলায় হিংলাজ ও আশাপুরী নামে মালা এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণের রীতি রয়েছে। এছাড়া গলায় সেলী নামে উর্ণ, উপবীতে শিংনাদ নামে ২-৩ আঙুল পরিমাণ কালোরঙের শিং-এর বাঁশি ধারণ রীতি আছে। এই শিং-নাদ পবিত্রী নামক বলয়াকার দ্রব্য থেকে লব্ধ হয়। এই শিং-নাদ ও পবিত্রী জগৎ কারণের প্রতীক রূপে নাথযোগীরা ধারণ করেন। গৈরিক বা শ্বেতবস্ত্র ধারণ, জটাধারণ বা মুণ্ডিতমস্তক হওয়া এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্রধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধনের নিমিত্তে ধুনি ও চিবুকভার ন্যস্ত করার জন্য *আঁচল* নামে খঞ্জ যষ্টি ব্যবহৃত হয়। দণ্ড ও শিখা ধারণ এঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়দের পিণ্ডদানের সময়ে গণ্ডারের চামড়া নির্মিত পাত্রে জলদান করেন বলে গণ্ডারের চামড়াকে এঁরা পবিত্র মনে করেন।^{২৩} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ থেকে নাথসম্প্রদায়ের বেশকিছু যোগীর গান সংগ্রহ করেছিলেন সেখানে ‘যোগীর লক্ষণ’ নামে একটি যোগীর গান ছিল। গানটিতে নাথযোগীর আচার-সংস্কার ও বেশভূষার আভাস পাওয়া যায়—

‘কাঁহা মিলেরে যোগীয়া কাঁহা মিলেরে যোগীয়া।
কাঁহা মিলে জটাধারী হয় রে দয়াল যোগী।।
আমার যোগীয়ার মাথেরে সুবর্ণের মুকুট আছে
কানে মুদ্রা শিরে জটাভার।

... ..

আমার যোগীয়ার পায়ে সুবর্ণের নূপুর আছে
কানে মুদ্রা শিরে যার জটাভার।।^{২৪}

কুণ্ডল ধারণ:

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়ে কানে কুণ্ডল ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। নাথযোগীদের ধারণ করা কুণ্ডল বা মুদ্রার বিভিন্ন দার্শনিক অর্থ রয়েছে। কুণ্ডলের অপর নাম পবিত্রী। কানের দুই কুণ্ডল জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক। নাথসম্প্রদায়ের ধারণা কুণ্ডল ব্যবহারে দেবতারা খুশি হন। তাই কুণ্ডল ধারণ শুভ ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয়।^{২৫} প্রাচীনকালে কর্ণসংস্কার করে মাটির কুণ্ডল পরার রীতি ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সোনা, রূপো, তামা, স্ফটিক, হাতির দাঁত, গণ্ডার, হরিণের শিং দিয়ে কুণ্ডল নির্মিত হয়। নাথ অঘোরী, কাপালিক যোগী হাড়ের কুণ্ডলও পরেন। কোন কোন যোগী ১২ বছর পর্যন্ত মাটির কুণ্ডল পরে তারপর অন্য ধাতু নির্মিত বা পশুশৃঙ্গ নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করেন। নাথসম্প্রদায়ে কুণ্ডলধারী যোগীকে দর্শনীযোগী বলা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী দর্শনীযোগী কুণ্ডল ধারণ করে শিবকায়ী লাভ করেন। কুণ্ডলকে যোগদণ্ডও বলা হয়ে থাকে।^{২৬}

মুণ্ডমালা পরিধান:

নাথযোগী সম্প্রদায়ে কাপালিক অঘোরী ধারায় গলায় মৃত মানুষের হাড়মালা ব্যবহার করার প্রথাও দেখা যায়। ড. সুকুমার সেন কাপালিক যোগীদের গলায় হাড়ের মালা বা মুণ্ডমালা, পায়ে নূপুর পরার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া হাতে পুঁতির মালা, ডমরু থাকে। তিনি কাহ্নের একটি চর্যাগীতি উল্লেখ করে যোগীবেশের বর্ণনা তুলে ধরেছেন—

‘কাপালিক যোগী কাহ্ন বাহির হইয়াছে বিচরণে,
সে দেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকারে।

অ-বর্ণাদি (স্বর) ও ক-বর্ণাদি (ব্যঞ্জন) তাহার চরণে ঘুণ্টি-নূপুর,
রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুণ্ডল-আভরণ,
রাগ দ্বেষ মোহ ছাই করিয়া মাখা হইয়াছে,
পরম মোক্ষকে নেওয়া হইয়াছে মোতির মালা করিয়া।
শাশুড়ী ননদ শালীকে ঘরে মারিয়া রাখিয়া
মায়াকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কাহ্ন হইল কাপালিক।।’^{২৭}

নাথ-অঘোরী ধারায় তান্ত্রিক সাধনায় আজও নরমুণ্ডের ব্যবহার করা হয়। এমনকি যোগী
ডা. রামনাথ অঘোরীবাবার শ্মশান সাধনার আটন বা বেদীতে নরমুণ্ড ব্যবহারের উল্লেখ
রয়েছে—

পাঁচরায় তখন অনেকজন তান্ত্রিক সাধক থাকতেন। তারমধ্যে
অনেকে কৌলাভিষিক্ত। বক্রেস্বরে বাবা আটন পেতে বসে আছেন।
চারদিকে নরমুণ্ড টাঙানো। যেমন আমরা পূজো-আচ্চায় আমের শাখা
টাঙাই। তাঁরা দলবেঁধে পাপহরা হেঁটে পার হয়ে আসছেন। যাঁরা
অঘোরীর কাছে ছিলেন, তাঁদের ভয় হল, পাছে ওঁরা এসে হট্টগোল
বাঁধান। ভয়ে অঘোরী বাবাকে বললেন। তিনি বললেন, ‘তোরা চুপ
করে বসে থাক’। পাপহরা পার হয়ে ক্রমে এগিয়ে এলেন
কৌলাভিষিক্তের দল। আটনের গপ্তীর মধ্যে ঢোকবার সময়
দু’একজনের মাথায় ঠেকল নর-কপাল। দুলে উঠল সব মুণ্ডগুলি।’^{২৮}

নাথ-পরম্পরা পূজোবিধি:

নাথসাধক নিজের পরম্পরায় পূর্বজকে পূজো সংকল্প করে গুরুর ফটো আসনে স্থাপন
করে পূজো শুরু করেন। পূর্বদিকে থাকে পস্থের মূলগুরুর আসন, ঈশান কোণে দাদাগুরুর
(গুরুর গুরু), অগ্নিকোণে চোটি গুরুর, উত্তরদিকে চিরাগুরুর আসন, দক্ষিণদিকে বভূত
গুরু, বাঁদিকে উপদেশী গুরু এবং নৈঋত কোণে লংগোট গুরুর আসন স্থাপন করে
পূজোবিধি প্রচলিত আছে। সব আসনে গেরুয়া বস্ত্র রাখা হয়। উপরোক্ত আসনে অন্য যে
বস্ত্র রাখার নিয়ম রয়েছে তা হল—

গুরু	আসন
গুরু গদি	সোনা,রূপো, বাঘছাল।
দাদাগুরু	বাঘছাল, মৃগচামড়া ইত্যাদি।
চোটিগুরু	বাঘছাল, মৃগচামড়া, কম্বল ইত্যাদি।
চিরাগুরু	কম্বল।
বভূতগুরু	কম্বল, বাঘছাল, মৃগছাল, মৃত্তিকা।
উপদেশীগুরু	কম্বল বা কুশ আসন।
লংগোটগুরু	গেরুয়া বস্ত্রের কম্বল।

প্রতি আসনে একটি করে রত্নাক্ষ গুরুর নামে রাখা হয়। নাদ-জনেউ, সিঙ্গী, নাদী-পবিত্রী, কুণ্ডল, চিমটা, বেলচা, ত্রিশূল, ঝোলা ইত্যাদি গেরুয়া কাপড়ের উপর রেখে সমস্ত আসন গোলাকার বৃত্তে রেখে সংকল্প ঘট মাঝখানে থাকে। প্রদীপ, ধূপ ও সুগন্ধী দেওয়া হয়। তারপর ফলফুল ইত্যাদি সহযোগে পূজো দেওয়া হয়। পূজোর যথাবিহিত মন্ত্র ও নিয়ম অনুসারে পূজো সম্পন্ন হয়। নাথপন্থে সিদ্ধ শাবর-মন্ত্র অনুসারে পূজো-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। শাবরমন্ত্রকে অত্যন্ত কল্যাণকর ও প্রভাবশালী মনে করা হয়। ঈশ্বর আদ্যপুরুষ যোগী আদিনাথ ও তাঁর শিষ্য মৎস্যেন্দ্রনাথ শাবরমন্ত্র রচনা করেন। তিনি ত্র্যম্বকক্ষেত্রের অনুপান শিলায় বসে গোরক্ষনাথ ও অনন্ত কোটি সিদ্ধদের এই শাবরমন্ত্র, তন্ত্রের জ্ঞান এবং ধ্যান বিষয়ে পাঠ প্রদান করেন। এই সময় মা বিমলা, যোগিনীগণ, মাতা পার্বতী রূপী উদয়নাথ এবং নাগার্জুননাথ উপস্থিত ছিলেন। শাবরমন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন এবং গোপনীয় যা কেবল নাথসিদ্ধরা গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছেন।^{২৯} গৌরীপুত্র নিত্যানাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘শাবরচিত্তামণিঃ’ গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা শাবরমন্ত্র শুনেছিলেন। কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণ গ্রন্থে শাবরমন্ত্রের উপযোগিতা উল্লেখ করেছেন—

‘কলি বিলোকি জগ হিত হর গিরজা।

সাবর মন্ত্র জাল জিনহ সিরজা।

অনমিল আখর অরথ ন জাপু।

প্রগট প্রভাও মহেশ প্রতাপু।।’^{৩০}

পাত্রদেবতা বা পাত্রদেব পূজো:

পাত্রদেবতা পূজো- ব্রত -সাধনা-নিয়ম ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে মহাকুম্ভমেলা থেকে নাথপন্থে চলে আসছে। নাথসিদ্ধ যোগীরা নিজের শরীর রূপী ঘটকে (পিণ্ড) যোগের মাধ্যমে মন্তন করে অমৃত পান করেন। তারফলে অমরত্ব তথা জ্যোতিস্বরূপকে লাভ করেন। নাথযোগীরা মনে করেন তাঁর নিজের শরীরে সমস্ত তীর্থনিবাস অবস্থিত। যেখানে ষট্চক্রের যোগের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে বিভিন্ন চক্র ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রাতে প্রবেশ করতে হয়। অর্থাৎ এক গ্রহরূপী এক দ্বারকে খুলে দশমী দ্বারে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে অমৃত চক্রে অমৃত কুম্ভ থেকে অমৃত পান করে অমরত্ব অর্জন করা যায়।

নাথসম্প্রদায়ে কিংবদন্তি আছে ভগবান পরশুরাম তীর্থযাত্রা করতে করতে গোদাবরী তীরে ত্র্যম্বকেশ্বর সিদ্ধপীঠে এসে পৌঁছান। যেখানে কৌলাগড় পর্বতে বহু গোফা, জলাশয়, অনুপান শিলায় মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, নিবৃত্তিনাথ, গহিনীনাথ, জ্ঞাননাথ প্রমুখের পবিত্র তীর্থভূমি অবস্থিত। সেখানে পরশুরাম ‘রোটকব্রত’ পূজো-অর্চনা ইত্যাদি করে আদিনাথ শিবকে গোরক্ষনাথ রূপে দর্শন লাভ করেন। তখন ভগবান আদিনাথ তাঁকে কুম্ভপর্বে ‘পাত্রদেবতা’-র বিশেষ পূজো করতে পরামর্শ দেন। তাহলে তিনি শিবশক্তি সামরস্যের সমান আনন্দ অনুভব করবেন। তারপর ভার্গবপুত্র পরশুরামকে পাত্রদেবতা পূজো করার নির্দেশ দিলেন। তখন পরশুরাম পাত্রদেবতা পূজোর সংকল্প করেন।

পরশুরাম দেব-দেবী, যক্ষ, কিন্নর, নাথসিদ্ধ নিয়ে পাত্রদেবতার জয়জয়কার করে সদগুরু পূজো, সিদ্ধপীঠ পূজো শুরু করলেন। শেষে নির্বিকল্প সমাধি যোগে পরশুরাম

যোগীতে পরিণত হন। সেই থেকে গোদাবরী ক্ষেত্রে ত্র্যম্বক মহাকুস্তের সময়ে নাথযোগী সিদ্ধ তথা ‘অখিল ভারতীয় ভেষ ১২ পত্ন যোগী মহাসভা’-র নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে পাত্রদেবতা পূজা করে আসছেন। কর্ণাটকের কদলীমঠ থেকে মঠের মোহান্ত পাত্রদেবতা নিয়ে পদব্রজে মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বক মঠে এসে পাত্রদেবতা স্থাপন করেন।^{৩১}

নাথযোগীদের মধ্যে ছত্র ও পাত্রপূজা একটি পুণ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম উৎসব। শক্তিপীঠে ছত্রপূজা এবং সিদ্ধশিবপীঠে পাত্রপূজা করার নিয়ম প্রচলিত আছে। ছত্রের সঙ্গে উচ্চারণগত সাযুয্যের কারণে পাত্রকে পত্র বলা হয়। যেমন—

‘অনন্ত সিদ্ধা আদি পদ পায়া,
ঝোলি পাই পত্র পায়া, পায়া পত্নকা ভেদ,
পত্র সোহে আদি জোগি নিরঞ্জনকে হাথ।’^{৩২}

পাত্রপূজার উদ্দেশ্য নাদমুদ্রার উপাসনা। একটি পূর্ণ শুকনো লাউপাত্রে নাদ-মুদ্রা-সেলী-পবিত্রী স্থাপন করে ঐকে শিব-শক্তির প্রতীক-রূপে উপাসনা করার নাম পাত্র বা পত্রদেব উপাসনা।^{৩৩}

মহাশিবরাত্রি তিথিতে কর্ণাটকের কদলীমঠের (ম্যাঙ্গালোর) গদিতে রাজাযোগী অভিষিক্ত হন। তিনি ১২ বছরের জন্য নাথসম্প্রদায়ে রাজাযোগী রূপে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে যোগী নির্মলনাথ কদলী যোগেশ্বর মঠে মোহান্ত এবং রাজাযোগী রূপে আসীন রয়েছেন। পাত্রদেবতা নিজ হাতে ধারণ করে তিনি ঝুণ্ডিয়াত্রেয় মহারাষ্ট্রের নাসিক ত্র্যম্বকেশ্বর থেকে কর্ণাটকের কদলী মঠ পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। এই ঝুণ্ডিয়াত্রেয় শ্রাবণমাসের শুক্ল-পঞ্চমী (নাগপঞ্চমী) তিথিতে শুরু হয়ে কুম্ভমেলার সময় শেষ হয়। এই পাত্রদেবতা অনুষ্ঠানকে নাথপত্নে ‘নবনাথ ঝুণ্ডিয়াত্রেয়’ও বলা হয়। মনে করা হয় ‘নবনাথ-ঝুণ্ডিয়াত্রেয়’-র নবনাথ সহ চুরাশি নাথসিদ্ধ সূক্ষ্ম শরীরে অথবা নাথসন্ন্যাসী রূপে উপস্থিত থাকেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট বা সিলেটে নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্রদেব সম্পর্কিত কাহিনি প্রচলিত ছিল। রাজমোহন নাথ শ্রীহট্ট থেকে পাত্রদেবতা বা পাত্রদেব পূজোর একটি খণ্ড পুথি খুঁজে পান। সেখানে পাত্রদেব যাত্রা ও পূজোর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে—

‘আর্জুন পত্র সৃজ পত্র—
পত্রে সেভিৎ সামাগি খায়ে।
কোটি কোটি জনমের পাপ ছুটায়ৈ।।
শ্রীসত্যগুরু সত্য বাচা ফারদাতা কি কল্যাণ করে।
নাথজীকে ভাণ্ডার ভরিপুরি রহে শ্রীসত্যপুর।।
ওঁ পত্রপুর ছত্রপুর কাল কণ্ড বালাই যায় দূর।
ধরা নহে কিয়া পাপ চূর।।
ধরান কিয়া প্রকাশ— পত্র উপজে ব্রহ্মাকে পাস।
ব্রহ্মানে কিয়া চার বেদকা বিচার।
পত্র ছুড়ে শিব সুত্র বার।।
শিব গেছে নাথজীকে পাস।
শিবনে কাহা কর ফলকা বিচার।।
নাথনে কিয়া বিচার— পত্র পবিত্র
পূজ— এতে জগত চল— এতে জগত— এতা পত্রকা বিচার।।
পড়ন্তে গুণন্তে শুনন্তে উনকোটি ফল পায়তে
এতা শ্রীগুরুজী চরণাকু আদেশ!!’^{৩৪}

সাধারণত নাথমঠে অগণিত নাথযোগী ও সন্ন্যাসী সমবেত হয়ে পাত্রদেব প্রতিষ্ঠা করে পূজো করেন এবং পাশ্ববর্তী এলাকা পাত্রদেব নিয়ে পরিক্রমা করেন। হুগলির মহানাদ জটেশ্বরনাথ মঠে চৈত্রমাসে শিবরাত্রি তিথিতে পাত্রদেব পূজো, মোহান্ত অভিষেক ক্রিয়া প্রচলিত আছে। তবে পাত্রদেব নিয়ে পরিক্রমা মঠের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ থাকে। দমদমের গোরক্ষবাসী মঠ ও পূর্ব-মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সিদ্ধিনাথ মঠে মকরসংক্রান্তি

উৎসবের দিনে পাত্রদেব পূজা ও পাত্রদেব নিয়ে পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আগের মত বড়ো করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। যোগী চামেলীনাথ রচিত ‘শ্রীপাত্রদেব কদলীযাত্রা’ গ্রন্থে পাত্রদেব পূজা ও পাত্রদেব যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উপরোক্ত মঠগুলি ছাড়া নেপালে কাঠমাণ্ডু-মৃগস্থলী গোরক্ষমঠে আষাঢ় মাসের একাদশী তিথি থেকে পাত্রদেব যাত্রা শুরু হয়ে আশ্বিন মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে শেষ হয়। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা উপলক্ষে পদযাত্রা উৎসবও পাত্রদেব যাত্রার আরেকটি রূপ হতে পারে।

সিদ্ধ-ধুনি প্রজ্জ্বলন:

শ্রীনাথসিদ্ধ ধুনি নাথসম্প্রদায়ে আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসা একটি পরম্পরা। ওঁ-কার শিব আদিনাথ সর্বপ্রথম এই পরম্পরা প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হয়। অগ্নিতত্ত্ব-অগ্নিদেবতা অর্থাৎ ধুনি সর্বদেবদেবী, সাধু-সন্ত ভীষণ পছন্দ করেন। বিশেষত নাথসিদ্ধ যোগেশ্বর ধুনি সর্বত্র মেনে চলা হয়। চেতন ধুনি নাথসিদ্ধদের কাছে অভিন্ন অঙ্গ। ধুনির সান্নিধ্যে প্রচলিত সাধনা, যোগ, তপস্যা দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। নাথপন্থে এই প্রবাদটি প্রচলিত আছে—

‘ধুনি-পানি-সিদ্ধোঁ কী বাণী।’^{৩৫}

নাথযোগী, ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী, পীর-মোহান্ত, নাগা, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ত্যাগী, তপস্বী, সিদ্ধ-মহাসিদ্ধ প্রমুখ পর্যটনকালে জঙ্গলে ধুনি প্রজ্জ্বলন করে নিজেদের সাধনা যুগ যুগ ধরে করে আসছেন। জঙ্গল, পাহাড়ি এলাকায় সাধুদের সুরক্ষায় আগুন বিশেষ কার্যকরী। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরাও আগুন থেকে দূরে থাকে।

নাথযোগীরা গায়ে ভস্ম বা বিভূতি মাখেন তার উৎস এই ধুনি। বিভূতি বা বভূত গুরু তাঁর শিষ্যকে ধুনির ভস্ম বা বিভূতি গায়ে লেপন করে দেন। মনের মলিনতা দূর করে নির্মল-পবিত্র করতে গায়ে ভস্ম-জ্ঞান নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। কথিত আছে

যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথকে আদিনাথ শিব গায়ে ধুনির ভস্ম ঢেলে স্নান করিয়েছিলেন। ধুনি তথা ধুনির ভস্ম ভূত, প্রেত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য ইত্যাদি নেতিবাচক প্রভাবকে ভস্ম করে দেয়। এই কারণে ধুনি-ভস্মকে বরদায়িনী মনে করা হয়। সাধারণত নাথমঠে ধুনি কখনও নির্বাপিত হয় না।

শ্রীনাথসিদ্ধ জমাত:

নাথসিদ্ধদের জমাতে তপস্বী সাধু মহাত্মগণ সমবেত হন। এঁরা সকলেই যোগেশ্বর অথও ভস্মধারী, ধ্যানী যোগী, ত্যাগী তপস্বী, সমদর্শী এবং যোগী। নাথসম্প্রদায়ের জমাতে ১৮ পন্থী শিবযোগী ও ১২ পন্থী গোরক্ষযোগীদের মোহান্ত নির্বাচন করা হয়। প্রথমত ১২ পন্থের মোহান্ত তথা গোরক্ষযোগীদের পন্থ বা শাখা কপিলানী, গঙ্গানাথী, নটেশ্বরী, আই, বৈরাগ, রাওয়াল এই ছয়পন্থের মোহান্ত নির্বাচিত হন। তারপর ১৮ পন্থের শিবযোগীদের রাম, বন, পাকল, পাঁও, ধর্মনাথী, মল্লনাথী এই ৬ পন্থের মোহান্ত নির্বাচন করা হয়। ১২ এবং ১৮ পন্থের দুই ধুনিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন মোহান্তগণ। বাস্তবে ১২-১৮ পন্থের এক ধুনি। তারপর জমাত দলের সদস্য নাথসন্ন্যাসীরা সারাদেশে তীর্থভ্রমণ করেন।

ধুনার পূজারী পন্থ নটেশ্বরী পন্থ, অর্থাৎ নটেশ্বরী পন্থ থেকে পূজারী মনোনীত হন। সকাল ও সন্ধ্যায় ধুনি তথা দেবতাকে আরতি করা হয়। দিনে দুবার খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। খাবার-দাবারের ব্যবস্থাপনায় অঘোর যোগীরা নিযুক্ত হন। মোহান্তগণ হিসেব-নিকেশ, বই লেনদেনের দায়িত্বে থাকেন। জমাত চলাকালীন সময়ে প্রত্যহ ভোরবেলা চারটে বাজলে সবাই ভস্ম-স্নান করেন। আরতির সময় সকলে চক্রাকারে উঠে দাঁড়ান। এরপর বসে শ্রীনাথের আরতি বাল্যষ্টক, চালিসা, কুণ্ডলীমন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করা হয়। নাগফণী, শঙ্খ, ডমরু, ত্রিশূল, ঝোলা, ঝাণ্ডা ইত্যাদি সাধনা জমাতে সমান্তরালভাবে

চলতে থাকে। মূলত যোগী মহাসভার উদ্যোগে ও পরিচালনায় নাথ-জমাত অনুষ্ঠিত হয়।
 এঁদের কাজ সারাদেশে ঘুরে ঘুরে যোগধর্ম প্রচার করা। ১২-১৮ জমাতে মহারাষ্ট্রের
 নাসিক ত্র্যম্বক কুম্ভমেলা থেকে কর্ণাটকের কদলী মঠ পর্যন্ত পদযাত্রা বিশেষভাবে
 উল্লেখযোগ্য। জমাত নবরাত্রের সময়ে হিমাচল প্রদেশের জ্বালা মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানে
 মিলিত হয়। এখানে ৮ পীরকে সম্মান জানানো, ৩২ ধুনি ভাঙরা, মূর্তিস্থাপন এবং
 স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু ভাঙরা অনুষ্ঠিত হয়।^{৩৬} কার্তিক পূর্ণিমায় রাজস্থানের পুষ্করতীরে
 জমাত অবস্থান করে। মাঘমাসে পুষ্করে নাথমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে জমাতের
 সদস্যরা গুজরাটের গির্গার তীরে চলে যায়। জমাতের নাথযোগী সদস্যরা অর্ধকুম্ভ ও
 পূর্ণকুম্ভে যোগ দেন।^{৩৭} ২০২৫ খ্রি. প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ) কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে
 ‘অখিল ভারতীয় ভেষ ১২ পন্থ যোগী মহাসভা’-র নেতৃবৃন্দ হিসেবে যে নাথযোগী
 সন্ন্যাসীবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন— যোগী আদিত্যনাথ- অধ্যক্ষ, পীঠাধীশ্বর,
 গোরখপুর গোরক্ষনাথ মঠ, উত্তরপ্রদেশ; যোগী বালকনাথ- বিশিষ্ট উপাধ্যক্ষ, পীঠাধীশ্বর,
 মস্তানাথ মঠ, রোহতক, হরিয়ানা; যোগী নরহরিনাথ- উপাধ্যক্ষ, পীঠাধীশ্বর, অমৃতনাথ মঠ,
 ফতেপুর, রাজস্থান; যোগী চেতাইনাথ- মহামন্ত্রী, পীঠাধীশ্বর, গোরক্ষনাথ মঠ, হরিদ্বার,
 উত্তরপ্রদেশ; পীরযোগী শেরনাথ, সহায়কমন্ত্রী, পীঠাধীশ্বর, জুনাগড় গোরক্ষনাথ মঠ,
 গুজরাট; যোগী কৃষ্ণনাথ, রমতা মোহান্ত, ১২পন্থ এবং যোগী সমুদ্রনাথ, রমতা মোহান্ত,
 ১৮ পন্থ। ১২-১৮ মোহান্ত নির্বাচনের পাশাপাশি একসঙ্গে চলা, সহযোগিতার আদর্শ, সুমধুর
 বাক্যালাপ, গুরুপরম্পরা মেনে চলার আদর্শ জমাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য
 পায়। নিঃস্বার্থ সেবা, সাত্ত্বিক তথা সত্যধর্ম ইত্যাদি গুণ প্রকাশের পাশাপাশি জমাত
 ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে নাথ যোগধর্ম প্রচার করে।

আশ্রমিক সাধনধারা:

নাথসম্প্রদায়ের প্রতিটি মঠ, মন্দির প্রধানত যোগসাধনার কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোরখপুরের গোরক্ষনাথ মঠ, দমদমের গোরক্ষবাসী, হুগলির মহানাদ, পূর্বমেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সিদ্ধিনাথ মঠ, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের ‘যোগীরাজ শ্রীশ্রীঅঘোরীবাবা আশ্রম’, অসমের গুয়াহাটীর ‘যোগী সুন্দরনাথ সঙ্ঘতীর্থ যোগাশ্রম’, বড়পাথর যোগী শক্তিনাথের ‘শিরগোরক্ষ মঠ’ ইত্যাদি মঠ যোগসাধনার ধারা সুদীর্ঘকাল ধরে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। আবার সাধকের অভাবে অনেক মঠের হৃতগৌরব হারিয়ে গিয়েছে।

নাথসম্প্রদায়ে মন্দির, মঠ, আশ্রম ও সম্প্রদায় বিষয়ে যাবতীয় কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ মনোনীত হন। যেমন দমদম গোরক্ষবাসী মঠে বর্তমান মোহান্ত যোগী বিজয়নাথ, হুগলির মহানাদ মঠের মোহান্ত যোগী ব্রহ্মনাথ, পাঁশকুড়া সিদ্ধিনাথ মঠের দায়িত্বে আছেন যোগী সীতারামনাথ। মঠের মোহান্তদের গৃহস্থ নাথেরা যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, যোগী গোরক্ষনাথের প্রতিনিধি বলে সম্মান করেন। সাধারণ রীতি অনুসারে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় মোহান্ত নির্বাচন হয়ে থাকে। মোহান্তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, শাস্ত্রজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা, সৌন্দর্য ও জনসাধারণের উপর প্রভাব নির্ভর করে। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষা ও যোগসাধনা লাভ করতেই আশ্রমে এসে লোকজন মোহান্তের শরণাপন্ন হন। তাঁদের আধ্যাত্মিক পিপাসা দূর করতে সঠিক দিশা দেখানো মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্তের কাজ। নাথমঠগুলি নিরলসভাবে সেই কাজ করে চলেছে। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রমগুলি অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তির সঙ্গে যোগসাধনার আদর্শ প্রচার করে গৌরবান্বিত হয়েছে।^{৩৮}

বর্তমান সময়েও যোগী শিবনাথ মহারাজ ওড়িশার কেয়ারব্যাক্স মঠ, যোগী কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ কালিম্পং, যোগী বিজয়নাথ দমদম গোরক্ষবাসী, যোগী ব্রহ্মনাথ মহানাদ, যোগী কৈবল্যনাথ অসমের বশিগাঁও মঠ থেকে যোগসাধনার আদর্শ প্রচার করে আশ্রমিক নাথধারাকে অক্ষুণ্ণ ও জীবন্ত রেখেছেন। এছাড়া যোগী শনিনাথ, যোগী আকাশনাথ, যোগী রুদ্রনাথ, যোগী ত্রিলোকনাথ, যোগী সুন্দরনাথ প্রমুখ নাথপন্থকে বজায় রেখে চলেছেন নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকচেতনা ও যোগপরম্পরাকে কেন্দ্র করে। উত্তর-ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে ‘গুরুধাম যোগাশ্রম’কে কেন্দ্র করে শ্রীমৎ যোগী রাজচরণনাথ দীর্ঘদিন ধরে নাথসমাজকে যোগধারায় যুক্ত রেখেছেন। বর্তমানে যোগী সূর্যোদয়নাথ প্রমুখ সেই পরম্পরা বহন করে চলেছেন। অসমের কাছাড় শিলচরে নরসিংহপুর শালগঙ্গারপার ‘শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম’ও হতগৌরব বজায় রেখেছে। এই মঠ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন সর্বেশ্বরনাথ প্রমুখ। ত্রিপুরার কুমারঘাটে ‘পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল’ যোগপরম্পরা ও নাথ লোকচিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ধর্মনগরে তিলথে ‘পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম’ এবং বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার আদুকালি ‘শ্রীমৎ যোগী রাজচরণনাথ যোগাশ্রম ও শিবগাঙ্গিনী মঠ’ বাংলার নাথধারার প্রাচীনতম ধারা আদিনাথপন্থ বা আদিনাথধারার আদর্শ প্রচার করে নাথপন্থকে গৌরবান্বিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে আদিনাথ পন্থ বা ধারার কোন মঠ-মন্দির না থাকলেও অসম, ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) আদিনাথপন্থের বহু মঠ-মন্দির এখনও বর্তমান রয়েছে। পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের প্রসঙ্গ অন্যত্র উল্লেখ করেছি।^{৩৯} নাথযোগিনীরাও উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁদের ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগবিভূতি দর্শন করিয়ে অনেক ধর্মার্থীকে যোগপথে আকৃষ্ট করেছেন। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, যোগী গোরক্ষনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের আদর্শ বাংলার জনসমাজে প্রচার করছেন। এঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলেন যোগী গীতানাথ (ভাগলপুর, গুরু যোগী বীরনাথ), যোগী গঙ্গানাথ (গুরু সম্পূর্ণ নাথ, রমতা যোগিনী), যোগী লক্ষ্মীনাথ, যোগী অলখনিরঞ্জনানাথ, যোগী মহালক্ষ্মীনাথ (কালিম্পং, গুরু যোগী ত্যাগীনাথ), যোগী মণিকর্ণিকানাথ প্রমুখ। যোগিনী গীতানাথের ভাগলপুর আশ্রম, লক্ষ্মীনাথের বিরাটি খনা-মা আশ্রম, অলখনিরঞ্জনানাথের শামুকখোলা ইন্টারন্যাশনাল নাথযোগী সেবাশ্রম বিশেষভাবে প্রশংসিত মঠ ও আশ্রম। যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী প্রাণশক্তির সঙ্গে যোগসাধনার আদর্শ প্রচার করে গৌরবান্বিত হয়েছেন। একজন প্রভাবশালী যোগী হিসেবে বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তীর্থপর্যটন করে ভারতবর্ষ, নেপালে যোগসাধনার মহিমা প্রচার করেছেন। তিনি ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত (ব্রহ্মলীন হওয়া অবধি) নেপালের রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও ভোগবিমুখ মানসিকতায় জনসাধারণ প্রভাবিত হয়েছেন। তারফলে বালুরঘাটে আত্রৈয়ী নদীতীরে ‘যোগীরাজ শ্রীশ্রীরামনাথঅঘোরীবাবা আশ্রম’, বক্রেস্বর পুরনো শ্মশানে যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীবাবার সমাধি মন্দির ও মঠ, দুবরাজপুরে ‘অঘোরীর আনন্দকানন’ আশ্রম, মামাভাণ্ডে পাহাড়ে পাহাড়ীবাবার আশ্রম যোগসাধনার কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অঘোরীবাবার শিষ্য যোগী শক্তিনাথ বর্ধমানের কাঞ্চননগরে যোগী সুবলনাথ প্রমুখের সাহায্যে গোরক্ষনাথ মন্দির স্থাপন করেন। দার্জিলিং ফুবসেরিং টি এস্টেট লেবং-এ গোরক্ষনাথ মঠ স্থাপিত হয়েছে ২০১৮ খ্রি. কে. বি. যোগী প্রমুখের উদ্যোগে। পূর্বভারতে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে সাধারণ নাথ-গৃহস্থ থেকে সন্ন্যাসীরা আশ্রমজীবনের বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে যতটা অবকাশ পাওয়া যায় তার মধ্যেও নিরন্তর যোগসাধনায় মনোনিবেশ করে চলেছেন। যদিও নাথসম্প্রদায়ে মনে করা হয় আশ্রমিক বাতাবরণে নিরিবিলি যোগসাধনার পরিবেশ অনুকূল

নয়। তবু এসব মঠ-মন্দির থেকে অগণিত নাথযোগী যোগ ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেছেন।

ভক্তিসাধনা:

যোগপন্থী সাধকেরা যোগসাধনার সঙ্গে সাংখ্য, বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তার বিচার করেছেন। নাথপন্থে যোগী গোরক্ষনাথের সময় থেকেই জ্ঞান ও যোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে চলে আসছে। ‘শিবসংহিতা’ গ্রন্থে বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় হিসেবে যোগসাধনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান ও যোগের পরিপোষক রূপে ভক্তিসাধনা সবসময়ই সাধক সমাজে প্রচলিত ছিল। ঈশ্বর-উপাসনা, গুরুসেবা, দেবপূজা, ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে জীবপ্রেম জ্ঞানসাধক ও যোগসাধক উভয়েরই অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ভক্তিহীন জ্ঞান ও যোগ প্রাণহীন ও শুষ্ক হয়। জ্ঞানী ও যোগী উভয় সাধককেই ভক্ত আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তিমার্গে ভক্তিসাধনায় জ্ঞান ও যোগকে অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয় না।^{৪০}

গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ের ৬ পন্থের অন্যতম পন্থ বা শাখা কপিলানীপন্থের সঙ্গে পুরনো বৈষ্ণবীয় পরম্পরার যোগ রয়েছে। তাই একে বৈষ্ণবযোগও বলা হয়। কপিলমুনি বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। দশম শতাব্দীতে কপিলায়ন যোগ কোনরূপে ছিল তার আভাস ‘ভাগবত পুরাণ’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভগবান কপিল তাঁর মা দেবহূতিকে এই যোগ-পরম্পরার উপদেশ দিয়েছিলেন। ‘ভাগবত পুরাণ’-র তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায় থেকে শুরু করে অনেকগুলি অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ২৬ অধ্যায়ে সাংখ্যতত্ত্বের বর্ণনাও আছে। এরপর ২৭ অধ্যায় থেকে যোগের বর্ণনা শুরু হয়েছে—

‘হে মাতা! একটা নির্গুণ আত্মার প্রকৃতি চব্বিশ গুণসমূহ (শতগুণযুক্ত মন আদি, রজোগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি, তমোগুণযুক্ত পঞ্চভূতাদি) দ্বারা সজ্জিত হয়ে অহংকারময় হয়ে

ওঠে। এই অহংকারে মূঢ় হয়ে নিজেকে প্রকৃতির কার্যকর্তা মনে করে। অতএব এসব মোহে আবদ্ধ হয়ে পুনর্জন্মের চক্রে আবদ্ধ হতে হয়।- ২৭/১-৩

যম আদি যোগমার্গের অভ্যাস করে সত্য ভক্তিভাব সহকারে তাঁর (ঈশ্বর) কথা শুনতে হবে, সর্বপ্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, কারোর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবে না, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করবে, ব্রহ্মচর্য ও মৌনভাব অবলম্বন করবে (প্রয়োজনে কথা বলবে), ধর্মভাব প্রকাশ করে ঈশ্বরমুখী হবে।'-২৭/৬-৭

সংসারী মানুষের দেহে ব্রহ্ম বিরাজমান। এই ব্রহ্ম তিন আবরণে গঠিত— এক দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন। দ্বিতীয় অহংকার, ইন্দ্রিয়ময় দেহে আত্মার তেজ অপেক্ষা অহংকার বা চৈতন্যময় দেহ অধিক শক্তিশালী। তৃতীয় আবরণ প্রকৃতি। চঞ্চল মনকে ক্রমশ বুদ্ধি দ্বারা যোগসাধনের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। কপিলমুনির উপদেশ হল যোগের সারাংশ। সাংখ্য আশ্রিত পাতঞ্জল যোগে পরবর্তীতে প্রাণায়াম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রাণায়ামের মহিমা হঠযোগেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেবল এখানে ভক্তির মিশ্রণ ঘটেছে। অবশেষে যোগমার্গে কপিলায়ন বা কপিলানী সম্প্রদায় গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কপিলানী সম্প্রদায় গোরক্ষনাথের অনেক পূর্ববর্তী ধর্মসম্প্রদায়। এইভাবে সময়ের পথ ধরে বৈষ্ণব যোগসাধনা নাথমার্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।^{৪১} দমদমের গোরক্ষবাসী মঠ, পূর্বমেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সিদ্ধিনাথ মঠ নাথসম্প্রদায়ের কপিলানী পন্থের অন্যতম কেন্দ্র ও মঠ। 'ঘেরণ্ড সংহিতা' গ্রন্থের রচয়িতা ঘেরণ্ড মুনিও বাংলার বৈষ্ণব নাথযোগী ছিলেন। তিনি দেহকে সুস্থ, সবল রাখার উপায় হিসেবে সপ্ত সাধনের কথা বলেছেন। ষট্‌কর্মের দ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দার্দ্র্য, মুদ্রা দ্বারা স্তৈর্য, প্রত্যাহার দ্বারা ধৈর্য, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব, ধ্যান দ্বারা আত্মদর্শন ও সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা তৈরি হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। বেদের জ্ঞানমার্গ থেকেই যোগপ্রণালীর উদ্ভব

ও বিকাশ ঘটেছে।^{৪২} নাথপন্থে হঠযোগ, রাজযোগ প্রধান বিষয়। নাথপন্থের সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত কুণ্ডলিনী, নাড়ি ইত্যাদির বর্ণনা প্রকারান্তরে বৈষ্ণব গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গ্রন্থ ‘অহিৰুদ্র্য সংহিতা’, ‘বিষ্ণু সংহিতা’, ‘নারদ পঞ্চরাত্র’- তে যোগধারার উল্লেখ করা হয়েছে।^{৪৩}

আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের সভ্যতায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের বড় অবদান হল যোগশাস্ত্র বা যোগবিজ্ঞান। এই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি নাথসম্প্রদায়ের সাধুরা আজও সচল রেখেছেন। নাথমঠ ও মন্দিরগুলি যোগচর্চা করে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগতপস্যায় দীক্ষিত নাথসাধুরা যোগীশ্বর, জ্ঞানীশ্বর, ত্যাগীশ্বর আদিনাথ শিব ও তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রদায়িনী মহাশক্তির সাধনধারা প্রচার করেছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলিকে সরল সরস করে ভক্তিরসে জারিত করে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিস্তার সাধন করছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৃহী, সন্ন্যাসী, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণবাদী সকলেই নাথমন্দির-মঠ-নাথধারাকে নিজের বলে মনে করতে পারেন। বাংলায় নাথধর্ম এখনও জীবিত রেখেছেন নাথ-সন্ন্যাসীরা। কিন্তু গৃহস্থ নাথদের অনেকেই এখন স্বধর্মবিমুখ হলেও বলা যায় নাথধর্মের একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ ছিল। এমনকি তার উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছিল সত্য। অথচ তার ভিত্তি কখনও শিথিল হয়ে যায় নি। এই ভিত্তিটি আদি-বৈদিকযুগের মুনিধারা থেকেই গড়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. রাজমোহন নাথ, গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা, পৃ. ২১-২২।
২. জীবন নাথ, রাজমোহন নাথ, পৃ. ৬৭।
৩. আর্য়গুরু যোগীবংশ সৃষ্টি ও রহস্য, পৃ. ৩৭।
৪. কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ৩য় পটল, শ্লোক ২১-২২।
৫. প্রাগুক্ত, ৩/২৫-২৭।
৬. A. Mahadeva Sastri, Yoga Upanisads, p.505.
৭. লিঙ্গপুরাণ ১৮-২০ অধ্যায়, শিবপুরাণ- উত্তরখণ্ড ৩য় অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ- অবন্তীখণ্ড ইত্যাদি।
৮. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৪।
৯. কল্যাণী মল্লিক, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ১৯৬।
১০. সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, পৃ. ১০।
১১. নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।
১২. যোগবীজ, শ্লোক ৫১-৫২।
১৩. হঠযোগ প্রদীপিকা ১/৪৬, গোরক্ষশতকম্ শ্লোক ৫৪।
১৪. ঐ, ১/৪৭, ঐ শ্লোক ৫৫।
১৫. গোরক্ষসংহিতা ১/১৮২।
১৬. হঠযোগ প্রদীপিকা ১/১।
১৭. অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নাথযোগ, পৃ. ১৯।
১৮. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ১৭৫-১৭৬।
১৯. অথকুলাঞ্জিপট, শ্লোক ১-৪।
২০. প্রফুল্লকুমার নাথ, অসমের নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, পৃ. ৮৫।
২১. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ২৯২।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
২৩. ভারতীয় সাধনা, পৃ. ৯১-৯২।
২৪. গোখবিজয়, পৃ. ১৭৩।
২৫. প্রফুল্লকুমার নাথ, পৃ. ১০৪।
২৬. বিলাসনাথ যোগী, শ্রীনাথরহস্য, পৃ. ৪৭২।
২৭. নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, পৃ. ২৮৭।

২৮. দেবনাথ বকসী, *অঘোরীর আনন্দকানন* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১।
২৯. শ্রীনাথরহস্য, পৃ. ৪ ও ৪৭।
৩০. মৎস্যেন্দ্রনাথ, *শাবরচিত্তামণিঃ*, পৃ. ৩।
৩১. *শ্রীনাথরহস্য*, পৃ. ৫৩৯-৫৪৩।
৩২. *কবীর সবদী*, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংকলিত), পৃ. ১০৩।
৩৩. *পত্রবিচার*, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ১৭০।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
৩৫. সাক্ষাৎকার, যোগী শনিনাথ, নাথসন্ন্যাসী, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ২০২৪।
৩৬. *শ্রীনাথরহস্য*, পৃ. ৬১১-৬১৩।
৩৭. অজয়কুমার ভাণ্ডারী, *রমতায়োগী ও নাথসম্প্রদায়*, পৃ. ১৯।
৩৮. *শ্রীশ্রীযোগীরাজ গম্ভীরনাথ- প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩০-৩২।
৩৯. Partha Sarathi Nath, *Nath Pantha Shrines and perpetual Tradition in Bangladesh*, pp.187-215.
৪০. *শ্রীশ্রীযোগীরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৬।
৪১. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ১৯১-১৯৪।
৪২. *ঘেরঙসংহিতা*, বিজ্ঞান স্বামী (সম্পা.), পৃ. ভূমিকা অংশ।
৪৩. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *নাথ অউর সন্ত সাহিত্য*, পৃ. ৬১৭।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ସିଦ୍ଧସାହିତ୍ୟ

তৃতীয় অধ্যায়

সিদ্ধসাহিত্য

৩. ক. তনের বারমাসি

প্রাচীনকাল থেকে নাথসম্প্রদায়ের যোগিগণ বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করতেন— সেইরকমই একটি লোকসঙ্গীতের ধারা ‘তনের বারমাসি’। ‘তন’ শব্দের অর্থ তনু বা দেহ। কায়াসাধনামূলক এই গানগুলি সাধারণ মানুষকে নিবৃত্তিমার্গে আকর্ষণ করত। নাথসম্প্রদায়ের প্রাচীন মানুষেরা ভোরবেলা বিছানা ছাড়ার আগে বিছানায় বসে বসে আপনমনে ভাটিয়ালি সুরে গানগুলি গাইতেন। গানগুলি শ্রবণে অন্য মানুষেরাও রসময় চিত্ততন্ময়তা লাভ করতেন। বর্তমানে বৈরাগ্যমূলক কায়াসাধনার এই গানগুলি নাথসম্প্রদায়ের গৃহস্থাশ্রমের মানুষেরা প্রায় ভুলতে বসেছেন। অথচ শুধুমাত্র প্রাচীন-মধ্যযুগে নয় কিছুদিন আগেও বাঙালি জনসাধারণকে রস আশ্বাদনের খোরাক দান করে এসেছে ‘তনের বারমাসি’-র মত নিবৃত্তিমার্গের গানগুলি। অসমের বরাক উপত্যকায় অবস্থিত ‘শ্রীমৎ পুষ্করনাথ যোগাশ্রম’ থেকে শ্রীরাজেন্দ্রলাল নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৯৯৫ খ্রি. ‘তনের বারমাসি’-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অতিপ্রাচীন হাতের লেখার জীর্ণ পুথি থেকে ‘তনের বারমাসি’-র কিছু অংশ সংগ্রহ করেন। অবশিষ্টাংশ কাছাড়ের শিলচর দুধপাতিল নিবাসী ব্রজমোহন নাথ মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। নাথসম্প্রদায়ের গায়কগণের সুবিধার জন্য এর সঙ্গে আরও তিনটি বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীত যুক্ত হয়েছিল। যোগী শ্রীমৎ পুষ্করনাথের উদ্যোগে সম্পাদক মহাশয় সর্বপ্রথম ১৯৭০ খ্রি. এই লোকগানগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

‘তনের বারমাসি’ গানগুলির মধ্যে জগৎ, প্রকৃতি, আত্মা-পরমাত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ, যোগ, যোগসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ, অনাহত নাদ, সমাধি, অষ্টসিদ্ধি, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় হিসেবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। ভাটিয়ালি সুরে সহজ সরল ভাষায় গানগুলি ব্যঞ্জনাবহ এবং কৌতূহলপূর্ণও বটে। মানুষের জীবনকে সার্থক করে তুলতে ‘তনের বারমাসি’-র গান অত্যন্ত সহায়ক সিদ্ধ বলা যায়। ভাষা, বেশভূষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-সমাজ আলাদা রেখেও নাথসাধু ও গৃহস্থরা অভ্রান্ত জীবনের লক্ষ্যে ‘তনের বারমাসি’-র মত গানগুলি রচনা করেছিলেন। নাথসম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করেন তন বা তনু বা কায়াসাধনার মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সম্ভব। তাঁদের ধারণা তন বা তনু ত্যাগ (মৃত্যু), তনধারণ (জন্ম), মৃত্যুর পরে জীবের গতি, পঞ্চ-অবস্থা, পুনর্জন্ম, ত্রিতাপ, চুরাশি-লক্ষ যোনিভ্রমণ, চোদ্দ-লোক ইত্যাদি বিষয় সহ মানব শরীরের মহত্ত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠতা, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমধাম মুক্তিপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়।

নাথপন্থ অনুসারে শরীরে দশদ্বার, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের দেবতা, তিনগুণ, তিনশরীর, দশপ্রাণ, ৭২৮৬৪ সংখ্যক নাড়ি এবং তাদের দশনাড়ির অন্যতম তিনপ্রধান নাড়ি, ছয় পদার্থ, পঞ্চতত্ত্ব, প্রকৃতি-জীবাত্মা ইত্যাদি শরীরে রয়েছে। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মই। বহু যোনি ভ্রমণ এবং বহু দেহ ধারণের পর জীব বা জীবাত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করে। কিন্তু জীবদেহ ধারণের পর সাবধানতা আবশ্যিক। তার জানা উচিত সে কোথা থেকে এসেছে, মৃত্যুর পরে সে কোথায় যাবে ইত্যাদি। অথচ মানুষের তন বা শরীরে এক শক্তি রয়েছে, যাকে ভেদ করে জানতে পারবে ব্যক্তি মানুষ বা জীবাত্মা ঈশ্বর বা ব্রহ্মেরই অংশ। ‘তনের বারমাসি’-র গানগুলিতে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সেই পথই প্রকাশিত হয়েছে—

‘আপন রচিত কানন মাঝারে
 আপনি রয়েছ ফুটিয়া।
 চির মুখরিত আপন জ্ঞানে
 পুলকে আছহ ভাসিয়া।।
 তুমিহে অনন্ত তুমি হে মহান
 তুমি হে আত্মা তুমিহে জ্ঞান।।
 তুমি অনল অনিল ভূধর সলিল
 বিবিধ আকারে প্রতীয়মান।।
 সর্ব জনক নমো নমস্তে
 নমস্তে পরমাত্মন নমো নমস্তে।।
 মহিমা তোমার গাহিতে বাসনা
 তোমারই করুণা লইয়া।।’^১

সাংখ্যদর্শনে নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল প্রকৃতি, বেদান্তশাস্ত্রে সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা
 আত্মাই নির্গুণ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি হলেন মায়া। যাদের আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞানতা দূর হয়,
 তারা পরমাত্মা বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ দেহত্যাগ করবার পূর্বেই এই সংসারে
 থেকেও সমস্ত মোহাবেগ সংবরণ করে নাথযোগী ব্রহ্মেই অবস্থিত বা ভাবিত হতে পারেন।
 এইপ্রকার নাথযোগী হলেন সুখী এবং ইহজীবন মুক্ত পুরুষ।

‘তনের বারমাসি’ গানে গুরুচরণধূলি গ্রহণ করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গানের শুরু
 হয়েছে। গুরুকৃপাতে ভবসাগর পারাপার সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়। অজ্ঞানরূপ
 অন্ধকারকে দূর করতে এরপর অখণ্ড জ্যোতির্ময় প্রণতি জ্ঞাপন করেন সিদ্ধগায়ক। দ্বিতীয়ত
 তিনি নির্গুণ-নিরাকার-নিরঞ্জন-অবিনাশী ‘অলখ’ নামে মন, বাক্ ও কর্মকে প্রণাম জানান।
 তৃতীয়ত নিরাকার পরমব্রহ্ম পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি মায়া, প্রকৃতি রূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি

অবস্থাকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন। শেষে অদ্বৈত, অখণ্ড পরমেশ্বরের জ্ঞান ধ্বংসকারী জন্মমৃত্যু চক্র অতিক্রম করে চৈতন্য-আনন্দস্বরূপ আত্মাকে মোহিত করে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন—

‘ভজরে পাগলা মন জপ নিরঞ্জন।

ভজিলে শ্রীগুরুর পদে পাইবায় রতন।। ধু:।।

তনের বিবরণ কহি শুন সব ভাই।

মূর্খে কি বুঝিতে পারে জ্ঞান যার নাই।।’^২

যোগসাধনার মাধ্যমে জীবনের উদ্দেশ্যে সফলতা আসে। কিন্তু ভগবত সেবায় ইচ্ছা পূর্ণ না হলে সিদ্ধ বা সাধককে বার বার পুনর্জন্মের চক্রে ফিরে আসতে হয়। শেষে বৈরাগ্য অভ্যাস সাধনার দ্বারা সফলতা পাওয়া যায়। জীবনকে বাস্তবিক জীবনে উন্নীত করতে ‘তনের বারমাসি’ সিদ্ধ সহায়ক গানের সংকলন গ্রন্থ। গৃহস্থশ্রমে থেকে বা বাড়িঘর ছেড়ে সৎগুরুর সান্নিধ্যে নিজেকে সিদ্ধরূপে গড়ে তোলা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মনুষ্যতনু প্রাপ্ত হয়েও কেউ যদি দেহের ভেতরের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করতে না পারেন, তাহলে তিনি মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়ে অধম বলে পরিগণিত হতে পারেন।

মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশের সমন্বয়ে জীব তথা শরীর পিণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। একে পঞ্চতত্ত্ব বলে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে রজ-বীৰ্য মিলিত হয়ে বায়ুর সাহায্যে স্ত্রীগর্ভে শরীরের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে দ্রব রূপ বুদবুদে মাংস, পেশি এবং কঠিন মাংস পেশি তৈরি হয়। তারপর পিণ্ড রূপ লাভ করে শেষে হাত-পায়ের শিরাদি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। জীবসম্বন্ধ তৈরি হতে শুরু হলে সুখ-দুঃখাদির অভিব্যক্তি ঘটে। অবশেষে হাত-পা-চোখ-কান-রক্ত-মাংস-অস্থি-চর্ম গঠিত হয়। এইভাবে লিঙ্গশরীর, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ,

চার-অন্তঃকরণ— মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার যুক্ত হয়ে চেতনা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ চিদাকাশে শুদ্ধচেতনা প্রকাশে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মাকে জীবাత్মা বলা হয়েছে। অন্তঃকরণে অর্থাৎ মানবশরীরে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটে। এই দেহের লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা। সেই কারণে নাথসিদ্ধ বলছেন দেহের মধ্যে শ্যাম-নিরঞ্জন নিত্য খেলা করে যায়—

বৈশাখ মাসেতে তনু বছর পরবেশ।
 ভাবিয়া না পাই তনু আছ কোন দেশ।।
 প্রথমে তনের স্থিতি পিতার শরীরে।
 বিন্দুরূপে উতপতি হৈলা ধীরে ধীরে।।
 মায়ের উদরে আসি হৈয়া গেলা স্থিতি।
 ঈশ্বরের হুকুমে হৈছে এ তনের উৎপত্তি।।
 প্রথমে ধরিল তন পিণ্ডের আকার।
 তার পাছে হস্ত পদ চক্ষু কণ্ঠ আর।।
 রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্ম হইলা উৎপন্ন।
 দশে আর অষ্টে খাড়া হৈলা এই তন।।
 মাটির পুতুলা তনু আবের পতন।
 তার মাঝে করে খেলা শ্যাম নিরঞ্জন।।”

তন-মনের পরম পবিত্রতায় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে। দেহ আবরণের নাশ হলে পরম ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। এমনিতেই শরীর নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশের সংযোগে জীব ও তার শরীর পিণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। বিশ্ব চরাচরে এক সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম পূর্ণচেতন সত্তা বিরাজ করে, যে সত্য সনাতন, নিত্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ, অনন্ত, নিরঞ্জন স্বরূপ। এর অন্য কোন সত্তা নেই— ‘অয়মাত্মাব্রহ্মম’, ‘সর্ব খল্বিদং ব্রহ্মম’ ইত্যাদি কথা তার প্রমাণ। অনাদি অনির্বচনীয় ব্রহ্মসত্তা যোগমায়ার আধার রূপে ‘একোঅহংবহুস্যাম’ এই সংকল্প

নিয়ে অবিদ্যা সংযুক্ত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এই তিনতত্ত্ব শরীর সম্বন্ধকে প্রকাশ করে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান যা মহাশক্তি বা প্রকৃতি। এই মহাশক্তির কৃপায় মানবশরীরের প্রাপ্তি ঘটে। ব্যক্তি শরীরের সাহায্যে মোক্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হন। মহাশক্তি পরমপিতা পরমাত্মা স্বরূপ, যিনি আমাদের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিশ্ব চরাচরের নিয়ন্ত্রক শক্তি। বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা ও অসম্পৃক্ত থাকেন। আর জীবের শরীর পঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত, তা জানানোর গীতিময় প্রকাশ হল ‘তনের বারমাসি’-র গানগুলি—

‘তনের সমান নাহি বন্ধু একজন।।
 আইতে আইলায় পঞ্চমিলি যাইতে একা যাও।
 আসমানের চন্দ্র তুমি আবেতে লুকাও।।
 কার স্ত্রী, কার পুত্র, কার বাপভাই।
 কেহত না যাবে সঙ্গে পড়িলে তনাই।।
 হাহারে সাধের তনু কে নিল হরিয়া।
 নিলক্ষ্যের অক্ষিরপত্র পড়িল ঝরিয়া।।
 পড়িয়া রইল সোনার (তনু) কেবা গেল ছাড়ি।
 কে চলাইল, কে বলাইল বুঝিতে না পারি।।
 কোথায় তোমার ধনজন কোথায় সংসার।
 কোথায় রইল পুত্রকন্যা আমার আমার।।
 পড়ি রইল মাটির ঘর বাহিরিলা বায়ু।
 অসার হইল সোনার তনু ফুরাইল আয়ু।।
 পাঁচে পাঁচ মিলি গেল করিলে সংকার।
 কর্মফল চলি গেল সঙ্গে জীবাত্মার।।
 হরি বল, হরি বল, হরি বল মন।

এই তনের বারমাসি হইল পূরণ।।
 এত সব জানিয়া ভাই হও সাবধান।
 আগে হইতে হাছ ধন তরিবে নিদান।।’^৪

কায়াসাধনার মাধ্যমে সাধক অষ্টসিদ্ধ হলে সিদ্ধ শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
 যোগসাধনার সূক্ষ্মরূপ এখানে গূঢ়তত্ত্ব হিসেবে স্থান লাভ করেছে। গুরু কৃপাতেই কেবল
 সাধক যৌগিক ক্রিয়াতে যুক্ত হন। শরীর রূপ ঘরে জীবাত্মা বাস করেন, তার সঙ্গে পরমাত্মাকে
 এক করার নামই যোগ। যে যোগসাধনায় পঞ্চতত্ত্ব, অনাহতনাদ, খেচরি-মুদ্রা, অজপা-জপ,
 বন্ধনাল-সাধন, শরীর-ত্যাগের লক্ষণ, পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পুজোপাঠ, তীর্থভ্রমণ, ভজন-কীর্তন, যাগ-যজ্ঞ, দান-পুণ্য ইত্যাদি শুভকর্ম কেবল
 মনকে শুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এভাবে মুক্তি সম্ভব নয় বলে নাথসম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে
 করেন। সেক্ষেত্রে মুক্তির কাঙ্ক্ষিত সহায়ক হন গুরু। মানুষের শরীরে কর্ম ও ভোগ দুটো
 প্রধান কর্ম। তন হল সাধনার ক্ষেত্র এবং তা তার (সিদ্ধর) দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান
 মানুষকে শক্তি প্রদান করছেন। অতএব অভ্যাস ও যত্নের গুণে মানুষ তন ত্যাগ করে
 মোক্ষপ্রাপ্ত হতে পারেন। তাই নাথযোগী গুরুকৃপায় ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে মোক্ষপদ
 প্রাপ্ত হয়ে সর্ব-সুখধাম লাভ করেন। কিন্তু যে মানুষ তা করেন না, তিনি চুরাশি লক্ষ বার
 পর্যন্ত বারে বারে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের আবর্তে বাঁধা পড়েন।^৫ সেই কারণে নাথসিদ্ধরা মনে
 করেন—

‘চরণ নাই চলিতে দক্ষ, বদন নাই তার বলে বাক্য, অলক্ষ্য নিশানা।
 তারে বৈষ্ণব কয় বিষ্ণু হরি, শৈবে কয় শিব জটাধারী, শাক্তে শঙ্করী।।
 সে পুরুষ কি নারী, চিনিতে নারি, কোন যুক্তি শাস্ত্রে মিলে না।

যে জন তারে ফেলে, অন্যে চলে, তার একুল ওকুল মিলে না।।’^৬

প্রাচীন ভারতে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেহসিদ্ধি বা কায়াসিদ্ধি প্রচলিত ছিল। তাঁরা কায়াসিদ্ধির মাধ্যমে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ লাভ করতে চেষ্টা করতেন। হঠযোগীরা বায়ুকে আশ্রয় করে দেহসাধনা করতেন। রসেশ্বর সম্প্রদায় দেহে রস বা পারদ প্রয়োগ করে আঠারোটি সংস্কারের সাহায্যে সিদ্ধদেহ বা হরগৌরীতনু লাভ করার চেষ্টা করতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাবসাধনার মাধ্যমে ভাবদেহ লাভের কথা বলেছেন। তান্ত্রিক সাধনায় কুণ্ডলিনী সাধনার প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। এখনও বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, বাউল সম্প্রদায়, ফকিরি ও সুফি সম্প্রদায়ে গুহ্য কায়াসাধনা প্রচলিত রয়েছে। নাথযোগীরা হঠযোগের সাধক। তাদের মতে শরীরই সর্বস্ব। বায়ুকে উল্টোপথে চালিত করাই যোগীর উল্টোজ্ঞান। কবীর তাঁর ‘বীজক’-র সাথীতে বলেছেন—

‘গোরক্ষ বসিয়া যোগকে, মুয়েন জারী দেহ।

মাঁসগলী মাখিমিলা, কোরো মাঁজী দেহ।।’^৭

অর্থাৎ জন্ম হলে প্রলয়কালে মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু শ্রীগোরক্ষ এমন যোগসাধন করেছেন যে তাঁর মৃত্যুতেও দেহের বিনাশ নেই। দেহের মাংস গলে মাটির ভেতর মিশে গেলেও তিনি নবদেহ লাভ করবেন। জীবদেহে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। যোগী যোগসাধনের মাধ্যমে দুই দেহের বিচ্ছেদ ঘটান। যোগমার্গের উচ্চস্তরে যোগসাধন দ্বারা উভয় দেহের মিলনে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হন। এই দেহকে প্রণবদেহ বা প্রণবতনু বলা হয়। নাথেরা মনে করেন গোরক্ষনাথ আজও প্রণবদেহে বিরাজমান আছেন।

‘তনের বারমাসি’ কেবল বাংলায় প্রচলিত আছে তা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। দিল্লি নিবাসী যোগী চুন্নীনাথ রচিত ‘তন-প্রকাশ’ নামে একটি

গানের সংকলন গ্রন্থ হিন্দিতে গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথ মন্দির থেকে ১৯৮৯ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে। যোগী চুন্নীনাথ আইপন্থী নাথযোগী। বাংলার নাথেরাও অধিকাংশ আইপন্থী বা আদিনাথপন্থী। নাথপন্থের যোগিনী বিমলা মাতার নাম অনুসারে আইপন্থের নাম হয়েছে। ‘আই’ শব্দের অর্থ মাতা। বৈদ্যনাথধামের ঈশানকোণে বিশালক গ্রামে গোরক্ষনাথ ও তাঁর শিষ্য বিমলামাতার সিদ্ধ আসন অবস্থিত।^৮ গোরক্ষনাথ ও বিমলাদেবীর কথোপকথন অবলম্বনে ‘গোরক্ষোপনিষদ’ রচিত হয়েছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনে যোগের অবদানের নিদর্শনের আভাস এসব লোকগান এবং স্থানীয় ভাষা সাহিত্যে যতটা পরিষ্কারভাবে পাওয়া গিয়েছে, অন্যত্র তেমনটা সুলভ নয় বলেই মনে হয়। ‘তনের বারমাসি’-তে পাঁচালি বা ব্রতকথার মত করে ধর্মীয়-তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমগ্র ভারতাত্মার আত্মপ্রসাদ স্বরূপ অমরত্বলাভ বা জীবনুজ্জীবনের তত্ত্বটিই নাথসম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকগীতি ও সাহিত্যের মতো এখানেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলিতে আদিবৈদিক যুগ থেকে গণসমাজে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপ্রণালীর সংকেত রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে কায়সাধনা বিষয়ক এই গানগুলি আজও প্রচলিত আছে, সেই সমাজের লোকেরা এগুলিকে এখনও ধর্মীয় বাণীরূপে সম্মান করে। এমনকি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর কাছে বিষয়গুলি আয়ত্ত করে নিজের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পথ সন্ধান করে।

দোহাকার বা গীতিকাররা আভ্যন্তরীণ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করতে শব্দ ও বাক্যবিন্যাস করেছেন, সেইভাবে অর্থের সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে শুধু বাহ্যিক রূপের উপর নির্ভর

করে গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সেই কারণে নাথসিদ্ধ লালনাথ বলেছেন—

‘লালনাথ বলে আমি উত্তরিনু পার।
মূঢ়গণ পড়ে রইল ভবের সে পার।।
চঞ্চল যে ভণ্ড যোগী ডুবেছে সাগরে।
এপারেতে নাই সে যে-ন তু অন্যপারে।।’^৯

তাই ‘তনের বারমাসি’-র মত গানগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা হল নাথ সম্প্রদায়ের দর্শনের ব্যাখ্যামূলক সাক্ষেতিক ভাষা। অতএব বাচ্যার্থ নয়, প্রতীক বা সন্ধেতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে ধর্মের অভ্যন্তর অর্থ ও রহস্যকে ভেদ করা সম্ভব হবে। তাই নাথসিদ্ধরা দেহতত্ত্বের রূপকে অতিসহজে যা বোঝেন, অন্যকেও গানগুলির মধ্য দিয়ে তা বোঝাতে পারেন। নাথযোগীরা যোগের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কর্মফল ভোগ এবং পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি প্রত্যাশা করে। এটাই তাঁদের কায়সাধনার লক্ষ্য—

‘হে পণ্ডিত! পড়ি শুনি বল ব্রহ্মজ্ঞান।
তোমার চরণে মুক্তি, বৈকুণ্ঠে স্থান।।
মৃত্যু পরে সবে যায় কবর চিতাতে।
ভ্রমণ তাহার পর চৌরাশী যোনিতে।।’^{১০}

তাই শেষপর্যন্ত নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথ জীবনুজির সাধনায় গুরুত্ব দিয়েছেন—

‘নাথ’ হই আমি যবে যোগের সাধনে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি আমার অধীনে।।
বৈকুণ্ঠেতে গেলে হয় পুনরাগমন।
অ-লোকেতে গিয়া আমি হই নিরঞ্জন।।

আসা যাওয়া হয় বন্ধ – নিরঞ্জে স্থিতি।

নাথ-যোগী মতে ইহা জীবন-মুকুতি।।^{১১}

যোগানুষ্ঠানের মাধ্যমে কায়, মন ও প্রাণের সব কাজ পরিত্যক্ত হলে নাথসিদ্ধ সহজ-অবস্থা প্রাপ্ত হন। সমরসীকরণের শুরুতে আত্মা বিশ্বকে অতিক্রম করে নির্বিকল্প-পদে স্থিতি লাভ করে। তারপর ভগবানের পরমাশক্তির সংযোগে পূর্ণত্ব অনুভব করে। তখন এই অবস্থাকে পূর্ণসামরস্য বলে। এই অবস্থায় বন্ধন-মোক্ষের ভেদ, মন-আত্মার ভেদ, সবিকল্প-নির্বিকল্প, দৃশ্য-দ্রষ্টার ভেদ থাকে না। ‘যোগবীজ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে—

‘অজরামরপিণ্ডে যো জীবনুক্তঃ স এব হি।’^{১২}

অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় দেহপাতের আগে যে মুক্তি তাই হল জীবনুক্তি। শেষে প্রারব্ধকর্ম লয় হলে বিদেহমুক্তি ঘটে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহনাশের পর মুক্তিই বিদেহমুক্তি। বিদেহমুক্তিতে দেহত্যাগ হয় বলে নাথেরা দেহ থাকতেই মুক্তি অর্থাৎ জীবনুক্তির কথা বলেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, ‘ওড়িশায় ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সমাজেও সিদ্ধগণের এই জীবনুক্তির ছায়া পড়েছে। তাঁরা দৈহিক পরিপূর্ণতা, মৃত্যুঞ্জয়ত্ব ও যোগের দ্বারা চন্দ্র-সূর্যরোধের আদর্শও তাঁদের ভাগবত-গীতার আদর্শের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।’^{১৩}

কাজেই নাথপন্থের প্রসার হয়েছিল ভারতময়। নাথপন্থের অমরত্বের স্বরূপ হল—

‘মূঢ় লোকে দৃষ্ট-নষ্ট দেখিলে হয় কাতর,
তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগর শোষে
মূঢ় থাকে যতদিন ততদিন লোকে দেখে না,
দুধের মাঝে মাখন থাকিলেও দেখিতে পায় না,
এই সংসারে কেহ আসে না যায়ও না।

এই ভাব লইয়া বিলাস করিতেছে যোগী কাহ্ন।’^{১৪}

এই কায়াসাধনা বা দেহতত্ত্ব গোরক্ষনাথের গান, যোগীকাচ, ময়নামতীর গান, যোগীর গান, গোপীচন্দ্রের গান সহ সমগ্র নাথসাহিত্যেই লক্ষ করা যায়। এমনকি বৌদ্ধ, জৈন ও সর্বভারতীয় সিদ্ধসাহিত্যেও কায়াসাধনার প্রসঙ্গ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীমৎ পুষ্করনাথ যোগী, *তনের বারমাসি*, ভূমিকা অংশ।
২. ঐ, পৃ. ১।
৩. ঐ, পৃ. ১।
৪. ঐ, পৃ. ৬-৭।
৫. *নাথগুরুবাণী ১ম খণ্ড*, রাজমোহন নাথ (অনু.), পৃ. ৫১।
৬. শ্রীমৎ পুষ্করনাথ যোগী, *তনের বারমাসি*, পৃ. ১২।
৭. শ্লোক ৪২।
৮. *গোপীচন্দ্রের গান*, রাজমোহন নাথ (সম্পা.), পৃ. ২৪।
৯. *গোরখবাণী*, *গোরখ শবদী ১০৫*, পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.), পৃ. ৫৬।
১০. ঐ, *গোরখ শবদী ১৬৮*, পৃ. ৭৭।
১১. *নাথগুরুবাণী ১ম খণ্ড*, পৃ. ৫২।
১২. *যোগবীজ*, শ্লোক ১৭১।
১৩. গোপীমোহন সিংহরায়, *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা*, পৃ. ৮৮।
১৪. *গোখবিজয়*, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), ভূমিকা পৃ. ৮১-৮২।

৩. খ. মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ

ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে যোগ, ভক্তি, নাদ, বিন্দুসাধনা ইত্যাদির চর্চা উপনিষদের মাধ্যমে ঘটেছে। উপনিষদ অনন্ত জ্ঞান ও সাধনার উৎসভূমি। শৈবাগমে শিবশক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পতঞ্জলি ‘যোগসূত্র’ রচনা করে কায়াসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে নাথপন্থে পাতঞ্জল যোগদর্শন অনুসরণ করা হয় নি। তাত্ত্বিক যোগধারা অনুসরণ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক শাক্তমত, তাত্ত্বিক শৈবমত এবং কাশ্মীরি শৈবমত (ত্রিকমত) এই তিনমতের প্রভাব পড়েছে নাথমতে।^১ ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাহিত্যে যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, যোগী গোরক্ষনাথ সহ অন্যান্য নাথসিদ্ধরা এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলায় চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধারা প্রকাশের পূর্ব থেকেই নাথপন্থ প্রভাবশালী লোকধর্ম ছিল। এমনকি চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যেও নাথপন্থের প্রভাব প্রবলভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ অখণ্ড পুথিরূপে ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’ পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তাঁর সম্পাদিত ‘গোর্থবিজয়’ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ঘ) অংশে খণ্ডিত পুথি রূপে ‘গোর্থসংহিতা’ নামে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯খ্রি.) পুথিটি প্রকাশিত হয়েছিল। পুথিটি তিনি ‘বর্ধমান সাহিত্যসভা’ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, পুথিসংখ্যা- ২৮। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘গোরক্ষ-সংহিতা বলিতে বাঙ্গালী যুগীরা কি বুঝিতেন, এবং কোন ধারার দর্শনে তাঁহাদের সাধনমার্গ অবলম্বিত হইত, তাহার একটি দুর্লভ নিদর্শন এই প্রাচীন পুঁথিখানি হইতে পাওয়া যাইবে। নাথসাহিত্যের এইরূপ প্রাচীন পুঁথি সম্ভবত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে বাঙ্গালা গোর্থ-সংহিতা বা নাথ-কড়চা কিংবা নাথ-কুলঞ্জী বলা যাইতে পারে।’^২ পরবর্তী

সময়ে তিনি নাম পরিবর্তন করে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ নাম দিয়ে পূর্ণাঙ্গ পুথিটি সম্বন্ধে বলছেন—

‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। উত্তরবঙ্গের পুথি থেকে এটি অংশত প্রকাশ করা হয়েছিল গোখবিজয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে, এবং পরে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয়েছে সাহিত্যপ্রকাশিকা পঞ্চমখণ্ড দ্বাদশমঙ্গল গ্রন্থে।’^৭

রাজমোহন নাথের ‘বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি’ গ্রন্থে প্রকাশিত ‘অথ শিষ্যগুরু সংবাদ’ এবং ‘সিদ্ধি সুবর্ণনাথ’ নামে দু’টি পুথির বিষয়বস্তুর সঙ্গে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থের মিল রয়েছে। ড. পীতাম্বর দত্ত বড়থাল সম্পাদিত হিন্দি ‘গোরখবাণী’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত ‘মছিন্দ্র গোরখ বোধ’ পুথির সঙ্গেও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।^৮ শেষেরটি সম্পূর্ণ পুথি। রাজমোহন নাথ ও পঞ্চগনন মণ্ডল সংগৃহীত বাংলা পুথি দুটি সম্পূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। তবে রাজমোহন নাথ ও পীতাম্বর দত্ত বড়থাল সম্পাদিত পুথির সঙ্গে ছবছ মিল থাকলেও পঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত পুথির সঙ্গে ছবছ মিল লক্ষ করা যায় না, কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

‘শ্রী গোরক্ষ উবাচ—

কাহা দেখিবা কাহা বিচারিবা কাহা করিবা সারং।

কাহা দেখি মস্তক মুণ্ডাইবা কাহাছে উত্তরিবা পারং।।’

‘শ্রীমচ্ছন্দ—

আপ দেখিবা অনন্ত বিচারিবা নিজ তত্ত্ব করিবা সারং।

ঋদ্ধি সিদ্ধিকা মস্তক মুণ্ডাইবা—ব্রহ্ম আসনছে উত্তরিবা পারং।।’^৯

‘গোরক্ষ—

স্বামী কৌন দেখিবা কৌন বিচারিবা, কৌন লে ধরিবা সারং।

কৌন দোষ মস্তক মুডাইবা কৌন লে উত্তরিবা পারং।’

‘মহিদ্—

অবধু আপা দেষিবা অনন্ত বিচারিবা, তত লে ধরিবা সারং।

গুরু কা সবদ দেষি মসতগ মুড়াইবা, ব্রহ্ম জ্ঞান লে উতরিবা পারং।।’^৬

উপরোক্ত অংশটি রাজমোহন নাথের ‘বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি’ ও ড.পীতাম্বর দত্ত বড়খাল সম্পাদিত ‘গোরখবাণী’ গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’ পত্রিকা প্রকাশিত অংশে নেই। ‘অথ সিদ্ধি সুবর্ণনাথ’ পুঁথিটির সঙ্গেও ‘মীন-মহন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে। গভীর শাস্ত্র অধ্যয়ন, জ্ঞান আলোচনা, যোগশাস্ত্রনির্ভর কঠোর আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম ইত্যাদির চর্চা না করেও শুধু গুরুভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাকে ‘সুবর্ণসিদ্ধি’ বলে।^৭ নাথসম্প্রদায়ের ‘মঞ্জুনাথচরিত’ গ্রন্থে সুবর্ণসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—

‘ভক্তিসিদ্ধাং জন-জ্ঞাঘাং ভাগ্যবন্তো বিবৃণতে।

তেষাং সুবর্ণ- সংসিদ্ধিঃ প্রত্যদভূতা পদে পদে।

ন কুলেন ন বিদ্যাভির্গ শীলেনাপি লভ্যতে।’^৮

রাজমোহন নাথ ১৯৪২ খ্রি. পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণকাছ গ্রাম থেকে শিক্ষক উদয়চাঁদ নাথের কাছ থেকে ‘শিষ্য-গুরু সংবাদ’, ‘সিদ্ধি সুবর্ণনাথ’ ইত্যাদি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন বলে ‘বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি’-তে উল্লেখ করেছেন।^৯ আমরা অবশ্য ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ‘সাহিত্য প্রকাশিকা’ পত্রিকা ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত ‘মীন-মহন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থ অনুসারে নাথপন্থের দর্শন, যৌগিকসাধন পদ্ধতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছি।

মৎস্যেন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্ব, লৌকিক ধর্মদর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমকালীন সমাজভাবনা বিষয়ে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ পুথিতে নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়েছে। পুথিটিতে যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য যোগী গোরক্ষনাথের প্রশ্নোত্তরে কায়াযোগ দর্শনের সনাতন ধারা সূত্রাকারে অথবা বিশদভাবে স্থান পেয়েছে। প্রশ্নোত্তর-শৈলীতে লেখা ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ নাথসম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টিতে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এখানে যোগসাধনার সমস্যা ও সমাধানের পরিচয় পাওয়া যায়, যা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে ‘অবধূ’ বা ‘অবধূত’ বলে এবং গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে ‘স্বামী’ সম্বোধন করেছেন। অবধূতের কোথায় থাকা উচিত, কী দেখা উচিত বা কী বিচার করা উচিত ইত্যাদি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তার অতিরিক্ত নাথ, বিন্দু, দেবতা, উন্মন, চক্রজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে। সবশেষে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ এবিষয়ে একটি সহজ সাধারণ উত্তর দিয়েছেন।

নাথপন্থের প্রবর্তক হলেন আদিনাথ, যাঁকে স্বয়ং শিব বলে মনে করা হয়। নাথসম্প্রদায় ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়। সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতে নাথধর্মের প্রসার ঘটে।^{১০} স্কন্দপুরাণে দেখা যায় বশিষ্ঠ মুনির উপদেশে নিয়ম অনুসারে অনাদি শিবলিঙ্গ আরাধনা করে শিবলিঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে।^{১১} নাথযোগীরা শিব উপাসক। নাথধর্ম মূলত শৈব যোগধর্ম। নাথসম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন শিব যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক। যোগশাস্ত্রগুলি শিব-পার্বতীর প্রশ্নোত্তর রীতিতে রচিত হয়েছে।^{১২} নাথপন্থে যোগীগুরুরাও প্রহেলিকার সাহায্যে ছড়ার মাধ্যমে যোগশিক্ষা উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করে তুলেছিলেন। এঁদের রচিত বাংলা অধিকাংশ প্রহেলিকা ছড়ায় অধ্যাত্মচেতনা রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত

হয়েছে। এমনকি হিন্দি, রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও বাংলার সুর শোনা যায়।^{১৩} নাথপন্থী যোগীদের অনেকেই রমতায়োগী। এঁদের মধ্যে জাতপাতের বৈষম্য নেই, ভাষার গণ্ডিও ছিল না। জৈন সম্প্রদায়ের প্রচলিত অপভ্রংশ দোহাতেও যোগপন্থী সিদ্ধ সাধকের প্রশ্নোত্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়—

‘প্রশ্ন। কালহিঁ পবনহিঁ রবিসসিহিঁ

উত্তর। সসি পোষই রবি পজ্জলই।’^{১৪}

মহাভারতের বনপর্বে যে ‘বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ’ রয়েছে তার মূলেও রয়েছে প্রশ্নোত্তরে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা।

নাথপন্থে শিব-শক্তির মিলনের তত্ত্বই পরমতত্ত্ব। এখান থেকেই জগৎ বা পিণ্ডের উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে। এই জগৎ দ্বিবিধ—নিরাকার এবং সাকার। নাথসিদ্ধগণ সাকার-নিরাকার এবং সগুণ-নির্গুণের পরমতত্ত্বকে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পরপিণ্ড থেকে অনাদিপিণ্ড, অনাদিপিণ্ড থেকে আদ্যপিণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে সাকার পিণ্ড, আবার সাকারপিণ্ড থেকে শিবের অষ্টমূর্তি বিশিষ্ট মহাসাকার পিণ্ড সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে মহাসাকার পিণ্ডের অন্যতম ব্রহ্মা মূর্তি থেকে ক্রমান্বয়ে গর্ভপিণ্ডের উৎপত্তি ঘটেছে। এইভাবে জীবের জন্ম শুরু হয়েছে। ‘গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ গ্রন্থেও একই সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ রয়েছে।^{১৫}

অদ্বৈত সাকার নিরাকার অতীত নাথ-অবস্থা প্রাপ্ত হলে নিরাকার জ্যোতির্নাথের সৃষ্টি হয়। তাঁর থেকে সাকার নাথ এবং সাকার নাথের ইচ্ছা থেকে সদাশিব ও ভৈরব সৃষ্টি হয়েছেন। ভৈরবের শক্তি ভৈরবী থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটেছে। অনামা

বা নাথ বা পরমতত্ত্ব থেকে পরপিণ্ড বা অনাদিপিণ্ড ও আদ্যপিণ্ডের প্রকাশই নিরাকার সৃষ্টি। আদ্যপিণ্ড থেকে সৃষ্ট পঞ্চমহাভূত ও ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত পিণ্ডই হল সাকার সৃষ্টি। ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রশ্নোত্তরশৈলীর মাধ্যমে মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথকে সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গোরক্ষনাথ প্রশ্ন করছেন যে সাকারপিণ্ড যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন পবন, জল আদি চন্দ্র, সূর্য থাকবে না। তাহলে হংসের তখন কী পরিচয় হবে? মৎস্যেন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছেন—

‘হৃদয় না ছিল জখন
নিরঞ্জে ছিল মন।
নাভি না ছিল জখন
নির্মলে বহে পবন।
রূপ না ছিল জখন
নির্মলে বহে শব্দ।
গগন না ছিল জখন
উনহুৎ বহে চন্দ্র।’^{১৬}

মৎস্যেন্দ্রনাথ আরও বললেন যে যখন সবকিছু থাকবে না, সাকার নিরাকার হয়ে যাবে; তাহলে হংসের নিবাস পরম জ্যোতিতেই হবে। সে সম্পর্কে তিনি বলেন—

‘সহজ হী আকার নিরাকার হোইসী
পরম জ্যোতি হংস কা নিবাস।’^{১৭}

নাথপন্থে মন্ত্রযোগের একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া হল ‘হংস মন্ত্র’। এই মন্ত্রের জপ মানবদেহে দিবারাত্র চলছে। স্বাভাবিকভাবে হংসমন্ত্র সাধনায় নিজস্ব চেষ্টায় জপ করতে হয় না। শুধু এই জপে মনকে একাগ্র করে মনে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে অনুভব করতে হয়। এই কারণে এই সাধনা

মন্ত্রযোগ হলেও এর নাম ‘অজপা সাধন’। মানবদেহে সারাদিনে স্বাভাবিক নিয়মে ‘অজপা জপ’ ২১৬০০ বার চলে। যোগী গোরক্ষনাথ গুরু যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথকে হংসের বাসস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন এবং সদগুরু হিসেবে তিনি অবধূত গোরক্ষনাথকে উত্তর দিয়েছেন—

‘নাভিকমলে বৈশে শ্বাস উশ্বাসা।

হৃদয়কমলে হংসে করে বাসা।।

সহস্রদল কমলে সম্পূর্ণে রহে।’^{১৮}

সিদ্ধ যোগীরা কুম্ভকের সাহায্যে এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হন যখন রেচক ও পূরক থাকে না। এই সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবেগ শান্ত থাকে। এই অবস্থায় নাভিকন্দে প্রাণ ও অপানের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে সহস্রদল পদ্ম থেকে যে অমৃতধারা সবসময় ক্ষরিত হচ্ছে তা ঐসময়ে পান করার সুযোগ আসে। প্রাণ চঞ্চল থাকলে এই অমৃত পান সম্ভব নয়। যোগী প্রাণ ও অপানের সমতা লাভ করে শান্তিতে অবস্থান করেন এবং অমৃতপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি ওই অমৃত পান না করে তার সাহায্যে নাভিস্থিত শিবকে অভিষিক্ত করে হংস মন্ত্রের আবর্তন করান। হংসের কারণে দেহে প্রত্যক্ষ যজ্ঞ করার প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে হংস-যোগের বা অজপা সাধনের বিবরণ পাওয়া যায়। হংস যোগের মাধ্যমে সিদ্ধ যোগীর আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান তৈরি হয়। এটাই হংস জ্ঞান। আমরা যাকে জাগতিক ভাষায় প্রাণ-অপানের ব্যাপার বলি তাই যোগীর ভাষায় হংস মন্ত্রের উচ্চারণ। এই ‘হংস’ মন্ত্রকেই ‘মহামন্ত্র’ বা ‘অজপা গায়ত্রী’ বলা হয়। গুরু উপদেশে এই মন্ত্রই ‘সোহং’ মন্ত্রে পরিণত হয়। ‘হংস’ মন্ত্র বা ‘অজপা’ গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। ‘হংস’ মন্ত্রের মাধ্যমে নাথপন্থের ‘শিবশক্তি’ তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। যোগী গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘হংকারেণ বহির্ঘাতি স-কারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হংস হংসেত্যমুং মন্ত্ৰং জীবো জপতি সর্বদা।।’^{১৯}

মৎস্যেন্দ্রনাথ কায়াসিদ্ধির কথাও বলেছেন শিষ্য গোরক্ষনাথের প্রশ্নের উত্তরে। সিদ্ধ সম্প্রদায়ে কায়াসিদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেহের স্থিরতা হলেও যতক্ষণ না মায়ানিবৃত্তি হচ্ছে ততক্ষণ পরামুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাঁর মতে কায়াসিদ্ধ যোগী বাত, আতপ, আগুন, বৃষ্টি, তুহিন প্রভৃতির দ্বারা পীড়া অনুভব করেন না। এইভাবে যোগী জরা-মৃত্যু জয় করেন। সিদ্ধযোগী সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করে ঈশ্বরে পূর্ণ সমাহিত থাকেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য অবধূত গোরক্ষনাথকে সেকথায় বলেছেন—

‘আজ্ঞা পরিচয় লাগে বান্ধা।

জ্ঞান পরিচয় অজর অমর হয় কান্ধা।’^{২০}

নাথযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ দেহসিদ্ধির জন্য রস (পারদ) প্রয়োগ, কেউ কেউ বায়ুপ্রক্রিয়া, অন্যরা বিন্দুসিদ্ধির জন্য পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এসব প্রক্রিয়া যোগপ্রক্রিয়া নামেই পরিচিত। এঁরা লোকোত্তর যোগসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। অবশ্য মহাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া কায়াসিদ্ধির কোনো উপায় নেই। পরপিণ্ড থেকে স্বপিণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পিণ্ডের জ্ঞানলাভ করলে পরমপদে সমরসতা প্রাপ্তি ঘটে।

মহাজ্ঞানের মাধ্যমে পরমশূন্য যোগ লাভ সম্ভব। গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে মহাশূন্য লাভের উপায়ও নির্দেশ করেছেন—

‘সহজ শূন্য সোঁ উৎপত্তি।

অমিল শূন্য সোমায়ে।।

অতীত শূন্য সোঁ জায় সামায়ে।

পবন শূন্য সৎগুরু লথায়।।’^{২১}

মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্যত্র ‘মৎস্য’ এবং ‘পাশ’ বলতে চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে বুঝিয়েছেন, যা জ্ঞানেন্দ্রিয়র অর্থকে প্রকাশ করছে—

‘মচ্ছাঃ পাশাঃ সমাখ্যাতাঃ চপলাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ।

ছেদিতাস্তু যদা তেন মচ্ছন্দস্তেন কীর্তিতঃ।।’^{২২}

অর্থাৎ নাথপন্থে বৌদ্ধ শূন্যবাদের অনুগামিতা ঘটেনি। নাথপন্থীরা ভগবান আদিনাথ এবং আত্মাকে কেবল বিশ্বাস করেননি, এমনকি তাঁর উপাসকও বটে। নাথপন্থে শূন্যের প্রচলন এবং ব্যবহার ‘ব্রহ্মরক্ত’, অন্তর-আকাশ বা চিদাকাশ চক্রে অবস্থিত আকাশ এবং চিদাকাশ ইত্যাদি অব্যক্ত, অবাঙ্গমানসগোচর অর্থকে দ্যোতিত করেছে। নতুংক দর্শনকে দ্যোতিত করা নাথপন্থের উদ্দেশ্য নয়, নাথপন্থীরা অস্তিবাদী অর্থাৎ আস্তিক। কিন্তু চরম সত্যকে প্রকাশ করতে তারা ‘অস্তি-নাস্তি’-র সীমা অতিক্রম করে ‘শূন্য’-কে প্রকাশ করেন। ড. কল্যাণী মল্লিক বলেছেন—

এই শূন্যের ধারণা বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রবেশ করিয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ
অনুমান করিলেও উহা অযথার্থ।^{২৩}

‘গোরক্ষবিজয়’ গ্রন্থে গোরক্ষনাথ কদলীরাজ্যে যোগভ্রষ্ট গুরুকে বলেছিলেন—

‘কায়াসাধ কায়াসাধ।’^{২৪}

আবার গুরুকে ‘উলটিয়া যোগ ধর’ বলেছেন। এটা আসলে উল্টোসাধন পদ্ধতি। এই সাধন পরিণামে অর্থাৎ যোগফলে ‘মহারস’ উর্ধ্ব পৌঁছালে আয়ু বাড়ে। এই প্রকার দেহসিদ্ধিতে বন্ধনাল বা শঙ্কিনী নাড়ির ভূমিকা রয়েছে। শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে বলেছেন—

‘সরুয়া সংখিনী একা ভেদি কাল।

বেঙ্কনালে সাধ গুরু না করিও হেলা।।’^{২৫}

ষট্চক্র সাধনের কথাও এখানে আছে। শরীরের বিভিন্ন নাড়ি, অজপা জপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই কায়াসাধনের শিক্ষা যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে প্রদান করেছিলেন ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন—

‘মছন্দ উবাচ ।।

অবধু,
কিঙ্কিনী নালে জীব সঞ্চারে,
শুখমনি বৈশে জিউ।
বেকানালা সে পিউ।।’^{২৬}

নাথপন্থে দেহের ভেতরকার শক্তিকে জাগ্রত করে উর্ধ্বমুখী করার সাধন পদ্ধতি ‘উল্টোসাধন’ নামে পরিচিত। এই সাধনায় বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা হয়। এই প্রকার সাধনপথে শরীরের বিভিন্ন নাড়ি, বিশেষ করে বঙ্কনাল বা শঙ্কিনী নাড়ির অবস্থান জানা প্রয়োজন। বেদান্তের বিবেকবৈরাগ্য সাধন, সাংখ্যের ষোড়শবিকার জয়, পাতঞ্জলের যোগসাধন সবই চিত্তবৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে মনকে অন্তর্মুখী করবার সাধনা বিশেষ। নাথ উল্টোসাধনকেই বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা ‘পরাবৃত্তি’-র পথ বলে অভিহিত করেছেন।

দেহ-মনের চঞ্চলতা দূর হলে যে অবস্থায় নাথগণ পৌঁছান তাকে ‘নিরুত্থান দশা’ বলা হয়। এই নিরুত্থান অবস্থা সামরস্য বা পরমপদে স্থিতিলাভের মাধ্যম। এই অবস্থা লাভই নাথদের আদর্শ। এই পরমপদ প্রাপ্তিই জীবের অভীষ্ট, গীতাতেও রয়েছে—

‘যদ গতা ন নির্বতন্তে তদ্ধাম পরমং মম।’^{২৭}

এই নিরুত্থান অবস্থায় নাম ও রূপহীন ভাবের উদয় হয়, যা ‘দ্বৈতাদ্বৈতহীন নাথস্বরূপ’ অবস্থা। এই সাধনধারা হঠযোগের বিষয়। নাথসম্প্রদায়ের ‘যোগবীজ’ গ্রন্থেও দ্বৈতাদ্বৈত সমতত্ত্বরূপ নাথস্বরূপকে জ্ঞানপূর্ণ যোগের সাহায্যে লাভ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি যোগাঙ্গির সাহায্যে সপ্তধাতুময় দেহকে জয় করে অজর অমর হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। প্রাণ ও অপানের সংযোগে যোগাঙ্গির মাধ্যমে দেহ দগ্ধ করা সম্ভব—

‘প্রাণাপানসমায়োগাত চন্দ্রসূর্য্যেক্যতা ভবেত ।

সর্বধাতুময়ং দেহমগ্নিনা জারয়েদ বুধঃ ।।’^{২৮}

প্রাণ-অপানের যোগসাধনই হঠযোগের বিষয় ।

শরীর পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই কারণে শরীরেই পঞ্চমণ্ডল অবস্থিত, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। শরীরের অস্থি, মাংস অংশ নিয়ে কাঠিন্য তৈরি হয়, যাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলে। শরীরের জলীয় অংশ হল রস, রজ, বীর্য, রক্ত ইত্যাদি। শরীরের তেজাংশ যথাক্রমে দীপ্তি, কান্তি, তেজ ইত্যাদি। শরীরের গতি, প্রাণ, বল, স্পর্শকে বায়ু অংশ বলা হয়েছে। শরীরের শূন্যস্থান হল সবই অবকাশ স্থান, যাকে আকাশ অংশ বলে। পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত থেকে নাথযোগীরা সৃষ্ট হন—

‘পৃথ্বী জলং তথা বহির্বাযুরাকাশমেব চ ।

এতে সত্ত্বানোদয়াস্ত সম্যগেব প্রকীর্তিতা ।।’^{২৯}

‘গোরক্ষ সংহিতা’-তে অবশ্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে। কিন্তু এদের সত্তা নেই, নিখিল জগতে একমাত্র ব্যক্তিসত্তাই দৃশ্যমান।^{৩০}

নাথযোগীরা নিজের দেহকে ব্রহ্মাণ্ড মনে করে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে নিজের দেহের মধ্যেই কল্পনা করে থাকেন—

‘দেহেহস্মিন বর্ততে মেরু সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ ।’^{৩১}

অর্থাৎ মানুষের দেহে সপ্তদ্বীপের সঙ্গে সুমেরু পর্বত, সমস্ত নদনদী, সমুদ্র, ক্ষেত্রপালগণ অবস্থান করে। ঋষি, মুনিগণ, নক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠ দেবতাসকল এই দেহে বিরাজ করেন। সৃষ্টি, সংহারক রবিশশী এই দেহে সর্বদা ভ্রমণ করছেন। এছাড়া ক্ষিতি, অপ,

তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতও অবস্থান করছেন। এমনকি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনে যত জীব আছেন সে সকল মেরুকে বেষ্টন করে নিজেদের কাজ করছেন, যিনি এইসব বিষয় অবহিত আছেন তিনিই নাথযোগী।

নাথপন্থে যম ও নিয়ম পরিত্যক্ত হলেও শরীর শোধনের জন্য ছ’টি যোগাসের সঙ্গে ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ট্রাটক ও কপালভাতি নামক ষট্‌কর্ম সাধনার কথা বলা হয়েছে—

‘ধৌতিবস্তিস্তুথা নেতি লৌলিকিস্ট্রাটকস্তথা।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌ কর্ম্মানি সমাচরেৎ।।’^{৩২}

মন একদিকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে আত্মার সঙ্গেও সংযুক্ত। আমরা মনের সাহায্যেই সবকিছু অনুভব-উপভোগ করে থাকি।

প্রাণ এক বিশেষ চেতনাশক্তি। প্রাণের ধর্ম গতিশীলতা বা বাণ বা প্রবাহ। জীব যখন এই প্রাণের বাণ হারিয়ে ফেলে তখনই জীবের মৃত্যু ঘটে। ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা মন, অন্যদিকে মনের রাজা বায়ু। প্রাণের অস্তিত্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বায়ুই প্রাণ, বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রাণ-সংরোধ। এই ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই যোগের প্রাথমিক কাজ। যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে (প্রাণবায়ু) নিয়ন্ত্রণে রাখেন তিনি আমি বা আত্মা। এই আমি বা আত্মা চিদ্‌ আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ সত্তা—

‘ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথঃ মনোনাথস্তু মারুতঃ।’^{৩৩}

যোগের সাহায্যে প্রাণবায়ু গতিহীন হয়ে নিরোধ সম্ভব হয়। বিজ্ঞানের কথায় বাইরের বায়ু ও শরীরের ভেতরের বায়ু গতিহীন হয়ে শেষে সমচাপসম্পন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় কুম্ভক

যোগে যোগী জল বা মাটির ভেতর থাকতে পারেন। তাতে যোগীর মৃত্যু হয় না। হলায়ুধ মিশ্রের ‘সেকশুভোদয়া’ গ্রন্থে এমন কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়।^{৩৪}

মনই তো চন্দ্র-বিন্দু পূর্ণচন্দ্র; অবশ্য বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। তাই বিন্দু থেকেই চিদ-অনুভবের সূচনা ধরা হয়। মনের উপাদান ক্রমশ ক্ষীণ হলে কালের ভয় থাকে। মনকে চন্দ্র ও কালকে রাহু বলা হয়। মনের নিরোধ বা উন্মী অৱস্থায় কালের বিনাশ ঘটে। নাথযোগীরা মনে করেন মনকে অতিক্রম করতে পারলে আত্মার পূর্ণ জাগরণ ঘটে। মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে বলেছেন—

‘মছন্দ উবাচ।।

অবধু,
হৃদয়ে করে মনস গুণ আনগুণ।
নাভি পবন করে আয়নগয়ন
গগণমুখে চন্দ্র নিরন্তর রহে।
মনসুখে কাল নিদ্রা করে।।’^{৩৫}

নাথযোগী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আদিনাথ শিব হলেও পৃথিবীতে মৎস্যেন্দ্রনাথই প্রথম তা প্রচার করেন। এরপর যোগী গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ, কানুপানাথ বা কাহুপা, চৌরঙ্গীনাথ, ভর্তৃহরিনাথ, যোগিনী ময়নামতী প্রমুখ সিদ্ধযোগীদের আবির্ভাব ঘটে। মনে করা হয় যে কপিল, মার্কণ্ডেয়, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ হঠযোগের উপদেষ্টা ছিলেন। ‘নারদ পরিব্রাজক’ উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পূর্বেও অনেক নাথসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা হলেন— শ্বেতকেতু, রিভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দুর্বাসা, বৈদেহ (জনক), শুক, বামদেব, দত্তাত্রেয় প্রমুখ।^{৩৬} নাথযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ দেহ সিদ্ধির জন্য রসপ্রয়োগ, কেউ কেউ বায়ুপ্রক্রিয়া, অন্যরা

বিন্দুসিদ্ধির জন্য পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আবার কেউ কেউ হঠযোগের মাধ্যমে সিদ্ধ, কেউ কেউ তান্ত্রিকমতে বিন্দুসিদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধ হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছেন—

‘গুরু গোসাঈঃ
কোন ধরতি কোন আকাশ,
কথা বৈশে পঞ্চতত্ত্ব [পাশ]।
কথা বৈশে মাতা পিতাকে বিন্দু।
কথা বৈশে কায়াজী কায়াজীউকে চন্দ্র।।’^{৩৭}

এসব প্রক্রিয়া যোগপ্রক্রিয়া নামেই পরিচিত।

নাথযোগীদের মধ্যে আকাশচন্দ্র ভেদের প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। তাঁরা মনে করেন যে দেহরস অমৃতে পরিণত হওয়ার পর উর্ধ্বগামী বায়ুর সাহায্যে সহস্রাতে গিয়ে সঞ্চিত হয়। এই মত চারপ্রকার চন্দ্রের কথা বলা হয়েছে—

১. আদিচন্দ্র ২. নিজচন্দ্র ৩. উন্মদচন্দ্র এবং ৪. গরলচন্দ্র

রসাত্মক নিজচন্দ্রকে যোগী উর্ধ্ব আকাশচন্দ্রে নিয়ে যান। উর্ধ্বগতির কারণে রস অমৃতে পরিণত হয়। সহস্রাতে আকাশচন্দ্র অবস্থিত। এরপর যোগী গরলচন্দ্রকে পান করবেন। নাথযোগী সিদ্ধদের গরলচন্দ্র পান ও প্রণবসাধন অতিপ্রয়োজনীয় অংশ। গরলচন্দ্রের মাধ্যমে দেহ ও মনের শোধন সম্ভব হলে যোগী সিদ্ধদেহ লাভ করেন। সে-সম্পর্কে মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে বলেছেন—

‘মছন্দ উবাচ।।

অবধু

মন পরিচয় মায়া মোহ ছুটে।

পবন পরিচয় শশিঘট টুটে।

আজ্ঞা পরিচয় লাগে বান্ধা।

জ্ঞান পরিচয় অজর অমর হয় কান্ধা।।^{৩৮}

কায়াসাধনায় বিন্দুর অধঃস্থলন-রোধ ভীষণ জরুরি। নাথযোগী সিদ্ধদের ধারণা তা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। নাথযোগীরা মনে করেন—

‘মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।’^{৩৯}

তারা বিন্দুর উর্ধ্বগতির জন্য কায়াসাধনা করেন। বিন্দু মলযুক্ত বলে তা নিম্নগামী বা অধোগামী থাকে। সেই কারণে বিন্দুর শোধনশক্তি ও নিরোধশক্তির মাধ্যমে তার অধোগতি রোধ করা দরকার। তারপর কর্মমুদ্রার সাহায্যে বিন্দুর উর্ধ্বগতি সম্ভব হলে সিদ্ধ অমরতা সিদ্ধি লাভ করেন—

‘রবি অমাবাস্যা চন্দ পরিভয়া।

অধের মহারস উর্দ্ধে লেয় তুলিয়া।

গগনস্থানে রূনিপুনি রহে,

পুছে গোর্থ মছদলি কহে।।^{৪০}

কায়াসাধনায় তিনটি পর্যায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ—

১. প্রবর্তকভূমি ২. সাধকভূমি ৩. সিদ্ধভূমি।

প্রথমভূমিতে মন্ত্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ হলে সিদ্ধ প্রবর্তকভূমি থেকে দ্বিতীয় ভূমি সাধকভূমিতে পৌঁছাতে পারেন। সাধকভূমিতে সিদ্ধ ভাবসাধনা ও প্রেমসাধনা করেন। ভবদেহ পাওয়া সম্ভব হলে সিদ্ধ সেইদেহে সাধনা করেন। সিদ্ধ তৃতীয় ভূমিতে অর্থাৎ সিদ্ধ অবস্থায় রসসিদ্ধ হন। দেহান্তর ঘটলেও সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণের মায়া দেহে থেকে যায়। কিন্তু শুদ্ধ মায়া অর্জন সম্ভব

না হলে যোগাভ্যাস সেই দেহে সম্ভব নয়। অশুদ্ধ প্রাকৃত দেহ শুদ্ধ মায়া দেহে পরিণত না হলে মৃত্যু ও সংসার নিবৃত্তি আসে না। এই শুদ্ধ দেহকেই ‘প্রণবতনু’ বলা হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধের কাছে প্রণবতনু লাভই জীবনুজ্জি। এই দেহের কিছুকাল অশুদ্ধ জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই তার পরামুক্তি ঘটে। জীবনুজ্জ দেহ শুদ্ধ মায়াময়, পরামুক্ত দেহ মহামায়াময়। পরামুক্ত দেহে দেহ ও আত্মার ভেদ চলে যায়। এই দেহসিদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি নাথযোগীদের লক্ষ্য। দেহসিদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে নাথসিদ্ধ পরমসত্ত্ব লাভ করেন। এই প্রকার পক্ষপাতমুক্ত মুনীশ্বরকে ‘অবধূত’ বলা হয়। এইভাবেই সিদ্ধযোগী ‘নাথপদ’ প্রাপ্ত হন। এই অবধূতের পরম পুরুষার্থ মুক্তি যা দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বন্দের মধ্যে পড়ে। ‘অবধূত গীতা’য় বলা হয়েছে কিছু মানুষ অদ্বৈতকে চায়, কিছুজন দ্বৈতকে। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ সমতত্ত্ব কেউ জানে না। যদি সর্বগত দেব স্থির, পূর্ণ অথবা নিরন্তর হয় তাহলে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনা মোহ-মায়া নয় কি?^{৪১} এই কারণে সিদ্ধযোগী জালন্ধরনাথ নাথ দ্বৈত-অদ্বৈত দুই তত্ত্বকেই ‘দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ’ বলে উল্লেখ করেছেন।^{৪২} এই মত বেদান্ত, সাংখ্য, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মে নিজস্ব ভাবনায় বিশেষত্ব লাভ করেছে।^{৪৩} বেদ দু’প্রকার বলে মনে করা হয়—স্থূল ও সূক্ষ্মবেদ। স্থূলবেদ যাগযজ্ঞের বিধান করে, যোগীদের এই বিষয়ে আগ্রহ নেই। তাঁরা কেবল কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী, যেটা সূক্ষ্মবেদের বিষয়।^{৪৪}

যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথপন্থের প্রথম মানবগুরু। তাঁর দ্বারা কথিত ও প্রবর্তিত নাথমত সন্ন্যাসীযোগী, গৃহস্থযোগী এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই অব্যাহত ছিল। তাঁর উপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অব্যয় এবং বিভেদমুক্ত যোগপরম্পরা। সবকিছু মিলিয়ে নাথপন্থের যোগমার্গের সাহায্যে লৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের চরম সত্যকে পাওয়া সম্ভব

বলে নাথসিদ্ধরা মনে করেন। তাঁরা যোগমার্গকে সামাজিক সমরসতার মহামন্ত্রও বলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধ গোরক্ষনাথকে যোগসাধনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনের উপযোগী সহজমার্গে অবতরণের উপদেশও দিয়েছেন। মানব শরীর ও আত্মার কেন্দ্র হিসেবে বিন্দুকে ধরা হয়। নাথেরা বলেন মানব শরীরে ভগবানের বাস। আদি-অন্ত্য সাধনার মূল বিষয় এটাই—

‘মহুন্দ উবাচ ।।

অবধু,
আদেশের অনাদি গুরু,
ধরতীর অমর স্বামী।
শূন্যের নিরন্তর বাসা,
সাধিবেক আদ্য অন্ত ধারা।।’^{৪৫}

অলখ নিরঞ্জন স্বসংবেদ্য পরমশিব মানুষের ভেতরে থাকেন। শরীরে জ্ঞানস্বরূপ গুরু অনাদি শিবের অধিষ্ঠান। শরীরে স্থিত আত্মাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। ইড়া, পিঙ্গলার সংযোগস্থান সুষুমাতে সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথ বাস করেন। অন্যদিকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিব অবস্থান করছেন। যোগের সাহায্যে শরীর, আত্মা ও পরমশিবের সংযোগসাধন সম্ভব হলে সিদ্ধ মোক্ষপদ লাভ করেন বলে মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে জানিয়েছেন—

‘মহুন্দ উবাচ ।। অবধু,

রাত্রি নহিলে দিন সহজে হি নাই।
দিয়া বুঝে জ্যোতি উন জায় সামাই।
পিণ্ড নাই প্রাণনাথ ব্রহ্মস্থানে বাসা।
কহে মহুন্দ লহ লেহ বাসা।।’^{৪৬}

অমনস্কযোগ নাথসম্প্রদায়ের যোগমার্গের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে বলেছেন যে সমাধি অবস্থায় মনের মহালয়াবস্থা ঘটে। এই মহালয়াবস্থাকে শূন্যরূপে মনের বাসস্থান বলা হয়েছে। মন সাধারণভাবে হৃদয়ে অবস্থিত। কিন্তু হৃদয় থেকে অতীত হলে উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়ে অমনস্ক হয় এবং শূন্য মহালয়াবস্থা লাভ করে। গোরক্ষনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছেন যদি হৃদয় না থাকে তাহলে মন কোথায় থাকবে। মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে দ্রুততার সঙ্গে শিষ্য গোরক্ষনাথের জিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন—

‘মছন্দ উবাচ।।

হৃদয় না ছিল জখন

নিরঞ্জে ছিল মন।’^{৪৭}

বাস্তবে মনের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সংকল্প-বিকল্প চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের লয় ঘটে। এই (সংকল্প-বিকল্প) তত্ত্ব মনের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সংকল্প-বিকল্প নাশের মাধ্যমে মনোনাশ হয় বা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে। যেমন ঘিয়ের সঙ্গে ঘি মিলিত হয়, দুধের সঙ্গে দুধ, সাগরে বুদ্ধবুদ্ধ সাগরের জলে মিলে যায় তেমনি অমনস্ক স্তরে তত্ত্বে সমাহিত যোগী তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে যান। এইভাবেই সিদ্ধ যোগী পরম শক্তিমান পরমেশ্বর হয়ে যান। এটাই সিদ্ধমতের রহস্য এবং অমনস্ক যোগের শ্রেয় পন্থা।

ছন্দের সংগীত ও সংগীতাত্মকতার সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কবিতা আমাদের প্রাণের সংগীত, ছন্দ হল হৃদস্পন্দন। কবিতার স্বভাব হচ্ছে ছন্দের সঙ্গে লয়মানতা লাভ করা। ছন্দোবদ্ধ শব্দ চুম্বকের মতো নিজের চতুর্দিকে থাকা আকর্ষণরত লৌহচূর্ণের মতো একটা আকর্ষণক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। সংগীতের ছন্দ মানুষকে ভাবতন্ময়

করে তোলে। ছন্দোভাবের বন্ধন হৃদয়কে মুক্তি দেয়। স্বভাবতই মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কথোপকথন কাব্যশৈলীতে এবং অন্য রচনায় চৌপাই, ষট্পদী, দোহা ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটেছে। ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে সঙ্গীতময়তার এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আজও নাথপন্থের মঠে এইসব রচনা থেকে অংশ বিশেষ সঙ্গীতের মত পাঠ করা হয়, সেখানে সাধারণ মানুষ সঙ্গীত শুনতেই মিলিত হন। এই কবিতা বা গানগুলির মধ্যে ছন্দ, তাল, লয় বিশিষ্টতা লাভ করেছে। রাগ-রাগিনী, ছন্দের অতিরিক্ত কথোপকথন-শৈলীর কবিতা অনেক পাওয়া গিয়েছে। মুক্তক-ছন্দ ও অন্ত্যমিল না থাকাটা যেমন আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে লক্ষ করা যায় তেমনটি মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কথোপকথন শৈলীতেও পাওয়া গিয়েছে। এই সিদ্ধগণ আধ্যাত্মিক দর্শনের গূঢ় বিষয়কে সরল ও বোধগম্য করে তুলতে কোথাও কোথাও প্রশ্লোত্তরশৈলীর প্রয়োগ করেছেন। কখনো নাটকীয়শৈলীতে বোধগম্যতার পাশাপাশি আকর্ষণও সৃষ্টি হয়েছে। কথোপকথনের নাটকীয়শৈলীতে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ রচনা অসাধারণ মহত্বপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। যেমন—

‘গোরক্ষ উবাচ।।

রাত্রি না ছিল দিন কথা হইতে আইল।
 দিয়া বুঝে জ্যোতি কথা গিয়া রহিল।
 পিণ্ড নাহি প্রাণনাথ কথা [হইতে] আসা।
 ইহা তত্ত গুরু গোশাঞিঃ উন পরমহাসা।।’

‘মছন্দ উবাচ।।

অবধু,
 রাত্রি নহিলে দিন সহজে হি নাহি।
 দিয়া বুঝে জ্যোতি উন জায় সামাই।

পিণ্ড নাই প্রাণনাথ ব্রহ্মস্থানে বাসা।

কহে মছন্দ লহ লেহ বাসা।।^{৪৮}

ভাবকে প্রকাশ করতে সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল ভাষা। সাহিত্যিকের অন্তঃস্থলে কখন প্রকাশের ইচ্ছা নিহিত থাকে। কখনভঙ্গিকে প্রভাবশালী করতে কবি বা সাহিত্যিক রূপক, প্রতীক ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাবকে সরল ও শিল্পময় করে তুলতে সাহিত্যিক সচেষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে সাহিত্যিক নিজের অনুভূতি, অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকজীবন এবং লোকব্যবহার থেকে প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করেছেন। তারফলে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পলালিত্য এবং অমূর্ত সৌন্দর্যের প্রতি অকারণে দুর্বলতা কাজ করেনি। সেক্ষেত্রে কবি লোকজীবনকে আশ্রয়ের মাধ্যমে সরলতম ও বোধগম্য শব্দ ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন—

‘গোর্থনাথ উবাচ।।

গুরু গোসাঐঃ

আদেশের কোন গুরু,

ধরতীর কোন ভাতার।

শূন্যের কথা বাসা,

সাধিবেক কোন দুয়ার।।^{৪৯}

প্রাচীনযুগ থেকে সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার চলে আসছে। সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত্যে সঙ্ক্যাভাষা ও প্রতীকের ব্যবহার ভীষণভাবে ঘটেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথের অন্য রচনায়ও প্রতীক লক্ষ করা যায়। ‘মায়া’ শব্দের বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার ‘মীন মছন্দ গোরখ গোষ্ঠ’ পুথিতেও দেখা যাচ্ছে। যেমন—শশিঘর, বান্ধা, কান্ধা ইত্যাদি। এছাড়া মন, পবন, পিণ্ড, নাভিকমল, সুরং, জ্ঞান, সহজ, শূন্য, সমাধি, মুদ্রা, মহারস, বিন্দু, সহস্রদল, হংস, ব্রহ্মস্থান,

শুরতি প্রভৃতি প্রতীকের ব্যবহার করেছেন মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ তাঁদের উভয়ের কথোপকথনে। এই শব্দগুলি কোন উপমা নয়, প্রত্যেকটি শব্দ প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। মিথের ব্যবহারও ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে লক্ষ করা যায়। কথাকে প্রামাণিক করা, কবিতাকে জনমনোহর এবং বোধগম্য করে তুলতে সাহিত্যিক মিথের ব্যবহার করে থাকেন।
যেমন—

১. ‘গুরু গোসাঐঃ

আদেশের কোন উপদেশা।’

২. ‘মছন্দ উবাচ।। হৃদয় না ছিল জখন

নিরঞ্জে ছিল মন।’ ইত্যাদি।

নাথসিদ্ধ বেদের ওঁ-কার সাধনার মাধ্যমে ‘আদেশ’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর্শ জ্ঞান করেন। গোরক্ষনাথ তাঁর ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে এই কথাকে অন্যভাষায় বলেছেন—

‘আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।

ত্রয়ানামেক সংভূতি আদেশ ইতি কীর্তিত।’^{৫০}

অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা—এই তিনের বিচারে তিনের একত্ববোধই ‘আদেশ’ বলে কীর্তিত।^{৫১} অন্যদিকে ‘নিরঞ্জন’ শব্দের উৎপত্তি ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত থেকে হয়েছে বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন।^{৫২} ঋগ্বেদে শব্দটি ‘আদিশ’ (৬/৪৮/১৪, ৯/২১/৫৬; উপনিষদে ‘আদেশ’ হয়েছে। বেদে তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আদেশ বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু নাথসম্প্রদায়ে আজও তার ব্যবহার হয়।^{৫৩} এর বাইরে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে তৎসম, অপ্রচলিত লোকজ শব্দেরও প্রয়োগ ঘটেছে—যেমন শুখমণি, সোজো, শামাউ, চেলা, ভাতার, মছদলি ইত্যাদি।

‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে জনসাধারণের উপযোগী সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তারফলে অলংকার প্রয়োগ কম ঘটেছে। তাসত্ত্বেও মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ নাথসম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। স্থূল জগতের রূপ প্রকাশ করে অনুভূতির সূক্ষ্মভাবকেও আশ্রয় করেছেন। তারফলে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অলংকার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন—

উপমা— ১. ‘রবি অমাবাস্যা চান্দ পরিভয়া।

অধের মহারস উর্ধ্বে লেয় তুলিয়া।

গগনস্থানে রুনিপুনি রহে।’

২. ‘মন মূল পবন বেলা,

শব্দ গুরু সুরং চেলা।’

রূপক— ১. ‘মন সরোবর পানি বিনো,

পবন বিনো ডাল।

আশা পরিমল বাসা বিনু,

নিদ্রা মৃত্যু বিনা কাল।।’

২. ‘হৃদয়ে বৈশে মন,

নাভিতে বৈশে পবন।

রূপে বৈশে শব্দ,

গগনে বৈশে চন্দ্র।।’ ইত্যাদি।

‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে প্রতীকাত্মক সন্ধ্যাভাষা অথবা বক্রোক্তি ও ব্যঞ্জনার ব্যবহার হয়েছে। তারফলে কথনশৈলীতে বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। এই বিশেষ শৈলীতে শ্রোতাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এবং ভাববার অবকাশ তৈরি হয়েছে। অনধিকারী শ্রোতার কাছে গুহ্যজ্ঞান অনেক সময় অজানা বা গোপন থেকে যায়। আধ্যাত্মিক জগতে জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে জ্ঞানীসিদ্ধরা

অধিকারভেদ রাখেন। সেই কারণেই সন্ধ্যাভাষা, বক্রোক্তি ও ব্যঞ্জনার প্রয়োগ করেন।^{৫৪} স্বাভাবিকভাবে অনেক অলংকারের অর্থ নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে লোকভাষা, উপভাষা, বিভাষা এবং হিন্দি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। কাহিনিতে যোগতত্ত্ব প্রধান বিষয় হলেও ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও শব্দ ব্যবহারের কারুকার্য এবং কথনশৈলীর নাটকীয়তায় গ্রন্থটি সাহিত্যের দরবারে সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারবে বলা যায়। গুরুবাদ, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, ষট্চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব, শিব-শক্তি মিলনের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ, শক্তিপূজো প্রভৃতি মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে বলেছেন যে বিষয়গুলি নাথপন্থের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত বা তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি চক্রসাধনার ক্ষেত্রে ছয়, আট ও নয় চক্রের উল্লেখ করা রয়েছে। গোরক্ষনাথ ‘গোরক্ষবাণী’ গ্রন্থে আটচক্রের কথা বললেও মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে ছয়চক্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে চক্রের নাম, বিবরণও আলাদা। তান্ত্রিক ষট্চক্রভেদ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয় যে গোরক্ষনাথ কর্তৃক চক্রব্যবস্থা এবং সংখ্যা ‘ষট্চক্রনিরূপণ’ থেকে স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র

১. কৌলজ্ঞান-নির্ণয় ১ম খণ্ড, শ্যামাকান্ত দ্বিবেদী (সম্পা.), পৃ. ১।
২. গোখবিজয়, পৃ. ২০৭।
৩. সাহিত্যপ্রকাশিকা ৪র্থ খণ্ড, ভূমিকা পৃ. ১১।
৪. গোরখবাণী, পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.), পৃ. ২০৫-২২১।
৫. বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২০২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, শ্লোক ৩-৪।
৭. রাজমোহন নাথ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
৮. মঞ্জুনাথচরিত, ২৫/৪৪-৪৫।
৯. বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ১৬৩।
১০. ময়নামতীর গান, নলিনীকান্ত ভট্টশালী (সম্পা.), ভূমিকা পৃ. ৭।
১১. 'আত্মদর্শনমাত্রেন জীবনুভো ন সংশয়।'
১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ১৬৬।
১৩. সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪।
১৪. পাহাড় দোহা, হীরালাল জৈন (সম্পা.), পৃ. ২১৯।
১৫. গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, শ্লোক ১/১১।
১৬. মীন মহন্দ গোরখ গোস্বামী, সাহিত্য প্রকাশিকা ৫ম খণ্ড, পঞ্চদশন মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ৩৩৪।
১৭. পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.), পৃ. ২১০, শ্লোক ৪০।
১৮. মীন মহন্দ গোরখ গোস্বামী, পৃ. ৩৩৬।
১৯. গোরক্ষ সংহিতা, শ্লোক ১/৩৬।
২০. মীন মহন্দ গোরখ গোস্বামী, পৃ. ৩৩৭।
২১. ঐ, পৃ. ৩৩৫।
২২. Kaulajñana-nirnaya of the School of Matsyendranatha, P. C. Bagchi (ed.), Michael Magee (trans.), p. 5.
২৩. কল্যাণী মল্লিক, নাথপন্থ, পৃ. ২৭।

২৪. গোখবিজয়, পৃ. ৬৩।
২৫. ঐ, পৃ. ৯৬।
২৬. মীন মহন্দ গোরখ গোর্খ, পৃ. ৩৩৫।
২৭. শ্রীমদ্ভগবত গীতা, শ্লোক ৪/৩৫।
২৮. যোগবীজ, শ্লোক ৭০।
২৯. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, ৬/৫২।
৩০. গোরক্ষ সংহিতা, ৫/৩৫।
৩১. শিব সংহিতা, ৫/১-২।
৩২. গোরক্ষ সংহিতা, ৪/৯।
৩৩. হঠযোগ প্রদীপিকা, ৪/২৯।
৩৪. Sekasubhodaya of Halayudha Misra, Sukumar Sen (ed.), pp. 24-26.
৩৫. মীন মহন্দ গোরখ গোর্খ, পৃ. ৩৩৪।
৩৬. Mohan Singh, Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism, p. 18.
৩৭. মীন মহন্দ গোরখ গোর্খ, পৃ. ৩৩৫।
৩৮. ঐ, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।
৩৯. হঠযোগ প্রদীপিকা, ৩/৮৮।
৪০. মীন মহন্দ গোরখ গোর্খ, পৃ. ৩৩২।
৪১. ‘অদ্বৈত কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমতত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্।।’- পৃ. ১১।
৪২. ‘বন্দে তত্রাত্তেজো ভুবনতিমিরহং ভানুতেজস্করং বা।
সত্ত্বতুৰ্য্যাপকং ত্বা পবনগতিকরং ব্যোমবহ্নিৰ্ভরং বা।
মুদ্রানাদবিশুলৌৰ্বিমলরুচিধরং খর্পরং ভস্মমিশ্রং।
দ্বৈত বা অদ্বৈতরূপং দয়উতপরং যোগিনং শংকর বা।।’ -পৃ. ২৮।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
৪৫. মীন মহন্দ গোরখ গোর্খ, পৃ. ৩৩২।
৪৬. ঐ, পৃ. ৩৩৪।

৪৭. ঐ, পৃ. ৩৩৪।

৪৮. ঐ, পৃ. ৩৩৪।

৪৯. ঐ, পৃ. ৩৩২।

৫০. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, ৬/৯৪।

৫১. ভোলানাথ নাথ, ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়, পৃ. ২১।

৫২. সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।

৫৩. বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ. ২২৬।

৫৪. শান্তিপ্রসাদ চন্দোলা, যোগবাণী পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৩৮।

চতুর্থ অধ্যায়

যোগীনাটক

যোগীনাটক

৪. ক. যোগীনাটক: চম্পাহরণ

বাংলা নাটকের প্রধান বিষয় লোকজীবনের কৃত্য ও রুচি, যা নৃত্য, গীত, বাদ্যের যে ধারা পূর্বেই ওড্রমাগদী-রীতিতে লক্ষ করা যায় তা মূলত রসনিষ্পত্তির আঙ্গিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিকতায় আজও বাংলা নাটকের প্রধান অবলম্বন হিসেবে লক্ষণীয়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি নাথসম্প্রদায়ের নাট্যঐতিহ্যে বাংলা নাটকের প্রধান অবলম্বন ধর্মীয় কৃত্য এবং নৃত্য, গীত, বাদ্যের সহযোগে নাট্যপরিবেশনার ধারা প্রচলিত আছে।^১ কোনো কোনো ধর্মীয় তত্ত্বমূলক ধারার প্রসারের ফলে সাম্প্রদায়িক রূপ পরিবর্তন করে সমগ্র জাতির পরিচায়ক হয়ে একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। নাথধর্ম ও সাহিত্য ধারাতেও এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। গবেষক শ্যামল বেরা মনে করেন ‘ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়। নাথযোগীরা সেনরাজাদের দমন-পীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নতুন পথ খুঁজতে শুরু করলেন। অনেকেই মুসলিম শাসকদের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে শুরু করেন। এসব অনুশঙ্গ নানাভাবে আমাদের লোকনাটকে এসেছে। এ ধরনের একটি পালা ‘চম্পাহরণ’।’^২ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য ‘চম্পাহরণ’। স্থানীয় মানুষের কাছে নাটকটি যোগীযাত্রা বা যুগীযাত্রা নামেই পরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই সম্বয়ের ধারায় পীর-ফকির-নাথ-সহজিয়া ইত্যাদি ধারার প্রভাবে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্রদেবতা রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিন্দুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ, অন্যত্র সত্যপীর নামে পূজো পেয়ে থাকেন।^৩ নাথধর্মের অবক্ষয়ের দিনে মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলি মুসলমান শাসকদের অধীনে ছিল। এসময়ে এইসব এলাকায় বহু মুসলমান পীর ফকিরের

আগমন ঘটে। তারা ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য নাথসম্প্রদায়ের কথা ও কাহিনিকে বিকৃত করতে সচেষ্ট হয়। সেই অপপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হচ্ছে যোগীযাত্রা।^৪ অজয় বিশ্বাস মনে করেন যে যোগী সম্প্রদায়ের আরাধ্যদেবতা যোগনাথ দাপট হারিয়ে সত্যপীরের মাহাত্ম্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।^৫ সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথ যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বন করে কদলীরাজ্যে নারী প্রলোভন জয় করে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করেন— সেই কাহিনি ‘গুরু মীননাথের পালা’য় এবং ‘গোরক্ষবিজয়’ কাহিনিতে পাওয়া যায়। শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, মুসলমানদের মধ্যেও এই কাহিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু মেদিনীপুরে এসে এই কাহিনি বিকৃত হয়ে সুফি ভাবধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ভবনাথ সরকার মনে করেন সাধারণভাবে যোগীযাত্রার নায়ক হলেন যোগনাথ। তিনি ছিলেন নাথযোগীদের আদিপুরুষ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ ষোলজন নাথসিদ্ধের পিতা। (চন্দ্রাদিত্য পরাগম) এই যোগনাথের নাম অনুসারেই যোগী জাতির নাম হয়েছে। অথচ মেদিনীপুরের যোগীযাত্রায় তিনি হয়ে উঠেছেন পত্নীহারা কামুক ও ভণ্ডযোগী।^৬ শুধু যোগীনাটক নয়, নাথসম্প্রদায়ের তিননাথের গান বা ত্রিনাথের পাঁচালিও বাংলার সুফিধর্মকে প্রভাবিত করেছে। ওয়াকিল আহমেদ মনে করেন ত্রিনাথ বাংলার নিজস্ব পৌরাণিক চরিত্র, তিনি নাথসম্প্রদায়ের দেবতা। অনুমিত হয় নাথযোগীদের যে অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা ত্রিনাথকে নিজেদের উপযোগী করে ত্রিনাথ পীরে পরিণত করেছে।^৭ ড. এনামুল হক দেখিয়েছেন, বাংলায় এসে সুফিধর্ম কীভাবে নাথধর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে—

From the seventeenth century downward, Sufism in Bengal, adopted new channel and within a century and a half, it absorbed so many indigenous elements in both beliefs and practices that it not only lost its pristine purity and individuality but also its spiritual significance, inherent strength and expansive character. With the loss of all these, Sufism in Bengal, became identical in many

respects with Tantrikism, Yogiism, Nathism and other similar system of indigenous thought and asceticism.^৮

আব্দুল কাদির তাঁর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘বাঙলার ফকিরী দলের লোকেরা যে সমস্ত তত্ত্বের গান গাহিয়েছেন, নাথমার্গের লোকদের প্রভাব তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক।’^৯ গবেষক অচিন্ত্য বিশ্বাস যোগীনাটক ‘চম্পাহরণ’-র নায়িকা চম্পাবতীর স্বামীবিরহে কাতরতার সঙ্গে দৌলত কাজীর ‘লোরচন্দ্রানী’ গ্রন্থের নায়িকা চন্দ্রানীর আচরণে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যোগীনাটকে দেখা যায় স্বামী বহির্বাণিজ্যে বের হবে তাই চম্পাবতী আসন্ন বিরহে কাতরতা প্রকাশ করেছে—

একালের কান্ত ছানি যাউচি হয় গো
রামা যাউচি গো
শিশির শীতকু ডর মরুচি গো।
আইলা মোগুশির শীত,
ছাড়ি গলে মোর প্রাণ কান্ত
বসন্ত কালকু ডর মরুচি গো।

অন্যদিকে যৌবন যন্ত্রণায় কাতর চন্দ্রানীর মনের অবস্থা দৌলত কাজী বর্ণনা করেছেন—

স্বামীহীন নারীর কি ফল সংসার।
বিফলে বঞ্চয় নিশি রমণী যাহার।।
স্বামী গুণ গুণী নিশি সীদতি অঙ্গনা।
হৃদে কামানল জ্বলে দক্ষিণ পবনা।।
বায়ু অগ্নি হৈল যদি কুমারীর বৈরী।
শুখাইব যৌবন নীর না আনিব ফিরি।।

এইভাবে একটি বিশেষ সময়কার সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের পরিচয় বহন করছে যোগীনাটক এবং ‘লোরচন্দ্রানী’ কাব্যগ্রন্থটি।^{১০}

মেদিনীপুরের পাশাপাশি ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলেও যোগীনাটক প্রচলিত আছে। বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণে ‘যোগীযাত্রা’ বা ‘যুগিয়াপালা’ উল্লেখযোগ্য। এই ‘যোগীযাত্রা’ ‘চম্পাবতী হরণ’ বা ‘বাঘাম্বর’ পালা নামে এখানেও পরিচিত। লেখক কৃপাসিন্ধুর সময় অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দী হতে পারে। কৃপাসিন্ধু সত্যনারায়ণের পাঁচালিও লিখে থাকতে পারেন। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে ‘যোগীযাত্রা’য় দ্বিজ কৃপাসিন্ধুর ভণিতা লক্ষ করা যায়—

১. যে আঙা বলিল সবে অঙ্গিকার কলা।

ভণে কৃপাসিন্ধু দ্বিজ জ্যোতিষ ডাকিলা।। (১ম অঙ্ক/ ২য় দৃশ্য)

২. ভণে কৃপাসিন্ধু যোগী কাঁদি ২ কহুছি। (১ম অঙ্ক/ ৫ম দৃশ্য)

৩. কৃপাসিন্ধু যে কুহই যোগীয়ার দুঃখ এই

হে প্রভু নারায়ণ কর উদ্ধার। (২য় অঙ্ক/ ১ম দৃশ্য)

৪. যদি কর বলাৎকার

ধর্ম পিতা হেবু মোর।

ভণে কৃপাসিন্ধু দ্বিজ কর নিস্তার।। ৩য় অঙ্ক/ ১ম দৃশ্য)

৫. ভণে কৃপাসিন্ধু দ্বিজ তা হস্তে যোগী মরিব। (৪র্থ অঙ্ক/২য় দৃশ্য)

৬. এমন্ত সময়ে যোগী করাছি গমন।

ভণই যে কৃপাসিন্ধু যোগীর নিধন।। (৫ম অঙ্ক/ ১ম দৃশ্য)

৭. ভণে কৃপাসিন্ধু দ্বিজ হরিবল সভাজন। (৫ম অঙ্ক/ ৩য় দৃশ্য)

সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত ৪ নং উদাহরণটিতে ওড়িয়া ছন্দরীতি লক্ষ করা যায়।

নাট্যপালাটি সম্পূর্ণ কৃপাসিন্ধুর নাও হতে পারে। তিনি হয়ত ‘চম্পাবতির কথা’ই

লিখেছিলেন। পরে তা নাট্যায়িত হয়েছে। কৃপাসিন্ধু দ্বিজ না যোগী সন্দেহ হয় ২নং উদাহরণ থেকে।^{১১}

যোগীনাটক চম্পাহরণ: বহিরঙ্গ পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ‘লোকশ্রুতি’ পত্রিকায় আষাঢ় ১৪১৬ (২০০৯) সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় গবেষক শ্যামল বেরা সংগৃহীত যোগীযাত্রা ‘চম্পাহরণ’ নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে ৩৩ পৃ. থেকে ৮১ পৃ. পর্যন্ত। সংগ্রহের স্থান: দমনমোহন জানা, গ্রাম-আলুয়াচক, পোস্ট-খারুই, জেলা-পূর্বমেদিনীপুর। সংগ্রহের তারিখ: জুন, ২০০৩ খ্রি., সংগ্রাহক: গবেষক শ্যামল বেরা। সংগ্রাহক শ্যামল বেরা মনে করেন ‘সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ধারায় লেখা হতে থাকে পালাগান। প্রচলিত নানাকাহিনি অবলম্বনে, কাহিনিকে অদলবদল করে যেমন পালা লেখা হল, তেমনি একেবারে নতুন কাহিনির আমদানি হল। বহু কবি কলম ধরলেন। লোকধর্মের বহু কৌণিক বিন্যাস ও দর্শন এসব পালায় নিহিত আছে।’^{১২} দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অর্থাৎ বিহার, ওড়িশা সংলগ্ন অঞ্চলে যোগীযাত্রা ‘চম্পাহরণ’ বা ‘বাঘাস্বর পালা’ লোকনাট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। ওড়িশার বালেশ্বর সহ মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, দাঁতন, নারায়ণগড়, বেলদা, তমলুক, কেশিয়াড়ি অঞ্চলে ‘চম্পাহরণ’ খুবই জনপ্রিয় নাটক হিসেবে অভিনীত হত। কিন্তু অধিকাংশ কলাকুশলীদের মৃত্যুর পরে আর নতুন করে দল তৈরি না হওয়ায় যোগীযাত্রা ‘চম্পাহরণ’ পালা অবলুপ্তির পথে প্রায় চলে যেতে বসেছে। অবশ্য যোগীযাত্রার গায়ক ও শিল্পী কয়েকজন বেঁচে আছেন। তাঁরা যোগীযাত্রার সংলাপ বা গান অনর্গল আজও বলতে পারেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কেশিয়াড়ি ব্লকের লোকশিল্পী জয়ন্ত নাগ, নারায়ণগড় ব্লকের শঙ্কর রাণা প্রমুখ। শঙ্কর রাণা ২০২১ খ্রি. প্রয়াত হয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে টিভি সিরিয়াল, মোবাইল ফোন ইত্যাদির দৌলতে এসব লোকনাট্য বা গানের জনপ্রিয়তা কমে এসেছে। বাংলার গৌরবময় প্রাচীন লোকসংস্কৃতির কথা বর্তমান প্রজন্মের মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছেন।

‘চম্পাহরণ’ যোগীনাটকের পুরুষ চরিত্ররা হল যথাক্রমে—

- রাজা - মাধব
- মন্ত্রী
- হীরানন্দ - বণিক
- জয়ানন্দ - বণিক
- শ্যামানন্দ - বণিক
- মুকুন্দ - বণিক
- উপানন্দ - বণিক
- জ্যোতিষী
- দাঁড়ি
- মাঝি
- ফকির
- যুগী
- বাঘাস্বর, প্রমুখ।

স্ত্রী চরিত্ররা হল—

- বুড়ি - হীরানন্দের মা
- চম্পাবতী - জয়ানন্দের স্ত্রী
- রূপবতী - হীরানন্দের স্ত্রী
- মালিনী
- তাঁতিনী
- নর্তকী, প্রমুখ।

গবেষক শ্যামল বেরা সংগৃহীত ‘চম্পাহরণ’ লোকনাট্য পালার গানের ভণিতায় দু’জন রচয়িতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়— দ্বিজশংকর(দু’বার) এবং কৃপাসিন্ধু (পাঁচবার)। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি উল্লেখ করেছেন ‘চম্পাবতী’ লোকনাট্যের রচয়িতা চুড়ারাম দাস।^{১০} গবেষক বিশ্বজিৎ ঘোষ সুবর্ণরেখার পূর্বতীরে দাঁতন থানার অন্তর্গত বেলমূলা গ্রামের পুলিন প্রামাণিকের কাছ থেকে যোগীনাটকের আরেকটি পালা সংগ্রহ করেন। পালার নাম ‘বাঘাস্বর কর্তৃক যুগীনাথ বধ’। প্রকাশক ও রচয়িতা কৃপাসিন্ধু দাস। প্রকাশ কাল ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। পালা রচয়িতা কৃপাসিন্ধু দাস ও চুড়ারাম দাস একই ব্যক্তি কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে বলা যায় কাহিনিটি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা এলাকায় মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ছিল, পালাকার ও কবির নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে যোগীনাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন। যোগীনাটকের কাহিনি বিস্তৃত, রোমাঞ্চকর ও রূপকথা মঙ্গলকাব্যধর্মী। যোগীর মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চম্পাবতী রূপকথা-মঙ্গলকাব্যের নায়িকার মত ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন।^{১১} লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন বাঘাস্বর। সেখানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বাচ্চাদের অজগর খেতে গেলে তাকে বাঘাস্বর হত্যা করে। ব্যাঙ্গমার বাচ্চাদের অনুরোধে ব্যাঙ্গমা বাঘাস্বরকে নিয়ে যায় লঙ্কায়। অঞ্চল বিশেষে কিছু বৈচিত্র্য কাহিনিতে চোখে পড়ে। নাথেরা কোনো না কোনো ভাবে কায়াসাধনা তত্ত্বের মাধ্যমে মুসলমান যোগীদের প্রভাবিত করেছিল। তারফলে বাংলায় নাথযোগীদের প্রভাব মুসলমান মরমী সাধকদের উপর সক্রিয় ছিল। যোগীযাত্রা ‘চম্পাহরণ’-র ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে বলে মনে হয়। যোগী প্রায় অমর অবস্থায় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছেন। সে যোগদড়ি হাতে সর্বত্র যাতায়াত করে। এ যোগদড়ি যেন অগ্নিমা-লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধির প্রতীক। তার সাধনা এখানে সত্যপীরের কেরামত, অর্জিত যোগলৌকিক শক্তি নয়। যোগনাথ অবশ্য যোগীনাটকে ভ্রষ্টচরিত্র। যোগদর্শনের এখানে পরাজয় ঘটেছে। তাকে আলাদা করে চেনা যায় না।^{১২}

নাট্যবন্দনা:

লোকনাটকে গুরুবন্দনা ও আসরবন্দনার রীতি প্রচলিত আছে। নাট্যকার কৃপাসিন্ধু দাস

তঁর যোগীনাটক পালায় শুরুতে গণেশ বন্দনা করে সিদ্ধ গণনাথের জয়ধ্বনি করেছেন—

‘বন্দে হেম গিরিরাজ সুতা সুত, জয় গণনাথ।

সর্ব বিঘ্ননাশ করু তুহি বিঘ্নরাজ নাম অছু বহি।।

মোর বিঘ্ন নাশ কর গো গণেশ।

মো হৃদকমলে রহু স্থিত জয় গণনাথ।।

রক্তবর্ণ তব কলেবর পরিধান তব রক্তাস্বর।

গলে স্বর্ণমাল, শ্রবণে কুণ্ডল।।

শোভা দিশা তোর নিশাকান্ত জয় গণনাথ।

ক্ষুদ্র নয়ন তোর দীর্ঘ কর্ণ দীর্ঘ চতুস্বর গজানন।।

শোভা গজ শির, মদ্রিত সিন্দুর।

শোভা তোর বক্র দন্ত, জয় গণনাথ।।

মূষিক বাহনে হয়ো স্থিত।

সর্ব অগ্রে পূজা পাও নিত্য।

যাগযজ্ঞে হোমে যেরা তব নামে।।

ন পূজিলে সর্ব হয়ে বৃথা, জয় গণনাথ।

মু অতি অজ্ঞান, মূঢ়মতি ন জানই।।

কিছু ভক্তি স্তুতি, আসি মো আসরে।

কৃপাদৃষ্টি কর,কহে কৃপাসিন্ধু।

জোড়ি হস্ত, জয় গণনাথ।।’^{১৬}

গবেষক শ্যামল বেরা সংগৃহীত ‘চম্পাহরণ’ পালায় গুরুবন্দনার সঙ্গে সঙ্গে আদি গুরুমাতাকে বন্দনা করা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবী এবং জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে পালাকার কৃপাসিন্ধু দাস বন্দনা করেছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয়, কাহিনির শেষে হরিবন্দনা করেছেন। যোগীযাত্রা মেদিনীপুর জেলা অতিক্রম করে ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তারফলে ওড়িশার ভাষা, সংস্কৃতির প্রভাব নাটকটিতে লক্ষ করা যায়। গবেষক শ্যামল বেরা বলেছেন যে সম্প্রতি ভাস্করব্রত পতি বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর থানার নামপো গ্রামে এরকম একটি দলের অভিনয়ের কথা জানিয়েছেন। দলের নাম ‘মাতৃশক্তি গীতিনাট্য’। দলের ম্যানেজার ও অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ পরিদা। এই দলটি ‘চম্পাহরণ’ পালা বহুদিন থেকেই করছেন।^৭ যোগীযাত্রায় ‘বৃহৎ লক্ষ্মী চরিত্র’ উপাখ্যানের প্রভাবের কারণে লক্ষ্মীবন্দনা প্রসঙ্গ এসেছে—

‘প্রথমে বন্দই মুজে শ্রী গুরুচরণ গো (গুরুদেব)
 অমুক্ত শরীরে মোর মুক্ত করাইলা গো
 আদ্য গুরুমাতা বন্দই পিতার চরণ গো
 যাহা হতে দেখি আমি এ তিন ভুবন গো
 সেই মাতার পিতার পদে বহুকু মোর আশা গো
 নীলাচলে বন্দই সে প্রভু জগন্নাথ গো
 দারুণরূপে বসি আছি প্রভু জগন্নাথ গো
 অপরূপ ধড়া মালা শোভিয়াছি গলে গো
 দপদপ স্বর্ণমণি কপালে জলুছি গো
 জগন্নাথ বলরাম বর্ণ জুরি দুই গো
 মধ্যতে বন্দই মুজে সুভদ্রা ভগিনী গো
 লক্ষ্মীমাতার পাদপদ্মে রহুক মোর আশা গো
 তারপর বন্দই মুজে মাতা সে বাসুলি গো।
 লক্ষ টাকার ধন মায়ের অঙ্গুলি গো

ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চড়ুয়া মাতা করুছি গমন গো
 বালুয়া তিন ঘটে নিয়ে মাতা সে বসুছি গো
 একে একে সভার পদে লহুছি শরণ গো
 উত্তর দক্ষিণ বন্দই পূর্ব পশ্চিম গো
 চম্পাবতী হইবেক করুণা শ্রবণ গো
 ভণয় কৃপাসিন্ধু যুগী আনন্দ লহরী গো
 পূর্ণিত বদনে সর্বের বলুন হরি হরি সভাজন।^{১৮}

দিগবন্দনা করে পালাকার কৃপাসিন্ধু দাস যোগীর আনন্দগান পরিবেশন করে শেষে কৃষ্ণবন্দনাও করেছেন। দেবী বাণুলীর বন্দনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে বাণুলী দেবীর যোগ অনেকদিনের। আজও দমদমে নাথসম্প্রদায়ের মঠে গোরক্ষনাথ ও বাণুলীদেবী পূজিত হন। তন্ত্রে প্রকৃতিরূপী আরাধ্যা দেবী হলেন বাণুলী, কালী, দুর্গা, তারা প্রমুখ।

আখ্যানবস্তু:

শ্রীহট্টনগরের রাজাকে দূত এসে জানালেন তাঁর মন্দিরে চন্দন-চামরের অভাবে দেবীর পূজো বন্ধ রয়েছে। রাজা মন্ত্রীকে সেই সংবাদ জানানো মাত্র তিনি হীরানন্দ, জয়ানন্দ, মুকুন্দ, উপানন্দ প্রমুখ ছয় বণিক সহোদরকে পৃথক ডিঙা সাজিয়ে নৈরাটপাটনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে চন্দন-চামর পাওয়া যাবে। রাজা দূতকে সেই সংবাদ জানিয়ে দিলেন। নর্তকীরা নৃত্যগীত সহযোগে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। ঘটনার অব্যবহিত পরেই বণিক হীরানন্দকে রাজসমীপে ডেকে পাঠানো হয়েছে। রাজা তাঁকে নির্দেশ দিলেন—

‘তম্বুর ছয় ভাইকু ছয়খানি ডিঙ্গা সাজন করি দেউছি।
 সেই নৈরাট পাটন থেকে চন্দন-চামর আনিতে হেব।

চন্দন-চামর আনিলে দেবদেবীর পূজা হেব।’

হীরানন্দসহ ছ’ভাই পৃথক পৃথক বাণিজ্যতরী নিয়ে নৈরাট পাটনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেন। এরমধ্যে নাটকে রাজা-জ্যোতিষীর কথোপকথন নাটকীয় পরিবেশ রচনা করেছে।

হীরানন্দ রাজা মাধবের নির্দেশে নৈরাট পাটনে যাত্রার আগে মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিতে গেলেন। বুড়ি তাকে জানালেন যে ছোট ছেলে জয়ানন্দকে তিনি পাঠাতে রাজি নন। তখন বুড়ির সঙ্গে ছোটছেলে জয়ানন্দের নাট্যসংলাপে ঈশ্বর নির্ভরতা প্রকাশিত হয়েছে—

‘বুড়ি: তুফানে পড়িলে তরী কি করিবে বল।

জয়া: মুদিয়া দুর্গানাম করিব কেবল।

বুড়ি: ঘূর্ণিত অতল জলে পড়িলে তরণী।

জয়া: অন্তরে ভাবিব কেবল তারা ত্রিনয়নী।’ ইত্যাদি

শেষপর্যন্ত রাজার আদেশ পালন করতে সদ্যবিবাহিত স্ত্রী চম্পাবতীকে বাড়িতে রেখে জয়ানন্দকে যেতে হল নৈরাট পাটনে।

ছয়ভাই বাণিজ্যতরী নিয়ে যাত্রা করলেন। পথে যাত্রা বিরতিকালে মাঝিরা নমাজ পড়া শুরু করলে, জনৈক ফকিরের আগমন ঘটে। তিনি জানান যে মক্কা-মদিনা থেকে এসেছেন এবং অন্যপারে তাদের সঙ্গে যেতে চান। মাঝিরা তাকে নিতে রাজি না হলে ফকির অপমানিত হন। জয়ানন্দ ফকিরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নৌকা থেকে নামিয়ে দেয়। তখন ফকিরের মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি জানিয়ে দেন জয়ানন্দের স্ত্রী চম্পাবতীকে যোগীর হাতে যেভাবেই হোক তুলে দেবেন। বৃদ্ধ যোগীকে দিয়ে ফকির চম্পাবতীকে অপহরণ ও অপমানের পরিকল্পনা করেন—

‘ফকির:

রে অক্ষয়নাথ, তোম এধার আও। হাম একঠো বাত বলে গা। তোম
সামজো।

যুগী:

এ ফকির সাহেব কুহ কুহ

ফকির:

কুহই ফকির শুন যোগীবর
হীরানন্দ সাধু তাহারি ভাদ্রবধু চম্পাবতী নাম
এমন্ত বচন শুন যোগীয়ারে মূর্ছাগত হই গলা
দেব সত্যপীর ভাবিলাম পার হইলা ও কই যোগীয়ারে।’

ফকির যোগীকে দিয়ে চম্পাবতীকে অপহরণের পরিকল্পনা করেন। তিনি অপহরণের কৌশল যোগীকে শিখিয়ে দেন। তিনি জানান যে যোগী চম্পাবতীর বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেলে তার উপর ধুলোপড়া মন্ত্র প্রয়োগ করবেন এবং চম্পাবতী তৎক্ষণাৎ কালো কুকুর হয়ে যাবে। তখন চম্পাবতী কুকুর হয়ে যোগীর সঙ্গে চলে আসবে। যোগী সিন্ধি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ফকিরের কাছ থেকে ধুলোপড়া মন্ত্র শেখেন। শেষে যোগী চম্পাবতীকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে যান। এই কাহিনিকে ভিত্তি করে যোগীনাটক ‘চম্পাহরণ’ বা ‘বাঘাস্বর’ পালা লোকনাট্যটি রচিত হয়েছে। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ ও ভাষা নাটকটিতে অসাধারণ দক্ষতায় প্রকাশিত হয়েছে।

মোটিফ:

‘চম্পাহরণ’ লোকনাট্যটি শুধু নাথসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আপামর জনসাধারণের মধ্যে এর বিস্তার ঘটেছে। এখানে লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাথপরম্পরা সঞ্চারণের চেষ্টা হয়েছে। তারফলে মোটিফ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

যেমন—

- ক) যোগীবেশ ধারণের ক্ষেত্রে রামায়ণের আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে।
 খ) চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীপতি সামন্তর ছেলেকেও বাঘাস্বরের মত গজনা শুনতে হয়েছে।
 গ) ‘চম্পাহরণ’ নাটকে ১৯ টি পালা বা অংশ রয়েছে।
 ঘ) নারায়ণ ও পীর সংযোগে সত্যনারায়ণ প্রসঙ্গ চলে এল। ফকির রূপে নারায়ণ হলে, শেষে সত্যপীরের মোটিফ প্রতিষ্ঠিত হল।

ধর্মীয় সমন্বয়:

পীর, নারায়ণ, সত্যনারায়ণ প্রসঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে। ফকিরের কাছে যোগদড়া, চম্পাবতীর কাছে যোগছড়ায় পরিণত হল।

সমাজচিত্র:

১. ‘চম্পাহরণ’ নাটকে বাংলার অত্যন্ত প্রাচীন ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের সমকাল বলেই মনে হয়।
২. বাণিজ্যযাত্রার বিবরণে প্রাচীনতার ছাপ লক্ষ করা যায়।
৩. নাটকে হিন্দু- মুসলমানের সহাবস্থান লক্ষ করা যায় যখন ফকির নারায়ণ রূপ ধারণ করেছেন। সেক্ষেত্রে ধর্মমঙ্গলের প্রসঙ্গ মনে পড়ে—

‘যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন

আনন্দতে পরিল ইজার।

বিষ্ণু হইল পয়গম্বর ব্রহ্মা হৈল পাকাম্বর

আদম্ব হইয়া শূলপাণি।।’^{১৯}

৪. জাতিভেদ, বর্ণভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে। বৃত্তিগত জাতি উল্লেখ আছে।
৫. টোল- চতুষ্পাঠীতে বালকের শিক্ষা আরম্ভ হত। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীপতি তার গুরুর কাছে যে কটুবাক্য শুনেছিল একই কটুবাক্য বাঘাস্বরের শুনতে পায় তার মাস্টার মশাইয়ের কাছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে লোকযাত্রার কালানুসরণ বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে গুরু হয়ে উঠেছেন আধুনিক মাস্টারমশাই।
৬. নাটক বা যাত্রার একটি জনপ্রিয় প্রকরণ হল খিস্তিখেউড় বা অপশব্দের প্রয়োগ।

আলোচ্য যুগীযাত্রার ৫নং অংশে কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে তাঁতি এবং তাঁতিনীর একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। এখানে তাঁতি এবং তাঁতিনী ঝগড়ার মধ্যে নির্বিচারে অপশব্দ প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ চিত্তবিনোদনের জন্যই এই তাঁতি ও তাঁতিনীর প্রবেশ।

যোগীনাটক ‘চম্পাহরণ’ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

১. নাথধর্মে নারীবর্জিত কায়াসাধনা স্বীকৃত। কিন্তু নাট্যকাহিনিতে যোগী চম্পাবতীকে হরণের মত বিগর্হিত অপরাধ করছেন। সুতরাং নাথপন্থের দর্শন অনুযায়ী এটা প্রথমেই বিরুদ্ধ পরম্পরা।

২. ‘বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র’ গ্রন্থের যে ‘চম্পাবতী উপাখ্যান’ থেকে ‘চম্পাহরণ’ যোগীযাত্রার কাহিনি গৃহীত হয়েছে, সেখানে লক্ষ্মীদেবী যোগীকে দেখে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছেন—

‘কি হেতু এরূপ বেশে করিছ ভ্রমণ।

সবিশেষ বল তুমি আমার সদন।।’

যোগী উত্তরে বলেন—

‘যোগী কহে শুন বলি নিকটে তোমার।

ঘরনী মরিল মোর শূন্য হইল ঘর।।’

এই কথোপকথন থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার যে প্রথমত লক্ষ্মীদেবী বুঝেছেন ওই দিব্যকান্তি রূপবান ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যোগী নন, সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত সন্ন্যাসীবেশী ‘যোগী’-র উত্তরে লক্ষ্মীদেবীর ধারণাটি সত্যি বলে প্রমাণিত হয় যে ওই যোগী স্ত্রী-বিয়োগে বিষণ্ণচিত্ত হয়ে এইরকম বেশ ধারণ করেছেন।

৩. ‘চম্পাবতীর উপাখ্যান’ বস্তুত লক্ষ্মীদেবীর পূজো প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। নাথধর্ম ও সাধনার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। উপরন্তু যে দেবীর (অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী) পূজো প্রচার করা হচ্ছে তিনি বাদে বাকি সমস্ত দেবতা তথা ধর্মমতকে কলঙ্কিত করার স্বাভাবিক প্রয়াস

এখানে দেখা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে অনুরূপ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এই আলোকে বলা যায়, চম্পাবতীর যে উপাখ্যান অবলম্বনে ‘চম্পাহরণ’ লোকনাট্য রচিত হয়েছে তাতেও যোগী চরিত্র বা নাথপন্থ কোনভাবেই উজ্জ্বল, গৌরবাস্বিত হয়ে উঠতে পারে না। লোকনাট্যে যোগী অক্ষয়নাথ পত্নীবিয়োগে গান গাইছেন—

‘যুবাকালে যোগী আঁড়ি মোর মরুছি গো।।

একে দুঃখী যুগী মুই, যুগিনী মোর মরু ছই।

ছয় মাস হেলা যুগিনী মোর মরি গলা।

... ..

যুগিনী মোর কাঁই গেলু মোরে অনাথা করিলু।

তোর লাগি মোর মনে মদন দহুছি গো

এ কালের কান্ত ছাড়ি যাউছি গো।’

৪. ‘বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র’-র চম্পাবতী উপাখ্যানের সঙ্গে ‘চম্পাহরণ’ লোকনাট্য মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় ‘চম্পাবতীর উপাখ্যান’-এ লক্ষ্মীদেবী নিজে তাঁর পূজো প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চম্পাবতীকে বশীভূত করেছেন; চম্পাহরণ নাটকে ফকির আপন প্রতিশোধস্বপ্ন চরিতার্থ করা এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের উন্মাদনায় যুগী অক্ষয়নাথকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম সাধন করিয়েছে।

৫. ‘বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র’-র চম্পাবতী উপাখ্যানে যোগী কোনোমতেই নির্ণায়ক চরিত্র নয়। স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথাও নয়, কারণ লক্ষ্মীদেবী পূজো প্রচারের জন্য লক্ষ্মীদেবীকেই নির্ণায়ক চরিত্র হতে হবে। অর্থাৎ চম্পাবতীর উপাখ্যানে খল চরিত্রের ভূমিকা পালন করে থাকলেও যোগী প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবীর ক্রীড়নক।

অন্যপক্ষে ‘চম্পাহরণ’ লোকনাট্যে যুগী অক্ষয়নাথ যে অপকর্ম করেছে—

ক. রূপবতী: ছোটোবধূ যে ভিক্ষা দিতে যাউথিলা, তাহাকে যুগীয়া কালা কুকুর করি লয়ি যাউছি।

খ. চম্পা: যোগনাথ আম্বর বার বৎসর উষাব্রত অছি। আম্বর অঙ্গেতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবুনি।

যুগী: বার বৎসর কি কউছি। আশ্বে বার দণ্ড শুনিবুনি।

গ. চম্পা: এই থিলা কি তোর যোগীবর মনর।

জ্বরী বড়ি কর বনি অঙ্গে দেবু হাত

আশ্বে তম্বর বেটী বটে তুম্বে আম্বর বাপ যোগীবর।

যুগী: দূর শলার মেয়া, সে আশ্বে কিছু মতো শুনিবুনি। চল ঘরকু চল।

ঘ. চম্পা: ঐ ঐ সেই দুষ্ট যোগী। আম্বরকু বলৎকার করি আম্বর সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য এই দিকে আসুছি। রক্ষা করুন মহারাজ,

ঙ. মালিনী: সেই দুষ্ট যোগীর মন্দিরকু যিবুনি বাপ। সে দুষ্ট যোগীর নিকট যে যোগদড়া অছি। সে দড়াড় প্রাণে বিনাশ করিবু।

এই বিষয়গুলি যোগী প্রথমে ফকিরের কুমন্ত্রণা অনুসারে করেছে। পরবর্তীতে তার কামাতুর হৃদয় অনুঘটকের কাজ করে পুনরায় অপকর্ম করতে ইন্ধন জুগিয়েছে। সুতরাং না উপাখ্যানে না লোকনাটে যোগী চরিত্র কোনোখানেই গৌরবান্বিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত:

‘চম্পাহরণ’ যুগীযাত্রার কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে প্রথম অংশে নির্ণায়ক চরিত্র ফকির, শেষাংশে বাঘাম্বর। এই যাত্রাপালাটি কোথাও কোথাও বাঘাম্বর পালা নামেও

অভিনয় করা হয়। সুতরাং যে যোগীপালায় যুগী চরিত্র কোন অংশেই নির্ণায়ক চরিত্র নয়— সেটি নাথধর্মের প্রচারক পালা কখনোই হতে পারে না।

সুতরাং নাথপন্থ প্রচার প্রসারের জন্য ‘চম্পাহরণ’ কোনো কৃতিত্ব দান করতে পারে না। যেহেতু ভিলেন চরিত্র হিসেবে যুগী অক্ষয়নাথ চরিত্র উপস্থিত সেহেতু নাথধর্ম মাহাত্ম্য, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি কোনটিই লোকনাট্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি। অথচ যোগীরগানে ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও নাথধর্ম-দর্শনতত্ত্ব কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন লোককবিগণ। যেমন—

ধু,— তোরা ঐ শুন গো, মিলনতীর্থ ক্ষেত্রে বাঁশীর রব শুন গো।
 চি,— রব শুন, রব শুন, রব শুন গো।। মিলনতীর্থ....
 বাজে বাঁশী একই সুতানে, প্রবাহময় প্রতিধ্বনি শুন গো কর্ণে।
 গাঙ্গিনীতে যাওয়ার জন্য, কর্ণে বাজে গো। মিলনতীর্থ....
 বাঁশির শ্রীনাদময় ধ্বনি, রং বিরং এ অবিরাম শুন।
 বিয়াল্লিশ বাদ্যধ্বনি, গগন ছাইল গো।। মিলনতীর্থ....
 গৃহকাজে ব্যস্ত হই যখন, সমন্বয় শব্দ স্পর্শে উদাসী হয় মন।
 বলে নাথযোগী রাজচরণ, শুনতে থাক গো।। মিলনতীর্থ....

-সংগৃহীত যোগীর গান।

শক্তি শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে অখণ্ড শিবস্বরূপে একাত্মভাবে অবস্থান করে। গাঙ্গিনী রূপ শক্তি রূপ থেকে নাদ উৎপন্ন হয় এবং নাদ থেকে বিন্দু সৃষ্টি হয়। নাদ বর্ণময় না হলেও বিন্দুর বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। ষট্চক্রের বিভিন্ন দল থেকে বর্ণের উৎপত্তি ঘটে। বাস্তবে এসব বর্ণ ঠিক ঠিক বর্ণ নয়, এরা আসলে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রকাশ করে। এই বর্ণগুলিতে নাদ এবং জ্যোতিও রয়েছে। বাস্তবে ষট্চক্রের তত্ত্বগুলো সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়গোচর তত্ত্বগুলো স্থূল। কুণ্ডলিনী শক্তির ভাব প্রকাশ বা মিলনের ফলেই জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়। তাই রাজচরণ

নাথযোগীও মনের নিরোধ ঘটিয়ে মহানাদে মিলন মুক্তির স্তরে পৌঁছে চিন্ময় সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। গানটি ভাবনার গভীরতা ও ভাব তন্ময়তায় রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সিদ্ধ বা সাধারণ মানুষ সকল চরাচরের সঙ্গে এক হয়ে বিশ্বের সব সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে সাধনা করেন, তখন গোটা জীবনটায় এক অখণ্ড মিলনতীর্থ হয়ে ওঠে। সংসার ও ধর্ম এক হয়ে যায়। সাধনা ও জীবনযাত্রার মধ্যে তখন আর পার্থক্য বা বিচ্ছেদ থাকে না। বরং সাধনা ও জীবনযাত্রা আলাদা হয়ে গেলে মিলনতীর্থ থাকে না। তাই রাজচরণ নাথযোগী গুরু ও পরমেশ্বরকে নিয়ে এক পরিবারে মিলনের ডাক দিয়ে যান।

‘বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র’ পাঁচালিতে যোগী শব্দটি থাকার কারণে ‘চম্পাবতী হরণ’ পালা যুগীযাত্রা হিসেবে নাথসমাজে প্রচার করা হয়েছে। পত্নীহারা কামাতুর এক ব্যক্তি ছদ্মবেশী যোগী। কিন্তু লোকনাটকে নাথপন্থ অনুসারে তাকে যোগী অক্ষয়নাথ চরিত্রে পরিণত করা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যোগীসাধককে শিল্পী লোক আখ্যানের মধ্যে নাথধর্ম ও সাধনপন্থাকে সম্বন্ধিত করে স্বতন্ত্র লোকায়ত ধারা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

ড. মধুপ দে ১৯৭৮ খ্রি. মেদিনীপুরে যোগীযাত্রা সংগ্রহ করতে গিয়ে লক্ষ করেন ‘চম্পাবতী’ পালা নয়াগ্রাম, কেশিয়াড়ি এবং দাঁতন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তিনি উল্লেখ করেছেন নয়াগ্রাম কাঁড়ঘসা গ্রামের রবিমাকির সহযোগিতায় চম্পাবতী নামে দুটি লোকযাত্রার সম্পূর্ণ পালা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। যে দুটি যোগীযাত্রা পরবর্তীতে তাঁর ‘জঙ্গলমহলের লোকযাত্রা’ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।^{২০} এছাড়া ম্যালি সাহেবের ‘মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে’ (১৯১১খ্রি.) যোগীযাত্রা ‘চম্পাবতী’-র বিবরণ রয়েছে—

Champabati is a play extolling the omnipotence of the deity and the chastity of females, which is performed mainly in the Oriya language.^{২১}

অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই যোগীযাত্রা ‘চম্পাবতী’ গ্রামীণ নাটক হিসেবে ২৪ পরগণার সুন্দরবন, মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন ওড়িশায় প্রচলিত আছে। তবে সেখানে ‘চম্পাবতী’ যাত্রায় ভিলেন চরিত্র হিসেবে ছিলেন একজন দরজি। পরবর্তী সময়ে দরজির জায়গায় উঠে এসেছে যোগী বা যুগী চরিত্র। নাটকটি লোকসমাজে সম্পাদিত হওয়ার কারণেই এই যোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি যোগীনাটকের কোনো লিখিত বা মুদ্রিত রূপও ছিল না, মৌখিক সাহিত্য হিসেবে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। তার কারণে ২৪ পরগণার সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক নামে যোগীযাত্রা নাটক অভিনীত হয়। কোথাও ‘বাঘাস্বর পালা’, কোথাও ‘চম্পাবতী’, আবার কোথাও ‘বাঘাস্বর কর্তৃক যুগীনাথবধ’ বা ‘চম্পাহরণ পালা’ নামে যোগীযাত্রা অভিনীত হত। তবে আমাদের দৃঢ় অভিমত হল যোগীযাত্রার সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মেদিনীপুরের নাথসম্প্রদায়ের মানুষ আবহমান কাল ধরে যোগীর গান পরিবেশন করে এসেছেন। যোগীর গান গেয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। যদিও যোগীভিক্ষা পেশা নয়, এটা একটি সামাজিক-রীতি। তারফলে গ্রামীণ সমাজে তাদের সেই প্রভাবের কারণে যোগীযাত্রার বিভিন্ন পালায় নাথযোগী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকেও জানা যাচ্ছে গোপীবল্লভপুর এলাকায় তোপগেরিয়া অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নাথযোগী পরিবারের মানুষ বসবাস করেন। তারা এখনো বছরপী সেজে যোগীর গান করেন। গোপীবল্লভপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীন্দর পাণ্ডুই জানান শ্যামানন্দের সময়ে এই অঞ্চলে নাথযোগীদের বসবাস শুরু হয়। তাঁরা যোগীর গান পরিবেশন করলেও যোগীনাটক ‘চম্পাহরণ’ ইত্যাদি পালা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না।^{২২} পাঁশকুড়ার অমরচন্দ্র নাথও জানান যে তাঁদের এলাকা শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামে নাথসম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধিনাথ মঠ থাকলেও সেখানে যোগীনাটক প্রচলিত নেই, যোগীর গান প্রচলিত আছে।^{২৩} যোগীর

গানের যোগীচরিত্র শেষপর্যন্ত বিভিন্ন লোকযাত্রার চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলায় মুসলমান শাসকদের আমলে সুফি ও ফকিরি ধারার সঙ্গে নাথযোগীদের যোগধারার একটা সমন্বয়ের কারণে নাথপন্থের কথা কাহিনি মিশে গিয়েছিল। যোগীনাটকে অবশ্য লোকসমাজের কারণে যোগী চরিত্র ভিলেন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, তিনি ফকির বা পীরের প্রভাবে তাঁদের মাহাত্ম্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে যোগীযাত্রার পালা জুড়ে যুগী কেবল সংলাপ উচ্চারণ করে কাহিনির বিস্তার সাধন করেনি, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন সহ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতেও পেরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল হালিম প্রামাণিক, *বাংলাদেশের নাথসম্প্রদায়ের নাট্যঐতিহ্য স্বরূপ ও সমীক্ষা*, পৃ. ২০৯।
২. *লোকশ্রুতি* পত্রিকা, খণ্ড ৭, সংখ্যা ২, জুন ২০০৯, পৃ. ৩৩।
৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮।
৪. ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১০৬।
৫. যুগীযাত্রা, *সীমান্ত সংস্কৃতি এবং দুটি রাজপরিবার*, শারদীয় পরিবর্তন, ১৯৮২; ভবনাথ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।
৬. ভবনাথ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।
৭. *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৬২।
৮. *A History of Sufi-ism in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975, p. 244; অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি*, পৃ. ৩৬০।
৯. *বাঙলার পল্লীগানে বৌদ্ধসাধনা ও ইসলাম* (প্রবন্ধ), *বাঙলার লোকায়ত সাহিত্য* (গ্রন্থ) পৃ. ৬৯।
১০. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি*, পৃ. ২১৪-২১৫।
১১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *উপকূলের যোগীযাত্রা সংস্কৃতির মিশ্র চরিত্র*, বিভাগীয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৬।
১২. *লোকশ্রুতি* পত্রিকা, পৃ. ৩৪।
১৩. বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, *দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি*, *লোকশ্রুতি* পত্রিকা, পৃ. ৩৩।
১৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *উপকূলের যোগীযাত্রা সংস্কৃতির মিশ্র চরিত্র*, পৃ. ২৯।
১৫. *ঐ*, পৃ. ৩৫।
১৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অবলুপ্ত লোকপালা যুগীযাত্রা*, *The Wall* সুখপাঠ, অনলাইন পত্রিকা, ৩ মার্চ ২০২১।
১৭. *লোকশ্রুতি* পত্রিকা, পৃ. ৩৫।
১৮. *ঐ*, পৃ. ৪০-৪১।
১৯. রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*, নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), পৃ. ১৪১।
২০. মধুপ দে, *জঙ্গলমহলের লোকযাত্রা*, পৃ. ৭।
২১. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers*, Midnapore, p. 83.

২২. তথ্যপ্রদাতা, লক্ষ্মীন্দর পালুই, পেশা গবেষক ও অধ্যাপক, গোপীবল্লভপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বয়স ৩৯, ৭ মে ২০২৩।

২৩. সাক্ষাৎকার, অমরচন্দ্রনাথ, গৃহস্থ নাথযোগী, গ্রাম পূর্বপীতপুর, পাঁশকুড়া, পূর্বমেদিনীপুর, বয়স ৭১, ৩ এপ্রিল ২০২২।

পঞ্চমে অধ্যায়

নাথসম্প্রদায়ের লোকগান

নাথসম্প্রদায়ের লোকগান

৫. ক. যোগীর গান

শিব বা আদিনাথই নাথসম্প্রদায়ের উপাস্য। তিনি অনাদি ও পরমব্রহ্ম স্বরূপ। তবে নাথ সম্প্রদায়ের আদিনাথ দেবগুরু ও মানবগুরু দুই-ই। জানা যায় মানবগুরু আদিনাথ কজরীবনবাসী হয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন গৌড়দেশের মৎস্যেন্দ্রনাথকে।^১ ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে শশাঙ্ক গৌড় দেশে রাজা হয়েছিলেন। আদিনাথ হঠযোগের প্রথম আচার্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘যোগবিষয়ঃ’ গ্রন্থে বলেছেন—

‘আকুলেনাদি নাথেন কেজাপুবীন বাসিনা।
কৃপয়ৈব পরং তত্ত্বং মীনানাথোহপি বোধতঃ।।
মীনানাথোহপি সচ্ছিত্যং প্রত্যাচ সমাহিতঃ।
ত্বং গুরুত্বং শিষ্যশ্চ শিষ্যস্য চ গুরোরপি।।
নানয়োরপি ভেদোহত্র সমসিদ্ধি প্রজায়তে।
উমাশঙ্করপুত্রোহহং মীনানাথো মুনীশ্বর।।’^২

আদিনাথ শিবের বিশেষণ হল অকুল। কেজাপুবীন সম্ভবত কদলীরাজ্য, সেখানে মৎস্যেন্দ্রনাথ রাজত্ব করতেন। সেই কদলীবন রাজ্যেই আদিনাথ মুনীশ্বর মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দেন। অনেকে দত্তাত্রেরনাথকে আদিনাথ বলতে চান। দ্বিজ লক্ষ্মণ ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে কদলী থেকে ফেরার সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ মহানাদে যোগীরাজ্য স্থাপন করেন।^৩ মহানাদ আজও নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ ও তীর্থস্থান। ড. পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘Natha Cult and Mahanad A study in Syncretism’ গ্রন্থে বলেছেন—

The presence of 'Kadalinagar' which has been subsequently renamed as Nagarpara by Chandraketu and localities like 'Harmala' and 'Yogidanga' at Mahanad are reminiscent of its flourishing as an important seat of the Natha cult.⁸

এই আদিনাথের নামে নাথসম্প্রদায়ে যে সম্প্রদায় বা পন্থ গড়ে উঠেছে তার নাম 'আদিনাথ সম্প্রদায়'। আদিনাথ সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ।^৫ 'মীননাথ-গোরক্ষনাথ সম্বাদে' তার উল্লেখও রয়েছে—

‘গোরক্ষ--তুমি কোন যোগী।

মীন—আমি আদ্যনাথ পন্থী যোগী।

গোরক্ষ--তোমার কোন রূপ কোন স্বরূপ।

মীন—আমার আদ্যনাথ রূপ, আদ্যনাথ স্বরূপ।।

গোরক্ষ—আদ্যনাথর কোন গোত্র, কোন সম্প্রদা, কোন মঠ।

মীন—আদ্য নাথর শিবগোত্র, কাশী সম্প্রদা, সুমেরু মঠ।।’^৬

সংস্কৃত ‘নাথ’ শব্দ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদাগত। নাথ্ ধাতু থেকে ‘নাথ’ শব্দের উৎপত্তি। অর্থ— ১. প্রার্থনা করা, ২. আশীর্বাদ, ৩. উপতাপ, ৪. ঐশ্বর্য, ৫. প্রভু, ৬. অধিপ। নাথ যোগধারার বেদনাম হচ্ছে— ‘সঃ যাতি আত্মানং ঈশ্বরম’। যার মহত্বপূর্ণ অর্থ পালক, কার্যসাধক ও রক্ষক। মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘নাথ’ শব্দের অর্থ প্রদান করে গিয়েছেন—

‘পরমাণুমুচ্যতে নাথো স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ।

সঃ জীবঃ পরতরো যন্তু সঃ হংসঃ শক্তিপুদগলঃ।।’^৭

নাথই পরমাণু, পরম শিব, সর্বব্যাপ্ত, জীবের শক্তিমূল হংস।

নাথযোগীদের আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘আগৈ মৎস্যনাথ অসত্য মায়া স্বরূপময় কাল তাকো খণ্ডন কর মহাসত্য তৈংশোভত ভয়ো আন নির্গুণাতীত ব্রহ্মনাথ তাকুং জানৈয়াতৈ আদি ব্রাহ্মণ

সূক্ষ্মবেদী’।^৮ এখান থেকে পরিষ্কার যে নাথযোগীদের সূক্ষ্মবেদ আদিবৈদিকযুগের নিবিদধারার বেদের গুণার্থরহস্যসূচক এবং সাধন সংকেতমূলক বেদ বা জ্ঞান। নাথযোগীরা মনে করেন এটা তাঁদের সংকেতশাস্ত্র বা শূন্যশাস্ত্র। অর্থাৎ এটি সন্ধ্যাভাষায় লেখা। এছাড়া নাথযোগীরা মনে করেন তাঁরা পরবর্তীকালীন চার-বর্ণাশ্রমের অতীত আদি একাশ্রমপন্থী।^৯ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডবাদী যাজ্ঞিকদের সঙ্গে ব্রহ্মবাদী গুহ্যসাধক নাথপন্থী সিদ্ধদের মতপার্থক্য ছিল, ঋগ্বেদেই তার উল্লেখ রয়েছে। ক্রিয়াকাণ্ডবাদী যাজ্ঞিকরা সোম নামক লতা থেকে উৎপন্ন সোমরস যজ্ঞে আহুতি দিতেন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস নিজেরাও পান করতেন। তাতে তাঁরা অমরত্ব অর্জন করতেন বলে ভাবতেন—

‘অপাম সোমং অমৃতাঃ অভূমঃ।’^{১০}

কিন্তু নিবিদ ধারার ব্রহ্মজ্ঞ গুহ্য সাধকেরা এইরূপ যজ্ঞকে বিদ্রুপ করে বলতেন—

‘সোমং মন্যতে পপিবান যৎ সংপিষন্ত্যৌষধিং।

সোমং যৎ ব্রহ্মাণোবিদূর্ন তস্যাপ্নোতি কল্লন।।’^{১১}

এই সোমলতার রস পানকারীরা কখনই ব্রহ্মবিদদের পরিজ্ঞাত সোম পান করেন না। নাথ সম্প্রদায়ের যোগী বা সিদ্ধদের ধারণা খেচরীমুদ্রার সাহায্যে সহস্রাতে অবস্থিত সোমচক্র থেকে ক্ষরিত অমৃত পান করতে হয়। সেই সোমরস পান করলেই অজর-অমর হওয়া সম্ভব। এই সোমরস যজ্ঞের বিধান, সূক্ষ্মবেদের বিধান। ‘বেদমালা’ নামের একটি ছোট পুথি আসামের কাছাড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় ২৫০-৩০০ বছর আগে বেদের নানা তত্ত্বালোচনা হত নাথযোগীদের মধ্যে।^{১২} যোগীতন্ত্রকলামতে নাথদের মধ্যে ছ’প্রকার বেদের প্রচলন ছিল—সামবেদ, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, নিলবেদ, অনিলবেদ ও সারবেদ। এই ষড়্বেদের

তত্ত্বজ্ঞানেই যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করত।^{১৩} এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ধর্মবিবর্তনের পথে মানব-মানসের ক্রমবিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। লোকায়ত দর্শনের অনেক বিষয়ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে লোকায়ত দর্শন থেকে উদ্ভূত আগম দর্শনের বিভিন্ন বিষয়। অথর্ববেদের প্রায় পুরোটাই তাই। বিশেষ করে অথর্ববেদে পাওয়া ‘শ্রীবিদ্যাসূক্ত’, ঋগ্বেদে ‘দেবীসূক্ত’, সামবেদের দুর্গাসূক্ত অর্বাচীন কালের সংযোজন বলা যায়। যোগদর্শন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের সমীকরণবাহী সাধকধর্ম। প্রাক-বৈদিক যুগ থেকেই ধর্মের বিবর্তনের উৎস ধরে এগিয়ে এসেছে সভ্যতার বিবর্তনধারায়। শেষপর্যন্ত গোরক্ষনাথ নাথপন্থকে ঔপনিষদিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন।^{১৪}

বৈদিক মুনিধারার সর্বশেষ ধারা নাথযোগী সম্প্রদায়। ড. জীবন নাথ ‘নাথ’ শব্দটিকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।^{১৫} নাথ সমাজের প্রাচীন প্রথা ছিল মোষের শিঙে তৈরি শিঙা হাতে করে নাদরূপ ব্রহ্মগীত গাওয়া। এই ধারা আজও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এমনকি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে মেদিনীপুরের নাথসম্প্রদায়ের মানুষেরা শিঙা বাজিয়ে ব্রহ্মগীত গায়তেন বলে সেখানকার পুরনো আমলের মানুষেরা জানান। এখনো মাধুকরীবৃন্তির নাথসন্ন্যাসীগণ ‘অলখ নিরঞ্জন’ উচ্চারণ করে ব্রহ্মচেতনার ভাবধারা প্রচার করেন। গৃহী নাথযোগী ও সন্ন্যাসী নাথযোগীরা একসময় মানুষ ও সমাজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মগীত গেয়ে বেড়াতেন। ব্রহ্মধারণা তথা নাদসাধনা নাথসম্প্রদায়ের যোগধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। শৈবোপনিষদের অন্তর্গত কৈবল্যোপনিষদ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

‘সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

সংপশ্য ব্রহ্ম পরমং যাতি ।’

‘রুদ্রহৃদয়োপনিষদ’-এ দেখা যায়—

‘ব্রহ্মৈব ভবতি স্বস্থঃ সচ্চিদানন্দমাত্রক ।’

সবার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সবাই—এই চেতনায় ব্রহ্মজ্ঞান। নাথযোগীরা সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখে নিজেরাও ব্রহ্ম-চেতনা সম্পন্ন হয়ে যান। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অথর্বশিখোপনিষদ স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছে—

‘সর্বান বৃংহয়তীতি ব্রহ্ম ।’

ঋগ্বেদ-এ ব্রহ্মগীত গাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

‘যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কিরেঃ ।’

অর্থাৎ যিনি উচ্চ নাদধ্বনি করে ব্রহ্ম বিষয়ে গান করেন। আরও পাওয়া যাচ্ছে—

‘তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ।’^{১৬}

তুরীয় হলো বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর— এই তিন মায়াময় অবস্থার অতীত চতুর্থ স্তর। আবার তুরীয় বাক্ হচ্ছে ‘নাদ’। নাদের ৪ বাগবৃত্তি— পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। পরা-সূক্ষ্মনাদ, পশ্যন্তি-সূক্ষ্ম স্ফোট নাদ, মধ্যমা- জপাদি অভ্যাসে বোধ্য, বৈখরী- বাগযন্ত্রে উচ্চারিত হয়। ভারতীয় ধর্ম সাধনায় এই নাদতত্ত্ব নাথসম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধনভাবনা। নাদসাধনা করে নাথ সম্প্রদায়ের যোগীগণ নাথত্ব অর্জন করেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে- ‘বিশ্বে দেবা মম নাথং ভবন্তু’ অর্থাৎ বিশ্বের সকল দেবতা আমার নাথ হোক।^{১৭}

অতএব বলা যায় নাথ যোগধারা প্রাগ্‌বৈদিক মুনিধারার ব্রহ্মবাদের ঐতিহ্য বহন করছে। একথা তাই বলা যায় না ‘নাথযোগিরা বেদ- স্মৃতি বহির্ভূত— না-হিন্দু না-মুসলমান জাতি’^{১৮}

‘ক্রিয়াকাণ্ডী বলে যোগী বেদ নাহি মানে।

যোগী বলে ক্রিয়াকাণ্ডী বেদ নাহি জানে।।’^{১৯}

বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণেরা বেদের বাহ্যিকতা নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞ করলেও নাথযোগী করেন না। তাঁরা বেদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম গূঢ়তত্ত্বকে আশ্রয় করেছেন। এই বিষয় নিয়েই বেদের মুনিধারা ও ঋষিধারার মতপার্থক্য ঘটেছে। উভয়েই বৈদিক ধারার সঙ্গে যুক্ত, পার্থক্য শুধু বেদের আচরণে। নাথপন্থের ‘হাড়মালা’ নামক যোগশাস্ত্র গ্রন্থেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। মহাদেবের কণ্ঠশোভন হাড়মালা দেখে গৌরীর প্রথম প্রশ্ন ছিল—

‘হীরা মণি মাণিক্য যে আছে নানা ধন,

তাহা ছাড়ি হাড়মালা পর কি কারণ।’

শেষেও একই প্রশ্ন করেন—

‘আমি যদি মরি তুমি না মর কেনে।

ইহার কারণ কহ শুনি তোমা স্থানে।।’

মহাদেব তার উত্তরে বলেন—

‘কহিব তোমাতে আমি সকল কথন।

ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে দেবী নাহিক মরণ।।’

ব্রহ্মজ্ঞান বা মহাজ্ঞানের মাধ্যমে শিবত্বপ্রাপ্তি বা নাথনিরঞ্জনত্ব কিংবা জীবনমুক্তি লাভই নাথধর্মের দর্শন বা আদর্শ।^{২০}

অপরদিকে অবৈদিক ও লৌকিক পরম্পরাকেও নাথযোগী-সিদ্ধরা নিজেদের মত করে গ্রহণ করেছেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের পেছনে আর্য ও আর্যেতর ধারার ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উৎস, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বেশভূষার উপকরণ, খাদ্যাভ্যাস, প্রথা-পদ্ধতি, সংস্কার কোনো কিছুই প্রায় বাদ থাকেনি।^{২১} নাথযোগীদের হঠযোগ-দর্শন তান্ত্রিক ও বৈদিক ঐতিহ্যসম্বলিত হলেও সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রবাদ ও নানা বিশ্বাসে, পাত্র ও স্থানের নামে, আচার-ব্যবহারে, পরিচ্ছদাদিতে আর্যেতর প্রভাব অনুমান করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশে আর্য ও আর্যেতর ধারার গঙ্গাযমুনা মিলে একটি সংহতরূপ ধারণ করেছে।^{২২} গোরক্ষনাথ সংগঠিত নাথপন্থে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগ ইত্যাদি মত অন্তর্ভুক্ত করার কারণে নাথ সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতিতে বৈদিক, অবৈদিক, তান্ত্রিক, দক্ষিণাচারী, বামাচারী তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।^{২৩} নাথসিদ্ধ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধযোগী হয়েও কদলীরাজ্যে রাজকন্যার প্রেমে অভিভূত ও রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য যোগী গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথের (হাড়িপা) শিষ্য কানুপানাথ বা কাহুপার কাছ থেকে গুরুর দুর্দশার কথা জেনে গুরুকে গানের মাধ্যমে যোগতত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। এরূপ একটি কাহিনি বা কিংবদন্তি প্রাচীন কাল থেকে বাংলার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। বিদ্যারণ্য স্বামী (১৩৫৩-১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ) ‘শঙ্কর দিগ্বিজয়’ গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের শিষ্য সনন্দনের মুখে একে প্রাচীন প্রবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{২৪} এছাড়া ‘মাণিকচন্দ্র রাজার গান’, ‘ময়নামতীর গান’, ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ ইত্যাদি কাহিনিতে নাথপন্থের দর্শন ও সাধনপ্রণালীগত গূঢ় তত্ত্বকথা মৌখিক পরম্পরায় বাংলায় প্রচলিত ছিল। নাথপন্থের সন্ন্যাসী ও গৃহীযোগীরা সেগুলি

রাগরাগিণীসহ বিভিন্ন ধর্মসভায় গাইতেন। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, ‘অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পূর্বে থেকে বাংলাদেশে বিশেষ করে সাধারণ শ্রেণির মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল—শৈব নাথ-মত এবং বৌদ্ধ সহজ-মত। নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা নিজেদের ‘যোগী’ বা ‘কাপালিক’ বলত। যোগীদের নামের শেষ শব্দ হত ‘নাথ’। বর্তমান সময়ে যোগী জাতির মধ্যে নাথ পদবি ও পূর্বেকার আচার-অনুষ্ঠানের স্মৃতি কিছু কিছু চলে এসেছে।’^{২৫}

যোগদর্শনে যেমন পতঞ্জলির মত দেখা যায় তেমনি নাথনিরঞ্জন প্রভৃতি অতি পুরাতন সব মতে কায়াসাধনের কথা আছে। আদিনাথ, মীননাথ, গোরখ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। সেই সবই বাংলার নিজস্ব যোগমত।^{২৬} চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলার গ্রামে গ্রামে নাথসম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী অবলম্বনে নাথ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে কাহিনি, গান রচনা করতেন ও গাইতেন। তাঁরা নাথযোগ সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্ব ও গুরু পরম্পরায় শিক্ষা গ্রহণ করে পুথি রচনা করতেন।^{২৭} বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এ তার উল্লেখও পাওয়া যায়—

‘যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত।

শুনিয়া সবার চিত্ত হৈত আনন্দিত।

... ..

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।

মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে নিশি জাগরণ।।’^{২৮}

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ‘কোন রাজার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তদুদ্দেশ্যে লৌকিক স্তুতিব্যঞ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত রাজন্যবর্গ মুসলমান আগমনের পূর্বে এতদ্দেশ্যে রাজত্ব করেছিলেন এবং খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব সময় হইতে যে প্রাপ্ত

প্রশংসাগীতিসকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমানে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।^{২৬} আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন উল্লেখ করেছেন ‘ভারতের সর্বত্র যোগীরা তীর্থযাত্রায় যেতেন এবং বেলুচিস্তান ও হিংলাজ তীর্থযাত্রায় অনেক বাঙালি যোগীকে তিনি যেতে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে পূর্বে অনেকে পারস্য আরব প্রভৃতি দেশ হয়ে মিশর দেশে নীলনদে স্নান করতে যেতেন। এইসব যোগীরা যুফ্রেটিস টাইগ্রিস নদীতে তীর্থস্নান করতেন, বোগদাদ প্রভৃতি নগরে যেতেন, মিশরের তীর্থস্নানগুলিতে যাতায়াত করতেন। টলেমী নাকি তাঁর অনেক খবর আলেকজান্দ্রিয়া নগরে এইসব ভারতীয়দের কাছে পান। সিরিয়া দেশে ভারতীয় জ্ঞানীদের লুসিয়ান দেখেছেন। বাকু নগরে বহু ভারতীয় যোগী থাকেন।’^{২৭}

নাথধর্ম ও সাধনপ্রণালী ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু নাথধর্মের মূলতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি বোঝা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। নাথ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য কি এবং কালক্রমে বিভিন্ন সাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কি আকার ধারণ করেছে, তা নিরপেক্ষভাবে আলোচনার যোগ্য। কারণ তত্ত্ববোধ না থাকলে শুধু শব্দার্থ মীমাংসার দ্বারা নির্ণয় হতে পারে না।^{২৮} নাথপন্থীদের বিশ্বাস শিব হতেই নাথধর্ম জগতে প্রচারিত হয়, কালক্রমে তা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলে মৎস্যেন্দ্রনাথ তার পুনঃপ্রচার করেন এবং গোরক্ষনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।^{২৯} সুলতান আলি মর্দানের রাজত্বকালে (১২১০-১২১৩) নাথসিদ্ধদের সাধন গ্রন্থ ‘অমৃতকুণ্ড’ আরবি-ফারসিতে অনূদিত হয়। মৌলানা রুকনউদ্দীন সেই পদ্ধতিতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভও করেন। সৈয়দ সুলতান তাঁর ‘রসুল চরিত’ ও ‘জ্ঞান প্রদীপ’ গ্রন্থে সুফিধর্মের সঙ্গে যোগ-তত্ত্বের সংমিশ্রণ করেন। এই কারণেই বোধ হয় সুপণ্ডিত আহমদ শরীফ সাহেব যোগতাত্ত্বিক কায়াসাধনাকেই বাঙালির ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন।^{৩০} নাথসিদ্ধ যোগীদের ইতিহাস অনেক

দিনের। চৌরাশী সিদ্ধের উল্লেখ রয়েছে চতুর্দশ শতকে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের ‘বর্ণনরত্নাকর’ গ্রন্থে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ যোগীসিদ্ধের ও পঁয়ত্রিশ জ্ঞানডাকিনীর (সিদ্ধ-যোগিনীর) কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল। রাউত নৃসিংহ রত্ন ‘পঞ্চাশৎসিদ্ধাবদান’ ও ‘পঞ্চত্রিংশ - জ্ঞান ডাকিন্যাবদান’ রচনা করেছিলেন এবং যোগীদের সাধনগীতি সংকলন করেছিলেন।^{৩৪}

১৫০৩ খ্রি. হোসেন শাহের সঙ্গী কুতবন ‘মৃগাবতী’ নামে একটি কাব্বলিক কাব্য রচনা করেছিলেন। তখন নাথপন্থীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তারা সহজেই কুতবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তারফলে মৃগাবতীর কবি কুতবন পুঁতির মালা, জটপাকানো লম্বা চুল, ত্রিশূল, ভস্ম, বীণা ও থলে দ্বারা সজ্জিত গোরক্ষপন্থী যোগী সন্ন্যাসীদের ঘুরে বেড়ানোর বর্ণনা দিয়েছেন।^{৩৫} নাথসাহিত্যে গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনি ছাড়াও আর একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে নাথধর্ম ও দর্শনবিষয়ক ছড়া। নাথধর্মের ও যোগমার্গের তত্ত্ব, উপদেশ ও দর্শন-সংবলিত বিভিন্ন পদ ও ছড়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কাহিনি সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং আজও যোগী সম্প্রদায়ের মানুষেরা নাথধর্মতত্ত্বের এই আখ্যানটি গান গেয়ে থাকেন। চর্যাপদের সমসাময়িককালে নাথধর্ম বাংলায় বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে নাথধর্মের বিকাশের শ্রেষ্ঠযুগ।^{৩৬}

এমনকি বৈদিকসাহিত্য ঋগ্বেদ-এ দেবস্তুতির মাঝে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, সেসময়কার সমাজব্যবস্থা, গার্হস্থ্যধর্ম এবং প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সামবেদ-র দেবতা স্তুতির অনেক মন্ত্রই হয়ে উঠেছে ‘শ্রমসঙ্গীত’। আর অথর্ববেদ হল সাধারণ মানুষের বেদ।^{৩৭} প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে যুক্ত হয়েছে

একদিকে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ, অন্যদিকে বাঙালির কাব্যদর্শ। তাই প্রাচীন বাংলার সাহিত্য ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছে সর্বভারতীয় কাব্য, অলংকার, দর্শন ও ধর্ম।^{৩৮} প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই বিষয়বস্তুতে বাংলায় যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের জন্ম হয় তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায় একদিকে রাজ্য শাসনব্যবস্থার পটপরিবর্তনে ধর্মীয় পটপরিবর্তন, অন্যদিকে কৃষিপ্রধান সমাজে ভূস্বামী ও সামন্তগোষ্ঠীর আবির্ভাবে বাংলার গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থায় নিম্নকোটি মানুষের উপর উচ্চকোটির মানুষের কর্তৃত্ব। কার্যত গুপ্ত-পাল আমলে বণিক শ্রেণির উদ্ভবে বাংলার এই সামাজিক অবস্থায় প্রতিফলিত হয়। আবার পাল আমলের অবসানে সেন রাজাদের কর্তৃত্বে বৌদ্ধসিদ্ধ ও নাথসিদ্ধগণ সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। গ্রামীণ জনসাধারণকে স্ব-স্ব-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। এই দীক্ষা-গুরুরাই পরবর্তী সাহিত্যে পেয়েছে সাধারণ মানুষের স্তুতি। নাথসাহিত্যের মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রমুখ এঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেই নাথসাহিত্যের জন্ম হয়েছে।^{৩৯} সম্ভবত দ্বাদশ শতকে দেশে শৈব নাথসিদ্ধরা প্রাধান্য লাভ করে। বঙ্গদেশে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শৈবধারার প্রাবল্যে বজ্রযানী বৌদ্ধরা অনেকে নাথসিদ্ধদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। কাজেই অনুমান করা হয় দ্বাদশ শতকেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আগমনে নাথপন্থ পরিপুষ্ট হয়। তবে ‘ময়নামতীর গান’ বা ‘গোরক্ষবিজয়’ জাতীয় কাব্য সপ্তদশ শতকের আগে রচিত না হলেও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ছড়া আকারে এ কাহিনি গড়ে উঠেছিল তা বলা যায়। বিপ্রদাস পিপলাই পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে তাঁর ‘মনসাবিজয়’ কাব্যে মীনচেতনের কাহিনি উল্লেখ করেছেন- ‘অতি তপে মীননাথ কদলীতে ভোলে’।^{৪০}

নাথপন্থের গীতিকাব্য ও গানগুলিতে সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি ব্যাখ্যা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ধর্মসভায় রাগরাগিণীসহ এই গানগুলি গীত হত, এখনো হয়। নাথসিদ্ধরা হেয়ালিপূর্ণ ভাষা পছন্দ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে নাথপন্থের মানুষের বাইরে অনেকেই এই গানগুলি গাওয়া শুরু করেন। তখন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে নাথদর্শন ও সাধনপ্রণালী কিছুটা বর্জন বা পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কবিত্বপ্রকাশই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। যোগীরগান মূলত ভজনগীতি বা নিগুণী সংগীত। ভজন বিষয়ক যোগীরগানগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, বিভিন্ন উপনিষদ ও যোগগ্রন্থগুলির বিষয় ও পদের ছবছ প্রকাশ ঘটেছে। রাজমোহন নাথ মনে করেন যে সেখানে মনঃসংযম এবং পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গনির্মাণকারী, মনের ন্যায় বেগবান ও সর্বত্র গমনশীল, গুহ্য সাধনার দ্বারা ভূলোক ও দুলোক পরিমাপকারী—প্রাচীন সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তারই ইঙ্গিত যোগীরগানগুলিতে সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।^{৪১} বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদ, ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থপাঠ, যজ্ঞ, দান, ইন্দ্রিয় নিরোধ, তপস্যার মাধ্যমে পরম ব্রহ্মকে জেনে মুনি বা যোগী হতে পারতেন—

‘বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসা,

অনাশকেন, এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।

প্রব্রাজিনো লোকম ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।’^{৪২}

অর্থাৎ তাঁরা ঘর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং চতুর্দিকে বিচরণ করে থাকেন। এই ভিক্ষাবৃত্তি থেকেই ভিক্ষু ও ‘ভেখ’ শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।^{৪৩} পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বের আচারিক বিষয় হল

যোগপদ্ধতি। আৰ্যধৰ্ম এবং সংস্কৃতিৰ চাপেও তা বিলুপ্ত হয় নি। মহাভাৰত-এ তাৰ স্বীকৃতি রয়েছে—

‘সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে হে।

দেবশ্চ সৰ্বে নিখিলেন ৰাজন।।’^{৪৪}

ড. সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন—

Some of the fundamental things in Brahmanical Hinduism,
like worship of Siva and Uma, Vishnu and Sri and Yogo
philosophy and practice came from the dravidian speakers.^{৪৫}

যোগ ও তন্ত্ৰ ধীৰে ধীৰে কাশ্মীৰ থেকে বাংলা-আসাম পৰ্যন্ত হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে প্ৰাবল্য দেখা যায়। শেষে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মেৰ পুনৰুত্থান ঘটাবৰ সময়তে এসব বিষয় ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মে অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। ড. সুকুমাৰ সেন নাথপন্থেৰ কাহিনীৰ উৎসে একদিকে ঋগ্বেদেৰ নাসদীয় সূক্ত, বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ, অপৰদিকে পলিনেশীয় জনসংস্কৃতিৰ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন। (ক. নাসদাসীৎ ন সদাসীতদানম্। তম আসীৎ তমসা গুটমগ্ৰে। স্বধা অধস্তাৎ প্ৰযতিঃ পৰস্তাৎ। তপসস্তন মহিনা জায়তেকম মনসো রেতঃ প্ৰথমং যদাসীৎ।-ঋগ্বেদ। খ. হিৰণ্ময়ঃ পুৰুষঃ এক হংসঃ।- বৃহদাৰণ্যক।)^{৪৬} মহাভাৰতেৰ শল্যপৰ্বৰ যোগীৰ কাহিনী কিংবা বিদুৰ, ব্যাসদেব, বিপুল, নাৰদ, সনৎকুমাৰ প্ৰমুখৰ কাহিনীতেও যোগীজীবনেৰ আভাস রয়েছে।^{৪৭} চৰ্যাকার চণ্ডন, সৰহ প্ৰভৃতিৰ গানেৰ প্ৰতিধ্বনি ও আদল মেলে কবীৰ, কুতবন, মালিক মুহম্মদ জায়সী, দাদু ও গোরখপন্থীদেৰ ৰচনায়। কৃষ্ণদাসেৰ ‘ভক্তমালা’ মীননাথ-গোৱৰ্দ্ধনাথও ঠাই পেয়েছেন। কাজেই নাথপন্থেৰ প্ৰসাৰ হয়েছিল ভাৰতময়।^{৪৮} নাথপন্থেৰ সিদ্ধদেৰ অমৰত্বেৰ মূলকথা হল—

‘মূঢ় লোকে দৃষ্ট (বস্তু) নষ্ট হল দেখে কাতর হয়
 তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগরে শোষে
 মূঢ় অবস্থায় লোকের দৃষ্টি খোলে না।
 (যেমন) দুধের মাঝে মাখন থাকে, কিন্তু কেউ দেখে না
 এই সংসারে কেউ আসে না, যায়ও না
 এই ভাব নিয়ে বিলাস করছেন যোগী কাহ্ন।’^{৪৯}

এই ধারারই পরিচয় পাওয়া যায় ‘যোগীরগান’-গুলিতে। কায়াসাধনা বা দেহসাধনা যোগীর গানের বিষয়বস্তু।

বেদ ‘অশ্বদমসপর্শরুপমব্যয়ম’ বলে যে ব্রহ্মের নির্দেশ করেছে তাই নাথসম্প্রদায়ের ‘নিরঞ্জন’। যিনি যোগসাধনা করে প্রত্যক্ষ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তিনিই নাথ। ন+অথ = নাথ। ‘ন অথ বিদ্যতে यस্য সঃ নাথ’ অর্থাৎ যার কোনো অথ নেই তিনি নাথ। ‘অথ’ শব্দের অর্থ নিরন্তর। যেমন- ‘অথৌ তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা’, ‘অথাতঃ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা’ যার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। আদিতে নিরাকার নাথ- নিরঞ্জন নাথযোগীদের উপাস্য হলেও কালক্রমে সাধারণের উপাসনার সুবিধার্থে যোনিলিপ্তের উপাসনা শুরু হয়। নাথেরা অবশ্য বাণলিপ্ত আরাধনা করেন।^{৫০} প্রাচীনকালে নাথসিদ্ধদের কায়াসাধনা বা যোগসাধনার কথা পদ বা কবিতা আকারে মুখে মুখে রচনা করে নাথসন্ন্যাসী ও গৃহস্থরা বিভিন্ন আসরে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে গানের মত গেয়ে শোনাত। নাথযোগীদের ধর্মীয় তত্ত্বমূলক এসব গানই ‘যোগীর গান’ নামে পরিচিত। চর্যাপদের গানগুলিতে মীননাথের একটি গান গৃহীত হয়েছে। প্রাচীনযুগের এই যোগীর গানের মধ্যযুগে অন্য নাম ছিল ‘যোগান্ত-ভেদান্ত’ গান।^{৫১} একসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে নাথযোগীদের প্রভাবের কথা জানা যায়- বিশেষ করে রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা জেলায় এদের সংখ্যা ছিল অনেক। এখন উপরোক্ত জেলাগুলিতে

যোগীপাড়া, নাথপাড়া, নাথেরকান্দি, যোগীরচর নামে বেশকিছু নাথযোগীদের বাসস্থান এবং নাথযোগীদের কয়েকটি তীর্থ বা সাধনপীঠের অবস্থানও দেখা যায়।^{৫২}

জন্ম-মৃত্যু লক্ষণ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বই ‘যোগীর গান’-র মূল বিষয়বস্তু। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ যোগীরা নাথপন্থের কোনো মঠ, মন্দির এবং ভক্তের বাড়িতে বসে যোগীর গান পরিবেশন করেন। অনেক গৃহস্থযোগী গোপীযন্ত্র বা একতারা বাজিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যোগীর গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। পুরুষ যোগীদের পাশাপাশি নারীযোগী বা যোগিনীদেরও মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। গোপীচন্দ্রের গানে বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হত বলে বিশেষ ধরনের একতারাটিকে ‘গোপীযন্ত্র’ বলা হয়। বর্তমানে একতারা, বাঁয়া ও গোপীযন্ত্র একান্তভাবেই বাউল গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র।^{৫৩} নাথপন্থের কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ সন্ন্যাসী নাথযোগী ও গৃহস্থযোগী যোগীর গানের গীতক হলে গেরুয়া বা লালরঙের ধুতি, বাংলাশার্ট বা ফতুয়া এবং চাদর পরিধান করেন। নাথ- অঘোরী সন্ন্যাসীরা আবার কালো রঙের পোশাক পরেন। তাঁদের হাতে ডমরু, শিঙা, খপ্পর এবং কাঁধে একটি ঝোলা থাকে। শিঙা বা শিঙ্গা বাজিয়ে তারা ‘অলখ নিরঞ্জন’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং যোগীরগান শোনান। তারা কোনো দাবি করেন না, গৃহস্থরা সন্তুষ্ট হয়ে যা দেন সেটাই তারা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। ভবনাথ সরকার মনে করেন যে নাথযোগীদের মধ্যে কিছু মানুষ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষাদ্বারা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নির্বাহ করেন। এই যোগীরা হাতে ডমরু, লাউয়ের ভিক্ষাপাত্র ও সিঙ্গা নিয়ে ভিক্ষায় যান। এঁদের পরনে থাকে গেরুয়া বস্ত্র। মাথায় গৈরিক পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। এঁরা ডমরু বাজাতে বাজাতে গৃহস্থের বাড়ির সামনে এসে নীরবে দাঁড়ান এবং কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে অন্যত্র গমন করেন। বেলা বারোটোর পর যোগীরা সিঙ্গা

বাজিয়ে ভিক্ষা করেন।^{৫৪} এখন অবশ্য ‘যোগীভিক্ষা’ খুব একটা প্রচলিত নেই। তবে যোগীর গান প্রচলিত আছে। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে যোগীর গান পরিবেশন ও লেখা হয়ে থাকে। একদিকে বিভিন্ন নাথমঠে নাথসন্ন্যাসী যোগমহাত্ম্য বিষয়ক যোগীর গান রচনা করে সেগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুরারোপিত করে পরিবেশন করেন। ভক্তরা সেগুলো মুখে মুখে শোনেন এবং যোগী পরম্পরায় প্রচলিত থাকে। বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা সহ সারা ভারতেই এই ধারা আজও প্রচলিত আছে। কোনো কোনো ভক্ত সেগুলি লিখে গ্রন্থ আকারেও লিপিবদ্ধ করেন। আবার প্রচলিত ‘যোগীরগান’-গুলি বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে নাটকের আঙ্গিকে নাথপন্থের বাইরের মানুষেরা পরিবেশন করে থাকেন। কেউ কেউ যোগীর গানের কাহিনি গল্পের মতো মুখে মুখে পরিবেশন করেন। ড. রঞ্জিত দে লোকসংগীতকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

১. আনুষ্ঠানিক সংগীত
২. ব্যবহারিক সংগীত
৩. প্রেম সংগীত
৪. বারমাস্যা
৫. শ্রম সংগীত
৬. ধর্ম সংগীত (তত্ত্ব সংগীত ও ভক্তি সংগীত)
৭. কীর্তন
৮. কবি সংগীত
৯. নৃত্য সংগীত
১০. শোক সংগীত^{৫৫}

উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে যোগীরগানকে ধর্মসংগীত (তত্ত্বসংগীত ও ভক্তিসংগীত) পর্যায়ে ফেলা যায় হয়ত। কিন্তু যোগীরগানকে আঞ্চলিক সংগীত বলা যাবে না। লোকসংগীতে

আঞ্চলিক জীবনই প্রধান বিষয় হলেও যোগীর গান সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে লোকসংগীত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। এখনো ভারতে ও বহির্ভারতে নাথযোগী সন্ন্যাসীরা যোগীরগান রচনা করে সুরারোপিত করে পরিবেশন করে চলেছেন। অনেকে মনে করেন নাথগীতিকা বা নাথসাহিত্যের দুটি রূপ একটি বিভিন্ন কবিদের রচিত লিখিত রূপ, দ্বিতীয়টি লোককবিদের মুখে মুখে গাওয়া গীতিকা যা লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। নাথগীতিকার দুটি শাখা— মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতীর গান বা গোবিন্দচন্দ্রের গান বা গোপীচন্দ্রের গান।^{৫৬} কিন্তু এর বাইরে আজ অবধি নাথসাহিত্য সজীব এবং এর জীবন্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আদিনাথপন্থী যোগী রাজচরণনাথ, কৌলযোগী সৎপুরানন্দনাথ, গোরক্ষপন্থীযোগী আনন্দনাথ এবং নাথঅঘোরীধারার যোগসংগীতগুলি তার পরিচয় ও প্রমাণ বহন করছে। শিবযোগী তথা নাথযোগীর মূল বৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ের গান গেয়ে গুরুগিরি করা। ষোড়শ শতকের বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’, গোবিন্দদাসের পদাবলী তার প্রমাণ। যেমন শিবযোগী বিজয়লক্ষ্মণের ‘শিবের গীত’- ‘তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।’^{৫৭} এমনকি কাছাড়ের লোককথায় শুধু দেবগুরু আদিনাথ নয়, মানবগুরু আদিনাথকেও পাওয়া যাচ্ছে—

‘আদিনাথেরে আদিনাথ
আদিনাথে দিলা বর।
এই ঘর সুবন্ধির ঘর,
সুবইন ঘরে তুলছে মাটিই
ঘর আছে কুমার আটি’...^{৫৮}

আজও নাথসম্প্রদায়ের সমস্ত রীতিনীতি, সাধনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। তারফলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজানা থেকে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে

প্রত্যক্ষবাদের মানদণ্ডে গুরুবাদী এই আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে উপলব্ধি করা এককথায় অসম্ভবই বলা যায়। যোগদর্শন মূলত অন্তর্বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের সমীকরণবাহী সাধনমার্গ। তাছাড়া একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে অবনত বৌদ্ধযুগে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন-আজীবিক ইত্যাদি দর্শন মিলে গিয়েছিল এবং আদিনাথের পরে নবনাথধারায় এখন আধুনিক নাথপন্থ। একথাও সত্য যে নাথসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী যোগীরাই নাথপন্থকে সজীব ও জীবন্ত ধারা হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন। এসব বিষয়ের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যোগীর গানকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি—

- মাধুকরী গান বা ব্রহ্মসংগীত,
- সাধনতত্ত্ব বা যোগতত্ত্ব বা গুরুব্রত যোগসঙ্গীত,
- নাটগীতিমূলক যোগীর গান, এবং
- বন্দনামূলক বা আখ্যানমূলক যোগীর গান।

১. মাধুকরী গান ও ব্রহ্মসংগীত:

মাধুকরী ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে যোগীর গানগুলিতে রূপকের সাহায্যে দেহসাধনা বা কায়া সাধনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন রাগ-রাগিনী, ছন্দ, তাল সহযোগে পরিবেশিত জ্ঞানমূলক সঙ্গীত এই ধরনের গানগুলি। গানের বাহ্যিক সৌন্দর্য অতিক্রম করে ভেতরের জ্ঞানময় সত্তাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন একজন যোগীপুরুষ। গৃহস্থ-যোগী, সন্ন্যাসীযোগীগণ একসময় এই ধরনের গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আব্দুল হালিম প্রামাণিক মনে করেন যে যোগীসম্প্রদায়ের এই আচার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি বিদ্যমান। বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের যোগীরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অন্যান্য পেশায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ গান গেয়ে ভিক্ষা করত এই ইতিহাসে এখনো তারা গৌরবান্বিত বোধ

করেন।^{৫৯} মাধুকরী ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে যোগীরগান হল যথাক্রমে- রাজচরণ নাথযোগী রচিত যোগীর গান, কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ রচিত যোগীর গান, যোগী আনন্দনাথ রচিত যোগীর গান, নাথ-অঘোরী ধারার যোগীরগান বা যোগসংগীত ইত্যাদি।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও তাঁদের অনুসারীদের যোগদর্শন এবং পদ্ধতি নাথ সম্প্রদায়ের লোক-মহাকাব্য বোঝার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক নয়। রূপকধর্মী যোগীর গান বা নাথগাথায় প্রকৃতপক্ষে কিছু রহস্যময় বার্তা থাকতে পারে। গ্রামীণ এলাকায় মানুষ নাথপন্থের সঙ্গে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে জড়িত হওয়ার কারণ শুধু যোগধারার কারণে নয়, বরং নির্গুণ ভক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কারণে। নির্গুণ ভক্তি গ্রামের মানুষের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়টিকে প্রচার করেন নাথ সম্প্রদায়।^{৬০} মাধুকরী গান ও ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে নাথপন্থের যোগীগণ সাধারণ মানুষকে নিবৃত্তি মার্গেও অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণত ভোরবেলায় উঠে গৃহস্থ যোগীরাও নির্দিষ্ট সুরে গান করেন তার অর্থজ্ঞান সকলের কাছে বোধগম্য না হলেও মানুষ সুরে বিমোহিত হন। বৈরাগ্যসাধন মূলক যোগীরগানগুলি নাগরিকজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিনোদনের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন সঙ্গীতের রস আনন্দন করে গ্রামের মানুষের অন্তঃকরণে একদা বৈরাগ্যের সঞ্চার হত। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে ছাড়া নাথসম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগীর গান গাইতে দেখা যায় না। তবে সন্ন্যাসী নাথযোগীরা নিয়মিত নির্গুণ ভক্তি-সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত চর্চা করেন, লেখেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সেই সঙ্গীতের রস-ভাব আনন্দন করে সাধারণ মানুষ যোগ পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হন।

ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, জেলা উত্তর-ত্রিপুরা পুষ্করনাথ যোগমঠ থেকে শিবযোগী আদিনাথপন্থী যোগী রাজচরণ নাথ রচিত বেশ কয়েকটি যোগীর গানের সংকলন পাওয়া গিয়েছে। যোগাচার্য রাজচরণ নাথের ‘লোকসঙ্গীত’ নামের যোগীর গানগুলি রূপকধর্মী গান। এই যোগীর গানগুলি মাধুকরী গান ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ে যোগীর গান। যোগী রাজচরণ নাথ অসমের যোগী পুষ্করনাথের শিষ্য যোগী হীরানাথের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি গুরুনির্দেশে অসম, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে নাথপন্থের দর্শন ও যোগপ্রণালী প্রচারের কাজ করেছেন। কলকাতায় ‘আসামবঙ্গ যোগী সম্মিলনী’-র মুখপত্র ‘যোগিস্থা’ পত্রিকাতে তাঁর বেশ কয়েকটি যোগীর গান প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা এই গানগুলি পাঠ করে দাদাগুরু যোগী পুষ্করনাথ ভীষণ প্রশংসা করেছিলেন। যোগী রাজচরণ নাথ বহু যোগীর গান রচনা করেছেন। এই গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘লোকসঙ্গীত’, ‘গুরুব্রত যোগসংগীত’, ‘পদাবলী কীর্তন’, ‘কীর্তন’, ‘গীতার ধর্ম’, ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’ ইত্যাদি। যোগী রাজচরণ নাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও নাথমঠ ও সংস্কৃতির শিক্ষায় অগ্রগণ্য যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর শিষ্য যোগী সূর্যোদয় নাথ (যোগদীক্ষার নাম, পূর্বাশ্রমে রমেশ নাথ ভৌমিক) জানিয়েছেন যোগীর গানে তাঁর অনুভূতির গভীরতা, ভাবতন্ময়তা, শব্দচয়নের দক্ষতা এবং অনায়াস গায়নভঙ্গী শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। ব্রহ্মবিদ্যার সাংকেতিক ভাষায় রূপক ব্যবহার তাঁর লেখা গানগুলির বিশেষত্ব। যোগী সূর্যোদয় নাথের সহযোগিতায় যোগী রাজচরণ নাথের গানগুলি পাওয়া গিয়েছে। আদিনাথ পন্থের এই নাথযোগী সন্ন্যাসী যোগী রাজচরণ নাথ ১২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরার পুষ্করনাথ যোগমঠে সমাধি গ্রহণ করে হিমালয়বাসী হন।

যোগী রাজচরণনাথের যোগীরগানের টেক্সট: (সংগৃহীত অংশ)

(১)

ধু:, -- বন্দি মূলাধারেতে, নিদ্রিতা গাঙ্গিনী গো, সাড়েতিন প্যাঁচে অচেতন।
 চি:-- সাড়েতিন প্যাঁচে অচেতন, গাঙ্গিনী গো, সাড়েতিন প্যাঁচে অচেতন।
 জাগো মা পদে লই শরণ, গুরুদত্তে বাঁধা মন গো।
 (এগো) প্রেম সুধা কর বরিষণ।। গাঙ্গিনী গো...
 হংসই তোমার বাহন হংসঃ পৃষ্ঠেই আরোহন গো।
 (এগো) স্বরোদয় উর্দ্ধাধঃ গমন।। গাঙ্গিনী গো
 শ্বাস প্রশ্বাস স্বরোদয় কালে, তোমার বাহন হংসঃ চলে গো
 (এগো) বাহন সহিতেই বন্দন।। গাঙ্গিনী গো সাড়েতিন...
 ভুজঙ্গিনী রূপ ধরে, আছ তুমি মূলাধারে গো।
 (এগো) যোগ সু-কৌশলেই চেতন।। গাঙ্গিনী গো
 নমো নমঃ গাঙ্গিনী, নমঃ জলধ বরণী গো।
 (এগো) গাঙ্গিনীতে বিলীন রাজচরণ।। গাঙ্গিনী গো...

গানের নির্দিষ্ট আঙ্গিকে যোগী রাজচরণ নাথ যোগীর গানটি রচনা করেছেন। গানটির প্রথম পঙ্ক্তিতে ধ্রুবপদ অর্থাৎ ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে। গানের যে পদ দোহাররা বার বার গায় সেগুলিকে ধ্রুবপদ বলে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি ‘চি’ অর্থাৎ চিতান, যে পঙ্ক্তিটি উচ্চস্বরে ওপরের দিকের স্কেলে গাওয়া হয়ে থাকে সেই পঙ্ক্তিকে চি অর্থাৎ চিতান বলে। যোগী রাজচরণ নাথ সব গানেই এই আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। লোকগান থেকে এই বিশিষ্ট আঙ্গিক এসেছে, না ধ্রুপদী সঙ্গীত থেকে এসেছে তা বলা মুশকিল। তবে লোকসমাজ থেকে তৈরি হয়ে কোনো বিষয় শেষপর্যন্ত চিরন্তন ও ধ্রুপদী রূপ লাভ করে তা বলা যেতে পারে। গানটিতে নাথপন্থের কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ থেকে শুরু করে চক্রভেদ, বায়ুতত্ত্ব বা পবনবিজয়, হংসসাধন বা

‘অজপা গায়ত্রী’-র প্রসঙ্গ রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ হঠযোগীর মত রাজচরণনাথও বলেছেন যে মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে না পারলে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কোনটাই মুক্তির উপায়ে পরিণত হবে না। তারফলে কর্ম ইত্যাদি সিদ্ধিদায়ক হয় না। কুণ্ডলিনীর ঘুম ভাঙিয়ে আত্মা বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভব হয়। সাপের মত কুণ্ডলিনী সাড়ে-তিন হাত পরিমাণের মূলাধার স্থান জড়িয়ে আছে। অলখ নিরঞ্জন পরমশিব মানুষের ভেতরে থাকেন। শরীরে জ্ঞানস্বরূপ গুরু অনাদি শিবের অধিষ্ঠান। শরীরে স্থিত আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। ইড়া-পিঙ্গলার সংযোগস্থলে গাঙ্গিনী বাস করেন। অন্যদিকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিব অবস্থান করেন। যোগের সাহায্যে সহস্রাতে গাঙ্গিনী রূপ শক্তি ও পরমশিবের মিলন হলে সিদ্ধযোগী মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। এভাবে যোগী রাজচরণ নাথও গাঙ্গিনী রূপ শক্তি ও পরমশিবের মিলন ঘটিয়ে সামরস্য লাভ করতে চাইছেন।

(২)

ধু:--তোরা ঐ শুন গো, মিলনতীর্থ ক্ষেত্রে বাঁশীর রব শুন গো।

চি:--রব শুন,রব শুন, রব শুন গো।। মিলনতীর্থ...

বাজে বাঁশি একই সুতানে, প্রবাহময় প্রতিধ্বনি শুন গো কর্ণে।

গাঙ্গিনীতে যাওয়ার জন্য, কর্ণে বাজে গো।। মিলনতীর্থ...

বাঁশির শ্রীনাদময় ধ্বনি, রং বিরং এ অবিরাম শুন।

বিয়াল্লিশ বাদ্যধ্বনি, গগন ছাইল গো।। মিলনতীর্থ....

গৃহকাজে ব্যস্ত হই যখন, সমস্বয় শব্দ স্পর্শে উদাসী হয় মন।

বলে নাথযোগী রাজচরণ, শুনতে থাক গো।। মিলনতীর্থ...

শক্তি শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে অখণ্ড শিবস্বরূপে একাত্মভাবে অবস্থান করে। গাঙ্গিনী রূপ শক্তি রূপ থেকে নাদ উৎপন্ন হয় এবং নাদ থেকে বিন্দু সৃষ্টি হয়। নাদ বর্ণময় না হলেও

বিন্দুর বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। ষট্চক্রের বিভিন্ন দল থেকে বর্ণের উৎপত্তি ঘটে। বাস্তবে এসব বর্ণ ঠিক ঠিক বর্ণ নয়, এরা আসলে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রকাশ করে। এই বর্ণগুলিতে নাদ এবং জ্যোতিও রয়েছে। বাস্তবে ষট্চক্রের তত্ত্বগুলো সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়গোচর তত্ত্বগুলো স্থূল। কুণ্ডলিনী শক্তির ভাব প্রকাশ বা মিলনের ফলেই জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়। তাই রাজচরণ নাথ-যোগীও মনের নিরোধ ঘটিয়ে মহানাদে মিলন মুক্তির স্তরে পৌঁছে চিন্ময় সত্ত্বাতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। গানটি ভাবনার গভীরতা ও ভাব তন্ময়তায় রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সিদ্ধ বা সাধারণ মানুষ সকল চরাচরের সঙ্গে এক হয়ে বিশ্বের সব সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে সাধনা করেন, তখন গোটা জীবনটায় এক অখণ্ড মিলনতীর্থ হয়ে ওঠে। সংসার ও ধর্ম এক হয়ে যায়। সাধনা ও জীবনযাত্রার মধ্যে তখন আর পার্থক্য বা বিচ্ছেদ থাকে না। বরং সাধনা ও জীবনযাত্রা আলাদা হয়ে গেলে মিলনতীর্থ থাকে না। তাই রাজচরণনাথ যোগী গুরু ও পরমেশ্বরকে নিয়ে এক পরিবারে মিলনের ডাক দিয়ে যান।

(৩)

ধু:...(তোরা) আয় সঙ্গিনী, সব গাঙ্গিনী চল যাই জল ভরিতে।
 চি:... গাঙ্গিনী কুণ্ডের ঘাটে, গাঙ্গিনী দর্শনেতে।। আয় সঙ্গিনী...
 স্বর্ণকুণ্ডের নয়টি ছিদ্র,কৌশলে কর বন্ধ।
 প্রাণায়ামকালে জন্ম, প্রাণবায়ু গাঙ্গিনীতে।। আয় সঙ্গিনী...
 গাঙ্গিনী কুণ্ডের জল যথা ত্রি-সঙ্গমস্থল।
 সিদ্ধনে অঙ্গ সু-নির্মল, যোগীর যোগ ধ্যানেতে।। আয় সঙ্গিনী...
 গাঙ্গিনী কুণ্ডের মাহাত্ম্য, স্নানেতে অমরত্ব।
 রাজচরণ নাথ যোগী নিত্য, স্নান করে সে জলেতে।। আয় সঙ্গিনী...

বাংলার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে জনপদ ধর্মের মর্মকথা গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে। গোরক্ষবিজয়ের ভাবের মিলের সঙ্গে রাগ রাগিনীর মিলও লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভাষার অনুসৃতি ঘটেছে। নাথপন্থের যোগে গঙ্গায়মুনা মিলে একটি সংহত রূপ লাভ করেছে। সহজ সাধক বৈষ্ণবরাও কায়াসাধনাকে সাধনার পথ বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে মানুষের দেহে বিভিন্ন সরোবর বিদ্যমান। কায়াসাধনায় সিদ্ধ হলে সরোবর প্রকাশিত হয়। এই সরোবরে জ্ঞান করে মনোময় রাজ্য লাভ করা যায় এবং তা অতিক্রম করে মহাশূন্য ভেদ সম্ভব হয়। এভাবে গাঙ্গিনী সরোবরে দেহশুদ্ধি ঘটিয়ে তারপর প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে পরমসত্ত্বের অভিব্যক্তি হয় বলে নাথযোগীরা মনে করেন। রাজচরণ নাথযোগীর গানে অনুরূপ ভাবনার গভীরতা রয়েছে। রসসিদ্ধ ও নাথসিদ্ধদের এটাই সিদ্ধান্ত। এসব প্রাচীন ও আধুনিক নানা কাহিনি ও ঘটনা লোকগীতির আকারে ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়কে বহন করেছে।

(৪)

ধু:... চল যাই গাঙ্গিনী দরশনে গো গাঙ্গিনীতে।
 চি:...(ওগো) আয় প্রেমিকা, সব সাধিকা, ডাকছে সংকেত
 বাণীতে।।গাঙ্গিনীতে...
 ডাকে গো ঐরূপ টাইমে, মান করে সে অনিয়মে গো।
 (ওগো) টাইমে টাইমে ক্রমে ক্রমে উদয় হয় সাক্ষাতে।।গাঙ্গিনীতে...
 সকল গাঙ্গিনী মিলে, চলে যায় গাঙ্গিনীর জলে গো।
 (ওগো) রাজচরণ নাথ যোগী বলে নির্দিষ্ট নিয়মেতে।।গাঙ্গিনীতে...

(৫)

ধু:... নয়ন ভুলিয়া রইল, গাঙ্গিনী রূপে প্রাণ নিল গো নিল...।
 চি:... ও প্রাণ নিল গো নিল, ও প্রাণ নিল গো নিল।। নয়ন...

ঐ দেখ গো রূপের জ্যোতি, কোথা হতে আসিল
 (এগো) সহস্র অরুণ যেন একত্র হল।। ও প্রাণ নিল গো নিল...
 রূপ দেখা যায় রব শুনা যায় বিমান ধ্বনি বিমানময় হল।
 (এগো) তার মধ্যে কোথায় গাঙ্গিনী, লুকায়ে রইল।। ও প্রাণ...
 গাঙ্গিনীর স্বরূপ অঙ্গ, শ্রীরূপে ঢাকা পড়িল।
 (এগো) রাজচরণ নাথ যোগী বলে, ঢাকার পথ খুল।। ও প্রাণ নিল গো...

(৬)

ধু:—রূপ প্রবাহ নয়নে হেরিয়া।
 চি:...তার মধ্যে কল কল ধ্বনি শুনি,জগৎ জুড়িয়া গো রূপ নয়নে হেরিয়া।।
 রূপ প্রবাহ...
 ও নাদময়ীর রূপান্তর রূপে, তন্ময় হইয়া।
 শব্দাঙ্গ সঙ্গমে ছিলাম, প্রেমে, বিলীন হইয়া গো রূপ নয়নে হেরিয়া।। রূপ
 প্রবাহ...
 ও অঙ্গে অঙ্গে মিশা গো মিশি, জীবন যৌবন দিয়া।
 গাঙ্গিনীর নিন্দুক থাকে নিত্য, আড় নয়নে চাইয়া গো রূপ নয়নে হেরিয়া।।
 রূপ প্রবাহ..
 ও মন চলে না গৃহে গো যাইতাম গাঙ্গিনীকে থইসা।
 রাজচরণ নাথ যোগী বলে চল প্রাণটি বাঁধা দিয়া গো রূপ নয়নে হেরিয়া।।
 রূপ প্রবাহ...

(৭)

ধু:... চল গো গাঙ্গিনী সবাই, জল ভরা শেষ গৃহে যাই।
 চি:...এর বেশি হেরিবার কার্য নাই, চল গৃহে যাই।। চল গো...।
 গাঙ্গিনীর শ্রীঅঙ্গকান্তি শব্দময় রূপ যত ইতি।
 লক্ষ্যদৃষ্টে বাঁচার আসা নাই, চল গৃহে যাই।। চলগো...
 চাইতে চাইতে ধাক্কা লাগল, ইন্দ্রিয়াদি মূর্ছা হল।

মুহূর্তেই বাহ্যজ্ঞান নাই, চল গৃহে যাই ।। চলগো...
 রাজচরণ নাথ যোগী বলে, শুন গাঙ্গিনী সকলে ।
 নাদরূপা রূপধ্যান করা চাই, চল গৃহে যাই । চলগো...

(৮)

ধু:... (আমি) গিয়াছিলাম গাঙ্গিনীতে ।
 চি:... বিদ্যুৎ বলকরূপ, কি হেরিলাম অপরূপ, গৃহে
 আসতে না লয় গো চিতে ।। গিয়াছিলাম...
 সুর নদীর জল, রূপের ছটায় টলমল, সে আলোড়ন বাজল কর্ণমূলে
 ভুবন মোহ রূপের জ্যোতি, আলো করে বসুমতী,
 নয়ন বাঁধা সেই রূপেতে ।। গিয়াছিলাম...
 রূপের তুলনা, কি দেব উপমা, মিলেনা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ।
 রাজচরণ নাথ বলে, মন প্রাণ সাঁপিলে ঈশ্বর দর্শন জ্যোতির্ময় রূপেতে ।।
 গিয়াছিলাম...

(৯)

ধু:... রূপ দেখে প্রাণ চমকে ওঠে, আমার জানি কেমন ঘটে ।
 চি:... (ওগো) ঘটে কিনা ঘটে আমার গুরুজন বিবাদী বটে ।। আমার জানি...
 জল ভরিতে গিয়াছিলাম, গাঙ্গিনী কুণ্ডের তটে ।
 (ওগো) রূপ দেখে প্রাণ মূর্ছাগত, হিয়াতে প্রাণ চমকে উঠে ।। আমরা
 জানি... ।
 গাঙ্গিনী রূপের ছটাতে, পড়েছি অতি সংকটে ।
 অরুণ বরণ রূপের কিরণ বিদ্যুৎ যেমন, উঠল ফুটে ।। আমরা জানি...
 রূপ স্বরূপে মাখামাখি, গাঙ্গিনী কুণ্ডের ঘাটে ।
 রাজচরণ কয় আয় কে দেখবে, থাকিলে আমার নিকটে ।। আমার জানি...

(১০)

ধু:... আয় কে দেখবে আয় গো পূর্ণাঙ্গ গৌর অঙ্গ দেখতে যাই ।

চি:... দ্বাপরেতে দেহ ভেদে, রূপান্তর রূপ নাই গো।।
 পূর্ণাঙ্গ গৌর অঙ্গ দেখতে যাই।। আয়কে...
 সুর নদী মিলন তীর্থ ক্ষেত্রে দেখবে তাই।
 সরু নদী আলো করলো, গৌর রূপের শেষ নাই গো।।
 পূর্ণাঙ্গ গৌর অঙ্গ দেখতে যাই।। আয় কে দেখবে...
 হংসঃ রূপা দেহ ভেদ রূপদ্বয় অস্তিত্ব নাই।
 হংসঃ পৃষ্ঠে গৌর সুন্দর, উদয় দেখতে পাই গো।।
 পূর্ণাঙ্গ গৌর অঙ্গ দেখতে যাই।। আয় কে দেখবে...
 রাজচরণ নাথ যোগী বলে, রূপে রূপ মিশাই।
 গৌর রূপেতে বিলীন হলে, পুনঃ জন্ম নাই গো।।
 পূর্ণাঙ্গ গৌর অঙ্গ দেখতে যাই।। আয়কে দেখবে...

ঈশ্বর জগতের সাক্ষী স্বরূপ। তাঁর সান্নিধ্যে প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। নাথপন্থে পরমেশ্বর হলেন উমা সহায়, প্রশান্ত, নীলকণ্ঠ ও ত্রিলোচন। তিনি ব্রহ্ম, শিব, অক্ষর, পরম, বিষ্ণু, প্রাণ ও আত্মা। ‘গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

‘ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।’^{৬১}

তিনি আনন্দস্বরূপ নিত্য শক্তিমান পরমেশ্বর এবং জ্ঞানরূপে জ্ঞেয় বিষয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বগুণ সৃষ্টিকর্তা কিন্তু ‘নাথ’ সগুণ- নিগুণ, সাকার নিরাকারের অতীত। তার বাঁ অংশে নিগুণ ব্রহ্ম, ডান অংশে সগুণ ইচ্ছাশক্তি এবং মাঝখানে তিনি নিজেই বিরাজমান থাকেন। এই নাথস্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ, বিশ্বময় হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ। উপরোক্ত গানগুলিতে নাথপন্থের নাথস্বরূপের কথায় প্রকাশিত হয়েছে। নাথসিদ্ধদের সাধনে পঞ্চ-ব্যোমতত্ত্ব আছে তার পরিচয় রাজচরণ নাথ যোগীর গানে আছে। এছাড়া চিত্তচাক্ষুণ্যের নিবৃত্তি ঘটিয়ে সম্যক চিত্তবিশ্রান্তি এবং স্ব-স্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুত্থান দশা। এই নিরুত্থান অবস্থার উপলব্ধি হল নাথপন্থের

পরমপদে স্থিতি।^{৬২} এই অবস্থায় শূন্য থেকে শূন্যে পৌঁছানোর শেষ অবস্থা। একেই গোরক্ষনাথ অমনস্ক যোগ বলেছেন। শিবশক্তি সমরসতা, কায়াসাধনা, শূন্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগের প্রকাশে গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ভাব, ভাষার চমৎকারিত্বে, কখনভঙ্গীতে মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েও আধুনিককালের শ্রোতা পাঠকের মন জয় করে নিতে পেরেছে বলা যায়। নিগুণ-ভক্তি সংগীত হিসেবে যোগীর গানগুলির আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(১১)

ধু:—গৌররূপ আমার লাগিল অন্তরে গো
নয়নে চটকে টানে।
চি:—চটকে টানে গো প্রাণে চটকে টানে গো
নয়নে চটকে টানে।। গৌররূপ...
জলের ঘাটে গৌর অঙ্গ গাঙ্গিনী দরশনে।
জলের ঘাটে গেলে পরে, মান কুলমান টানে গো
নয়নে চটকে টানে।। গৌররূপ
কুল কলঙ্কিনী মন্দ বলে সর্ব্বজনে।
রাজচরণনাথ যোগী বলে, কাজ নাই কুল মানে গো
নয়নে চটকে টানে। গৌররূপ...

(১২)

ধু:—গৌর অঙ্গ গাঙ্গিনী রূপে প্রাণ নিল হরিয়া।
চি:—রূপ দেখিয়া গৃহে এলাম, শুধু দেহ লইয়া
আমার প্রাণটি বাঁধা দিয়া, সখী গো...গৌর
কুলনাশি গৌর গাঙ্গিনীরূপ, নয়নে হেরিয়া।
মান কুলমান জীবন যৌবন, সব দিলাম যাঁচিয়া,

নতুন কুলমান ত্যজিয়া, সখী গো ।। গৌর অঙ্গ...
 সে কুল প্রথা ব্রত পূজা সব দিলাম ছাড়িয়া ।
 গুরুজনে মন্দ বলে, মর্ম না জানিয়া
 থাকি চিত্তে ক্ষমা দিয়া, সখী গো ।। গৌর...
 রাজচরণনাথ যোগী বলে শুন মন দিয়া ।
 গৌর রূপ অঙ্গ সঙ্গম কর, সব কিছু ছাড়িয়া
 ধ্যানে আত্মস্থ হইয়া, সখী গো ।।... গৌর অঙ্গ...

(১৩)

ধু:—গৌরচাঁদ, চাঁদ জানি কেমন গো ঐ রূপ দেখলাম না ।
 চি:—চরণ পাব পাব, পাব বলে, আমার আশা পূর্ণ হল গো না ।
 ঐরূপ দেখলাম না ...
 (ও) গৌর প্রেমের প্রেমিকা গণে গৌরময় ধ্বনি
 কর্ণে শুনে, প্রাণ সই গো ।
 রাজচরণ নাথযোগী বলে শুনতে শুনতে হও উন্মনা ।।
 ঐরূপ দেখলাম...

(১৪)

ধু:—গাঙ্গিনী গৌর অঙ্গখানি, দেখলে নয়ন না ফিরে
 গাঙ্গিনী প্রেম কাঁটা বাজল অন্তরে ।
 চি:—কাঁটা বিধে রইল অসুখ হইল গো সই,যেন হৃদয়কমলে কল করে ।।
 গাঙ্গিনী প্রেম...
 গৌর জ্বালায় জ্বলে মরি, বল না কি উপায় করি ।
 (ওরে) অন্তরে অন্তর আত্মা গো সই
 মনপ্রাণ লয় হরণ করে ।। গাঙ্গিনী প্রেম...
 গাঙ্গিনী নাম সুধা মধু পান করে মহাসাধু ।
 (ওরে) রাজচরণ নাথ যোগী বলে গো সই

(যার) আকাশ তত্ত্ব ভেদ করে। গাঙ্গিনী প্রেম—

(১৫)

ধু: – (আমার) প্রাণ জানি কই আছে গো (আমার) প্রাণ জানি কই থাকে গো
ও বল গো আমারে।

চি:—(তারে) পাওয়ার জন্যে নিশি দিনে হংসঃ জপ অন্তরে গো।।

ও বল গো আমারে...

(আর) প্রাণ অপানের আসা যাওয়ায়, মন লাগাই ধ্যান অবস্থায় গো।

প্রাণ বায়ুতে চঞ্চল থাকায় পাইনা বুঝি তারে গো।

ও বল গো আমারে...

রাজচরণ নাথ যোগী বলে, প্রাণ বায়ুকে স্থির করিলে গো।

(তখন) প্রাণের বাঁশী, আয় আয় বলে, ডাকে উচ্চ স্বরে গো।

ও বল গো আমারে...

(১৬)

ধু:—তোরা শুনগো গাঙ্গিনী, সুখের নিশি অবসান, থাকি একাকিনী।

চি:—(ওগো) ঐ বুঝি আসবে প্রাণনাথ, ধ্যানে যায় রজনী।

তোরা শুনগো...

সাজায়ে বাসর শয্যা ধ্যানে উন্মাদনী।

ইন্দ্রিয় নাশ চিত্ত সংযম, কালরূপ বাঘিনী।। তোরা...

এভাবে বাসর সাজিয়ে, নাথের কাঙ্গালিনী।

তন্দ্রাচ্ছন্ন তন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, কুঞ্জমণি।। তোরা...

রাজচরণ নাথ যোগী বলে আমি বিরহিনী।

তোমরা সবে জিজ্ঞাসিস কোন দোষের দোষিনী।। তোরা...

(১৭)

ধু:—তন্দ্রার কুঞ্জে গাঙ্গিনীদ্বয়, প্রাণনাথ উদ্দেশে যায়।

চি:—লক্ষ্য ধ্যানে চেয়ে দেখে, তন্দ্রার কোলে নিদ্রা যায়।

তন্দ্রার কুঞ্জে...
তন্দ্রাচ্ছন্ন নিদ্রামগ্ন, হেলে দোলে পড়ে যায়।
এভাবেই সুখের নিশি, এয় গাঙ্গিনী কাল কাটায়
তন্দ্রার কুঞ্জে...
রাজচরণ নাথ যোগী বলে, স্বয়ং গাঙ্গিনীর তাড়নায়।
ভয়ে ভীত তন্দ্রাবতী, গাঙ্গিনীর নাথ চলে যায়
তন্দ্রার কুঞ্জে...

(১৮)

ধু:—তুমি আমার হও চির সঙ্গিনী, মান ছাড় গাঙ্গিনী।
তন্দ্রাবতীর সঙ্গে প্রেমপাশা খেলিছ রঙ্গে।
মন রাখিতে এসেছ এখনি মান ছাড়
তন্দ্রা আচ্ছন্ন প্রেমে অবশ্য ছিলাম ঘুমে।
প্রেম রতি ভোগ কিছুই করিনি।। মান ছাড়...
রাজচরণনাথ যোগী বলে, তন্দ্রাবতীর চালে।
অসন্তুষ্ট মানময়ী গাঙ্গিনী।। মান ছাড়...

(১৯)

ধু:—তোরা আয়কে দেখবে গো, আত্মারামেশ্বর গাঙ্গিনী
মিলিল গো।
অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি বদনে বদন
কেবা আত্মা কে গাঙ্গিনী, শুধুই স্পন্দন।
তোরা আয় কে দেখবে...
সুরতি রমন রসে সঙ্গম সাধন।
এই মিলনে জীবনুজ, বলে রাজচরণ।।
তোরা আয় কে দেখবে...

(২০)

ধু:—এস হে ঈশ্বর, আত্মা, হৃদয়ও মাঝারে।

চি:—তোমার মনমাতানো, তন্ময় মূর্তি

হেরব দুই নয়ন ভরে।।

(তুমি) চৈতন্য আত্মা, যার নাই উপমা।

(তুমি) সার্বভৌম, পরমাত্মা সব জীবেরই অন্তরে।।

স্ব-যোগ ধর্মেতে, প্রাণ অপানেতে।

ওরে দু'অঙ্গে এক অঙ্গ হয়ে স্থিরাত্মা মূলাধারে।।

(তুমি) চৈতন্য আমি, সহস্রার গামী।

(ওরে) শান্ত মূর্তি, প্রণমামি, নয়ন মুদে ধ্যান করে।।

(২১)

ধু:—একে ঘোর কলিকাল, পাপাচ্ছন্ন, যোগ ভিন্ন

(জীবের) অন্য গতি নাই।

চি:—অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।। যোগ ভিন্ন...

সেজন্য গীতায় অর্জুনেরে, সু-পবিত্র যোগ করারই তরে,

যোগী হও, বলেন বলেন বারে বারে।

(যোগে) পাপসিন্ধু পার, ভব তরিবার, এমন ধর্মের

তুলনা নাই,।। যোগ ভিন্ন...

তখন হতে এখন পর্যন্ত পাপে পাপ বৃদ্ধি, পাপেই গ্রস্ত,

ভ্রান্ত কলির জীব একান্ত।।

(ওরে) সে পাপ হতে ত্রাণ, মুক্তির সোপান,

যোগ ধর্মেতে মোক্ষ পাই।। যোগ ভিন্ন...অন্তরা:

ধু:—আয় ভাই হয়ে যা পরম পবিত্রেরে, আয় ভাই

হয়ে যা পরম পবিত্র।

চি:—সর্ব ধর্ম ত্যাগ করি, কেবল যোগে যুক্ত।।

জয় জয় প্রাণ অপান, জয় জয় হংসঃ,

জয় জয় শব্দ ব্রহ্ম, জয় শব্দাতীত ॥

জয় যোগাশ্রয়বাসী, জয় গুরু মহন্ত ॥

(২২)

ধু:—(মিছে) দিনের প্রতি দিন তো বয়ে গেল, মনরে একবার হংসঃ নাম বল ।

চি:—(মনরে) শমন দমন, ঐ হংসঃ নাম, বদন ভরে বল ॥

(আর) গুরু দিলা মহামন্ত্র, পুনরায় তা বল ।

(ওরে) আসা যাওয়ার অজপা জপ, লক্ষ্যে লক্ষ্যে কর ।

(আর) স্থির আত্মা চৈতন্য বিনে, কে তরাবে বল ।

(মনরে) হংসঃ নামে সাইর গেয়ে, আপন দেশে চল ॥

(২৩)

ধু:—হংসঃ নাম জপ মহামন্ত্র, মাতৃগর্ভে হয়েছি প্রাপ্ত ।

চি:—(ওরে) সেই হংসঃ জীবের স্বধর্ম, একশত হাজার ছয়শত ॥

শ্রীচৈতন্যের হংসঃ নাম, হংসে প্রযুক্ত ছিলাম,

সপ্তমাসে নামের গুণে চৈতন্য পেলাম,

(ওরে) জন্মের মত হারাইলাম, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ॥

ঐ নাম ভব তরিবার, শ্বাস উঠা ও পড়ার,

সংগুরুতে দীক্ষা নিয়ে যুক্ত হও আবার ।

(ওরে) নামব্রক্ষে হলে একাকার, প্রেত আত্মা হবে যুক্ত ॥

(২৪)

ধু:—মন ওরে মন চল যাই মিলন তীর্থে

চি:—(ওরে) চৈতন্যাত্মা, শান্ত মূর্তি, আয় কে দেখবে ।

আয় দেখতে ॥

চৈতন্যাত্মার নাম সংকীর্তন, গগন ছাইল ধ্বনিতে ॥

শমন দমন, ত্রিতাপ হরণ, নামধ্বনি শ্রবণেতে ॥

(২৫)

ধু:—মিছা মায়ার খেলা ছাড় ভাই,
এসো মোরা সে খেলা খেলাই।
চি:—(ভাইরে) সে খেলা খেলিলে জীবের
আর তো জন্ম মৃত্যু নাই।।
হরণ আকর্ষণ রূপেতে উঠা পড়ায় মন লাগাই।।
মিলনতীর্থে শান্ত আত্মায়, স্বরূপ রূপদ্বয় মিশাই।।

(২৬)

ধু:—নাম নিয়ে প্রাণ কাঁদে না কেন, ওরে পাগল মন।
চি:—ঐ হংসঃ নাম শমন দমন, ভবজ্বালা হয় বারণ।।
মন তোর দেহঘর খাঁড়া, ঐ নাম প্রাণ অপান দ্বারা।
উভয়ে মিলান যারা, নামব্রক্ষে বিলীন হন।
নামব্রক্ষ সাধনায়, শব্দ ব্রক্ষা হওয়া যায়।
নাথনিরঞ্জন পরমাত্মা উন্নীত হন।।

(২৭)

ধু:—গণার দিন হয় অবসান, পুষ্কর দত্ত নাম কর গান।
চি:—(ওরে) মদনে মোহন নন, পুষ্কর, চৈতন্যাত্মা ভগবান।।
ঐ নামের কি মহিমা, তার গুণের নাই সীমা,
ভস্ম হয় মদনমোহন, সেই দুরাত্মা।
তখনেই চঞ্চলাত্মা, মদনমোহন (রূপ) অবসান।।
ঐ নাম জপগান যখন, ধ্যানে আত্মস্থ তখন,
গগনভেদী নামের ধ্বনি করহে শ্রবণ।
অজপা এই হংসঃ নাম, গানে নাই দাসত্বের স্থান।।

(২৮)

ধু:—হংসঃ নামে কর সংকীর্তন মানব জনম সার্থক কর মন।

চি:—হংসঃ নামে কর সংকীর্তন ।।

(মনরে) কোটি জন্ম সাধন করে, এসেছিলেন এ সংসারে
ভজবে বলে শ্রীগুরুর চরণ ।

(মনরে) মহামায়ায় বদ্ধ হয়ে, হারালে অমূল্য ধন ।।

দগুহাতে শমন দূতে, যখন বাড়ি মারবে মাথে,
তখন মন তোর হবে রে চেতন ।

(ওরে) হংসঃ নাম জপ গানেতে শমন হবে নিবারণ ।।

(২৯)

ধু:—পুষ্করনাথের দেওয়া লোট, সদগুরুগণে বিলায় ।

চি:—সদগুরুগণে বিলায় লোট, সদগুরুগণে বিলায় ।।

লোট দিয়েছেন অজপা নাম, হংস জপ কর অবিরাম ।

(ওরে) ব্রহ্মানন্দে হয়ে আরাম, সে নামের মহিমায় ।

অজপা নামেতে মিঠা, যারা পেয়েছে কিছুটা ।

(ওরে) অন্য মিঠায় নহে নিষ্ঠা, চিত্ত সংযম সাধনায় ।।

(৩০)

ধু:—রাজচরণনাথ দিছেন লোট, পুষ্করনাথ-ধাম পুরে ।

চি:—পুষ্করনাথধাম পুরে লোট, প্রতি ঘরে ঘরে ।।

হংসঃ নামে লোট দিয়েছেন ত্রিতাপ তরিবারে ।

(ওরে) ধরনেও ধরনেও, ডাকেন উচ্চস্বরে ।।

কেউ পেল কেউ পেল না লোট, কেহ আপশোষ করে ।

(ওরে) যোগেযুক্ত আবাল বৃদ্ধ, নিতেছে লোট কোচ ভরে ।।

যোগী রাজচরণনাথ লুপ্তপ্রায় নাথসংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সামাজিকতা প্রকাশের জন্য
‘গুরুব্রত যোগসঙ্গীত’ নামে আরও বেশ কিছু যোগীর গান রচনা করেন । এই সঙ্গীতগুলিকে
একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করেন যোগী লালমোহন নাথ । যোগ সঙ্গীতের প্রতি সাধারণ মানুষের

আগ্রহ ও নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রচারে, প্রকাশে গানগুলির আবেদন উল্লেখযোগ্য। এই যোগসঙ্গীতগুলিতে নাথ-নিরঞ্জন তত্ত্ব, হংস বা প্রণব সাধনা, নাথ শিবশক্তিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবনমুক্তিবাদ, পবন স্বরোদয় সাধনা, যোগের বিভিন্ন পর্যায়, তিননাথের লীলা, যোগসাধনায় গুরুর ভূমিকা, ইন্দ্রিয় সাধনা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, মন-পবন, যোগাঙ্গ, নিক্কাম কর্মতত্ত্ব, যোগের অনুশঙ্গে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব নির্দেশিত হয়েছে। নাথযোগী ধর্মতত্ত্ব, সাধনদর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে কৌতূহলী মানুষের কাছে যোগীগানগুলি বিশেষভাবে সহায়ক বলা যেতে পারে। তাছাড়া গানগুলিতে ধুয়া ও পদ সহ বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। নাথ ধর্মসভায় রাগ-রাগিনীসহ ভক্তিভরে এই গানগুলি গীত হয়। বাংলা গীতিকাব্যের আবীলতায় গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এখনও নাথদর্শন ও সাধনার যৌগিকধারা বাংলায় জীবন্ত তারই নিদর্শন বহন করছে এই ভজন গানগুলি। যোগী রাজচরণনাথের ‘শ্রীশ্রীগুরুব্রত যোগসঙ্গীত’ নামে যোগীর গানগুলি যোগ-পরম্পরায় আগ্রহী মানুষের কাছে এক অমূল্য সম্পদ বিশেষ। গুরুবন্দনা করে নাথনিরঞ্জনের আশীর্বাদপ্রাপ্ত যোগী রাজচরণনাথ নাথসিদ্ধদের ধর্মতত্ত্ব দর্শন নির্গুণ সাধনসঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন।

গুরুব্রত যোগসঙ্গীতের টেক্সট: (সংগৃহীত অংশ)

(১)

প্রথমে বন্দনা করি নাথনিরঞ্জন,
নাথনিরঞ্জন পরমাত্মা অব্যক্ত যে হন।
যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
বিশ্বাদি ব্রহ্মাণ্ড রূপে স্বরূপ আচ্ছাদন।
সেই স্বরূপ অব্যক্ত শব্দ রূপে ব্যক্ত হন;

জীবন শক্তি শব্দময়ী জীবনের জীবন।
 শব্দ ব্রহ্ম প্রণব জায়তে হংসঃ হন,
 হংসঃ পৃষ্ঠে শব্দব্রহ্ম বিশ্বরূপ ধারণ।
 যোগ কর্মে সুকৌশলে মুক্ত যোগীগণ,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে ভবরাধ্য ধন।

(২)

শ্রীশ্রীগুরুজী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎস কি।
 এই ব্রহ্মাণ্ড কি বিচিত্র, জানতে চাই তার সৃষ্টিতত্ত্ব,
 কোন্ শক্তিতে কাঁর ইচ্ছায় সৃজন।
 আকাশাদি বহুধরা, কেমনে উৎপত্তি তারা,
 দেবতা কিভাবে সৃষ্টি হন।
 প্রাণী জগৎ কাকে বলে, উৎপন্ন কোন শক্তির বলে,
 সেই শক্তি কি জীবের ভগবান।
 রাজচরণনাথ যোগী বলে, বিশ্বপতি কাকে বলে,
 কিভাবে হলেন বর্তমান।

(৩)

চেতন স্বরূপ পরমাত্মা নাথনিরঞ্জন,
 সৎ চিৎ আনন্দ মূর্তি রূপে ব্যক্ত হন।
 বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎস তিনিই তো হন।
 অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হন।
 কেবলমাত্র নাথনিরঞ্জন ছিলেন সর্বাদিতে
 কারণ সূক্ষ্ম স্থূল হয় তাঁর ইচ্ছাতে।
 সেই ইচ্ছায় পরমা প্রকৃতি নামে খ্যাত,
 পরমা প্রকৃতি শব্দ-রূপে হন ব্যক্ত।
 সেই শব্দময় অবস্থায় আকাশতত্ত্ব কয়,

শব্দময় আলোড়ন গর্ভে বায়ু তত্ত্বোদয় ।
বায়ুর তরঙ্গ গর্ভে তেজের সৃজন,
জলতত্ত্ব তেজের গর্ভে আবির্ভূত হন ।
জলতত্ত্ব গর্ভে পৃথিবী-ভাসে সেই জলে,
পৃথিবীতে জীব রাজচরণনাথ যোগী কন চলে ।

(৪)

নাথনিরঞ্জন নিজেই তো আবির্ভূত হন ।
মহাশূন্যময় গর্ভে জন্ম নেন একা নভ ভবে,
বিস্তর দেহ অতি সুগঠন ।
অব্যক্তের বিবর্তন মূর্তি শব্দময় রূপ যত ইতি
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুশোভন ।
পঞ্চমাথা রূপে ব্যক্ত দেখতে অপরূপ অদ্ভুত,
সেকারণে নাম পঞ্চগনন ।
মহেশ্বরের জন্ম ধন্য, প্রদর্শনে মহাপুণ্য
রাজচরণনাথ যোগীর সুদর্শন ।

(৫)

মহেশ্বর দুর্লভ জন্ম কেহ নাহি জানে,
সকলের আদিতো জন্ম তাই তো না জানে ।
দেবতা বঞ্চিত সবাই মহেশ দর্শনে,
একমাত্র মানুষই দেখে কোন কোন জনে ।
জন্মিয়া অনন্তকাল থাকেন গোপনে,
রাজচরণনাথ যোগী বলে জানে যোগীগণে ।

(৬)

যোগী করে মহেশ্বর দর্শন । যোগী করে-
যে তত্ত্বে ভগবান ব্যক্ত, যোগীরাই জানে মাত্র,

তত্ত্বদর্শী যোগ বিজ্ঞানী হন।
 ভজন যোগ্য দেহ ছাড়া মহেশ্বর দর্শন করা,
 অবশ্যই সম্ভব নয় কখন।
 দেবতাদের নাহি দেহ, ভজনার অঙ্গসমূহ
 মহেশ ভক্তি শুন সে কারণ।
 মানব হয়ে জন্ম নিলে ভজন যোগ্য দেহ মিলে,
 জন্ম সার্থক করলে যোগসাধন।
 স্বরোদয় ভজনাঙ্গে সাধন ভজন যোগমার্গে
 মহেশ্বর শিব লাভ তখন।
 যোগস্থ মহেশ্বর ভজন মোক্ষপ্রাপ্তি বন্ধন মোচন,
 রাজচরণনাথ যোগীর যোগে মন।

(৭)

যোগেশ্বরীর যোগধ্যান কঠোর সাধনা
 মহেশ্বরকে পুত্ররূপে পাওয়ার বাসনা।
 যোগেশ্বরী গাঙ্গিনী গর্ভবতী হন
 সাড়ে তিন প্যাঁচেতে যোগনিদ্রায় অচেতন।
 নিদ্রাতে জন্মেন শিশু গাঙ্গিনী না জানে,
 অন্তরস্থ যাতায়াত হংসঃ বাহনে।
 জন্মিয়া মহেশ-শিব মাতৃহারা হন
 আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির আশ্রয়ে পালন।
 এইভাবে জীবাত্মা শিব প্রতি ঘটে রন
 রাজচরণনাথ যোগী ভবরাধ্য ধন।

(৮)

জীবাত্মাই মহেশ্বর,
 জন্ম ত্রয় ত্রিভঙ্গ রূপ শেষ রূপান্তর।

একে তিন, তিনে এক বিচিত্র সুন্দর,
 লীলার কারণে স্থান ভেদে রূপান্তর।
 শব্দরূপে ভূতাত্মার প্রাণ নিজেই মহেশ্বর
 গাঙ্গিনী রূপেতে তিনি প্রাণীর প্রাণেশ্বর।
 অতএব ত্রিভঙ্গ রূপ দেহের ভিতর,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে নিত্যই গোচর।

(৯)

তিননাথের লীলাক্ষেত্র এদেহ মাঝারে
 যোগ সাধনে যোগীগণ দিব্যচক্ষু হেরে।
 লীলাকারী পরম ব্রহ্ম ত্রিভঙ্গ রূপ ধরে,
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপে স্বরূপ ঢাকা পড়ে।
 সে জন্য মহেশ অদৃশ্য কেহ পায় না তারে
 রাজচরণনাথ যোগী বলে তাই চোখের জল পড়ে।

(১০)

(ধর) ধর ধর ধর নাথকে ঢাকার পথ খুলে
 ঢাকার জন্য যায় না ধরা তাই তো অধর বলে।
 ধরতে গেলে যায় না ধরা ঢাকার বেড়াজালে
 এমতাবস্থায় পূজা কতই কৌতূহলে।
 পাব পাব পাব সদায়, আশা অন্তঃস্থলে,
 পাবে না কেউ অধর নাথকে বেড়াজাল থাকিলে।
 পথ খুল পথ খুল খুলার তালে তালে,
 তবেই নাথ দরশন রাজচরণনাথ যোগী বলে।

(১১)

গুরু পতিত পাবন—
 কহ শুনিহে দয়াল গুরু ঢাকার পথ কেমন।

যে পথ বন্ধ সবাই অন্ধ থাকিতে নয়ন,
সেই সে ঢাকার পর্দা কি দিয়ে গঠন।
মানুষের পরম শত্রু যদি তাহা হয়,
তাহার স্বরূপ তত্ত্ব বল মহোদয়।
চোখ ঢাকা বদল যথা পর্দায় চোখ বন্ধন,
রাজচরণনাথ যোগী বলে অজ্ঞানী তেমন।

(১২)

গর্ভস্থ সন্তান যথা দৃশ্য নয় কখন,
কেবল অনুভবে জ্ঞাত স্বরূপ লক্ষণ।
বুঝা যায় দেখা যায় না সে সন্তান কেমন,
গর্ভস্থ আবরণই হয় না দেখার কারণ।
তেমনি মত ত্রিভঙ্গ ভগবান আচ্ছাদন,
রাজচরণনাথ যোগী বলে তাইতো অদর্শন।

(১৩)

ভগবান আবৃত আছেন সকলের গোচরে,
আবৃত আবরণ তৈরি নানান অলঙ্কারে।
ত্রিভঙ্গ ঢাকার অলঙ্কার ঝল-মল ঝল-মল করে,
মনোময় অবস্থায় প্রথম আবরণ পরে।
চাঞ্চল্য বশত বলে কেহ পায় না তারে,
রাজচরণনাথ যোগী বলে তাই ভগবান দূরে।

(১৪)

ভগবান পাওয়া যায় না যে কারণ—
প্রথমেই প্রতিবন্ধক কাল স্ব-মন।
কুমতির চক্রান্তরে,
ও বিরবী পাপ কর্মে মন যুক্ত রন।

আমার, আমার, বিষয় ভাবনা,
 কামভাব বিনে কিছুই যে আর ভাল লাগে না।
 কামভাব রাশির কামভাবনারে,
 ও বিষয়ী কাম ছাড়া থাকে না মন।
 চিত্ত জাত বিষয়ের সঙ্গে
 পরিবেশ দূষিত হয়রে ইন্দ্রিয়ের যোগে।
 (তখন) শীত, গ্রীষ্ম অনুভব করেরে,
 ও বিষয়ী রাজচরণনাথ যোগী কন।

(১৫)

বিষয়ের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়,
 ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখাদি বিষয় জ্ঞানোদয়।
 এই সব জ্ঞানই নিত্য জন্মে নিত্য মৃত্যু হয়,
 এই সব জ্ঞানই অনিত্য জ্ঞান উত্তম জ্ঞান হয়।
 এই সব জ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞানে সহ্য করতে হয়,
 এই সব জ্ঞানই ঈশ্বর পাওয়ার পরিপন্থী হয়।
 সে জন্যই এই সব জ্ঞানকে বর্জন করতে হয়,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে তাই মোক্ষ নিশ্চয়।

(১৬)

শুন বিষয়ীরে বিষয় চিন্তায় যুক্ত হয় যখন।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ, নিজ নিজ কাজে যুক্ত হন,
 (তখন) ইন্দ্রিয়ের পাছে ছুটে মন।
 তার ফলশ্রুতি বিষয়াক্ত, সর্বদা মন চঞ্চল গ্রন্থ,
 বিকার ময় অবস্থা তখন।
 এভাবে আবরণ তৈয়ার, পরিপন্থী ঈশ্বর পাওয়ার
 রাজচরণনাথ যোগীর সোচ্চার মন।

(১৭)

গুরু বল মোর কাছে—

মন কেন দৌড়ায় ইন্দ্রিয়ের পাছে পাছে।

চৌদ ভুবনের রাজা মন মহাশয়,

মনের অধীনে সবাই থাকে সব সময়।

ইন্দ্রিয়াদি প্রজাবৃন্দ আছে যত জন,

মনের নিয়ন্ত্রণে তারা থাকে সর্বক্ষণ।

তাইতো ইন্দ্রিয় বশ হয় মনের প্রভাবে,

রাজচরণনাথ যোগী বলে মন কেন দৌড়াবে।

(১৮)

(ওরে) জোর করে কর্ম করায়। (রে)

সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম, প্রকৃতির গুণজাত ধর্ম,

চিন্তে নিত্য কাম ভাব জন্মায়।

মন কভু নিষ্ক্রিয় নয়রে, জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে করে,

জোর করে প্রকৃতি করায়।

তাহাই চিন্তা-বৃত্তি-কর্ম, সবে জানে না তার মর্ম,

ইন্দ্রিয়ের স্বধর্ম হয়।

ইন্দ্রিয়ের ধর্ম যাহা, মানুষের অধর্ম তাহা,

পরধর্ম তাহাকেই কয়।

তাই তো প্রকৃতির গুণে মন কর্মের বন্ধনে,

কর্মে রত কর্মময় মন।

রাজচরণনাথ যোগী বলে, পর ধর্মের ফলে,

ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না কখনো।

(১৯)

একি অপরূপ কি আশ্চর্য শ্রবণে শ্রবণ।

গুণ কর্ম অনুসারে, সকলেই কর্ম করে,
 এ সংসারে কেহ তো বাদ নন।
 প্রকৃতির বসে মন কর্ম করে সর্বক্ষণ,
 ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রন।
 বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়, যখনই যুক্ত হয়,
 তখনই চিত্ত আলোড়ন।
 প্রকৃতির তরঙ্গ তালে, চিত্ত উচাটনের কালে,
 চিত্তে নৃত্য উন্মত্ত স্ব-মন।
 প্রকৃতি-ইন্দ্রিয়-মন, তাদের না করলে দমন,
 ভগবান পাওয়া যায় না কখন।
 বলে যোগী যোগী রাজচরণ, তাদের করতে দমন,
 গুরু কৃপাই কেবলম্।

(২০)

বল বল বল, বল গুরুধন,
 ইন্দ্রিয়-প্রকৃতি-মন কেমনে দমন।
 প্রকৃতি-ইন্দ্রিয়-মন— তাদের চালনায়,
 ভগবানকে পাওয়া যায় না, সাধের জনম্ যায়।
 ভগবানকে পেতে মানব জনম্ নিলাম,
 ইন্দ্রিয়-মনের অধীনে জনম্ কাটলাম।
 পরবসে রঙ্গরসে জীবন করলাম ক্ষয়,
 মৃত্যু শেষে অবশ্যই যাব যমালয়।
 ভগবানকে না পাইলে প্রেতাগ্নাই যখন—
 কেমনে প্রেতাগ্নার মুক্তি জানতে অকিঞ্চন।
 ইন্দ্রিয়-মন কিসে দমন পেতে ভগবান,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে লহ তার সন্ধান।

(২১)

তুই করিস না চিন্তন—

মন-ইন্দ্রিয় দমন হয় করলে যোগ সাধন।

সাধনাঙ্গ সমজ্ঞানে কর্ম নিরূপন,

চিন্তে সমতা আসে মন হয় দমন।

নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব গীতায় সম্বোধন,

সেই কর্মে যুক্ত হলে মন হয় দমন।

যোগাঙ্গ নিষ্কাম-কর্ম-প্রণালী সাধন,

ঢাকার পথ প্রশস্থ হয় ভগবৎ দর্শন।

রাজচরণনাথ যোগী বলে করলে যোগসাধন—

প্রেতাঙ্গার মুক্তি হয় নিষ্পাপ তখন।

(২২)

ধন্য ধন্য যোগধর্ম, ধন্য যোগধর্ম। (গো)

প্রেতাঙ্গার হয় মুক্তি, ঈশ্বরলাভ ভগবৎ ভক্তি,

যোগী হয়ে করলে নিষ্কাম কর্ম।

নিষ্কাম কর্মের সাধনা, যোগী ছাড়া জানে না,

করলে পরে ধন্য মানব জন্ম।

নিষ্কাম কর্ম কি যে হয়, জানতে বড় ইচ্ছে হয়,

দয়াল গুরু বল তার মর্ম।

রাজচরণনাথ যোগী বলে, সন্ধান খুঁজে লও সকলে,

ইচ্ছে হবে করতে নিষ্কাম কর্ম।

(২৩)

যোগ সাধনাই নিষ্কাম কর্মের কর্মসাধনা।

নিষ্কাম কর্মই নিত্য কর্ম, একুশ হাজার ছয়শত,

দিবারাত্র করে আনাগোনা।

নিষ্কাম কর্মই প্রাণের ক্রিয়া, প্রাণ-অপানের আসাযাওয়া,
সেই কর্ম ছাড়া প্রাণ বাঁচে না।
সেই কর্মে যুক্ত হলে, অধর-নাথ প্রাণকে মিলে,
থাকে না আর ভবযন্ত্রণা।
রাজচরণনাথ যোগী বলে, প্রাণকর্ম কর সকলে,
এই কর্মই নিষ্কাম সাধনা।

(২৪)

(তুমি) করহে শ্রবণ, নিষ্কাম কর্ম-যোগের বিবরণ।
প্রাণ-অপানের আসা-যাওয়া, অজপা হংসঃ প্রক্রিয়া,
কামনাহীন উর্ধ্বাধঃ গমন।
তা যে ভগবান প্রদত্ত, কর্ম চলে অবিরত,
অনিচ্ছাতে চলে সর্বক্ষণ।
জীব এই যে কর্ম করে, কেউ তা না কামনা করে,
নিষ্কাম কর্ম নাম সে কারণ।
রাজচরণনাথ যোগী বলে, প্রাণ কর্ম কর সকলে,
নিষ্কাম-কর্মে যুক্ত যোগিগণ।

(২৫)

একুশ হাজার ছয়শত বার, (রে বিষয়ী) ...
চলছে কর্ম অহরহ, মহাযোগধ্যায় প্রত্যহ,
কোন রূপ প্রতিক্রিয়া নাই তার।
এই কর্মই কামনা শূন্য, নির্বাণ প্রাপ্তি মহাপুণ্য,
নিষ্কাম কর্ম তাই তো নাম তার।
শ্বাস-ক্রিয়া নিষ্কাম কর্মযোগ, সকলেই করে উপভোগ,
হংসঃ মন্ত্র রূপে অবতার।
এই হংসই সচরাচর, নিষ্কাম কর্ম যোগেশ্বর,

যোগীরাই ভজে অনির্বীর ।
 হংসঃই জগতের পতি, মানুষের একমাত্র গতি,
 অন্তরে-বাহিরে গতি তার ।
 হংসের আসা-যাওয়াতে, জীবন রক্ষা মৃত্যু হতে;
 রাজচরণনাথ যোগী তাই সোচ্চার ।

(২৬)

(শুন বিষয়ীরে) মানুষ রূপেই হংসঃ অবতার ।
 হংসঃই মানুষাবতার, মানুষই হংসাবতার,
 তাই তো হংসের উপাসনাই সার ।
 অজপা-হংসঃ শ্বাস-ক্রিয়া, নাসারন্ধ্রে আসা-যাওয়া,
 আসা-যাওয়ার স্থিতি বারে বার ।
 আসা-যাওয়ার এই যে স্থিতি, যোগাঙ্গ সাধন পদ্ধতি,
 তাহাই তিন বীজ যোগীর যোগ সাধনার ।
 এই হংসঃ মন্ত্র হতে, তিন বীজের উৎপত্তি তাতে,
 পরম সুহৃদ জীবিত থাকার ।
 এই তিনে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, তিনধারায় তিন সাধনা হয়,
 সৎ-চিৎ-আনন্দ নাম তার ।
 বলে নাথযোগী রাজচরণ, এই তিনকে করতে হয় সাধন,
 যোগ ছাড়া সাধন হয় না তার ।

(২৭)

তিন ধারায় তিন সাধন । (রে)
 হংসঃ হইতে উদয়, রাম-রমা-কাম বীজ ত্রয়,
 তিনধারায় রয় তিন সাধন ।
 রমা নামে নাম যে হরে, প্রাণের গতি যায় বাহিরে,
 তাহাকেই রমা সম্বোধন ।

আকর্ষণে পুনরায়, প্রাণগতি অন্তরে যায়,
 তাহাই কাম নিত্য আকর্ষণ।
 আকর্ষণই কামের ধর্ম, বিকর্ষণ বাঁচার কর্ম,
 কর্ষণই কৃষ্ণ-শক্তি কৃষ্ণ হন।
 কামভাব কৃষ্ণ মহাশয়, শ্বাস প্রবেশ আর কিছুই নয়,
 বহির কুম্ভকের পরাগমন।
 গমনা গমন পর্বে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ মধ্যে,
 স্থিতাবস্থায় রাম সম্বোধন।
 কুম্ভকে প্রাণ স্থির হয়, তাই তো কুম্ভক করতে হয়,
 তাহাতেই দুয়ের হয় মিলন।
 রাম শব্দে আরাম স্থির প্রাণ, স্থির প্রাণের নামই ভগবান,
 গতিরূপ গমনাগমন।
 এই গতি স্থির শান্ত যখন, প্রজ্ঞা স্থির হয় তখন,
 তা'তে নাম স্থির কহে রাজচরণ।

(২৮)

যোগাঙ্গ প্রাণায়ামকেই রাম রমা কাম বলে—
 অন্তরে বাহিরে তাহা অহরহ চলে।
 মহাযোগী শিব এই ত্রয় সাধন করেন,
 মৃত্যুকে জয় করে তিনি অমর হলেন।
 মুক্তির সেতু রাম রমা কাম প্রাণায়াম সাধন,
 যোগীরা করেন তাহার ভজন।
 যোগ সাধনে যোগীরা আমি-ই সেই হন,
 দেবতাদি সকলের প্রভু হয়ে রন।
 রাম রমা কাম সাধন করতে যোগী হতে হয়,
 যোগী ছাড়া অন্য কেহ পারবে না নিশ্চয়।

এই ত্রয় সাধন করিতে হইলে,
যোগই সম্বল রাজচরণনাথ যোগী বলে।

(২৯)

রাম রমা কাম হংসঃ জপ হ'তে রে বিষয়ী,
হংসঃ জপ কর সর্বক্ষণ।
অজপা এই দু'টি মন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসে হং আর সঃ,
মহামন্ত্র তাহাকেই কয়।
মাতৃগর্ভে গর্ভবাসে, ভ্রূণাবস্থায় সপ্তমাসে,
প্রকৃতির বিধানে লাভ হয়।
অজপায় হংসঃ মন্ত্র, গর্ভস্থ ভ্রূণ তাতেই মুক্ত,
অজ্ঞাত সারে হংসঃই জপ হয়।
মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস কালে, ভ্রূণের হংসঃ জপ চলে,
নাভিপদ্মে মাতৃনাড়ী রয়।
এই ভাবেতে নামে যুক্ত, কিন্তু যে ভূমিষ্ঠ মাত্র,
বিচ্যুত হয়ে ওই নাম হারায়।
পুনরায় হংসঃ অজপায়, মুক্ত যদি না হওয়া যায়,
ভগবানকে পাওয়া নাহি যায়।
ভগবানকে যদি পাবে, হংসঃ জপ করিতে হবে,
যোগীর কাছে দীক্ষা নিতে হয়।
দীক্ষা নিয়ে করলে সাধন, প্রাণনাথ ভগবান দর্শন,
ফিরাগমন স্ব-স্থানে উদয়।
গুরু প্রদত্ত সন্ধানে, হংসঃ জপ হংসের ধ্যানে,
চলেন গগনভেদী উচ্চস্বরে।
গোষ্ঠলীলা সাজ করে, ফিরাগমন সহস্রারে,
রাজচরণনাথ যোগী নিত্য করে।

(৩০)

গোষ্ঠলীলা গোচারণ আর দরকার নাই,
 ক্রোধাদি সব বৎসগণকে দমন করা চায়।
 দেহজমি ঘোর কানন পতিত হয়ে রইল,
 আয়তনের ফলে গো-চারণ ক্ষেত্র হইল।
 কামরিপুই কামধেনু গোষ্ঠের প্রধান গাই,
 অজ্ঞাতে কু-কর্ম করায় নরমগামী তাই।
 কামরূপা গাভী তাই ধ্বংস করা চাই,
 গোষ্ঠলীলা সাজ করে ঘরে ফির তাই।
 কামরূপ গাভী ধ্বংস হয় যোগ সাধন করলে,
 প্রাণনাথের ফিরাগমন হয় সহস্রদলে।
 ফিরাগমনে মুক্ত হন যোগীগণ,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে সোহহং ব্রহ্মই হন।

(৩১)

দিন যায়, গনার দিন তো গত হয়ে যায়।
 দিনে দিনে দিন যায়, সন্ধ্যা আগত প্রায়,
 গাঙ্গিনী যে আশাপস্থে চায়।
 গোচারণ গোষ্ঠলীলা, মিছে মায়ার খেলা,
 নরমগামী এই তো খেলায়।
 খেলা ছেড়ে যোগ কর, স্বগৃহে গমন কর,
 পরমা জননী যথায়।
 গোচারণের মিছা খেলা, ছাড় তুমি এই খেলা,
 রাজচরণনাথ যোগী অন্ত চায়।

(৩২)

ও বিষয়ী মায়ের ডাক যে এসেছে—

ওই শুন রে উচ্চস্বরে ডাকতেছে।
 আয় পুত্র আয় পুত্র বলেরে,
 ও বিষয়ী গগনভেদী রব উঠেছে।
 মায়ের ডাকে ওই ধ্বনি শুনে,
 মায়ের কোলে বসে শব্দের ধ্যানে।
 মা-পুত্রের সঙ্গম রসেরে
 ও বিষয়ী স্ব-স্থানে যাবে পৌঁছে।
 শিঙ্গা ডুস্বোর নিয়ে করে
 মহাদেব মহেশ্বর—আত্মা সহস্রারে।
 স্বরূপে রূপ মিশে যায় রে
 ও বিষয়ী ভব বন্ধন যাবে ঘুচে।
 যোগীকুলের যোগসাধনায়
 প্রাণায়াম পাক্ষিতে চড়ে দেশে ফেরা যায়।
 জন্ম মৃত্যু বারণ হবেরে
 ও বিষয়ী সে পথ সুগম রয়েছে।
 তাই তো রে ফিরাগমনে
 যাহা ছিল তাই হবে তাঁর বিধানে।
 রাজচরণনাথ যোগী বলে রে
 ও বিষয়ী গুণার দিন তো যাইতেছে।

(৩৩)

মহেশ্বর-শিব গাঙ্গিনীর মিলন হইল,
 গমন সুন্দর রূপান্তর রূপ অবসান হইল।
 কে বা শিব, কে গাঙ্গিনী চেনা তো না যায়,
 একাসনে দাঁড়ালেন একই ভঙ্গিমায়।
 অঙ্গে অঙ্গে মিশে গেল বদনে বদন,

দুই অঙ্গে এক অঙ্গ হইল কলুষ বর্জন।
 ফিরাগমন যুগলমিলন স্বরূপ প্রাপ্তি হন,
 সেই স্বরূপই পরমাত্মায় আত্মার মিলন।
 পরমাত্মায় জীবাত্মার মিলন যোগ সাধনে,
 রাজচরণনাথ যোগী বলে কর সর্বজনে।

(৩৪)

ধন্য ধন্য যোগধর্ম, ধন্য যোগ সাধনায়,
 হংসঃ নামে দীক্ষা নিলে ভগবান পাওয়া যায়।
 এই হংসঃ নাম বিনে তাই, জীবের অন্য গতি নাই,
 কলিতে হংসঃই কেবলম্।
 যদি হংসঃ নাম লওয়া যায়, কলি প্রস্ফুটিত হয়,
 কলিতে হংসঃ নাম সুউত্তম।
 কলিতেই হংসঃ নাম, হংসঃ জপ অবিরাম,
 এই নামেই জীবন শক্তি রয়।
 সম্পূর্ণ পাপের দ্বারা, ভগবান আছেন ঘেরা,
 হংসঃ নামে কলিতে উদয়।
 কলিই জীবন ভগবান, হংসঃ নামে বর্তমান,
 অন্তরে বাহিরে কেবল ঘুরে।
 ঐ নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে চলে, মৃত্যু ঘটে চলে গেলে,
 ঐ নাম ছাড়া কলির জীব মরে।
 হংসঃই জীব-তারক, জপ করাই তো অত্যাৱশ্যক,
 রাজচরণনাথ যোগী বলেন সবাই যোগে যুক্ত হোক।

যোগী কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথের যোগী গানের টেক্সট: (সংগৃহীত অংশ)

যোগী সৎপুরানন্দনাথ কৌলসিদ্ধ নাথযোগী। তিনি যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের পরম্পরার যোগী সন্ন্যাসী। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নাথমত কৌলসাধকের সংখ্যা বর্তমানে বাংলায় খুবই নগণ্য।

বাংলায় তাঁর

মতে দু-একজন

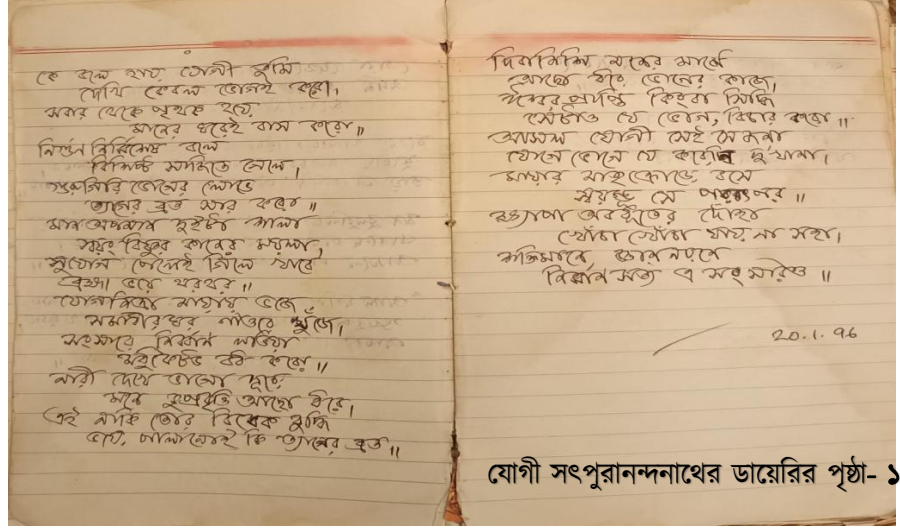
সন্ন্যাসী

আছেন।

অবধূত যোগী

সৎপুরানন্দনাথ

রচিত যোগীর



যোগী সৎপুরানন্দনাথের ডায়েরির পৃষ্ঠা- ১

গানগুলি ভাব গভীরতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতায় এবং কৌল যোগতত্ত্বের পরম্পরায় সাংকেতিক ভাষায় প্রহেলিকার মতো করে রচিত হয়েছে—

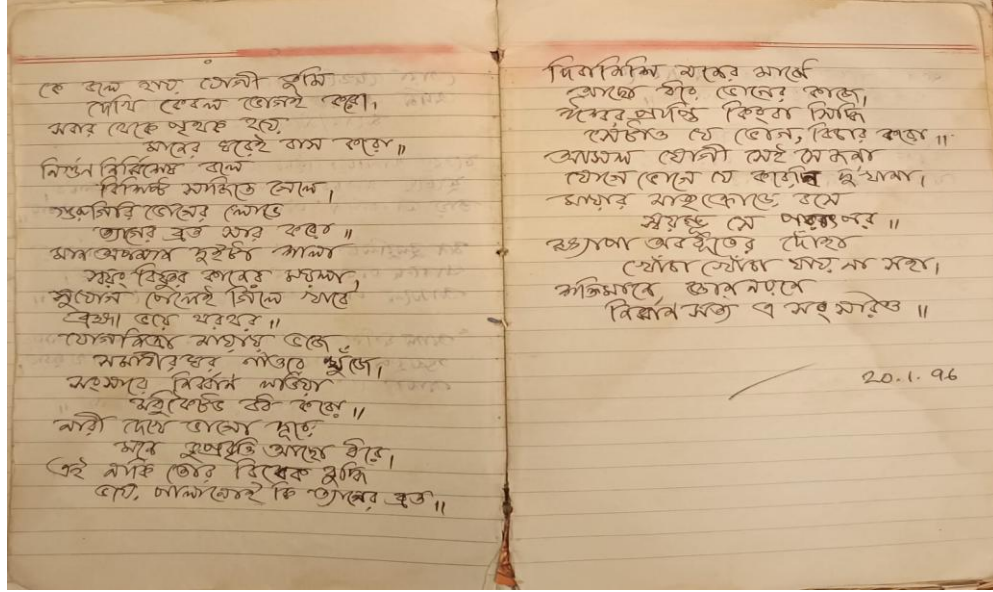
(১)

এক চাঁদে তিন বিন্দু গ্রাসে

দেখ প্রেমযোগী।

চাঁদে চাঁদে ছাঁদে ছাঁদে

বিন্দু ধরে সহজ সুখী ॥



কামের ধারা যে শুষেছে
 প্রেমের বানে ভেসে গেছে ।
 বিন্দু মাঝে সিঁদু ধরে
 আর রাখেনি বাকি ॥

ভাবচাঁদে কর কামচাঁদের আশ্রয়
 দ্বিতীয়চাঁদে বিন্দু ধরিতে হয় ।
 পেলে জ্ঞানচাঁদের প্রশ্রয়
 তবেই হবে রসিক ত্যাগী ॥

চতুর্থে ধ্যানচাঁদে বিন্দু
 ধরলে মিলবে দীনবন্ধু ।
 শূন্যচাঁদে শূন্যবিন্দু
 সাধলে হবে বশ-তপস্যা ॥

শূন্য-ধ্যান-জ্ঞান এই তিন বিন্দু

যে কামচন্দ্রে ধরে সেই দীনবন্ধু ।
ক্ষাপা অবধূতের হৃদয়-সিন্ধু
ছেড়ে মুক্তি প্রেমে অনুরাগী ॥

সহজ সাধকদের ভাবের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে নাথসিদ্ধগণ কায়াসিদ্ধির জন্য গুহ্য চন্দ্রসাধন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতিতে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ নামে দ্বিবিধ অমরত্ব স্বীকৃত হয়।^{৬৩} সিদ্ধ দেহরসকে অমৃতে পরিণত করতে উর্দ্ধগামী বায়ুর সাহায্যে সহস্রাতে নিয়ে সঞ্চয় করেন। রসাত্মক নিজচন্দ্রকে উর্ধ্বে আকর্ষণ করে আকাশচন্দ্রে যুক্ত হয়। আকাশচন্দ্র সহস্রার নিকটে অবস্থিত। শেষে গিয়ে সিদ্ধ যোগী গরলচন্দ্রকে পান করেন এবং প্রণবের ধ্যানে নিবিষ্ট হন। শেষে দেহ ও মনের শুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধদেহ লাভ সম্ভব হয়। নাথকৌল সাধকের এই সাধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৌদ্ধ বজ্রসাধকের সাধন প্রণালীর মিল রয়েছে। বিন্দুর অধোগামিতার কারণে যেমন কামদেহের উৎপত্তি ঘটে তেমনি বিন্দুর উর্দ্ধগামিতার কারণে দিব্যদেহ লাভ করা যায়। সাধারণভাবে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত এই চারচন্দ্র ভেদ করতে পারলে বিশুদ্ধ ও আঞ্জা ভেদ করা কঠিন হয় না এবং সিদ্ধ অমরতা সিদ্ধি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে সব শূন্যই মনে হয়। ‘গোপীচাঁদের পাঁচালী’-তেও অনুরূপ ভাবনার গভীরতা লক্ষ করা যায়—

‘শূন্য কাঁথা শূন্য বুলি রাজা কান্ধে দিয়া ।
দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥’^{৬৪}

(২)

কামাতুর ভালবাসা নেওয়া যায় না,
নেওয়া যায় না বেচাকেনা,
সমঝোতার অজস্র দলিল...

নিতে হয় খুনগুটি,
নিতে হয় মেনে,
নিতে হয় ভালবাসা ভালবাসা দিয়ে।

পাওয়া যায় মাধুকরী...
মুষ্টিভিক্ষা দ্বারে দ্বারে,
ভালো বাসা-বাঁধা বাঁধা দিয়ে ফেলে।
পাওয়া যায় না চেয়ে থাকা দিন।
মেঘে মেঘে দূরু দূরু মেলে না আর ...
মেলে না নদীতে-সাগরে তিয়াসা।

সবার ভালবাসার ফুলঝুড়িটা
ভরে আছে ফুলে
পরিপূর্ণ শূন্য আমার কূলে।।

সিদ্ধ কায়াসাধনায় শিব-শক্তির মিলনসাধন করলে পরমশান্তির উদয় হয়। এই অবস্থায়
নিজের সঙ্গে নিজের বিহার চলে। পরমেশ্বর নিজের অঙ্গভূত হয়ে যান। আত্মারাম অবস্থার
প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সহজিয়াসাধকগণ রাগ ও বিরাগকে অতিক্রম করে পরম (সহজানন্দ)
ও বিরম (বিরমানন্দ) অথবা কাল ও বিকাল বলে থাকেন।^{৬৫}

(৩)

সৌন্দর্যের পিয়াসী আত্মা
জ্ঞানানন্দ-রুচির সায়ে
শ্রী-মন শ্রী-বোধ শ্রীমান

দ্বৈত-অদ্বৈত-সমনিত্য
 সমাসমে ধ'রে - এই 'আমি'রূপ।
 শূন্যগর্ভে খেলে স্পন্দ যেমন আরামে
 সমদ্বয়ে বজ্রক্ষেত্র - অনাবিল ত্রিকা
 সুন্দরের আবিষ্কারে পঞ্চরসময়ী
 ব্যাপ্তির নিত্যতা-তৃষ্ণা প্রকৃতি যেমন
 তেমনই শ্রীতৃষ্ণা জীবন।
 রূপাকীর্ণা নামাকীর্ণা রসাকীর্ণা
 আনন্দ তাণ্ডব ঘন মত্তা শিবকামী
 অনুরাগ-আস্বাদনে পঞ্চেন্দ্রিয়-বেদন-মানসী
 অন্তর-বাহিরভেদে সংস্কারময়ী বিজ্ঞা
 অভিজ্ঞা সংবাদ অন্তে প্রজ্ঞাপারমিতা।
 তাই 'আমি' রুচিমগ্ন নির্বিশেষ জীবনসুন্দর।
 তুমি যে জীবনতৃষ্ণা ত্রি-পুর-সুন্দরী।।

মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, অন্যদিকে বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি হলেন অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত
 আত্মা। মনকে বিষয় চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জীবভাব দূর হয়ে শিবভাব প্রতিষ্ঠিত
 হয়। ধ্যান, ভাবনার গভীরতায় পৌঁছে দ্বৈত-অদ্বৈত বিষয় অতিক্রম করে সমরসতা ভাব প্রাপ্ত
 হলে আত্মার স্বরূপ দর্শন সম্ভব হয়। সুতরাং এককে জানতে হলে স্থূলকে বাইরে থেকে
 আকর্ষণ করে সূক্ষ্মে প্রবেশ করতে হবে। বিবেক বুদ্ধি দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে,
 পঞ্চমহাভূতকে পঞ্চতন্মাত্রায়, পঞ্চতন্মাত্রাকে অহংতত্ত্বে লয় করতে হয়। তারপর বিবেক
 বিচার দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতির (শিব-শক্তি) পার্থক্য বুঝে পুরুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বন্ধনমুক্তি

ঘটে। এইভাবে সিদ্ধ বাইরের বিষয়কে অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সিদ্ধি লাভ করেন।

(৪)

পশুপতি, রাখাল হয়ে আমার জানোয়ার- মনটাকে পোষ মানিয়ে তোল
তোমার শৃঙ্খলতার পূজায়
যুদ্ধ থেকে খেলায়।
বিরূপাক্ষ, তোমার বাম দৃষ্টিতে
তোমার মানব মনকে সরিয়ে নাও
কামনার বহমানতা থেকে
নিম্নগামী স্রোতকে উর্ধ্বপথে টেনে।
তৎপুরুষ, তথতার ধারক দিব্যমনের শিক্ষায় পূর্ণ করো
সর্বজ্ঞান থেকে মোক্ষবোধে
অজ্ঞানতা থেকে সত্য অন্বেষণে।
অঘোর মায়াতীত মায়াময় দ্রবীভূত করো উপলব্ধ মন
শূন্যতার গহনে—
বিশিষ্টতা থেকে নির্বিশেষে।
সদ্যজাত হে,
খেলা তোমার নির্বাণের
চিত্তমাত্রতা নিয়ে
জীবনের মহোৎসবে সকল
আত্মবৃত্তিকে রূপান্তরিত করে
নৈরাশ্রতায়।
পঞ্চ-আনন করুণাত্ম
প্রজ্ঞাবান,

শূন্যে পঞ্চ-মহাভূত
 তন্মাত্রের লয়ে
 সংসারে সচকিত অদ্বয়ে সজাগ-
 দেখাও আমোঘ পথ গুরুনাথ হে।
 পরিবর্তনশীলতা তাণ্ডবে
 করো রক্ষা প্রশান্ত আনন্দ,
 সব পাপ ভুলে ক্ষমা করো
 বিপক্ষে মৈত্রীতে মজিয়ে।
 অস্তিত্ব-চৈতন্য শিব হে-
 নৃত্যরত আনন্দ তাণ্ডবে
 শূন্যতা রাত্রির মহোৎসবে
 সকলকে রাখো হে শান্তিতে।

বাস্তবে রসাস্বাদনের জন্য মোহমুক্ত স্বচ্ছমন প্রয়োজন হয়। এই মনে সিদ্ধ স্বভাবের খেলা প্রতিবিম্বিত হতে দেখেন। এটা আসলে ভাবের খেলা। এই স্তরে সিদ্ধ ভাবাতীত অনুভূতি লাভ করেন। তিনি এক অব্যাহত ও অনন্ত আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হন। তান্ত্রিক নিয়মে সব বস্তুই শূন্য বা স্বভাবহীন। এখানে অতীত নেই, অনাগতও নেই। এই মনোভাবকে শূন্যাত্মক বলা হয়েছে। তার প্রভাবে মোহমুক্ত নির্বিকার আনন্দ ও শান্তির অভিব্যক্তি জন্মায়। বাঙালির যোগ এবং তন্ত্রের সমন্বয়ে গানটির এক অভিনব সাধনশৈলী প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলি নিদ্রাকাতর ইন্দ্রিয়সুখ বিলাসী মানুষের মনের দরজা খুলে দিয়েছে। গানটিতে নাথযোগী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ধরা পড়েছে। যোগীরা জানেন ভৌতিক ও মানসিক বিষয়গুলি অবিনশ্বর নয়, বিনাশের সূত্রে বাঁধা। তাই তারা নাস্তি-অস্তির সীমা অতিক্রম করে শূন্যজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত কষ্টসাধ্য

জীবনশৈলী বেছে নেন। সেই সূত্রেই আধুনিক সময়েও যোগীর গান রচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে জীবনচেতনা ও কসমিক আবেদনে নিজস্বতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(৫)

অন্তরে নির্গুণ বাহিরে সগুণ
সমযোগে নির্গুণেরই গুণ।
একজন বেগুণ একজন আগুন
ধুনী জ্বলে খাও বেগুন-পোড়া।।
পঞ্চকোষ-পিঁয়াজ আর লংকা দাও ডোলে
সোম্বারা রসতত্ত্ব সর্বের তেলে।
রাগ্নাঘরেতে প্রদীপ জ্বলে দিয়ে
আত্ম-ইষ্টে ভোগ নিবেদন করা।।
সকামে নিক্শামে যোগেরই করণ
মধ্যমায় শূন্যতা করিতে ধারণ।
ক্ষ্যাপা অবধূতে মানে না বারণ
সহজে জীবনপ্রসাদ পাওয়া।।

যিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি জীবনমুক্ত যোগী। মুক্তজীব আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। কিন্তু আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেও অনেক সময় ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ থেকে যায়। নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক ধুনি, অন্যদিকে বেগুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি সগুণ সত্ত্বাকে অতিক্রম করে আত্ম সত্তা লাভ হলে সকাম সাধনা নিক্শাম সাধনায় পরিবর্তিত হতে পারে। তখন অবধূত যোগী মায়ামোহ ত্যাগ করে ধ্যানে লীন হয়ে যান। শেষে সিদ্ধযোগী ব্রহ্মজ্ঞান বা সহজসমাধি স্তরে পৌঁছাতে পারেন।

(৬)

সদগুরু ধরে করলে সাধন
 সত্যের সন্ধান পাবে,
 অসদ্ গুরু ধরে সত্যের সন্ধান
 গুরু মারা হবে।
 সদগুরু সত্যস্বরূপ,
 মূর্তিমান প্রেম সে রূপ।।
 পূর্ণিমা অমাবস্যার যুগল ঔ রূপ,
 অনুভবে পাবে স্বরূপ।।
 যাওরে ভাই অচিনপুরে,
 সদগুরুর হংসে চড়ে।
 স্বরূপ আয়না দেখে ভালো করে,
 ফেরত এসো উল্টো রথে চড়ে।।
 দীন সোমনাথের কথা,
 ঘুরো না যথা তথা।
 বদ সঙ্গে মুড়িয়ে মাথা,
 অন্তে হবে জীবন ব্যথা।।

সদগুরুর কৃপায় যোগী যোগাঙ্গির সাহায্যে দেহের পাশসমূহ দণ্ড করে উর্ধ্বগামী সাধনপথে
 অবিচল থাকেন। এই অবস্থায় স্নিগ্ধ অমৃতরসে যোগীর সকল সত্তা প্লাবিত হয়। এই সময়
 তিনি ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই অবস্থার নাম পূর্ণাভিষেক। যোগী নিজেই জগৎ-
 গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পূর্ণতা লাভ করেও তাঁকে ফিরে আসতে হয় বা সেই অবস্থা
 অতিক্রম করতে হয়। না হলে পরম শিবের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। এটাই তান্ত্রিক
 আধ্যাত্মিক দর্শনের পন্থা।

(৭)

প্রেম দেব প্রেম দেব
আর কিবা আছে দেব বলো।
দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি সাধনে করিতে শুদ্ধি
ধন-মান-প্রতিপত্তি গেলো।।
রয়েছি একেলা পড়ে
এই প্রাণনদী তীরে চলো।
কালাকাল মহাকাল জন্মমৃত্যু চলাচল
মুখে শুধু হরি হরি বলো।।
হরিরে হরিয়া আমি
পেয়েছি বিষামৃত লহো।
প্রেম দেব প্রেম দেব
আর কিবা আছে দেব বলো।
প্রেম নাও প্রেম নাও
প্রেম ছাড়া কিবা নিবে বলো।
শূন্য হৃদি পূর্ণ করে চলো যাই প্রেমপুরে
ক্ষাপা অবধূতে বলে চলো।।

(৮)

উভয়-অধীনতা সে বড় সুন্দর
যায় যদি অহম্ প্রেমেতে।
তাইতে অনুরাগ অনিষ্ঠায় বৈরাগ
স্থূলে বীতরাগ স্বরাগে।।

দ্বৈতে রহিয়ে অদ্বৈতে সাধিয়ে

সহজে মজিয়ে লীলা অধিষ্ঠান।
 দেখ না রে শিবে জ্বালায়ে মদনে
 আনন্দ সদনে শৃঙ্গার অনুষ্ঠান।।
 নিষ্কামে সকামে হইলে যোগাযোগ
 ভোগ হবে পূজা সেই ধ্যানে।
 বলে ক্ষ্যাপা অবধূতে শুন গো সকলে
 মিলন হবে রাগে-বিরাগে।।

৭ ও ৮ নং যোগীর গানে দ্বৈত-অদ্বৈত ও কায়াযোগ দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্তের আত্মদর্শনই নাথপন্থের পরমপদপ্রাপ্তি। নাথের নিজের দেহকেই অমরত্ব দিতে চেষ্টা করেন। উপনিষদের আদর্শ হল সমস্ত কামনা বাসনার অবসান ঘটিয়ে অমরত্ব লাভ করা।^{৬৬} যোগী কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে কায়িক ও মানসিক কর্ম ত্যাগ করে সহজ অবস্থা লাভ করেন। বুদ্ধিবৃত্তি নিবৃত্ত হলে নির্বিকার স্বরূপে অবস্থান করেন। সেটাই সহজাবস্থা বা জীবন্মুক্তি। মৎস্যেন্দ্রনাথ কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থে জীবকেই শিব বলেছেন। অর্থাৎ দেহমধ্যে ইনি জীব এবং দেহমুক্ত হলে শিব।^{৬৭} মনের ভোগবাসনার কারণে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়। সকাম কর্মসাধনায় বাসনার প্রকাশ ঘটে এবং পূর্ব সংস্কারগুলি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। সুখ দুঃখই কর্মের ভোগফল। মানুষ সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকে কর্মফল ভোগ করে। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত ও চিত্ত নিবৃত্তি সম্ভব হলে যোগী জন্মমৃত্যু থেকে অব্যাহতি পান।^{৬৮} তখন তিনি সিদ্ধদেহে অবস্থান করতে পারেন।

(৯)

কেন আমায় আনলি রে মা
 এই জ্বালার জগতে।
 হেথায় সবে মিথ্যা বলে

রংমাখা ভালোবাসে ।।
শিক্ষা নিতে আসে সকল
নিজের গতেই চলে ।
সৎ উপদেশ নাহি মানে
অহংবুদ্ধি ফলে ।।
না হয় আদেশ অনুসরণ
অনুকরণ করে ।
গুরুবাক্য না মানিয়া
মনের ধন্দে ফেরে ।।
ভাব দেখিয়ে কথা নেয় মা
ভাবে নাহি থাকে ।
ভাবের ঘরে চুরিবিদ্যা
ধর্মব্যবসা করে ।।
এই দুনিয়ায় মানুষ হতে
বাসতে হবে ভালো ।
ভালোবাসার ব্যথা সয়েই
জীবনটা যে গেল ।।
ক্ষাপা অবধূতে বলে
পরে প্রেমের ফাঁসি ।
এখন কেমন দেখ দেখি মা
ব্যথাই অভালোবাসি ।।

মা দুর্গার পূজো দিয়ে সিদ্ধকবি কামাখ্যা গিয়েছিলেন । কুচবিহারে মহাষ্টমী ও মহানবমী পূজো
কাটে বড়মার রূপ সন্দর্শনে । দেখতে দেখতে সিদ্ধ সাধকের দেহের জন্মতিথি চলে আসে ।
শিষ্য ভক্তরা আনন্দ উৎসব করেন । তখন কৌলসাধকের মনে হয় এসব ভালোবাসা ও আনন্দ

উৎসব ক্ষণিকের আনন্দ দান করে। তিনি আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে চাইছেন।
অবধূতের এই পথ নয়।

(১০)

হলকর্ষণ করো বলরাম--
মানব- জমিন রইল পতিত।
আবাদ করো মনস্কাম।।
বৃন্দাবনের রাসলীলা
অসম্পূর্ণ রসের খেলা।
দেহ-জমিন আবাদ হলেই
মিলবে নিত্য গোলোকধাম।।
হলকর্ষণ করো বলরাম--
ব্রজ ছাড়ি গোপীর মানে
গেলা কানাই সে কোনখানে।
বলাইদাদা রসে মজে
রেখেছিল গোপীর মান।।
হলকর্ষণ করো বলরাম--

যোগের লাস্তল হাতে ধরে
ভাব-যমুনা শতধা করে।

জ্ঞানের রসে ভাব শুধরে
দাও গো প্রভু অভিরাম ।।
হলকর্ষণ করো বলরাম –
নিত্যানন্দ রূপ ধরি
জাগাও চৈতন্য-পুরী ।
তোমার সঙ্গে হে কাণ্ডারী
পাবো সহজ পরিণাম ।।
হলকর্ষণ করো বলরাম–
হলকর্ষণ করো বলরাম–
বলে খ্যাপা অবধূতে
(তোদের) বেলা গেল খেতে শুতে ।
ক্ষেতের ফসল তুলতে হলে
হলধরে সাঁপে দাও মন ।।

ক্ষেত হল শরীরের প্রতীক, লাঙ্গল যোগাচারের কৌশল । যৌনতা- লোভ- ক্রোধের প্রলোভন
জয় করে যোগের সাহায্যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে সিদ্ধ কায়াসিদ্ধি লাভ করেন বলে গানটিতে
বলা হয়েছে । ঝুলনপূর্ণিমা আবার বলভদ্র-পূর্ণিমা, বলরামের জন্মদিন । নাথসম্প্রদায়ের
স্বয়ম্ভুনাথ অবধূতের প্রাচীন দিগম্বর বেশ ধারণ করেছিলেন বলভদ্রকে স্মরণ করে । বলরাম–
কৃষ্ণ মহাকাল সাধনায় গুরু-শিষ্য রূপে পরিগণিত হয়েছেন । সংসার-সিদ্ধি এক করেছিলেন
বলরাম, তাই তাকে সহজসাধক রূপেও কল্পনা করা হয়েছে । আবার নিত্যানন্দ রূপে

শ্রীচৈতন্যকে চৈতন্যদানে আবির্ভূত হয়েছেন। ঝুলন-পূর্ণিমাকে নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগীরা
অবধূত পূর্ণিমা রূপেও পালন করেন।

(১১)

হে জগন্নাথ-

মম মন-রথে কর আরোহণ।।

দ্বিতীয়ার দ্বৈত তালে

কায়া-সাধন পূর্ণ-ফলে।

জগৎ দর্শনের কালে

লইলাম হে শরণ।

হে জগন্নাথ-

মম মন-রথে কর আরোহণ।।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ

রথচক্রে চারি লক্ষ।

পথ অনাহত বক্ষ

ভাব-দুন্দুভি বাজে অবিরাম।

হে জগন্নাথ-

মম মন-রথে কর আরোহণ।।

পঞ্চেন্দ্রিয় রথের ঘোড়া

অ-দ্রুর বৃত্তি লাগাম ধরা।

সাধন-বিজয় ধ্বজা-ওড়া

প্রাণাপন রজ্জু আকর্ষণ।

হে জগন্নাথ-

মম মন-রথে কর আরোহণ।।

হে সাক্ষী-চৈতন্য প্রভু

কর্মেতে হাত নাহি কভু ।
অচল বিগ্রহ শুধু
ঠুঁটা তুমি পতিত-পাবন ।
হে জগন্নাথ-
মম মন-রথে কর আরোহণ ।।
অখণ্ড ভেদাভেদ-দৃষ্টি
বাঁকা হাসি মিষ্টি মিষ্টি ।
প্রলয়েতে রাখো সৃষ্টি
স্তবে নিন্দায় নাইরে কোন কান ।
হে জগন্নাথ-
মম মন-রথে কর আরোহণ ।।
গাহে ক্ষ্যাপা অবধূতে
রথযাত্রা সমারোহে ।
প্রেম বরিষণ ধারে
রাখো হে পরাণ ।
হে জগন্নাথ-
মম মন-রথে করো আরোহণ ।।

(১২)

আমিকে শুদ্ধ রাখার জন্য বৈরাগ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ।
কী কী ছাড়তে হবে তা বিবেকরূপ আত্মবাণীই বলে দেবে ।
যতক্ষণ ‘আমি’ আছে ততক্ষণ বিবেক-বৈরাগ্য লাগবেই ।
‘আমি’ যখন পরিকাঠামোয় ক্লান্ত, তখন চাই বিস্তার ।
‘বিস্তার’ অনন্ত আয়তনের অনুভব, কেন্দ্রে ‘আমি’ ।
‘আমি’র ব্রহ্মানুভূতি আকাশবৎ ।

যেমন আকাশ মহাবিশ্বপ্রপঞ্চকে ধরে রেখেছে তেমনই ‘আমি’ চিন্তনকে ধরে রেখেছে।

এইখানেই ‘আমি’র বিশ্রাম দরকার আর সমাধিতে মৃত্যু।

যেমন ভাবে শূন্য থেকে জগৎ এসেছে

তেমনই নির্বিকল্প সমাধিরূপ মৃত্যু থেকে আবার ‘আমি’ উঠে আসে।

(১৩)

যোগে কর্তৃত্ব, জ্ঞানে জ্ঞাতৃত্ব, ভক্তিতে ভোক্তৃত্ব।

যোগ ক্রিয়াশীল শক্তিতে দাঁড়িয়ে যে ‘আমি’ সৃষ্টি করে তাই কর্তৃত্ব।

যোগের বাহ্যক্রিয়া স্থূল, অন্তরক্রিয়া সূক্ষ্ম, স্বয়ংক্রিয়া কারণ।

স্থূলে কায়ভিত্তিক ব্যক্তিগ্রাহ্য অহংকার, সূক্ষ্মে চিত্তভিত্তিক দিব্য অহংকার,

আর কারণে অহংবোধ ঈশ্বরস্বরূপে থেকেই যায়।

জ্ঞানের স্থূল হল বিষয় বা বাহ্যবিদ্যা জ্ঞানে ‘আমি’ জ্ঞানী,

সূক্ষ্ম হল সাক্ষী ‘আমি’

কারণ হল কেবল ‘আমি’

ভক্তির স্থূল হল পূজাপাঠাদি বৈধীভক্তি-পরায়ণ ‘আমি’,

সূক্ষ্ম হল ভাবৈশ্বর্য-ধারক ‘আমি’,

কারণ হল সালোক্য-সষ্টি-সামীপ্য-সায়ুজ্য অহংবোধ।

মুক্তি হবে কবে?

আমি যাব যবে।

যবে হৃদয় মহাভাবে।

উঠবে রেঙে প্রেমে।।

প্রেম কি দ্বৈত? প্রেম কি অদ্বৈত?

প্রেমানুভূতিতে তুমিও যা আমিও তাই।

আবার তুমিও নাই, আমিও নাই...

শুধু প্রেম আছে।।

যোগের বাহ্য বা স্থূলক্রিয়া হল যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা। অন্তর বা সূক্ষ্মক্রিয়া হল ষড়নাড়িতে ষট্চক্রভেদ। স্বয়ং বা কারণক্রিয়া হল সিদ্ধ মহামুদ্রায় ৬৪ কলাভেদ, ব্রহ্মরন্ধ্রভেদে ১২ লিঙ্গভেদ।

(১৪)

বিশুদ্ধ-চৈতন্য আদ্যাগর্ভ থেকে স্বয়ম্ভু-স্পন্দ হয়ে নেমে আসে ব্রহ্মস্বরূপে।

আদ্যাপ্রকৃতি শূন্যশক্তি হয়েও ব্রহ্মে প্রপঞ্চশক্তিরূপা।

ব্রহ্মস্পন্দ ব্রহ্মশক্তিজাত জগতস্পন্দ হয়ে পঞ্চমহাভূতাত্মক প্রকৃতিতে

নিত্য পরিবর্তনতা ধরে মানুষ অবধি রূপ-নাম সৃষ্ট হয়।

এই ভাবেই মানুষেও স্বয়ম্ভু অবতীর্ণ হয় তত্ত্ব থেকে জীবনে।

শিবতত্ত্বই স্বয়ম্ভুতত্ত্ব, জীব-শরীরে গুরুতত্ত্বের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠ।

নিজের দেহমানে এই তত্ত্বকে আবিষ্কার করাই যোগতত্ত্বের পথ।

এই সত্য আবিষ্কার করলে তুমিই স্বয়ম্ভু।

আদ্যাগর্ভ থেকে ফেরত আসার মুহূর্তে স্বয়ম্ভু-স্পন্দের জ্ঞান হয়।

স্বয়ম্ভু কোন সাধনা নয়, সহজ সিদ্ধি।

বিশুদ্ধচৈতন্য আদ্যাগর্ভে ফেরত না গেলে কি স্বয়ম্ভুস্পন্দকে অনুধাবন করা
সম্ভব?

ফেরত গেলেও সম্ভব নাও হতে পারে।

বার বার যেতে যেতে ফেরবার চেতনা সজাগ হয়,

তখন তা অনুভূতি থেকে বিশুদ্ধ মনে ধরা পড়ে।

সেখানে ফেরত যেতে নির্বিকল্প সমাধিতে যেতে হয়।

যোগতত্ত্বের কথায় গানটির বিষয়বস্তু। পিণ্ডতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

(১৫)

বুঝি এতদিনে

হল গো কৃপা (কৃপাময়ী)।

এলি মা মানুষ হয়ে

জেনে ছেলের বুকের ব্যথা।।
কত মূর্তিতে পূজেছি তোরে
কত আবাহনে আর বিসর্জনে।
গড়াভঙ্গার কল্পনাতে
হয়েছি মা আত্মহারা।।
যখন সারা হল মনের খেলা
দেখলাম মা তোর স্বরূপে মেলা।
মানুষরূপে পেতে তোরে
গেল মা জীবন-বেলা।।
প্রাণের দেবী মনের মানুষ হয়ে
এলি মাগো জীবন শেষে।
নিলি কোলে ক্ষাপা অবধূতে
ষোড়শীরূপেতে মাতা।।

(১৬)

দিব্যকল্পনা সম্যক স্থির হলে অন্তরের দিব্যরূপ বাইরে প্রতিবিম্বিত হয়।
তাই প্রথমাবস্থার ঈশ্বরদর্শন।
এই ঈশ্বরদর্শন দৃঢ় হলে পূর্ণ দিব্যতায় অন্তরদর্শন জ্যোতির্ময় হয়,
আর নিত্যবর্ধমান বলে ব্রহ্মবোধ হয়।
এই দ্বিতীয়াবস্থার ঈশ্বর-ব্রহ্মদর্শন।
তৃতীয়াবস্থায় আন্তর দ্বৈততার লয়ে অদ্বৈতবোধে ঈশ্বরব্রহ্ম অহং ব্রহ্মানুভবে
বিশুদ্ধ হয়।
অহং ব্রহ্মানুভব চতুর্থে কেবল-অস্তিত্ববোধে লয় হয়।
পঞ্চমে শূন্য—
জীবন সৌন্দর্য তন্ময়তায় প্রকৃতিপ্রেমে সা-ধারণ হয়!

(১৭)

তব পদতলে মুরছি মুরছি
লভিব প্রেমের সার।
ঘর বাঁধিবারে করেছিঁ আশা
হৈনু ঘরের বার।।
আমায় সাজাস নে আর।
ধুলায় পড়ে থাকতে দে গো
সাজাস নে আর।।
আমি জটায় বেঁধেছি চিৎচন্দ্রে
বিষধর বাঁধি গলে।
শৃঙ্গার ভৃঙ্গরস পানে মোরে
বাঁধিলে গো পলে পলে।।
আমায় সাজাস নে আর।
ধুলায় পড়ে থাকতে দে গো
সাজাস নে আর।।
দিবসে আমার বিদ্যার মন্দির
শ্মশানে আমার বাস।
সুন্দরী চরণে লইয়া শরণ
পুরিল গহন আশ।।
আমায় সাজাস নে আর।
ধুলায় পড়ে থাকতে দে গো
সাজাস নে আর।।

মরণেরে মম করেছি ধরম
জীবনের পদে পদে।

প্রেমভিক্ষা করি ওহে গো সুন্দরী
লীলারস আস্বাদিতে ।।
আমায় সাজাস নে আর ।
ধুলায় পড়ে থাকতে দে গো
সাজাস নে আর ।।
বহুত মিনতি করিয়ে তোঁহারে
মানুষ হয়েছি শেষে ।
ব্যথা সহিবারে বিষপান করি
আমায় মানুষ থাকিতে দে রে ।।
ঠাকুর আমায় সাজাস না রে আর ।
ধুলায় পড়ে থাকতে দে গো
সাজাস নে আর ।।
যোগী তাই হয়েছে প্রকৃতির নায়ক ।
সেখান থেকেই ললিতার প্রসাদে মানুষ ।
সাধারণগোল্লাস ।।
প্রকৃতিকে নিজের ভেতর খুঁজে পাওয়ার উল্লাসেই মানুষ ।
তাই সে প্রকৃতির কোলে বিশ্রামরত, সদ্যোজাত ।
প্রকৃতি ‘বিরাম-ক্ষণ-দ্বীপিকা’, তারিণী ।
তুমিই মাতা আবার তুমিই কামাখ্যা ।।

(১৮)

স্বয়ম্ভু আদেশ!
আত্মজাত তত্ত্বের নিষ্ঠাক্রম ।
অঘোর আদেশ!
জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত নিষ্ঠাক্রম ।
অবধূত আদেশ!

অনাচার-আচার-অভাব স্ব-ভাব নিষ্ঠাক্রম।

অলক্ষ্য নিরঞ্জন!

সতঃ স্বজ্ঞা-বিজ্ঞা-প্রজ্ঞা নিষ্কলঙ্ক অনুভব-অভিজ্ঞা।

ব্যোম!

আজ্ঞাচক্রে আগুন হওয়ার

মন-বুদ্ধি মাধ্যমক আকাশ

শূন্য।

ব্যোম!

ব্রহ্মরন্ধ্রে সমানাকলা-চক্রে হাওয়া- আকাশের।

বুদ্ধি-অহং-র মাধ্যমক আকাশ

শূন্য।

ব্যোম!

চিৎবিমর্ষকলা-চক্রে আকাশ-মাটির

অহং-নৈরাশ্রের মাধ্যমক আকাশ

শূন্যতা।

অঘোর মহাসিদ্ধ নাথগুরুগণ নিরন্তর থেকে সহজের দিব্য করুণাধারা যাঁরা নিতে পারেন
তাঁদের অন্তরে প্রবাহিত করেন। অঘোর চতুর্দশীর পুণ্যদিনে উগ্রতারা ভগবান স্বয়ম্ভুনাথকে
নীলজ্যোতি-বিন্দুরূপ হুঁ মন্ত্রাখে আত্মসাৎ করে অচিন্ত্য-গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আবার
কৌশিকী অমাবস্যায় তাঁকে সদ্যোজাত রূপে জগতে প্রসব করেছিলেন।

(১৯)

গোহাড়ের মালা গলে

ধলে যুবতীর কোলে।

মুখে হরি হরি বলে

নিতাই চাঁদ আমার ।।
জগত-মায়া নাশি
নিমাই হল সন্ন্যাসী ।
হবে বলে অবিনাশী
নিতাই সাধিল শৃঙ্গার ।।
বসুধা-যমুনা লয়ে
জাহ্নবায় বসতি করে ।
লক্ষীমাবাইয়ে (লক্ষ্মীরায়ে) বুকে ধরে
নারায়ণী কইল শিরধার ।।
নিমাই যাই গো ঘর ছাড়িয়া
নিতাই এল ঘর বাঁধিয়া ।
মাগুর মাছের ঝোল হরি হরি বল
অদ্ভুত অবধূত আচার ।।
ধর্ম করে পাপী মনে
পাপ নাই যার ধরে পরম ধনে ।
সে না যায় বিন্দুক্ষরণে
ক্ষ্যাপা অবধূত কয় অদ্ভুত ব্যাপার ।।

(২০)

ছাড়ি মহাসুখ ধাম
পুরাতে প্রেমের কাম
নিতাই আসিল দুয়ারে ।। (ধুয়া)
বৃদ্ধ মাধবেন্দ্র পুরী
নিতাই পেয়ে বলিহারি ।
নিমাইয়ের সন্ধান জুড়ি
রসের পসরা পাঠাইল রে ।।

নদীয়ার পণ্ডিত নিমাই
স্ত্রী বিয়োগে বিবাগী তাই।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে বসাই
শচীমাতায় যে ফাঁদ পাতিল রে।।
নিতাই এক ক্ষ্যাপা ছিল
গৌরাচাঁদে সে কোল দিল।
প্রেমেতে ভাসায়ে নিল
বাউল বানাইল তারে।।
নিতাইয়ের সঙ্গ পেয়ে
গোরারায় চৈতন্য হয়ে।
হরিনামের ধারায় বয়ে
কপট সন্ন্যাসী সাজিল রে।।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধরে
না রাখতে পারল শ্রীগৌরাঙ্গে।
নিতাইয়ের প্রেমের রঙ্গে
নীলাচলে চলে গেল রে।।
নিত্যানন্দের সহজ ফান্দে
পড়িয়া শ্রীচৈতন্য কান্দে।
গম্ভীরায় কি রসাস্বাদে
মাধবী সঙ্গেতে ওরে।।
বলে ক্ষ্যাপা অবধূতে
পোষ মানালে পঞ্চভূতে।
নিতাই তোরেও নেবে সাথে
প্রেমভিখারী বানাইবে রে।।

(২১)

দোল লেগেছে প্রাণে আমার
রঙ লেগেছে মনে ।
অরুপরতন শ্রীচৈতন্য
হৃদয়-বৃন্দাবনে ।।
জ্ঞানাকাশে পূর্ণচন্দ্র
বসন্তের হাওয়ায় ।
অনুরাগের স্পন্দ-ছন্দ
প্রেমযোগেতে বায় ।।
হরি-নামের দোলায় দোলে
রাগানুগা রঙ্গে ।
সকল পরাণ উঠুক রেঙে
গোরাচাঁদের সঙ্গে ।।
বল হরি বল হরি বল হরিবোল
যোগানন্দ-বলে বেজে উঠল
দে-খোল ।
কর-করতালে তালি দিয়ে বাহু তোল
ক্ষ্যাপা অবধূতে রটে
আনন্দেরই রোল ।।
দেহ মনে বিরাজ করেন রাম
কোন মন্দিরে কোন ধর্মমতে
বান্ধিব পরাণ ।।
দেহরূপ মন্দির মাঝে
সমাধির গর্ভগৃহে
চিৎস্বরূপে তাঁহার অধিষ্ঠান ।।

জ্ঞানেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি
 করিছে গো তাঁর আরতি
 অহং-ভোগ করি নিবেদন ।।
 কামেরে রতিতে তুলে
 সেই মাধুর্যে রাম বিলাস করে
 কর মন তারই উদ্বোধন ।।
 ক্ষাপা অবধূতে গাহে
 অদ্বয়যোগেতে বহে
 জয় রাম জানকীরমন ।।

(২২)

দ্বৈত-অদ্বৈতের রমনের মাধুর্যে যে জীবনস্বরূপ
 নবদুর্বাদলশ্যাম ।
 যাঁকে অবধূত জনকনন্দিনী বরণযোগ্য বলে গণ্য করেছিলাম,
 যিনি বজ্রগুরু হনুমানের পূজ্য ।
 দশমুখ অহংকারের যিনি মুক্তিদাতা,
 দুর্গাতিনাশের সঙ্কল্পে যিনি দুর্গাপূজারী ।
 ক্রোধরাত্রিতে অ-যোধ্যাসিদ্ধিতে সেই
 শ্রীরামের অনুকম্পাভিলাষী হই ।
 কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে
 শ্রীরাধা প্রেম-আহ্লাদিনী ।।
 অনুরাগ চৈতন্য
 নিত্যানন্দ নিরবধি ।
 ভাবলক্ষণাদি বহুবর্ণ
 রঙের খেলাতে ।।

ফাগুনের ফাগ-হিল্লোলে
রস বরিষণ হৃদকমলে।
পুলকে তাঁর দলে দলে
রসে রেঙেছে।
ক্ষাপা অবধূতে গাহে
প্রেমের মাতানে।।

(২৩)

আসা যাওয়া নেই রে যাঁহার
তাঁরই বোধন নিরঞ্জন!
মানবমনের প্রেক্ষাপটে
চিতিমাতার কল্লায়ন।।
সমগ্র সংসারটি যাঁহার
গর্ভে উদয় গর্ভে লয়
তাঁরই কোলে সদ্যোজাত
পীযুষ পানে মত্ত রয়।।
সেই মা দুর্গা যোগমায়া
বিজয়ার এই আনন্দে
স্বানুভবের শীর্ষে গিয়ে
দিলেন পাড়ি কৈলাসে।।

(২৪)

কেউ চলেছে উর্ধ্বপথে
কেউ হাঁটিছে নিম্নপথে।
চলি আমি মধ্যমা পথে
আকাশে মাথা মাটিতে পা।।

কেউ যায় ডাইনে কেউ বা বাঁয়ে
 কেউ বয় ভাটিতে কেউ উজানে।
 রহি আমি স্থির মধ্যমে
 মিলে গেছে আমার না আর হাঁ।।
 কেউ বা ধর্মে কেউ অধর্মে
 আমি রই কর্মে ধর্মাধর্ম শূন্যে।
 কিবা সেই আমি কোথায় বা সেই
 খুঁজে না পেয়ে পেলাম তথতা।।
 খ্যাপা অবধূতে মিলায়ে দ্বৈতাদ্বৈতে
 শান্তিতে রহে প্রকৃতির কোলে।
 মায়ের সন্তান মায়ের কোলে রইলে
 ঘুঁচে যায় সকল চিন্তাভাবনা।।

(২৫)

মূলাধারচক্র গতি আর স্থিতির কেন্দ্র।
 এই দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের
 বিভিন্নতায় সৃষ্টি হয় ভয় আর ক্রোধ।
 স্বাধিষ্ঠানচক্র সৃজনশীলতা আর
 কামের কেন্দ্র।
 এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
 সৃষ্টি হয় বিকৃত মানসিকতা।
 মণিপুরচক্র তৃপ্তি আর অতৃপ্তির কেন্দ্র।
 এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
 সৃষ্টি হয় উৎকর্ষ।
 অনাহতচক্র প্রেম আর ঘৃণার কেন্দ্র।

এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
সৃষ্টি হয় আশঙ্কি।
বিশুদ্ধচক্র ধারণা আর প্রকাশের কেন্দ্র।
এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
সৃষ্টি হয় অবসাদ।
আজ্ঞাচক্র ঈক্ষণ আর ইচ্ছার কেন্দ্র।
এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
সৃষ্টি হয় অহংকার।
সহস্রাচক্র অভিজ্ঞা আর বিচারের কেন্দ্র।
এই দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের বিভিন্নতায়
সৃষ্টি হয় বিশুদ্ধচৈতন্য।
চিৎবিমর্ষকলাচক্র ব্রহ্মরক্তের উপর অষ্টমচক্র,
মহাশূন্যের কেন্দ্র।
জড়-কুলকুণ্ডলিনীচক্র অবতরণের শেষে
মূলাধারের তলে মধ্যাকর্ষণবোধের কেন্দ্র।
নবম গুণ্ডচক্র আনন্দকন্দ হৃদয়ে
আকাশ-মাটির সমীকরণ কেন্দ্র।
এইখানে বিশুদ্ধ চৈতন্য জীবনের সুরে
তত্ত্বযোগের পারস্পরিক পরিকাঠামোয়
সাধনায় এগিয়ে চলে।
আকাশে মাটিতে, মোক্ষ-জীবনে।।

(২৬)

সহজ আছে চার ঘরেতেই
সাধন করো ভাব বুঝে।।
স্থূলের সহজ গুরুসেবা

নিষ্ঠারতি মনলোভা ।।
প্রবর্তের সহজ প্রীতি ধরা
গুরুর ভাবে যোগ মিলিয়ে ।।
সাধনের সহজ সাধন
গুরুর মতি করো ধারণ ।।
সিদ্ধির সহজ কর আস্বাদন
গুরুর ধ্যানে অনুরাগে ।।
সহজেরও সহজ আছে
প্রেমে শৃঙ্গার আস্বাদিয়ে ।।
ক্ষাপা অবধূতে বলে—
আত্মগুরু রমণ করে ।।

(২৭)

কে বলে হয় যোগী তুমি
দেখি কেবল ভোগই করো ।
সবার থেকে পৃথক হয়ে
মনের ঘরেই বাস করো ।।
নির্গুণ নির্বিশেষ বলে
বিশিষ্ট সাজিতে গেলে ।
গুরুগিরি ভোগের লোভে
ত্যাগের ব্রত সার করো ।।
মান অপমান দুইটা শালা
স্বয়ং বিষ্ণুর কানের ময়লা ।
সুযোগ পেলেই গিলে খাবে
ব্রহ্মা ভয়ে থরথর ।।
যোগনিদ্রা মায়ায় ভজে

সমাধিঘর নাওরে খুঁজে।
সংসারে নির্বাণ লভিয়া
মধুকৈটভ বধ করো।।
নারী দেখে ভাগো দূরে
মনে কুপ্রবৃত্তি আছো ধরে।
এই নাকি তোর বিবেক বুদ্ধি
ভয়ে পালানোই কি ত্যাগের ব্রত।।

(২৮)

দিবানিশি মনের মাঝে
আছো ধরে ভোগের কাজে।
ঈশ্বর প্রাপ্তি কিংবা সিদ্ধি
সেটাও যে ভোগ, বিচার করো।।
আসল যোগী সেই যে জনা
যোগে ভোগে যে করেনি দু'খানা।
মায়ার মাতৃক্রোড়ে বসে
স্বয়ম্ভু সে পরাৎপর।।
ক্ষাপা অবধূতের দোঁহা
খোঁচা খোঁচা যায় না সহ।
শক্তিমানে জ্ঞাননয়নে
নির্বাণ সত্য এ সংসারও।।

যোগী আনন্দনাথের যোগীরগানের টেক্সট: (সংগৃহীত অংশ)

যোগী আনন্দনাথ বীরভূমের কঙ্কালীতলায় নাথপন্থের যোগী তারানাথের কাছে নটেশ্বরীপন্থে
অঘোরদীক্ষা লাভ করেন। তারপর রাজস্থানে যোগী রামনাথের কাছে ‘ভর্তৃহরি বৈরাগ’ পন্থে
দর্শনী যোগী হিসেবে কুণ্ডলদীক্ষা পান। তিনি কুলাচার ও বামাচার বিষয়ে তন্ত্রসাধনা করে

যোগমার্গে আধ্যাত্মিক পথে স্থিত হয়েছেন। তাঁর রচিত বেশকিছু যোগীরগানে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ প্রধান বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে—

(১)

মদন বেটা মোটাসোটা সহজ সরল মন।
 মা মা করে ডেকে বেড়ায়, সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণ।।
 গয়া, গঙ্গা, কাশি, তারা।
 সর্বতীর্থ মদন সারা।।
 একলা বসে ভাবি মদন
 ঠাকুর যেন দেয়নি ধরা।।
 কে যেন কয় মদনেরে!
 বাইরে কোথায় খুঁজিস!
 মা আছে তোর বুদ্ধির ভেতর।
 বুদ্ধির ভেতর, এ কেমন কথা!
 আমি মদন নয়কো বোকা।।
 সে কয়, বুদ্ধির ভেতরে রয়েছে গুহা
 সেই গুহাতে শিবের বাস।।
 খোঁজ সেখানে ভালো করে, করিস নে আর উপবাস।।
 মদন বলে, তুমি কেগা! কি করে পেলে এত জ্ঞান?
 তীর্থ, ব্রত, পূজো করে হয়েছি আমি অজ্ঞান।।
 সে কয়, ওরে মদন আমি তো তোর চৈতন্য।
 এত কাছে রয়েছি আমি কেন করছিস লগুভণ্ড।।
 দে দেখিনি ডুব ভালো করে, ধরতে পারিস আমাকে।
 দেখা হলে বলবো তোকে, মুক্তি বলে কাকে।।

(২)

যে জ্ঞানে মোক্ষ তোমায় ছাড়া করে,
 সেই মুক্তি আমি চাই না।
 পরাপ্রেমের ডোরে শক্ত করে বাঁধো মোরে,
 তোমার শীতলস্পর্শ পাই না।
 দর্শনের পাণ্ডিত্যে পড়ুক ছাই,
 তব পানে চাহিয়া শান্তি পাই।
 বোঝো নাকো ওগো, এই জগতে,
 তুমি বিনা মোর কেহ নাই, কিছু নাই।
 শোনো কেহ আছে, জ্ঞানদীপ শিখাখানি বাহিরে বার করো।
 অন্তর থাকুক আমার অন্ধকার, নাহি চাই আলো।
 অন্ধকারে অজ্ঞানী হয়ে থাকবো তবুও ভালো,
 সবাই আমায় বলবে, অজ্ঞানী! তোর মা তো কালো।
 স্বার্থপরের মলিন হৃদয় বুঝবে না, এর গভীরতা
 এ প্রকৃত প্রেম, এ নয় যা তা।
 বাইরে থেকে সবাই দেখে, মোরা দুই
 কেউ জানে না সত্যখানি অন্ধকারে, মা ছেলে এক হই।

(৩)

হারিয়ে গেছে ভক্তি, প্রেম, দু'নয়নের রাখা জল।
 সূর্যের তীব্র তাপদাহে অন্তর, বাহির পরবৈরাগ্যে শীতল।।
 অসমপ্রজ্ঞাতের ভূমিতে থাকতে কে বা চায়?
 মোক্ষ, চাহিনা আমি হৃদয় করে হায় হায়।।
 কার দ্বারা চালিত আমি বুঝিনা, নিরুপায়।
 ত্যাগকে ত্যাগ করিতে না পারি?
 কূলে এসে থেমে গেছে তরী।

এ সময় লাগে বড় অসহায়।।

(৪)

তব চরণ ধূলা, চন্দন হয়ে মম মস্তকে শোভা পায়।
জ্ঞানের অহঙ্কারে জর্জরিত না হই, ভক্তি যেন না হয় লয়।।
শুদ্ধ ভক্তি, প্রেমময় তার স্বাদ অনন্য, অনন্ত।
অখণ্ড স্বাদে, ভুলি না যেন লীলা স্বাদের আনন্দ।।
যে পথেই যাই না কেন! অশ্রময় নয়ন অনবরত।
কখনো তোমার সন্তান, কখনো আত্মায় স্থিত।।

(৫)

কতশত জন্ম বিতেছে মোর।
জপ, ধ্যান, তীর্থ, যজ্ঞ, মায়ার ঘোর।।
কতবার পুত্র, মিত্র, সন্তান, জননীহারা।
কতবার ছেড়েছি এ প্রিয় বসুন্ধরা।।
প্রবৃত্তির থেকে নিবৃত্তির পথ মাঝে।
শতশত ধাঁধা লুকিয়ে আছে।।
সত্যে পৌঁছে কে যেন বলে, বদ্ধ মুক্ত, মুমুক্ষু নও তুমি।
সাধক নেই, সাধন নেই, নয় তুমি সিদ্ধ।।
চলে গেছে, সবাই ঘরে যে যার।
এখন আত্মা তোমার বিশ্রামাগার।।

(৬)

সময় যাচ্ছে চলে, নিজের মতন।
মন স্থির না করলে, কি করে সাধন!
মায়ার বন্ধন, সংসার অসীম সাগর।
মার্মাথানে যদি এসে ওঠে প্রবল ঝড়।।
যদি যায় ডুবে তরীখানি, নাহি পৌঁছায় কিনারায়।

ফিরে আসতে হবে আবার, এই যে বড় অসহায়।।
 প্রার্থনা করি প্রভু, ত্রিতাপ জ্বালা আর সহ্য না।
 তোমার কোলে পার হব, এ সাগর, এ মোর বায়না।।
 দেৱী হল ঠিকই, এ সত্য কথা বুঝতে।
 যদি না পারি এ জনমে, কর্মের বন্ধন মুছতে।।
 একদিনের জীবন, পুষ্প হয়ে ফুটিয়ো পরজন্মে মোরে।
 নিবেদিত হবে পুষ্পাঞ্জলি রূপে, তব শ্রীচরণের তরে।।

(৭)

মোরা মায়াতেই সাধু, মায়াতেই চোর, মায়ারই রূপকথা।
 ত্রিগুণ শক্তি দিয়ে, সবাই বদ্ধ, কারুর নেই কোন মাথাব্যথা।।
 ব্রহ্মের স্বরূপ, বুঝতে, বোঝাতে সবাই খাবি খায়।
 পুঁথিগত পাণ্ডিত্যে, বেদের ব্যাখ্যা দেয়।।
 ‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’, বলে চিৎকার করে উঠি।
 আবার সব ভুলে গিয়ে, মায়াতেই ঢুকি।।
 তোমার দ্বারা সৃষ্টি মায়া, তুমি নয় জড়িত।
 মায়ার খেলা দেখে, চোখ বিস্ফোরিত।।
 সবাই কত অসহায়, মাকে বলে আসি।
 কখনো কি থামবে না, মায়ার অউহাসি।।

(৮)

শিবের সাধনা করি যদি কৃষ্ণ নিন্দা।
 অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি, এ ভারি চিন্তা।।
 মাথার উপর থাকেন শিব, হৃদয় মাঝে বংশীধারী।
 একই দেহে, দুজনকে কিভাবে পৃথক করি।।
 দেহ মধ্যে বিরাজিত শক্তিরূপে মা।
 কৃষ্ণ নাম, নিয়ে শক্তি নিন্দা করি।।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন নিয়ে মারামারি করি।

ব্রহ্ম যে এক এই সহজ জিনিস বুঝতে নাহি পারি।।

(৯)

আমি সন্ন্যাসী, ভিক্ষা করে খাই।

একথা বলতে আমার কোন লজ্জা নাই।।

আজ এখানে, কাল সেখানে, যখন যেমন, তখন তেমন।

কখনো গাছ তলায়, কখনো আশ্রমে, আমি দিন ভালোই কাটাই।।

যে চিন্তা নিয়ে যায় চিতায়, সে চিন্তা আমার নাই।

কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তা, করি ভাই।।

কেউ বলে ভণ্ড, কেউ সাধুবাবা বলে ডাকে।

আরও কত দেয় নাম, প্রণাম করে চরণেতে।।

বলে আমায় দেহ দিয়েছে, কর্ম করে খাও।

ঠিক বলেছ, কর্মের সাথে অনেক চিন্তা নাও।।

যার করি নাম সে গোবিন্দ বাঁচাবে আমার প্রাণ।

অর্থের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু অর্থ ছাড়াও আনন্দের জীবন পান।।

নদীর পাড়ে শোয়া।

ধর্মশালায় বিনা পয়সায় পেট ভরে খাওয়া।।

সে কি আনন্দ কি করে তোমাদের বোঝাই।

সন্ন্যাসী আমি ভিক্ষা করে খাই, একথা বলতে আমার কোন লজ্জা নাই।।

(১০)

অজ্ঞানের অন্ধকারে জগত সংসার ভূমি।

হাত ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে তুমি জ্বালালে জ্ঞানের ধুনি।।

মৃত্যুর মহামিছিল দেখে মাঝে মাঝে মনে ভয় আনি।

কিসের ভয় এত আমি তো তোর সাথে আছি শুনলাম সেই বাণী।।

হে গুরুদেব তোমায় আমি প্রণাম করি।

বামাচার কুলাচার বেদাচার পালন করে।
 কত জন্ম গেল চলে।।
 কারা যেন বলে দরকার নেই গুরু।
 নিজ থেকে কর সাধনা শুরু।।
 অনেক সময় হয়েছে নষ্ট আরো কত হবে।
 গুরু বিনে পরমখনির সন্ধান হারাবে।।
 দেরিতে নয় তাড়াতাড়ি চরণ দুটি ধরি।
 হে গুরুদেব! তোমায় আমি প্রণাম করি।।^{৬৯}

নাথ-অঘোরীধারার যোগীরগানের টেক্সট: (সংগৃহীত অংশ)

সমস্তজীবকে ভালোবাসার সাধনায় নাথ-অঘোরীধারার যোগীরা আত্মনিয়োগ করেন। সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, মান-অভিমান মুছে ফেলার আহ্বান তাঁদের গানে ধ্বনিত হয়েছে। যোগী রামনাথ অঘোরী দীর্ঘদিন নাথ অঘোর সম্প্রদায়ে থেকে বহু ভক্তকে অঘোরমন্ত্রে দীক্ষিত করে অঘোরেশ্বরে পরিণত হলেন। যোগী রামনাথ অঘোরী মনে করতেন সাধু সন্ন্যাসীর একটাই সম্প্রদায়— ‘তাঁরা সন্ন্যাসী’। তাছাড়া আর সবই ভেক। সাধক যোগী বাসুদেব তিনি তাঁর শিষ্য না হলেও প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যোগী রামনাথ অঘোরীকে খুব কাছ থেকে দেখে এসেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা নিম্নোক্ত যোগীরগান গুলিতে প্রকাশিত হয়েছে—

(১)

ওরে কে আছিস কোথা তোরা
 ওই বাজে কাড়া নাকাড়া
 মহারুদ্র চলেছে কৈলাসে ওই
 দিকে দিকে জাগে সাড়া।।
 স্বর্গের দূত এসেছে মর্ত্যে

কে যেন হয়েছে ছন্নছাড়া
মহাযোগী আজ যোগনিদ্রায়
হবে যে আত্মহারা ।।
ওই আসে ছুটে তাল-বেতাল
দেবে না দেবে না কারেও ধরা
অঘোর সন্ন্যাসী চলেছে স্বর্গে
ও যে বিশ্ব পাগল পারা ।।
ও যে বিশ্ব শ্মশানের রাজা
মণিকর্ণিকায় বসিয়েছে হাট
খুলেছে বন্ধ কারা
ওরে ও নয় মাতৃহারা ।।

(২)

বিশ্বপ্রেমিক প্রেমের ফুলে
জানায় প্রণাম তোমায়
হে যোগীবর যজ্ঞেশ্বর
কিছু বলে দাও আমায় ।।
ব্রহ্ম হতে কানে কানে মোর
বলে যেও তব কথা
আমি শপথ করেছি তব সম্মুখে
মিটাবো অন্তর ব্যথা ।।
দিও দিব্যজ্ঞান দিও গো প্রেম
আরও ঢেলে দিও মোরে
হে উদাসী সমাধি অঙ্গনে
কহি আজি কর জোড়ে ।।
মোর বীণাখানি বাজায়ে যেও

জাগরণে স্বপনে
 কহে যেও কিছু না বলা কথা
 আমারই মনে মনে।।
 যেথা থাকো তুমি হে মহারুদ্র
 পরশিও আসি নিশীথে
 যদি ভুলে যাই এ পথ চলিতে
 টেনে নিও তব সাথে।।
 লহ নমস্কার লহ প্রণাম
 গাহি বন্দনা তব গান
 যা ছিল হৃদয়ে সবই করে গেনু
 ঐ রামনাথ পদে দান।।

(৩)

আমার দিন ফুরালো ও মা তারা
 এবার চলে যেতে হবে
 পাগলা রামনাথ এবার—
 তোদের ছেড়ে চলে যাবে।।
 শ্মশান মশান ঘুরলাম কত
 দেখছি জ্বলছে ঐ যে চিতা
 তারার কোলে ঘুমাবো এবার
 পাগলা চলে যাবে।।

যোগী সাধক বাসুদেবকে ১৯৭৯ সালে নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে যোগী রামনাথ
 অঘোরীবাবা ভস্মেশ্বর শ্মশানে বসে এই গানটি শুনিয়েছিলেন। এই গানটি যোগী রামনাথ
 অঘোরীবাবার প্রিয় গান ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে গানটির নির্যাসটুকু গ্রহণ করতেন বলে
 সাধক যোগী বাসুদেব উল্লেখ করেছেন।^{৭০}

(৪)

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরুদেব মহেশ্বর
গুরু অখণ্ড পরম জ্যোতি
চিদাকাশে ঈশ্বর ॥
গুরু মন্ত্র গুরু তন্ত্র
গুরু যোগ যজ্ঞেশ্বর
গুরু মাতা গুরু পিতা
গুরুই ভবে পরমেশ্বর ॥
গুরু জ্ঞান গুরু ধ্যান
গুরুই ইষ্ট নিখিলেশ্বর
পরপার গুরু এ তিন ভুবনে
গুরুই একম্ বিশ্বেশ্বর ॥
অশ্রুও তিনি আনন্দও তিনি
এহ তারা সবই লোকেশ্বর
লোক হতে ঐ লোকাভীতে
বিরাজিছেন গুরু ঈশ্বর ॥

(৫)

নাশ কর মম অসুরবৃদ্ধি
নাশ কর মহারুদ্ধ
কামনা বাসনা ক্ষুধার তাড়না
নাশ কর প্রভু রুদ্ধ ॥
রুদ্ধ কর হে মানব পাত্রে
অসহায় যত ছিদ্র

দাও প্রেম দাও হৃদয় ভরিয়া
আমরা যে অতি ক্ষুদ্র ॥
মহানের দ্বারে মাগি কর জোড়ে
হতে পারি মোরা শূদ্র
ব্রাহ্মণ তুমি কর পবিত্র
অমৃতে ভর গো পাত্র ॥
তোমারই অমৃত বাণী হয় যেন
অমৃতস্য পুত্র
নমো গুরুদেব শ্রীরামনাথ
নাশ কর পাপ রুদ্র ॥

(৬)

তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম অচ্যুত হরি
অবধূত নারায়ণ
তুমি শ্মশানেশ্বর মহাশ্মশানে
অনাথের যত ধন ॥
তুমি সিদ্ধিদাতা মহাগণেশ
জগতেরে কর তারণ
তুমি পরম প্রসাদ অমৃত সাগর
তন্ত্রের উপবন ॥
তুমি মন্ত্র মুক্তি সাধন মূলে
কারণ আর অকারণ
তুমি ব্রহ্মানন্দে বিরাজিছো ভবে
তুমি শুদ্ধ চৈতন্য ব্রাহ্মণ ॥
তুমি বেদীমূল তুমিই মুরতি
ধ্যান ধারণা অনুক্ষণ

তুমি প্রভাতে বাল গোপাল
অচ্যুত নারায়ণ ।।

(৭)

সমাধি তীর্থে তীর্থ কর—
গুরুর চরণ মূলে
জাগিবে চেতনা অন্তরে জেনো—
গুরুর কৃপাটি হলে ।।
জাগিবে গুপ্ত আদিশক্তি
গুরু লবে টেনে কোলে
পরশ কর গো তীর্থ মন্দির
জয় গুরু জয় বলে ।।
মুছে যাবে যত আঁধার কালিমা
ভাসো গো নয়ন জলে
সমাধি তীর্থে এসো মিলি সবে
উঠিবে সে ভূমি দুলে ।।
গাহি তাঁরই গান এসো করি দান
যা আছে সর্বস্ব ঢেলে
গুরু সেবা কর গুরু পূজা কর
সমাধি জাগিবে ফুলে ফুলে ।।

(৮)

গুরু পরমপদে ঠাঁই লয়েছো
ভবের মায়া ভুলে
আমরা যে গো আজিও কাঁদি
তোমারই তো ছেলে ।।
কত লীলা করে গেলে

দিবানিশি সাথে খেলে
কেউ জানে না তোমার মায়া
কারেই বা কি দিলে।।
তোমার ছবি অন্তরেতে
সাজিয়ে ফুলে ফুলে
দয়াল গুরু পথ চেয়ে রই
কবে আসবে নিতে তুলে।।
অনেক আশায় পথ চেয়ে রই
ভাবছি পলে পলে
গুরুর পদে কবে যাবো
সকল মায়া ফেলে।।

(৯)

কার তরে কর আঁধার কুঠিরে
অভিষেক আজি যোগী
মুকতি মন্ত্র সিদ্ধ করিতে
গিয়াছো কি সব ত্যাগী?
কোন ভক্তের বাসনা মিটাতে
রয়েছো আঁধারে জাগি
এসো যোগীরাজ রামনাথ স্বামী
ভক্তের ব্যথা লাগি।।
অবধূত তুমি অবধূতিকায়
শ্মশানের শিব যোগী
ও আঁধার ছাড়ি এসো গো ধরায়
আমরা যে অনুরাগী।।

(১০)

মহাবীরের সাধন করে
জয় করেছো মন
তুমি মুক্ত হলে সাধন বলে
তোমার মুক্ত ঐ চরণ।।
রামনাথ তাই নাম নিয়েছো
সিদ্ধ যে সাধন
রামের প্রসাদ দিতে ভবে
করলে ভীষণ পণ।।
মহাবীরের হৃদয় নিয়ে
তাজিলে যে ধন
তোমার মত এমন গুরু
পেয়েছে কয়জন।।
সেই সাধনের ব্রত খানি
দাও না শিথিয়ে এখন
পরমধামে যাবো চলে
যেথা তোমার মুক্ত চরণ।।

(১১)

করুনা সাগর তুমি হে মহেশ্বর
বিপদভঞ্জন তুমি হে যজ্ঞেশ্বর
তাই তো দিবানিশি করি যে স্মরণ
হে প্রভু দয়া কর ওগো বিশ্বেশ্বর।।
ভ্রমি মোরা আঁধারে হে প্রাণেশ্বর
দেখাও শুদ্ধপথ হে গুণেশ্বর
কেমনে মুকতি পাবো কহ ভগবান

তোমারই বাণী লয়ে কাঁদি হে ঈশ্বর ।।

মানব জনম প্রভু দিও নাকো আর
চাই না মোহে ভরা মিথ্যে এ সংসার
ব্রহ্ম হতে দাও গুরু প্রসাদ তব
নমো হে চন্দ্রকান্ত হে রামেশ্বর ।।

(১২)

বাবা আমার পাগল ভোলা
ন্যাংটা শ্মশানে
জ্বালিয়েছে তাঁর সব বাসনা
চিতার আগুনে ।।
বাবা আমার বাউল হয়ে
আছে গানে গানে
সুরগুলি তাই লুটায় ওরে
বাবার চরণে ।।
বাবার আছে একটি ঝোলা
ঘরের ও কোণে
সেই ঝোলাতে পেলাম খুঁজে
রাতের গহনে ।
একমুঠো ছাই ছিল তাতে
কেউ কি তা জানে
মেখে নিলাম বাবার প্রসাদ
আমার মনে মনে ।।

(১৩)

আমার এমন দিন কি

হবে ও গুরু
যবে তোমার নামটি সার করে
হবে আমার যাত্রা শুরু।।
দুই নয়নে তোমার নামে
বইবে ধারা গানে গানে
সেই দিনটি আসবে কবে
কবে শান্ত হবে জীবন মরু।।
কবে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে
ঐ চরণে পড়বো গিয়ে
সেই আশাতে আছি বসে
বক্ষে করে দুরু দুরু।।

(১৪)

কে এসেছে দেখনা চেয়ে
শ্মশান ভস্ম মেখে
আপন রূপটি এমন করে
কে রেখেছে ঢেকে।।
রামনাথ যার নামটি ধরায়
চিনতে পারে কে তাকে
সে যে শ্মশান সিদ্ধ পীর বাবারে
দেখ না তাকে ডেকে।।
পাবি সারা দেবে ধরা
নেবে টেনে বুকে
এমন পুরুষ আর কি তোরা
দেখবি ও চোখে।।

(১৫)

কর্ণকুহরে যে নাদ ধ্বনি
 শুনায়ে দিয়েছো স্বামী
 তাহা যেন মোর সম্পদ হয়
 কিছু নাহি চাহি আমি ।।
 ভেদ কর মোর কর্ণকুণ্ডল
 গুরু মোর যে গো তুমি
 অনাতের নাথ রামনাথ প্রভু
 তোমার ও চরণে নমি ।।
 নবনাথ আর চুরাশি সিদ্ধর
 একজন প্রভু তুমি
 কর নাদ ধ্বনি ফুকার শিঙা
 তুমি যে জগৎ স্বামী ।।

(১৬)

কাজ কি রে সামান্য কথায়
 যার নামেতে জগৎ কাঁদে
 সেই যে আজ সবার সহায়
 কাজ কি রে সামান্য কথায় ।।
 রামনাথ যার হাত ধরেছে
 সে কি কভু মরে গেছে
 দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
 সে নিয়েছে যে বিদায় ।।
 যার পদতলে বিশ্ব লুটায়
 কত যম দানবের মুক্তি হয়
 এমন গুরুর প্রসাদ খেয়ে

দেনা যত চিন্তা বিদায় ।।

(১৭)

প্রভু তোমারে মনের কথা
আমি জানাই অন্তর ব্যথা
অসাধু করো না এই ধরনীতে
গাহিব তোমারই গাথা ।।
সাধু হতে কভু চাহি নাই আমি
মানুষের যত ব্যথা
মানুষ হইয়ে করিব গো জয়
হোক নত আজি মোর মাথা ।।
মুছে দিয়ে যাও কামনা- বাসনা
গাহিব না নিজ গাথা
বিশ্ব জনেরে বিলাবো প্রেম
শুধু রামনাথ কব কথা ।।

(১৮)

তুমি লোকেশ্বর লোকানন্দ
পুরুষোত্তম নারায়ণ
তুমি ব্রহ্মানন্দ নিখিলেশ্বর
কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ।।
গোলকের নাথ বাসুদেব তুমি
মহাদেব অনুক্ষণ
তুমি সর্বশ্রী বিশ্বশ্রী
শ্রীগুরু নারায়ণ ।।
পরমপুরুষ পরমশক্তি
সকলের প্রিয়জন

তুমি সকলের সাথি বিশ্বব্যাপীয়া
শান্ত কর গো মন।।

তুমি বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি
করি যে নিত্য চয়ন
তোমারে প্রণাম জানায়ে নিত্য
পূজা করি সমাপন।।

(১৯)

হৃদি মন্দিরে বিরাজ কর
নবাবরূপে সাজে দেবতা
বল বল তুমি কোন লোক হতে
পাঠায়েছো বারতা।।
বল হে যোগী কোন মহাধামে
জ্বালায়েছো ধুনি চিতা
তুমি যদি রাম হও গো ভুবনে
কোথা গেল মম সীতা।।
বল সুন্দর হে শংকর
তুমি কি জীবের ত্রাতা
হৃদি মন্দিরে বিরাজ কর
হে রামনাথ পিতা।।

(২০)

সমাধির দ্বারে পূজিতে এসেছি
অন্তর বীণা লয়ে
ভাঙাবো কি ধ্যান কহ সুন্দর
হারাবো কি গান গেয়ে।।

তোমা হতে আসে সুদূরের বাণী
বাজে বাঁশুরীর নূপুরের ধ্বনি
সবই মনে হয় চিনি ওগো চিনি
লগন কি যাবে বয়ে ।।
কহ হে উদাসী ওগো পরবাসী
কত রব পথ চেয়ে
সমাধির দ্বার দাও খুলে দাও
পূজারীরা আসে ধেয়ে ।।

(২১)

গুরু আছেন পরম ধামে
সেই তো আমার দেশ
গুরুগৃহে ঠাঁই লব ভাই
তাই করি আদেশ ।।
যোগীরাজের রাজত্বে ভাই
নাই কো ভয়ের লেশ
নবনাথ আর চুরাশি সিদ্ধের
নানান নানান ভেষ ।।
অঘোর হয়ে পরম ঘোরে
সদাই আছেন ভাবের ঘরে
সেই দেশেতে যাব এবার
পেয়েছি তাই আদেশ ।।^{৭১}

২. সাধনতত্ত্ব বা যোগতত্ত্ব বা গুরুব্রত যোগসঙ্গীত:

নাথপন্থের যোগীগণ যেসব সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিবৃত্তি মার্গে আকর্ষণ করতেন
সেইসমস্ত সঙ্গীতে একদিকে যোগতত্ত্ব, অন্যদিকে বৈরাগ্যসাধন মূল আবেদন হিসেবে কাজ

করেছে। গ্রামীণ বিভিন্ন লোকগানের সুর, কোথাও ভাটিয়ালি সুরে বৈরাগ্যের সঞ্চার ঘটানোই এই ধরনের যোগীর গানগুলির লক্ষ্য। প্রাচীন সঙ্গীতের রস আন্বাদনের মাধ্যমে বৈরাগ্যমূলক যোগীরগানগুলি আবহমান কাল ধরে মানুষের মনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। যেমন –‘শ্রীশ্রীগুরুব্রত যোগসংগীত’ ইত্যাদি।

৩. নাটগীতিমূলক যোগীরগান:

যোগীরগান কেবল নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে এখন সীমাবদ্ধ নেই। তারফলে অনেক যোগীর গান পালা বা নাটকের মতোও পরিবেশন করা হয়। মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনি বা গানগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগে এতবেশি জনপ্রিয় হয়েছিল যে নাট্যধারায়ও অস্তিত্ব মেলে। এখনো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ‘মোনাই তোনাই’ পালায় তার অস্তিত্ব রয়েছে। যোগীর গানের নাট্যরীতির পরিবেশনা রাজশাহী, বগুড়া অঞ্চলেও পরিবেশিত হয়। যোগীর গানের দলের সদস্যগণ তাকে যোগীর গান বলেই পরিচয় দেন। যোগীর গানের বিভিন্ন পালায় নাথ সম্প্রদায়ের যোগতত্ত্ব বিশেষ করে সৃষ্টিরহস্য, দেহতত্ত্ব, চন্দ্রসাধন, স্বপ্নতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। যোগী শিব ও যোগিনী দুর্গা মর্ত্যে এসে লোকায়ত সমাজে যোগজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেন। এই যোগীর গান নাটকের মত পরিবেশিত হলেও এখানে কায়াসাধনার কথা বলা হয়েছে।^{৭২} যেমন-পূর্ববঙ্গে প্রচলিত যোগীর গান, হেচো গান বা গোরক্ষনাথের গান ইত্যাদি।

৪. বন্দনামূলক বা আখ্যানমূলক যোগীরগান:

গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বনে বহু যোগীর গান রচিত হয়েছে। এখনো এই ধরনের যোগীর গান রচিত হয় এবং গাওয়া হয়ে থাকে। এমনকি বিভিন্ন পুজো, অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উমা, মেনকাকে অবলম্বনে যোগের যেসমস্ত কাহিনি ও আচরণ প্রচলিত আছে সেবিষয়েও যোগীর গান রচিত হয়েছে। এই ধরনের যোগীর গানে একটা প্রচলিত বিষয়বস্তু বা কাহিনি গড়ে উঠেছে। এদের আখ্যানমূলক যোগীর গান বলা যেতে পারে। যেমন—দুর্গামঙ্গলের গান বা নিগম সপ্তক, তিননাথের গান, গোরক্ষনাথের মাগনের গান ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১. জীবন নাথ, *নাথযোগের প্রাচীন ঐতিহ্য*, আদিনাথ শিক্ষাভাণ্ডার স্মরণিকা, পৃ. ৬।
২. মৎস্যেন্দ্রনাথ, *যোগবিষয়ঃ*, শ্লোক ৮-১৩; ভোলানাথ নাথ, *ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়*, পৃ. ১৫৪।
৩. সুকুমার সেন, *বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড*, পৃ. ২৫৮।
৪. P. K. Bandhyopadhyay, *Natha Cult and Mahanad A Study in Syncretism*, p. 23.
৫. জীবন নাথ, *নাথযোগের প্রাচীন ঐতিহ্য*, পৃ. ৬।
৬. অথ কুলাঞ্জিপট বা মীননাথ-গোরক্ষনাথ সম্বাদ, রাজমোহন নাথ, *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ২৩৯।
৭. মৎস্যেন্দ্রনাথ, *কৌলজ্ঞাননির্ণয়*, শ্লোক ৬/৫।
৮. গোরক্ষ উপনিষদ, রাজস্থানী ভাষা; *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ২২৪।
৯. ঐ, পৃ. ২২৪।
১০. ঋগ্বেদ ৮/৪৮/৩।
১১. ঋগ্বেদ ১০/৮৫/৩।
১২. রাজমোহন নাথ, *নাথধর্মে বেদতত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১, ৪র্থ সংখ্যা।
১৩. ঐ।
১৪. L. P. Tessitori, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. XII, pp. 833-835.
১৫. *ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা*, ১০ বর্ষ, সংখ্যা ১১, ২০০১, জীবন নাথ সংখ্যা, অনিল দাশ পুরকায়স্থ (সম্পা.), পৃ. ১১৫।
১৬. ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৫।
১৭. *ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা*, পৃ. ১১৫-১১৬।
১৮. ক্ষিতিমোহন সেন, *জাতিভেদ*, পৃ. ২৩।
১৯. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *কবীর*, রাজমোহন নাথ, *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ২২৭।
২০. *হাড়মালা*, নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পা.), পৃ. ৫-৬।

২১. বিশ্বনাথ রায়, বায়ুবিজয়শাস্ত্রের সন্ধানী সম্পাদক, পুঁথিপ্রাজ্ঞিক পঞ্চগনন মণ্ডল চর্চা ও চর্যা, অণিমা মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা কুণ্ডু ও প্রণবকুমার সাহা (সম্পা.), পৃ. ৬০।
২২. গোর্খবিজয়, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ২৮।
২৩. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ, পৃ. ৭৯।
২৪. বিদ্যারণ্য স্বামী (১৩৫৩-১৩৭১), শঙ্কর দিগ্বিজয়, শ্লোক ৯/৮০।
২৫. সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৩৫।
২৬. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, পৃ. ৩৩।
২৭. রাজমোহন নাথ, বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, ভূমিকা পৃ. ৬।
২৮. বৃন্দাবন দাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), শেষখণ্ড, পৃ. ৩৩১।
২৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩।
৩০. ক্ষিতিমোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, পৃ. ৯৫।
৩১. গোপীনাথ কবিরাজ, কাশীর সারস্বত সাধনা ও পত্রাবলী, পৃ. ১৪৯।
৩২. ভারতীয় সাধনা, নাথপন্থ, পৃ. ৮১।
৩৩. যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ, পৃ. ১১।
৩৪. সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।
৩৫. মোকাদ্দেসুর রহমান, হোসেনশাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪-১৫৩৮), মমতাজুর রহমান তরফদার (অনূ.), পৃ. ১৫১।
৩৬. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব, পৃ. ৮৩-৮৫।
৩৭. উমা সেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ, পৃ. ৬।
৩৮. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।
৩৯. আব্দুল হালিম প্রামাণিক, বাংলাদেশের নাথসম্প্রদায়ের নাট্যঐতিহ্য স্বরূপ ও সমীক্ষা, পৃ. ৫১।
৪০. যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ, পৃ. ৩৫।
৪১. গোরক্ষপদাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা পৃ. ৪।

৪২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৪/২২।
৪৩. রাজমোহন নাথ, নাথযোগী তত্ত্ব, পৃ. ২৯।
৪৪. মহাভারত শান্তিপর্ব, ৩৫১ অধ্যায়।
৪৫. Kirata-jana-krti, p. 151.
৪৬. বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।
৪৭. সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, মহাভারতের সমাজ, পৃ. ৪৬৮-৫২১।
৪৮. আহমদ শরীফ, বাঙলার সূফী সাহিত্য, পৃ. ৩৮।
৪৯. সুকুমার সেন, গোখবিজয়, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), ভূমিকা পৃ. ৮১-৮২।
৫০. হরেকৃষ্ণ দে, আত্মারাম শ্রীশ্রীবাবা সুন্দরনাথ, পৃ. ১।
৫১. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, পৃ. ৭৯।
৫২. লোক-সাহিত্য সঙ্কলন, চতুর্দশ খণ্ড, আলমগীর জলিল (সম্পা.), পৃ. ৩১।
৫৩. আবদুল ওয়াহব, বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, পৃ. ১৬৭।
৫৪. ভবনাথ সরকার, নাথধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ. ১০৪।
৫৫. রঞ্জিত দে, ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ও জনজীবন, পৃ. ৪৩।
৫৬. ঐ, পৃ. ১২।
৫৭. জীবন নাথ, তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ২৭।
৫৮. প্রভাষচন্দ্র নাথ, বরাক উপত্যকার লোকছড়া, তুষারকান্তি নাথ (সম্পা.), আকাদেমি পত্রিকা, ২০১১-১২; তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ২৫।
৫৯. বাংলাদেশের নাথসম্প্রদায়ের নাট্যঐতিহ্য স্বরূপ ও সমীক্ষা, পৃ. ১৩০।
৬০. Ann Grodzins Gold, *A Carnival of Parting the Tales of King Bharthari and King Gopi Chand*, p. 42.
৬১. গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃ. ৮।
৬২. কল্যাণী মল্লিক, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ৩৬১।

৬৩. গোপীনাথ কবিরাজ, *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত*, পৃ. ৩৭৩।
৬৪. ভবানী দাস, *গোপীচাঁদের পাঁচালী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।
৬৫. গোপীনাথ কবিরাজ, *ভারতীয় সাধনার ধারা*, পৃ. ৯০।
৬৬. কঠোপনিষদ ২/৩/১৪।
৬৭. Kaulajnana-Nirnaya of Matsyendranatha, 6th Patala, Sloka-7.
৬৮. গোপীনাথ কবিরাজ, *তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম*, উত্তরা পত্রিকা, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ১১২।
৬৯. যোগী আনন্দনাথ, *আনন্দের অনুভূতি*, পৃ. ১২-৪০।
৭০. সাধক বাসুদেব, *আদেশ পত্রিকা*, পৃ. ১৬।
৭১. সাধক বাসুদেব, *আদেশ পত্রিকা*, পৃ. ১২-৪৭।
৭২. আব্দুল হালিম প্রামাণিক, *বাংলাদেশের নাথসম্প্রদায়ের নাট্যঐতিহ্য স্বরূপ ও সমীক্ষা*,
পৃ. ১৭৬।

৫. খ. নাথসম্প্রদায়ের যোগীর গান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদহে থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ মানুষের গভীর সান্নিধ্যে আসেন। সেখানকার লোকায়ত সংস্কৃতি ও অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতির ইতিহাস জানার সুযোগ তিনি লাভ করেন। গ্রামবাংলার মানুষদের জীবনচর্যা ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি এইসব সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে এগিয়ে এলেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে নাথসম্প্রদায়ের সাধন বিষয়ক কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন। নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই ‘যোগীর গান’ গুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উৎসাহে ড. পঞ্চগনন মণ্ডলের ‘গোখবিজয়’ পুথিটি সম্পাদিত হতে পেরেছিল।’ ‘গোখবিজয়’ প্রথম প্রকাশের সময় ড. পঞ্চগনন মণ্ডল বইয়ের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

‘রবীন্দ্রনাথের পুণ্যনামে / নিবেদিত হইল।’

শিলাইদহ কুমারখালির যোগীদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাথপন্থী সিদ্ধ যোগীদের হঠযোগ সাধনার পুথি ‘যোগীরগান’ সংগ্রহ করেন। ড. পঞ্চগনন মণ্ডলের ‘গোখবিজয়’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সম্পাদনা করে ‘যোগীর গান’গুলি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ড. বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন—

জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের দিয়ে পুঁথিটির অনুলিপি করিয়েছিলেন কবি। এবং তার থেকে অনেকগুলি গান শান্তিনিকেতনের সাহিত্য সভায় পাঠ করে শুনিয়েছিলেন ১৩২৮ সালের ২৪ ফাল্গুন।^২

‘যোগীর গান’ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়ের গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত ঘুরে ১৩৫৫ বাংলা সালে বাংলা পুঁথি বিভাগে জমা পড়ে। এর পরের বছর ‘যোগীর গান’ মুদ্রিত হয়। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ‘যোগীর গান’ ‘গোর্খবিজয়’ গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে।

শুধুমাত্র ‘যোগীর গান’ নয়, বিশ্বভারতীতে বিভিন্নজনের সংগ্রহে নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাহিত্য ছিল। ড. পঞ্চানন মণ্ডল অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সংগ্রহ থেকে ভীমসেন রায়ের পুঁথিটি সংগ্রহ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর পুঁথি সংগ্রহে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছের মানুষ। ‘গোর্খবিজয়’ ছাড়াও তাঁর সংগ্রহে নাথপন্থের অন্য পুঁথিও ছিল। ড. পঞ্চানন মণ্ডল ‘গোর্খবিজয়’-র দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ করেছেন—

বিশ্বভারতীতে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে আমি একখানি পুঁথি দেখেছিলুম- ‘গোর্খসংগীতা’। মীন-গোর্খের প্রশ্নোত্তরী বিষয়ে এই পুঁথিখানির সহিত পরিশিষ্ট ‘গ’-এ মুদ্রিত পুঁথিখানির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলুম। একই পুঁথির খন্ডাংশ হওয়া সম্ভব। এই ‘গোর্খসংগীতা’ পুঁথিখানি বর্তমানে পুঁথির গহন অরণ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না।^৩

‘গোর্খবিজয়’ -র ‘খ’ পরিশিষ্ট অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ‘যোগীর গান’ পুঁথির সম্পাদিত পাঠ যুক্ত হয়েছে। ১৩৫৬ বাংলা সালে ‘গোর্খবিজয়’ প্রকাশিত হয়। ঠিক তার আগের বছর ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে ‘যোগীর গান’-র সম্পাদনার কাজ দ্রুত শেষ হয়। তখন অবশ্য পুঁথি সম্পাদনার আধুনিক পদ্ধতি চালু হয়নি।

শিব বা আদিনাথই নাথসম্প্রদায়ের উপাস্য। তিনি অনাদি ও পরমব্রহ্ম স্বরূপ। নাথযোগীসম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁকে নাথ বা পরমব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন। তারা মানবদেহকে কেন্দ্র করে যোগমার্গে দেহাতীতের সাধনা করেন। গুরুশিষ্য পরম্পরাতে এই সাধনায় নাথসিদ্ধ সিদ্ধি বা শিবত্ব অর্জন করেন। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ এবং যোগী গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথপন্থাই নাথযোগীদের আদর্শ। নাথসিদ্ধ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধার স্বরূপ জীবাত্মাকে মূলাধারচক্রে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে একাত্মতার চিন্তা করেন। তারপর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, বিশুদ্ধ, অনাহত এবং আজ্ঞা এই ছয়চক্র ভেদ করেন। শেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত সহস্রদল চক্রে পরম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হন।^৪ এটাই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা, শিব ও শক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগসাধন। নাথ সন্ন্যাসী বা যোগীগণ পুরুষ ও প্রকৃতির একীভূত অবস্থাকে ব্রহ্ম বলে ভাবেন। ব্রহ্ম নির্গুণ। কিন্তু নির্গুণের সাধনা সম্ভব নয় বলে ব্রহ্মকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে কল্পনা করে নাথযোগীরা কায়াসাধনা বা যোগসাধনার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ‘যোগীর গান’-এ কায়াসাধনা বা যোগসাধনারই পরিচয় পাওয়া যায়—

‘মানবদেহের খবর জানরে মন,
দেহের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোথায় বৃন্দাবন।
দেহে দশজনা আছে ছয়রিপু তার কাছে,
পঞ্চতত্ত্ব শ্রবণতত্ত্ব গুরু (যে) দিয়াছে।
দেহে কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কে দেখায় স্বপন,
দেহে আছে পঞ্চজন তার কেমন রে গঠন।
কোথায় বসতি কোথায় স্থিতি কোথায় করে গমন,
দেহের কয়জনা বা পুরুষ বটে প্রকৃতি বা কয়জন।’^৫

যোগসিদ্ধিবিহীন দেহ বিনাশের কারণ। তাই আজও নাথযোগী সন্ন্যাসীগণ হঠযোগ সাধনা করে অজর অমর হওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিটি মানুষ সুখ চায়। অথচ যোগীরা অন্যের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে কষ্টসাধ্য জীবনশৈলী বেছে নেয়। কিন্তু কেন? সেই বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা ‘যোগীর গান’ গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আজও মেদিনীপুর, কোচবিহার, এবং পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া জেলাতে ‘যোগীর গান’ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে বাঙালি গায়নের দল পরিবেশন করেন। শ্রোতা হিসেবে গ্রামের লোকেরা আগ্রহে অবাধে যোগ দেন। কারণ প্রতিদিনের সুখদুঃখের জীবনের বাইরে একটা কসমিক জগতের সন্ধানের চেষ্টা থাকে তাতে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নাথসম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্বমূলক সংগীতকে ‘যোগীর গান’ বলা হয়। অঞ্চল বিশেষে নাথসম্প্রদায়, নাথযোগী সম্প্রদায় বা যোগী সম্প্রদায় বা নাথ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। সিদ্ধযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ বা হাড়িপা এবং কানুপানাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা, সাধনভজন প্রভৃতি ‘যোগীর গান’-র বিষয়বস্তু। একসময় বাংলার বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন অঞ্চলে নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে মেদিনীপুর, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, নাটোর, বগুড়া, দিনাজপুর, সিলেট ও কুমিল্লা জেলায় ‘যোগীর গান’ প্রচলিত ছিল। এখনও মেদিনীপুর, কোচবিহার, নাটোর, বগুড়া, রাজশাহী অঞ্চলে যোগীর গান প্রচলিত আছে। উপরোক্ত জেলাগুলিতে আজও যোগীপাড়া, নাথপাড়া, নাথেরকান্দি, যোগীর চর নামে বেশ কিছু এলাকা এবং নাথযোগীদের তীর্থস্থান বা সাধনপীঠের অবস্থানও লক্ষ করা যায়। সামাজিক বিবর্তনে ক্রমশ নাথযোগী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সমাজে

মিশে যাওয়ায় আজকাল নাথযোগীদের মধ্যে যোগীর গানের তেমন প্রচলন নেই। তবে যোগীর গান অন্যান্য সম্প্রদায় ও অন্য ধর্মের গীতকদের মুখে আজও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শোনা যায়। যোগীর গানে ব্যবহৃত বিশেষ বাদ্যযন্ত্র একতারা বা ‘গোপীযন্ত্র’ ব্যবহার করতে খুব কমই দেখা যায়। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সংসারত্যাগী সিদ্ধযোগীরা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যোগীর গান গেয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন। তাঁদের হাতে লাউয়ের ভিক্ষাপাত্র, ডমরু ও সিঙ্গা থাকত। তাছাড়া গায়ে গৈরিক বা লালবস্ত্র এবং মাথায় একই রঙের পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা তাঁরা পরিধান করতেন। আজও উত্তর ভারতে নাথযোগী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ‘গোপীযন্ত্র’ বাজিয়ে ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে’-র গান গেয়ে ভিক্ষা করেন। এই ‘গোপীযন্ত্র’ বা একতারাটি রাজা গোপীচন্দ্রনাথের স্মৃতি বহন করছে। সাইমন জাকারিয়া বলেছেন—

নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও নাথধর্মমত কেন্দ্রিক একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকের অস্তিত্ব রয়েছে উত্তরবঙ্গের নাটোর ও বগুড়া অঞ্চলে। এই ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকটি যুগীর গান বা যোগীপর্ব নামে পরিচিত। মূলত নাথধর্মের বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত দর্শনের ধারায় মৌখিক রীতিতে উপস্থাপিত এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্য।^৬

উল্লেখ্য গ্রামীণ সমাজে যোগীকে আঞ্চলিকতার প্রভাবে যুগী বলা হয়। বর্তমানে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগীর গান প্রচলিত হওয়ার ফলে গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাজপোশাক, বাদ্যযন্ত্র ও পরিবেশন রীতির ভিন্নতা চোখে পড়ে এবং নাথ সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে যোগীর গান এখন সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাথসাধন পদ্ধতি ও দর্শন জানার কারণে ‘যোগীর গান’ সংগ্রহ করেননি। তিনি একাজ করেছিলেন দেশের লোকায়ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণের

কারণে। তিনি মনে করতেন দেশের প্রতি ভালোবাসার প্রধান কর্তব্য হল দেশকে জানা। বিভিন্ন স্থানের সামাজিক প্রথা, ছড়া, গানে অনেক বিষয় জানার থাকে। তিনি লোকাযত সংস্কৃতির উপাদানগুলি শুধু সংগ্রহ করেননি, তার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন লোকাযত সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য—

তিনি লোকাযত সংস্কৃতির ক্ষীণ অথচ চির প্রবহমান ধারার ঘাটে ঘট

ভরেছেন নূতন জীবনপ্রেরণা নূতন রূপ নূতন রস আহরণের জন্যে।^৭

শুধু আহরণই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গ্রামবাংলার প্রতি আগ্রহ বোধ, দেশপ্রেম এবং জনপদ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনন্যসাধারণ মনন চেতনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ অঞ্চলে লালন ফকির অথবা কুমারখালির বাউল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আটখানা ‘যোগীর গান’ সংগ্রহ করেছিলেন।^৮ আটখানা গানে দীননাথ, এছা (এশাক বা ঈশা), শ্যামাচরণ ও গোপালধারীর নাম পাওয়া যায়। নাথ সম্প্রদায়ের গানগুলির তাঁরা হয়ত সম্পাদক বা গায়ক হবেন। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ‘যুগীকাচ’ বা ‘যোগীকাচ’ গ্রন্থেও এরকম অনেক গানের সংকলন লাভ করা যায়। এমনকি ‘গোরক্ষবিজয়’, ‘গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস’ গ্রন্থের কাহিনির মধ্যেও গানের সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। বিদ্যাধরি গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থের আগের রাত্রিতে যোগান্ত ও ভেদান্ত গান পরিবেশন করেছিল—

‘কেওয়া গোলাপ বাসে ফকির যুগীর বেশে কবি সুকুর মামুদ ভুলে।

যোগ পাঁচালীতে গায় নাচনী নাচিয়া যায় বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখোয়াজ।’^৯

এই শ্রেণির নাথসম্প্রদায়ের যোগীর গান ‘যোগান্ত’ ও ‘ভেদান্ত’ গান নামেই পরিচিত ছিল। গ্রিয়ার্সন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের রংপুর থেকে চারজন নাথযোগীর কাছ থেকে ‘মাণিকচন্দ্র রাজার গান’ সংগ্রহ করে এর উপস্থাপন রীতি বর্ণনা করেছেন। চারজন নাথযোগী আসলে চারজন নাথসিদ্ধর (মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ বা হাড়িপা এবং কানুপানাথ) প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাংলার লোকসমাজে গোরক্ষনাথ এখনও গোসম্পদের প্রতিপালনকারী দেবতা হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন। বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, অসম ও উত্তরবঙ্গে গোরক্ষনাথের ‘সেবা’ পূজা প্রচলিত আছে।^{১০} এই পুজোয় রণাগায়ক ও বালকেরা পাঁচালির আকারে ছড়াগান পরিবেশন করে। এই যোগীর গান গুলি গোরক্ষনাথের মাগনের গান নামেও পরিচিত। সেলিম আল দীন ময়মনসিংহ অঞ্চলের এইরকম একটি গোরক্ষনাথের গানের উল্লেখ করেছেন—

‘রণাগায়ক। থুব বনা থুব বাজে,--বালকগণ। হাচো
কাইচ কড়িটি বুমুর বাজে হাচো
বাজে বুমুর বাজে তাল হাচো
আমার গুরুখ জগৎমাল হাচো
ইত্যাদি’^{১১}

রংপুর থেকে সংগৃহীত ‘মোনাই-তোনাই’ পালাগানেও নাথ-যোগধারা এবং সুফি ভাবাদর্শের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। যেমন—

‘তকোন জলের ওপরেতে আছিল হরি শয়ন করি।
তকোন আছিল পিতিবি শূন্যে নৈরাকার।’^{১২} ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘যোগীযাত্রা’-র গানগুলি কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি এইসব বিষয়ের প্রতি কতটা আগ্রহী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠি থেকে। শাহজাদপুরে থাকাকালীন সময়ে তিনি এই চিঠিটি লিখেছিলেন

সাজাদপুর

ওঁ

অবন,

আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগচে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাখির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করছি। তোমাদের বুড়িদাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভালো না।

রবিকাকা।^{১০}

লোকসাহিত্যের লোক-মনোরঞ্জন ও নন্দনতত্ত্বগত মূল্যকে স্বীকার করে বলা যায় আজও ‘যোগীর গান’গুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সৌন্দর্যচেতনা ও কল্পনাশক্তি বিকাশে গানগুলির আবেদন শাস্ত্রত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত একটি যোগীর গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর।
 মনুষ্য দুর্লভ জন্ম অনেক সাধনে,
 ফিরে যে মানুষ হবে জানিবে কেমনে।
 এখন না নিলে নাম জিহ্বার আলসে,
 অন্তিমে সে নাম যদি মুখেতে না আসে।’^{১৪}

এই গানের মধ্যে একটা অরূপের অনুভূতি কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে করতেন সমস্ত সৃষ্টির পেছনে এক অদেখা সত্তার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যোগীর গান-র ভাব, কথা ও সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি গান—

‘আমি যখন ছিলাম অন্ধ
 সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।’

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর বা দেবতাকে খুঁজেছিলেন এক অন্তর্মুখী ভাবনার পথ ধরে। রবীন্দ্রনাথ যোগী, বাউল সম্পর্কে শুধু দেশবাসীকে নয়, বিশ্ববাসীকেই অবহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে যোগী বা বাউল না হলেও মনের গভীরে এইসব প্রভাবকে রীতিমতো স্বীকার করেছিলেন। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’-য় মানুষের প্রতি করুণায় বাল্মীকি যেন যোগী বা বাউল হয়ে উঠেছিলেন। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে সন্ন্যাসী, যোগী বা সাধকের মতন আচরণ করেছেন। এমনকি ‘বিসর্জন’ নাটকে অপর্ণা এবং ‘মালিনী’ নাটকে মালিনী চরিত্রের মধ্যে যোগীর মতন বন্ধনহীন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে নাথসম্প্রদায়ের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে ইসলাম ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরিত হন। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস, সংস্কার বর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারফলেই হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির ফলশ্রুতিতে বাউল

ধর্মের উদ্ভব হয়। বাউলদের আরাধ্য ‘অলক সাঁই’ আসলে নাথপন্থের ‘অলখ নিরঞ্জন’ থেকে এসেছে। বাউলদের মধ্যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন, নাথযোগীও ছিলেন। যেমন ঈশান যোগী, নিত্যনাথ।^{১৫}

রবীন্দ্রনাথ এই বাউলদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে যোগী বাউলদের সঙ্গে স্বাজাত্য ঘোষণা করেছেন। তাদের সমাজবন্ধনহীনতা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তাই ‘পত্রপুট’ কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায় ঘোষণা করেন—

‘কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে
আমারে শুধায়, ‘দেখে এলে তোমার দেবতাকে?’
আমি বলি, ‘না’।

রবীন্দ্রনাথ এখানে নাথযোগীদের মতন বন্ধনহীন নিবৃত্তিমার্গের জয়ই ঘোষণা করেছেন।

কিছু পরবর্তী সময়ে নাথপন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় বাউল, কর্তাভাজা, বলরামী, সাহেবধনী, লালনশাহী প্রভৃতি গৌণ সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়। এই গৌণ ধর্মগুলিতে আমরা কয়েকজন নাথ সাধকের পরিচয় পায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশান গোসাঁই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘বঙ্গবীণা’ (ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ১৯৩৪ খ্রি.) গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন ‘বাংলার বাউল’ গ্রন্থে ঈশানের গুরুকুলের যে তালিকা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখি—

আদিনাথ-মূলনাথ-নিত্যনাথ-কালাচাঁদ-হারাই-দীনা-ঈশান-মদন।

তিনি আরও বলেছেন—

এই তিনজন নাথবাউল দেখিয়া নাথপন্থের সঙ্গে বাউলদের প্রাচীন

যোগের কথা মনে আসে।^{১৬}

এক্ষেত্রে ঈশানের আত্মনিবেদনের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে ভক্ত যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী, তিনি যেভাবে ভক্তকে পরিচালনা করেন ভক্ত সেইভাবে চলেন। তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ তাঁর পায়েই সমর্পণ করে তিনি তৃপ্ত—

‘ধন্য আমি বাঁশীতে তোর। আপন মুখের ফুঁক।

এক বাজনে ফুরাই যদি। নাইরে কোন দুখ।

ত্রিলোকধামে তোর বাঁশী। আমি তোমার ফুঁক।

ভালমন্দ রঞ্জে বাজি। বাজি নিশুইত রাত।

ফাগুণ বাজি শাওন বাজি। তোমার মনের সাথ।

একেবারেই ফুরাই যদি। কোন দুঃখ নাই।

এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা। আর কি আমি চাই?’

কিন্তু ঈশ্বর কোথায় আছেন বা তাঁকে আমরা কোথায় খুঁজে পাবো? সেই প্রসঙ্গে ঈশান বলেছেন—

‘আকাশের গায়ে আলো ফুটছে, এবার দয়াল ফুটেছে আঁখিরে।

আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি। দয়াল আমার সম্মুখে জাহির।

রে সম্মুখে জাহির।

ফুল ঝরে, পাখি উড়ে, পাতায় শিশির।

গলে রে রোদের তাপে

আলোক নিশির –দয়াল আলোক শীর।

তাই ভেবে কাঁদে ঈশান, যাতনা গভীর। বড় যাতনা গভীর।’

প্রকৃতি সৌন্দর্যের মধ্যেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পেরে কবি সাধকের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিয়েছে। গানটি পড়লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সকালবেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছি তুমি এ কী?’ গানটির কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঈশান বাউলের গানকে খুবই ভালবাসতেন। ঈশান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

‘বল নীরব গুরু সাঁই, কোন্ সাধনে বাহির হলে ব্রহ্মকমল পাই
(চলে) চন্দ্রতারা নিত্যধারা, কোনো শব্দ নাই;
চক্রে চক্রে চলছে যে সাধন,
তাই নাই কোনো রব সদাই নীরব, ভরছে যে রস
(চলছে যে যোগ) –মনে মনে।’^{১৭}

বিরাত আকাশে চন্দ্র, গ্রহ, তারার প্রতি ক্ষেত্রে যেমন কোথায় ও শব্দ নেই, তেমনি অনবরত যোগীর দেহে চলছে চক্রসাধন, কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির সঙ্গে শিবের সামরস্য। এই নীরব সাধনার সাহায্যে সাধক বা যোগী পরমব্রহ্মকে লাভ করেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে শিব-শক্তির সামরস্য নাথসম্প্রদায়ের হঠযোগ সাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেকবেশি জনজীবন সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘বাউলের গান’ প্রবন্ধে রবীন্দ্র মানসের লোকায়ত চিন্তা-চেতনা ও সচেতনতা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

গ্রাম্যগাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ (যে বিষয় ও সম্প্রদায়ের হউক না কেন)
সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর
উপকার হয়।

তিনি নিজেই তাই নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংগৃহীত
'শিববন্দনা' বিষয়ক একটি 'যোগীর গান' উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘ধন্য তোদের ধন্য তোদের ধন্য ভোলানাথ।

নন্দী-ভৃঙ্গী তোমার সাথে,

গায়ে ভস্ম ভূষণ শিবের জটাধারণ

ববম্ ববম্ করে দিনরাত।

কানে ফণীর কদল ও কদল সমতুল

আমায় তরাও ভোলানাথ।’^{১৮}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিনাথের গান সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন—

ধোবড়াকোল কুঠিবাড়ির (ঠাকুরবাড়ির জমিদারির অন্তর্গত) কাছারির
পেয়াদা বাবা ত্রিনাথের ভক্ত রসিক দাসও সুযোগ পেলে কবিকে ত্রিনাথের
গান শোনাত। কবি জমিদার তাঁর অশিক্ষিত অদ্ভুত- গলার গ্রাম্যসংগীত
শান্তভাবে শুনতেন।’^{১৯}

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে ছোটদের জন্য লেখা একাধিক কবিতায় বার বার এসেছে এমন
লোককথা, কিংবদন্তি। তাঁর সত্তায় মিশে রয়েছে এসব বিষয়। ‘শিশু’, ‘শিশুভোলানাথ’-র
পাতায় পাতায় রয়েছে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত। শিশু সাহিত্যের ভিত্তিমূল যে এসব লোকাযত
সাধনা বিষয়ক গান, ছড়া, কবিতা রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নাথ
সম্প্রদায়ের আদিনাথ শিব নয় শুধুমাত্র, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় শিব বিষয়ে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় যোগেশ্বর শিবের পাশাপাশি লৌকিক শিবকে নিয়েও নিরন্তর চর্চা করেছেন। ‘কালান্তর’ গ্রন্থে ‘শক্তিপূজা’ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন—

বাতায়নিকের পত্রে আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন। আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল।^{২০}

রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় শিবের প্রসঙ্গ থেকে বেশি করেই লোকায়ত শিবের চর্চায় নিরলস ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কাছে লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা নিছক অবসর যাপনের সামগ্রী ছিল না। তাই দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশিত ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’ প্রকাশের পর এক চিঠিতে বলেন—

মৈমনসিংহ থেকে যেসব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর।^{২১}

প্রসঙ্গত ‘যোগীর গান’ -র যোগী শিবের প্রসঙ্গ ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থের ‘যোগী’ কবিতাতে লক্ষ করা গিয়েছে—

‘যোগী যেন চিত্রে লিখা – উঠিছে রবির শিখা
মুখে তারি পড়িছে কিরণ
পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি তামসী তাপসী নিশি
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন।
শিবের জটার ’পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে সন্ধ্যাসীর জটাজুটে
পুরব -আকাশ সীমা হতে।’

ড. অমর্ত্য সেন ক্ষিতিমোহন সেন রচিত ‘হিন্দুধর্ম’ গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছেন যে ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে আসার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লৌকিক ধর্মগুলি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়—

তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার পরে লৌকিক ধর্মান্দোলনগুলি সম্পর্কে তাঁর

গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।^{২২}

আসলে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ মনোভাব থেকে মুক্ত গ্রামীণ বাংলার মুক্তমনা অখ্যাত কবি ও গায়কেরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন। এই মুক্তচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ‘যোগীরগান’গুলিতে।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন লোকাযত জীবন যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতীয় সাধনার মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের ভারতীয় অভিপ্রায় সাধিত হবে না। ‘যোগীর গান’ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ফসল। বর্তমান আর্থসামাজিক বিশ্বায়নের যুগেও তা সমানভাবে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতিতে অনেক বিষয়ই হারিয়ে গেছে। কিন্তু যেকোনো গান মানুষের মন, মানসের পরিচয় বহন করে। ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এমন লোকগান আছে এবং গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গানেও এইসব গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আবার উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ‘যোগীর গান’ সহ অন্য অনেক লোক-সমাজের গানও হারিয়ে যেতে বসেছে।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বনাথ রায়, বায়ু-বিজয়-শাস্ত্রের সন্ধানী সম্পাদক, পুঁথি প্রান্তিক পঞ্চগনন মণ্ডল চর্চা ও চর্চা, অগ্নিমা মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.), পৃ. ৬৪।
২. বিশ্বনাথ রায়, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার: রবীন্দ্র উদ্যোগ, পৃ. ৯।
৩. গোর্খ-বিজয়, পঞ্চগনন মণ্ডল (সম্পা.), পৃ. ২৫৫।
৪. ঐ, পৃ. ৭৫।
৫. ঐ, পৃ. ৪৫৬।
৬. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক- বৈচিত্র্য, পৃ. ২৮১।
৭. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২।
৮. গোর্খ-বিজয়, পৃ. ১৪৮।
৯. গুপ্তচন্দ্রের সন্ন্যাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), পৃ. ১২৫।
১০. কামিনীকুমার রায়, বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, পৃ. ২।
১১. ঐ, পৃ. ১০-১২।
১২. লোক-সাহিত্য সঙ্কলন, মোহাম্মদ সাইদুর (সম্পা.), পৃ. ৫০।
১৩. গোর্খ-বিজয়, পৃ. ১৪৮।
১৪. ঐ, পৃ. ১৪৯।
১৫. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল, পৃ. ৫৯।
১৬. ঐ, পৃ. ৬০।
১৭. ঐ, পৃ. ৬৮।
১৮. গোর্খ-বিজয়, পৃ. ১৪৯।
১৯. অমৃতলাল বাল্লা, রবীন্দ্রনাথ ও বাউল, পৃ. ৫৫।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, পৃ. ১৬০।
২১. দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ-গীতিকা, পৃ. ভূমিকা অংশ।
২২. ক্ষিতিমোহন সেন, হিন্দুধর্ম, পৃ. ১৯।

৫. গ. গোরক্ষনাথের গান

বঙ্গদেশ ও অসমে নাথযোগী-সম্প্রদায়ের যে সকল লোক রয়েছেন, তাঁরা সাধারণত ‘যোগী’ জাতি বলে পরিচিত। এই জাতি প্রাচীনকালে যোগসাধক ও যোগধর্ম প্রচারক একটি সম্প্রদায় ছিল। এই ধর্মের বিশেষত্ব হল একদিকে যেমন গৃহত্যাগী সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে যোগসাধনা করা যায়; তেমনি আবার গৃহস্থ হয়ে যোগধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করে দেহ, মন ও চরিত্রের উন্নতি সাধন পূর্বক ধর্মভাবে থেকে সংসারের সকল কাজকর্ম সুসম্পন্ন করা যায়। এই প্রথা আদিবৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। নাথযোগীরা এই প্রাচীন পন্থার ধ্বজাবাহক।^১ নাথপন্থের সিদ্ধদের যোগসাধনার যেসব কাহিনি কাব্যের আকারে রচিত হয়েছে সেসব প্রাচীনকালে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। পালরাজাদের সময় থেকে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনি প্রচলিত আছে। সেগুলির উৎপত্তি প্রাচীন হলেও রচনা প্রাচীন নয়।^২ নাথনিরঞ্জন প্রভৃতি অতি পুরাতন সব মতে কায়াসাধনার কথা আছে। আদিনাথ, মীননাথ, গোরখ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পন্থের গুরু। সেই সবই বাংলার নিজস্ব যোগমত। মহাযান বৌদ্ধমতের মধ্যে দোহাকোষে গোরখ, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি কথায় বাউলদের গানে সেই যোগমতের অনেক পরিচয় এখনও মেলে।^৩ অন্যদিকে ‘সিদ্ধাহাড়ির গান’ উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর জেলাতে প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ‘রঙ্গপুর-দিনাজপুর এলাকায় অদ্যাবধি ‘সিদ্ধাহাড়ির গান’ নামে কানুপা-হাড়িপা-গোপীচাঁদের কাহিনী গীত হয়ে আসছে। স্থানীয় লোকেরা আজও এই সিদ্ধাহাড়ির (হাড়িপার) ‘গোফা’ বা সাধনস্থান দেখিয়ে থাকে। রংপুর জেলার ভেণ্ডাবাড়ির কাছে ‘হবুচন্দ্র রাজার পাট’, নীলফামারীর ‘ধর্মপাল’ নামক স্থানের অদূরে ‘ময়নামতীর কোট’,

‘রাজা হরিশচন্দ্রের পাট’ ইত্যাদি স্থান আজও গোপীচাঁদ-ময়নামতীর স্মৃতি বহন করছে।^৪ প্রাচীন কাল থেকেই নাথসম্প্রদায়ের সাধনমার্গ ‘সিদ্ধমত’ বলে পরিচিত ছিল। সিদ্ধমতকে লোকায়ত মতও বলা হয়। এ-অর্থে যে সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, বিপাকে ও অভীক্ষায়, গ্লানি ও উপভোগে যে-বোধকে নির্মাণ করেছে সে-বোধ তাদের জীবনচেতনা থেকেই উদ্ভূত বোধ, কোনও প্রকার আরোপিত বোধ নয়।^৫ ‘ভবিষ্যপুরাণ’ ও ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’-এ গোরক্ষনাথের উল্লেখ রয়েছে। ‘নারদপরিব্রাজক’ উপনিষদে (মাদ্রাজ সং) তাঁকে অবধূত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।^৬ নাথসিদ্ধদের যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বনে রচিত কাহিনিগুলি এখনও উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজে জনপ্রিয়। বিশেষ করে নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথ প্রাচীনকাল থেকেই গোরক্ষক দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতি গ্রন্থ ‘Pag Sam Jon Zang’ এর বিষয়সূচিতে গোরক্ষনাথ সম্পর্কে বলেছেন—

Gauraksa - a cowherd, who being initiated into Tantric Buddhism became the well-known sage Gauraksa whose religious school survives in the Yogee sect which goes under the designation of Nath.^৭

বাংলার লোকসমাজে গোরক্ষনাথ বরাবরই গো-সম্পদের প্রতিপালনকারী দেবতারূপে বন্দিত হয়ে আসছেন। একালেও বাংলাদেশ ও ‘ত্রিপুরা’য় গোরক্ষনাথের সেবা প্রচলিত আছে।^৮ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, আসামেও গোরক্ষনাথের পূজো এবং গান বর্তমান সময়েও লক্ষ করা যায়। এসব গান বা পূজোর অঙ্গ হিসেবে ‘রণাগায়ক’ ও ‘বালকগণ’ পাঁচালির আকারে ছড়া গান পরিবেশন করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এইরকম একটা ছড়ায় গোরক্ষনাথ সংক্রান্ত কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়—

‘রণাগায়ক। থুব বনা থুব বাজে, - বালকগণ।	হাচ্চো
কাইচ কড়িটি ঝুমুর বাজে	হাচ্চো
বাজে ঝুমুর বাজে তাল	হাচ্চো
আমার গুরুখ জগৎমাল	হাচ্চো
জগৎমাল নিমিঝিমি	হাচ্চো
সোনার বান্ধুম পাঁচ টিমি	হাচ্চো
ও পাড়ায় ডাক গুয়া	হাচ্চো
আমার গুরুখে খায় গুয়া	হাচ্চো
গুয়া খাওয়া বড় গুণ	হাচ্চো
পান্তা ভাতে ঢাল লুণ	হাচ্চো
পান্তা ভাতে ছল ছলায়	হাচ্চো
আমার গুরুখে খেইল খেলায়	হাচ্চো
খেইল খেলাইতে লাগলো জোর	হাচ্চো
কে কে যাইবা বিক্রমপুর	হাচ্চো
বিক্রমপুরিয়া কালাপানি	হাচ্চো
বাপ থইয়া তার পুত হানি	হাচ্চো
বাপ মরিল তার আলে ঝালে	হাচ্চো
পুত মরিল তার মরিচের ঝালে	হাচ্চো
মরিচ গাছটি আউল ঝাউল	হাচ্চো
তার মধ্যে গুরুখ বাউল	হাচ্চো
গোরক্ষ বাড়ী বাদ্যি বাজে	হাচ্চো।” ইত্যাদি

পূর্ব-মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চলেও গোরক্ষনাথের সিন্ধি দেওয়া হয়। গোরুর বাছুর জন্মানোর একবিংশতিতম দিনে গোরু ও বাছুরকে স্নান করিয়ে কিছু অনুষ্ঠান করার রীতি আছে। সন্ধ্যায় গোয়ালের সামনে ঐ গোরুর দুধে সন্দেশ ও অন্য মিষ্টি তৈরি করে নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়।

প্রতিবেশীগণ গোয়ালের সামনে সমবেত হন এবং গোরক্ষনাথকে সমস্ত নিবেদন করে প্রণাম জানিয়ে গোরক্ষনাথের ছড়া আবৃত্তি করেন-

‘গোরক্ষনাথ দেবকথা দিয়া শুন মন।

প্রথমে বন্দিয়া গাব সৃষ্টির পত্তন।।

অলক্ষ্যেতে জন্মিল অনাদ্য পুরুষ।

তৎপর জন্মিল চাঁদ আর সুরজ।।

তৎপর জন্মিল ভোলা মহেশ্বর।

ধেনু করে সৃজিলেন বিষ্ণু দেববর।।’^{১০}

অলক্ষ্যে আদিদেব বা অনাদি-পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি আদিদেবতা নিরঞ্জন বা অনাদি ধর্মনাথ নাথপন্থের মূল দেবতা। অনাদিধর্মনাথ স্বয়ং শিব। আদিদেবী শক্তি, তাঁকে অনাদিপুরাণে আদ্যা দেবী বা কাকেতুকা দেবী বলা হয়েছে।^{১১} সৃষ্টির কারণে প্রকৃতি (শক্তি) পুরুষ (শিব) থেকে বিমর্শা হন। গোরক্ষনাথ ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থেও শক্তিয়ুক্ত আদিনাথকে জগৎগুরু বলে নমস্কার জানিয়েছেন—

‘আদিনাথং নমস্কৃত্য শক্তিয়ুতং জগদ্গুরুম্।’^{১২}

পূর্ব-ময়মনসিংহের গোরক্ষনাথের গানগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে নাথ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই এইগান প্রচলিত ছিল। কারণ বিষয়বস্তুগতভাবে এখানে নাথ সৃষ্টিতত্ত্ব, চন্দ্রসাধন, নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গোরক্ষনাথের গান প্রসার লাভ করে বলা যায়। ময়মনসিংহে প্রচলিত আরও কিছু গোরক্ষনাথের গান পাওয়া যায়—

‘আইলেন গোরক্ষনাথ – হেঁচো।

বইলেন খাটে,

চরণ ধুইলাইন ঘাটের জলে।

কত্ত সকলে শ্যামসুন্দর।

রণা রণা, ফুলকা রণা।

ফুলের কড়ি।

তাই দিয়া কিনলাম কপিলেশ্বরী।

দুধ দেয় সে হাড়ি হাড়ি।

এক বাণের দুধ তার গোরখে খাইল।

এক বাণের দুধ তার বাছুরে খাইল।

এক বাণের দুধ তার বসুমতী খাইল।

থুব থুব থুব।

থুব রণা থুব বাজে।

তাল বাজে কি বুমুর বাজে।

বাজে থুব করতাল।

আমার গোরক্ষ জগতমাল।

জগতমাল নিমিঝিমি।

সোনার বাঁধুম পাঁচটিমি।

পাঁচটি খিল পেঁচিল গুণে।

সব জীবজন্তু হইল গোরক্ষঠাকুরের পুণ্যে।।’^{১৩}

তিনি অন্যত্র বলছেন, ‘এইরূপে যতি গোরক্ষনাথ শেষপর্যন্ত গোরক্ষক দেবতা রূপে বাংলাদেশে অর্চিত হতে লাগলেন। মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনি কিছু দিন পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এখনও পূর্বময়মনসিংহে গাজীর কীর্তনিসাদের মুখে গুরু মীননাথের কাহিনি শোনা যায়। মানত করে বিপদ থেকে মুক্ত হলে স্বগৃহে তাঁর পালাগানের অনুষ্ঠান করেন’।^{১৪}

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নাথসাহিত্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছেন- ‘নাথসাহিত্যের ধারাটি দু’রকমভাবে পাওয়া যায়- কবিদের রচনা থেকে এবং মৌখিকভাবে। দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মহম্মদ প্রমুখ কবিরা নাথসাহিত্যের রচনায় অগ্রণী ছিলেন। জর্জ গীয়ার্সন রংপুরের কৃষকদের কাছ থেকে ছড়া শুনে, তার মধ্য থেকে কাহিনিরস সঞ্চয় করে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি জার্নালে ১৮৭৮ সালে ‘মানিকচন্দ্র রাজার গান’ নামে প্রকাশ করেছিলেন। কাহিনির বিশ্লেষণে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন ফরাসি সাহিত্যে Chanson d’ Alexis কাব্যের আলেক্সিস চরিত্রটির সঙ্গে। গোপীচন্দ্রের বিবাহের পরে মাতৃনির্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ কাহিনিটিকে প্রাবন্ধিক সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গোপীচন্দ্রের পীড়িত পাপবোধের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় বিশ্বসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।”^{১৫} গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘গোরক্ষনাথের সঠিক জন্মস্থান নির্ণয় করা একটু কঠিন বলেই মনে করা যেতে পারে। কারও কারও মতে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান ছিল জলপাইগুড়ি জেলার জলেশ অথবা আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মেচপাড়া গ্রাম।’^{১৬} ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে গোরক্ষনাথকে ‘ঈশ্বর-সন্তান’ বা ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে।^{১৭} ভগবানের ঐশ্বর্য দর্শন থেকে দুর্গোৎসবের দশভুজার পূজো এ দেশে প্রচলিত হয়েছে। প্রবাদ আছে যে গোরক্ষনাথ সর্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁর শিষ্য বিরূপাক্ষনাথ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন।^{১৮} স্থান বিশেষে গোরক্ষনাথ গাভীদের ভাগ্যবিধাতা গ্রাম্য দেবতার আকার ধারণ করেছেন এবং এমনকি মুসলমানগণও গাভীর সুখপ্রসবের পরে গোরক্ষের নাড়ু দেওয়া কর্তব্য মনে করে।^{১৯}

উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম কামরূপের অনেক স্থান অদ্যাপি গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি বহন করে আসছে, যথা- গারো পাহাড়, বগুড়ার গোরক্ষনাথের মন্দির, রঙ্গপুরের গোরক্ষমণ্ডপ, গোয়ালপাড়ার যোগীঘোপা এবং দিনাজপুরের রাণীশঙ্কলের কাছে গোরক্ষনাথের মন্দির এবং নেকমর্দানের গোরক্ষকুই প্রভৃতি।^{২০} উত্তরবঙ্গে এই দেবতা সাধারণভাবে গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত এবং জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার অঞ্চলে ঐর গৌরীনাথ নামও শুনতে পাওয়া যায়। কোচবিহার জেলায় ঐর অপর এক নাম গোন্নানাথ বলে।^{২১} নাথসম্প্রদায়ের মানুষ গোরক্ষনাথকে সাক্ষাৎ শিব বলেই মনে করেন। তাই তিনি শিবের অন্যান্য নামে যথা গৌরীনাথ, গোন্নানাথ ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। গিরিজাশঙ্কর রায় আরও মনে করেন যে মুসলমান আগমনের পরবর্তী সময়ে গোরক্ষনাথের গানগুলি হয়ত রচিত হয়েছে, তার প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন পীরের প্রসঙ্গ গানগুলিতে এসেছে। সম্ভবত গোরক্ষনাথ পূজাদি প্রাথমিকভাবে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের মধ্যেই সীমিত ছিল, মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু রাজবংশীদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।^{২২} গোরক্ষনাথের গানে ‘পীরের’ প্রসঙ্গ যোগী অবন্তিকানাথের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সম্মান’ অর্থে ‘পীর’ উপাধি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন নাথমন্দিরের প্রধান সন্ন্যাসী বা মোহান্তদের নামের আগে ‘পীর’ উপাধি দেখা যায়। নাথ আখড়া বা মঠে তাঁরা ‘মহামণ্ডলেশ্বর’ রূপে সম্মান পান। পরবর্তীতে সুফি ভাবধারায় নাথপন্থের প্রভাবে ‘পীর’ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। সুফিধর্মে নাথ গুরুশিষ্য পরম্পরা গৃহীত হয়েছে।^{২৩} আজও যেমন নাথ সম্প্রদায়ের দমদমের গোরক্ষবাগুলী মন্দিরের মোহান্ত যোগী বিজয়নাথজী মহারাজকে বলা হয় ‘পীরযোগী’ বিজয়নাথজী মহারাজ। ‘পীর’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘বৃদ্ধ’ বা ‘প্রাচীন ব্যক্তি’ এবং আধ্যাত্মিক গুরু। শব্দটি ফারসি শব্দ।^{২৪}

নাথপন্থে যোগীসিদ্ধ বা যোগীগুরুরা যোগলৌকিক ক্ষমতা অর্থেই ‘পীর’ উপাধি পেয়ে থাকেন। মানিক পীরের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি গোরক্ষনাথের মতো গোরক্ষক পীর বা দেবতা। ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, ‘মানিক পীর হলেন এক অলৌকিক দেবসত্তা, কোন ঐতিহাসিক মানবসত্তা নন। কেউ কেউ বলেন যে নাথসম্প্রদায়ের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা নাথগুরু গোরক্ষনাথের ছায়াবলম্বনে মানিক পীরের পরিকল্পনা করেছে।’^{২৫} বাংলায় মুসলমান শাসকদের আগমনে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পীড়নে নাথপন্থের মানুষদের একটা বিরাট অংশ মুসলমান হয়ে যান। শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন—

জটেশ্বরনাথ মন্দিরের দক্ষিণে নগরপাড়ায় একসময় প্রায় দেড়শ ঘর যোগীর বাস ছিল। বর্তমানে মাত্র একটি যোগী পরিবারের বাস আছে সেখানে। মহানাদের ঈশানকোণে মাইল তিনেক দূরে, প্রাচীন মহানাদ মৌজার অন্তর্ভুক্ত ‘যোগীডাঙা’ বলে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি এখন মুসলমান প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুদারতার যুগে আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ তাতে সাড়া দিতে বিশেষ দ্বিধাবোধ করেননি। এইসব কারণে যে সব বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের হিন্দুরা মুসলমান যুগে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাথযোগীরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একাংশকে পাণ্ডুয়া-ভুগলী অঞ্চলের বিজয়ী মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করেছিলেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। তারই স্মৃতি বহন করছে মহানাদ মৌজার অন্তর্গত যোগীডাঙা। জটেশ্বরনাথ মঠের প্রাচীন ভূমিদানপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব জাফর খাঁর মোহরাক্ষিত দানপত্রে উল্লেখ আছে—

সেখ আলি দতমন্দ ওরফ ভোলানাথ আর ২ জুগীসমেত মোহলমানিতে
ভুক্ত হইল...^{২৬}

একাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে গোপালভট্ট রচিত ‘বল্লালচরিত’ গ্রন্থে যোগীজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেসময় যোগী পীতাম্বর নাথ সম্ভবত মহানাদের শিবমন্দিরের পূজারী অথবা মোহান্ত ছিলেন। তখন যোগীরা প্রভাবশালী ছিল বলেই মনে হয়—

‘এতস্মিন্ন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ।

বভুব ভৈরবাবশচ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাম।।’^{২৭}

স্বাভাবিকভাবে নাথসাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় যে মত প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমরা সহমত হতে পারিনি, ‘বাংলা ভাষায় লেখা নাথ সাহিত্য যখন সৃষ্ট হয়েছিল, তখন নাথ সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের যুগ, এই সময়ে তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও কাব্যরচনাক্ষম ব্যক্তি খুব বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। তাই বাংলা নাথসাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাথসম্প্রদায়ের বাইরের লোক এবং বেশ কয়েকজন মুসলমান। তবে এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বেশিরভাগ বোধহয় ছিলেন নাথ ধর্মাবলম্বী; কারণ নাথধর্মের যে সব গূঢ়তত্ত্ব এইসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে তাঁরা ছাড়া আর কারও আগ্রহ থাকার কথা নয়।’^{২৮} এক্ষেত্রে আব্দুল কাদিরের বিশ্লেষণ অনেকটা যথাযথ বলে মনে হয়—

নাথপন্থী সকলেরই লক্ষ্য ছিল মানুষ, ভগবান নয়। খিলজীর এদেশে আগমন সময়ে নাথেরা পূর্ববাঙলায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী মীননাথ, দীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুপা প্রভৃতি নাথধর্মের প্রচারক রামাঐঃ পণ্ডিত ধর্মের পূজার সময় ‘আদিনাথের পুষ্পং জয়’, ‘গোরক্ষনাথের পুষ্পং জয়’ ইত্যাদি বলিয়া আদিনাথ, দীননাথ, চৌরঙ্গিনাথ, রাঙ্গনাথ, গোরনাথ প্রভৃতির নামের উদ্দেশ্যে ফুল দিবার বিধান দিয়াছিলেন। রামাঐঃ এই সকল নাথকে আবরণ-দেবতার আসন দিয়াছিলেন। বাঙলার গানের

আলোচনায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, কিভাবে কত দিক দিয়া এই নাথদিগের
প্রভাব বাঙালী মুসলমানের জীবনে অক্ষুণ্ণ ভাবে আজিও বর্তমান
রহিয়াছে। শুধু মেলার ভজনেতে নয়, বেলাশেষে বাড়ি ফিরিবার সময়
আজিও পল্লী-মুসলমান গাহিয়া যায়:

‘সাধুরে ভাই,
দিন গেলে তিননাথের নাম লইও।
সারাদিন কৈর রে ভাই – সংসারের কাম।
সন্ধ্যা হৈতে লইঅ তিননাথের নাম।।

মুসলমান ফকীরদের হাতেই নাথ-পন্থীরা যে দলে দলে নিঃসঙ্কোচে
সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং
স্বভাবতই তাহাদের জীবনে শরিয়তী ইসলামের কোন ছাপই পড়িল না।
বলা বাহুল্য, বাঙলার বিরাট বাউলের দল এই নাথ-পন্থীরাই সৃষ্টি
করিয়াছিল।^{১৯}

তবে বর্তমানে উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহাবস্থানের চিত্র খুব একটা দেখা যায় না।

প্রাচীন উত্তরবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল রাজবংশীরা, পলিয়া ও কোচদেরও এই জনগোষ্ঠীর
অংশ বলা হয়ে থাকে। ‘The Koch, Rajbanshi and Poliya are for the most part one
and the same tribe.’^{২০} এদিকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ওপর নাথধর্মের প্রভাব বোঝা
যায়। ধর্মঠাকুর নাথসম্প্রদায়ের একজন দেবতা। পূজার ধরনও প্রায় নাথদের মত।
গোরক্ষনাথের পূজা, তা দিয়েও নাথধর্মের প্রভাব বোঝা যায়।^{২১} এছাড়া ঠাকুরগাঁও (অধুনা
বাংলাদেশ) জেলার গোরকুই বা গোরক্ষকূপের জল আজও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, কোচ,
পলিয়াদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। প্রতিবছর এখানে একটি মেলা বসে এবং হাজার হাজার
লোক এখানে সমবেত হন গোরকুইয়ের এক পাত্র জলের জন্য। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, মেলার
তিথিতে কূপের জল দিয়ে শরীর ধৌত করলে সর্ব ব্যাধি নিরাময় হয়। এই গোরকুই স্পষ্টতই
গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত।^{২২} গোরক্ষনাথের পূজায় কেবলমাত্র পুরুষরা অংশগ্রহণ

করেন। আতপচাল, গুড় ও পাকা কলা দিয়ে পুজো হয়। একজন অধিকারী বা কামরূপী ব্রাহ্মণ মাঠে এই পুজো করেন। কোনও মূর্তি থাকে না। পশু ও চোরের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য এই পুজো করা হয়। এটা শিবের পুজো। পুজোয় যারা অংশগ্রহণ করে তারা গান গেয়ে গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ফল ও টাকা সংগ্রহ করে। পুজোয় কোন বাজনা হয় না। প্রতিটি যুবক একটি বাঁশের লাঠি বহন করে আর বাঁশের লাঠি দিয়ে খাড়া ভাবে মাটিতে আঘাত করে বা একে অন্যের লাঠিতে বাড়ি মেরে গোরক্ষনাথের নামে সম্মান জানায়।^{৩০} জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাজবংশী সমাজে গোরক্ষনাথের গান প্রচলিত আছে। গবেষক চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত একটি গোরক্ষনাথের গান উল্লেখ করেছেন—

শিব নাচোরে শিব সাজে
 কানা কড়িটা ঝুমুর বাজে
 বাজেকো ঝুমুর বাজেকো তাল
 এই গিরিটা জগত ভাল
 জগতেরও রুনি বুনি
 সোনারে বাকিনু টুনি
 সোনারে খেরুয়া বাঁশ
 এক দুয়ারে ন্যাখো হাঁস
 হাঁস ন্যাখো জোরে জোর
 পারোয়া ন্যাখো পঁচিশ জোর
 পারোয়ারে ডাক গুয়া
 গিরির বউটা না খায় গুয়া
 খায় গুয়া তে না খায় চুন

পনথা ভাতত ঢালে নুন
 পনথা ভাত ছলবলায়
 গিরির বউটা খ্যাল খ্যালায়
 খ্যাল খ্যালাইতে খ্যাল খ্যালাইতে
 নাগিল ভোক
 কুনঠে নাগিছে পূজার ভোগ
 সোদোর খাইবে মদনপুর
 ক্যামন করি যাবে মদনপুর
 মদনপুরের পাইক পাড়া
 ছয় বুড়ি আঠারো ঘোড়া
 ঘোড়ায় ঘোড়ায় জু-জাগরি
 পাঁচ নামনটা নে-বেরি
 গিরির বউটা ছে-বেরি
 ভাল কাটা খান না পায়
 বিলাইক মারলেক থপকায়া
 হিপার হুপার মনতিয়া
 বিলাই আসিল বড়িয়া।’^{৩৪}

জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরে অবস্থিত পাহাড়পুর গ্রাম থেকে গোরক্ষনাথের গানটি সংগৃহীত হয়েছে। শিবাবতার গোরক্ষনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গানটি রচিত হলেও এখানে লোকজীবনের বিভিন্ন বিষয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গোরক্ষনাথের গানের বৈশিষ্ট্য প্রধান-গায়ক ‘গীদাল’ গানের একটি পঙক্তি গাওয়া শুরু করেন। দলের অপর সকল সদস্য বা দোহাররা সঙ্গে সঙ্গে পরের পঙক্তি গায়। গানের মাধ্যমেই গোরক্ষনাথকে পূজো দেওয়া হয়। গোরক্ষর দুধ বেশি পরিমাণে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গোরক্ষনাথের কাছে গানগুলির মাধ্যমে নিবেদন জানান হয়—

‘এই গাইয়ের দুই বাছুর - হেচ্ছ।
 চিতক পাইল্যা দাদুর বাছুর - হেচ্ছ।
 গাইয়ের নাম চ্যাল্লামুড়ি - হেচ্ছ।
 দুধ হয় আটারো কুড়ি—হেচ্ছ।’^{৩৫}

শুধু গোরুর দুধ বৃদ্ধি নয়, হারানো গোরু প্রাপ্তি, গোরুর অসুখ মুক্তি, সন্তান কামনা, পরীক্ষায় পাশ, চাকুরিপ্রাপ্তি প্রভৃতি ইচ্ছা গোরক্ষনাথের কাছে ব্যক্ত করা হয়। গোরক্ষনাথের পুজো প্রকরণে দেখা যায় যে গোরুর অসুখ হলে বা গোরু হারালে কৃষকেরা গোয়ালঘরে কলা, খই, ফলমূল সহযোগে গোরক্ষনাথের পুজো করেন। এই উপলক্ষ্যে গোরক্ষনাথের গান তারা কীর্তনের মতো করে গেয়ে থাকেন। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমা এলাকায় প্রচলিত এরকম একটি গোরক্ষনাথের গান হল—

‘কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে ঘটি
 গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর বেটি
 কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে দাও
 গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর মাও।’^{৩৬}

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত ‘ময়নামতীর গান’-এ দেখা যায় উত্তরবঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সংস্কৃতিক্ষেত্র ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে নাথপন্থের বিস্তার ও প্রভাব পড়েছে। গোপীচন্দ্র রাজার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজাদের সুসম্পর্কের বিবরণে নাথপন্থের প্রভাবের বৃহত্তর ভৌগোলিক এলাকা ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য ধরা পড়েছে—

‘পূর্বে দরবারে বৈসে চাঁদ সদাগর।
 উত্তর দিকে দরবার বৈসে রাজা জঙ্ঘেশ্বর।।
 পশ্চিমে দরবার বৈসে পীর পএগম্বর।
 দক্ষিণে দরবার বৈসে বালা লক্ষ্মীন্দর।।’^{৩৭}

এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় নাথপন্থী রাজা গোপীচন্দ্রের রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণে চাঁদ সদাগর ও লক্ষ্মীন্দরের রাজ্য। উত্তরে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৈবক্ষেত্র জল্লেশ বা জল্লেশ্বর। পশ্চিমে অবস্থিত পীর-পয়গম্বর রাজ্য। শুধু ভৌগোলিক নৈকট্য নয়, নাথযোগী সাহিত্যের সঙ্গেও মনসামঙ্গল, পীরসাহিত্য এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী- পলিয়া -মেচ সংস্কৃতির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন, ‘মনসামঙ্গল কাহিনির নেতা চরিত্রটি নাথযোগীদের আচরণের ফলাফল হতে পারে। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন ড. পীতাম্বর দত্ত বড়খাল সম্পাদিত ‘গোরখবাণী’-তে আছে-

‘চন্দা গোটা খুঁটি করিলই সূরিজ করিলই পাটি।

অননিশি ধোবী ধোবই ত্রিবেণী কা ঘাটি।।’^{৩৮}

চন্দ্রকে খুঁটি করা সূর্যকে পাট করা আর ত্রিবেণী ঘাটে ধোপার কাপড় কাচার ছবিটি – কাউকে অনভিজাত করে অঙ্কনের উদ্দেশ্য ভাবা হয় নি। এ হচ্ছে নাথদের দেহসাধনার প্রতীক চরিত্র।

ড. সুকুমার সেনের ব্যাখ্যা সামান্য উদ্ধার করা যায়—

it appears that the story of Manasa and of Neta washing clothes at Triveni was familiar to them and they used it as allegorical representation of some yogic process.^{৩৯}

গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত ‘মাণিকচন্দ্র রাজার গান’-এ গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে ‘বাণিক’ জাতি এবং ‘ক্ষত্রিয়’-কুল সম্ভূত বলা হয়েছে—

‘কোন দরজায় ভিক্ষা লয়ে কোন দরজায় যামু।

বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারামু।।’

পালরাজার ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু তাঁদের জাতিতত্ত্ব এখনও নির্ণিত হয় নি। পালরাজাদের গান-সংগ্রাহক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন গোবিন্দচন্দ্র রাজা ‘রাজবংশী’ ছিলেন। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার বংশধর এখনও উক্ত স্থানের নিকটবর্তী কোণ্ডাগ্রামে বাস করছেন, তাঁরা “রাজবংশী”।^{৪০} ঢাকা জেলার সাভারের হরিশ্চন্দ্র পাল রাজার দুই কন্যা ছিলেন অদুনা-পদুনা।^{৪১} তাঁদের সঙ্গে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল। অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর বাড়ির দিকের মানুষ ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। তাই শ্বশুরবাড়ির পরিচয়ে গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী বলায় সংশয় থেকে যায়। খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহমেদ বলেছেন, ‘গোপীচন্দ্রকে কেউ কেউ ব্রাত্যক্ষত্রিয় (রাজবংশী) বলেন। এই জাতির লোকেরাই এখন ময়নাবুড়ীর ‘দেঁওদা’ (দেওধাই) অথবা পূজারি। কথিত আছে গোপীচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে রাজ্যলাভ করে মা ও গুরুর সঙ্গে পশ্চিম কামরূপে এসেছিলেন। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত মানিকচান্দের গানে গোপীচান্দের সম্পর্কে শোনা যায়—

‘সিকিয়া বাকুয়া নিলে দুইটা জলর হাঁড়ী।

জল ভরিবার গেল করতোয়া নদী।।’

গোপীচান্দের গানে গোপীচান্দের পিতা মানিকচান্দের নবনিযুক্ত কর্মচারি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে—

‘দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।

সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুক কৈল কড়ি।।

দেওয়ানগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।

দেড় বুড়ি ছিল খাজনা পোন্দের গণ্ডা নিল।।’

বিভিন্ন পুথিতে অবশ্য উল্লিখিত পণ্ডিতের পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। সেসময় ‘বাঙ্গাল’ বলতে মুসলমানদের বোঝাত, পরে দক্ষিণ পশ্চিম দেশ থেকে আগত ব্যক্তিমাত্রকেই ‘বাঙ্গাল’ বোঝাত। শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলে জয়ন্তিয়া ও কাছাড় ‘বাঙ্গাল’ বলতে মুসলমানদের মনে করা হয়।^{৪২} গোরক্ষনাথের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ছিল গোটা উত্তর ভারতেই। আজও গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ের প্রভাব অম্লান। মীননাথের প্রভাবও সমভাবে পড়েছিল তিব্বত থেকে বাংলা-আসাম অবধি। কামরূপ অঞ্চলে কদলী নগরও মেলে।^{৪৩} দুটি ফলক থেকে জানা যায় পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে রাজত্বের সময় চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র (আনু. ৯২৫-৯৭৫ খ্রি.) পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে জমি দান করেছিলেন। কামরূপের সম্মানহানি করে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে এই ভূমি দান করেন। দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে পুণ্ড্রবর্ধন বাংলার রাজাদের দখলে ছিল। কিন্তু ব্রহ্মপালের সময়ে কামরূপের পশ্চিম সীমান্ত করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল অনুমান করা যায়। পূর্বদিকে নগাঁও-র কপিলী অঞ্চলে দবকা এবং কদলী নামক দুটি করতল রাজ্য ছিল। এই কদলীরাজ্যে নারী শাসন গড়ে উঠেছিল। দুটো রাজ্যেই তান্ত্রিকপ্রথার প্রবর্তক মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থল ছিল। সাংস্কৃতিকভাবে এই দুই রাজ্যের প্রভাব সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরেও ভারতের অন্যান্য স্থানে পড়েছিল।^{৪৪} তারফলে অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গোয়ালপাড়া জেলা সহ, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও মৈমনসিংহ অঞ্চলে নাথযোগীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রধান দেবতাও ছিলেন শিব। নাথ শৈব-যোগধর্মের সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত নাথসম্প্রদায়ের ‘গোপীচন্দ্রের গান’ বা ‘সন্ন্যাস’ বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ-গানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীয়ার্সন মনে করেন—

Gorakshanath moreover, had already supplanted Siva
himself, and was alone worshipped by his followers.^{8৫}

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষের কাছে শিবই গোরক্ষনাথ। পশুপতি শিব
গোরক্ষনাথ নাম নিয়ে এখানকার গৃহস্থের ঘরে ঘরে পূজা পেয়ে আসছেন। পশুপতি শিবই
যে গোরক্ষনাথ তা কোচবিহার জেলায় প্রচলিত গোরক্ষনাথের গানের বন্দনা অংশেই পরিচয়
পাওয়া যায়—

‘পোখমে বন্দোং মুই, করি জোর হাত।
পশুপতি শিব শঙ্কর তায়সে গোরক্ষনাথ।।
তারপরেতে গোরক্ষনাথের মাগোং কৃপাবর।
ধনে বংশে বারুক গিরি চন্দ্র দিবাকর।।
ক্ষেতে বারুক ধান্যলক্ষী গোয়ালে গোধন।
গোরক্ষনাথ রক্ষা করে গৃহস্থের ভবন।।’^{৪৬}

শুধু গোরক্ষনাথের গানে নয়, গোরক্ষনাথের মাগনের গানেও যোগী শিব বা যোগী
গোরক্ষনাথের উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবীরা যেমন শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে
‘popular worship of Siva’ কে প্রবল করে তুলেছিল, তেমনি বাংলার জনগণও
পুরাণবাহিত শিব ও শৈবধর্মকে লৌকিক সাধনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। ফলে এখানেও
ধর্ম নবভাবে বিকশিত হয়ে উঠল।^{৪৭} ব্রাহ্মণ্যধারায়ও যোগী হিসেবে ‘সর্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ’ এবং
যোগীশিবের প্রতিষ্ঠা ছিল পাকা। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর কৃষ্ণও বলেছেন—‘আহোনিশি যোগ
ধেয়াই’। তপস্যারত যোগীশিবের ধারাও ‘কুমারসম্ভবম্’-এর পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষেই
ভিত্তিমূল।^{৪৮} নাথপন্থে শিবের রূপকল্পনা যৌগিক সাধনার মধ্যে নিহিত আছে।
‘গোরক্ষসংহিতা’-র ‘কেবলঃ শিবঃ’ জ্ঞান ও সিদ্ধিদাতা। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ‘শিবায়ন’ কাব্যে

শিবের চাষি চরিত্র ও কোচনী-প্রীতি দেখিয়েছেন। অন্যদিকে পশু-পাশ-পতি, জীবের পাশমুক্তি অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধন ও সংস্কার নিবৃত্তির অধিপতি হলেন শিব। ‘বাংলাদেশে আমরা শিবকে কৃষক-দেবতা রূপে দেখি। কৃষি যে যোগসাধনার রূপক, তার প্রমাণ পাই রোহিণীপুত্র ‘বল’রামকে যখন হলধর রূপে দেখি। চাষী শিবের কুচুণীর পিছনে ছোট্টর এইদিক দিয়ে একটা তাৎপর্য থাকতে পারে।’^{৪৯} গবেষক অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর ‘শিবায়নে শিব’ সম্পর্কে আলোচনায় যে কথা উল্লেখ করেছেন তা এক্ষেত্রেও উল্লেখনীয়। তিনি মনে করেন তন্ত্র ও শক্তিকেন্দ্রিক পুরাণের প্রভাবে শিবের অন্যতম শক্তি হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে কোচবধু। বাঙালি কবিরা তন্ত্রের এ তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। যোগীরাজ শিবের দেহজ আকর্ষণ গড়ে ওঠার পেছনে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন এবং আর্যের লিঙ্গোপাসনার প্রভাবও বড়ো কম নয়। শিবসংহিতা ধরনের সংস্কৃত পুরাণেও পুরাণকারগণ শিবের এইরূপ বর্ণনায় রুচিবোধের ধার ধারেননি। এখানেও বাঙালি কবিরা পুরনো সেই সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যের রচয়িতাদের অনুসারী। অর্থাৎ লোকায়ত উৎসের পেছনে ছিল পৌরাণিক সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব।^{৫০} এখান থেকেই অনুমান করা যায় গোরক্ষনাথ ও শিব এক ও অভিন্ন দেবতায় পরিণত হয়েছেন কোচবিহারে প্রচলিত গোরক্ষনাথের লোকগানে—

‘শিবে গুরু শিবে চাষা শিবে গোরক্ষনাথ।

শিবে যোগী শিবে বৈদ্য শিবে তিল্লাথ।।

শিবে শূর শিব মহাকাল বুড়া চৌপাড়ি।

শিবে শিবে বলিয়া মাগন করি বাড়ী বাড়ী।।’^{৫১}

গোরক্ষনাথের নাগরিক ঠিকানা নির্দিষ্ট না থাকলেও ঐতিহাসিক অবস্থানের সংশয় নেই। তিনাথ বা তিননাথের গান নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার ঘরেই তিননাথের গান গাওয়া হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানরাও গেয়ে থাকেন, ‘দিন গেলে তিননাথের নাম লইও’। নাথসাহিত্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ হাড়িপার কাহিনি স্থান লাভ করলেও তাঁরা কেউ অবতার-পদ লাভ করেননি। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, ‘নাথসাহিত্য প্রধানত নাথগুরুদের অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত ও সাধনার কথাই বর্ণনা করিয়াছে, শিবকে তাঁহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও শিব চরিত্রের কোনও উন্নত পরিচয় তাঁহারা প্রকাশ করে নাই।’^{৫২} আমাদের কাছে মন্তব্যটি যথার্থ বলে মনে হয় নি, যার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায়—

‘মহাদেবের কাছে যাওতো চলিয়া।

কি আঞ্জা দেয় মহাদেব শুন কন ভরিয়া।।’—গোপীচন্দ্রের গান, পৃ.৫

অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে—

‘চল দেখি চল চলি জাই শিবের বরাবর।

জদি কালে হুকুম করে ভোলা মহেশ্বর।।’ -প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

এখানে শিব কর্তৃত্ব করতে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। এইজন্য তাঁর বিধান—

‘শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার ন্যাও।

তুমি জ্যামন আইসছ আমার জমপুরিক নাগিয়া।।

এই মত নরলোকে আসিবে সাজিয়া।।’ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

শিব এখানে ময়নামতীকে অমরত্বলাভের খোঁজ দিচ্ছেন। ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যেও যোগীশিবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—

‘বদনে জন্মিল শিব যোগরূপ ধরি।

শিরেতে উত্তম জটা শবনেতে কড়ি।।’- গোরক্ষবিজয়, পৃ.৩

‘যোগীর গানে’ শিব কিন্তু নাদধ্বনিকারী-

‘গায়ে ভস্ম-ভূষণ

শিবের জটাধারণ

ববম ববম করে দিনরাত।’- প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

‘অনাদ্যচরিত্রে’ শিবই ঈশ্বর আদিনাথ-

‘তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্যি ধর্মনাথ।

শিবের নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ।।’

—বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ.৯

তবে ১২৭২ বঙ্গাব্দে রচিত ‘শিবপুরাণ’ গ্রন্থে শিবের ভিক্ষা করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়-

‘ভিক্ষা মাগিবারে জাইন দেব মহেশ্বর

ব্যাসের চর্ম শিবের পৃষ্ঠের উপর।।’

- বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ.৫৯

অতএব নাথযোগ সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় না, ‘ইনি পৌরাণিক শিব নহেন, উত্তরবঙ্গের

কৃষক সমাজের লৌকিক দেবতামাত্র।... তিনি যে এই সমাজের (Supreme Deity) তাহাও

নহেন; নিরঞ্জনধর্ম বা সূর্যদেবতাই এই সমাজের (Supreme Deity) বা পরমেশ্বর।...

হিন্দুধর্মের প্রভাববশত মহাদেব (Great God)-এর নামটি এই অঞ্চলের... কৃষক সমাজে

প্রচার লাভ করিলেও তাঁহার লৌকিক রূপ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই।’^{৫৩} তবে

নাথসাহিত্যে ‘গোরক্ষবিজয়’-র প্রেক্ষাপটে বলা যায় গৌরীকে নিয়ে শিব সর্বপ্রথম গৃহস্থালি

পেতেছিলেন। তিনি গৃহস্থ যোগী। তাঁর পার্শ্বচর ছিলেন মীননাথ এবং হাড়িপা জালন্ধরনাথ।

সিদ্ধ দু’জনের সেবক ছিলেন গোরক্ষনাথ ও কানুপানাথ। গৃহযোগী শিবের মাহাত্ম্যই রাজবংশী

সমাজের উত্তরবঙ্গের গোরক্ষনাথের গানে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, তিনি একেবারে নাথ শিব ধর্মনিরঞ্জন দেবতায় পরিণত হয়েছেন—

‘ওঁ গোরক্ষনাথায় নম:

ধবল বসন ধবল আসন ধবল সিংহাসন

হে ঠাকুর গোরক্ষনাথ

তাহাতে আসি আসন করহ গ্রহণ।

শিব ধর্ম নিরঞ্জন

গোরক্ষনাথ রূপে পূজা লন

ডাকি তোমাক শিবগুরু বলিয়া

পুষ্প রথে আসো নামিয়া।’^{৫৪}

সংগ্রাহক সুভাষচন্দ্র রায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত সিকটিবাড়ি গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে গোরক্ষনাথের এই পুজোমন্ত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন। আজকের দিনেও রাজবংশী গৃহস্থের বাড়িতে বিভিন্ন পুজো উপলক্ষে সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজার সামনে গোরক্ষনাথের পুজো মণ্ডপ সাজিয়ে পুজো, গান হয়।

শুধু গোরক্ষনাথ নয় তিননাথের পুজোও কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। ড. জীবন নাথ মনে করেন, ‘নাথযোগে শিবের সঙ্গে পূজা হয় শিবলিঙ্গের, তিননাথ, নয়নাথ এবং চৌরাশি সিদ্ধারও। তিননাথের পূজাই তিননাথের মেলা। ব্রাত্যের রুদ্র, ঈশান ও মহাদেবই হিন্দুধর্মে ত্রিদেবতত্ত্বে পরিণত। নাথযোগে এলেন তিননাথ-আদিনাথ (মানবগুরু), মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথই তিননাথ। ‘ত্রিদেব’ অভিধানে থাকলেও ‘ত্রিনাথ’ নেই। আছে লোকসংস্কারে।’^{৫৫} তিননাথের একটি গানও কোচবিহারে প্রচলিত আছে—

‘স্বর্গে ছিল ত্রৈলোক্য নাথ মর্তে নিল অবতার।
 ভক্তগণ পায়া তারে করিল প্রচার।।
 গৃহস্থের গো-রক্ষায় হইল,গোরক্ষনাথ।
 ভাং সিদ্ধি দিলে তারে পূরায় মনের সাধ।।
 তিন্মাথের নাম যেরা স্মরণে লয়।
 ধনে জনে রক্ষা করে নাই তার ক্ষয়।।
 তিন্মাথ গোরক্ষনাথের মহাপ্রসাদ ভাঙ।
 তা ভাঙ সেবনকারী ভক্তদের মুখে অনুরূপ।।’^{৫৬}

পয়ার ছন্দে রচিত আরেকটি গোরক্ষনাথের গানে শিব, গোরক্ষনাথ হয়ে উঠেছেন—

‘বোম ভোলা
 জুড়িলাম খোলা
 ছিলিমে দিলাম টান।
 মহাপ্রসাদ সিদ্ধি খাইয়া
 গাইব এবার গোরক্ষনাথের গান
 জয় বাবা গোরক্ষনাথ।
 কৃপা করো দান
 সিদ্ধিতে সিদ্ধি হউক
 রাখো ভক্তের মান।’^{৫৭}

শৈবযোগী গোরক্ষনাথকে পূজোর উপাচার হিসেবে সিদ্ধি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধি বা ভাঙ শিব পূজোর উপকরণ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে শিবের সঙ্গে সিদ্ধির সম্পর্ক বোঝাতে গোরক্ষনাথের পূজোয় সিদ্ধি এসেছে। এখানে অবশ্য যোগলব্ধ সিদ্ধি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ড অংশের ৩৮/৩০ শ্লোকের শিব সম্পর্কিত বক্তব্য হল— ‘সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশ্বং যোগীন্দ্রানাং গুরোঃপুরুষম’। নাথযোগীদের ক্ষেত্রে অষ্টসিদ্ধি মান্য—অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ৪৫৮

প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা। তান্ত্রিক আচারেও সিদ্ধি দেওয়ার নিয়ম আছে। ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর পূজোয় সিদ্ধি প্রচলিত নেই। রাজবংশী সমাজের মানুষ শৈব ছিলেন, তাই শিব গোরক্ষনাথকে নৈবেদ্য হিসেবে সিদ্ধি দেওয়া হচ্ছে—

‘জটা বান্ধি বিরাইল ঠাকুর গোরক্ষনাথ।
 ভাঙা গাঞ্জা সিদ্ধির কথ্য উহার গলাত।।
 পূজা খাবার গেইল গৃহস্থের বাড়ি।
 গৃহস্থ বসিবার দিল আসন পাড়ি।।
 পূজা দিয়া গোরক্ষনাথে মাগিলেক বর।
 ধনে বংশে বারুক গিরি চন্দ্র-দিবাকর।।
 গোয়ালে বারুক গরু ভাঙারে বারুক ধান।
 কোলার জাদুয়া বারুক ভর পূর্ণিমার চান।।’^{৫৮}

লোকসমাজে গোরক্ষনাথ শিবরূপে প্রকাশিত হয়েছেন উপরোক্ত গানটিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শুধু রাজবংশী সমাজে নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তরবঙ্গে গোরক্ষনাথ পূজো প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক দুই-রূপই গোরক্ষনাথের পূজোয় ধরা পড়েছে। পূজোর আয়োজন ও উপকরণ একেবারে লৌকিক। পূজোতে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ভক্তি-শ্রদ্ধায় গ্রামের সহজ-সাধারণ মানুষের গোরক্ষনাথ পূজোর উপকরণ। আর তাতেই তাঁরা কসমিক জগতের সন্ধানে ঈশ্বর চেতনায় অনায়াসে যুক্ত হতে পারেন। সার্বিক মঙ্গল কামনায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সহ অন্য সমাজের মানুষেরাও গোরক্ষনাথ পূজোর ঘট, আসন ও নৈবেদ্য গোয়ালঘরের দরজার সামনে স্থাপন করেন। কলাপাতায় খই, মুড়ি, বাতাসা, কলা, গুড়, পিঠে-পায়েস ইত্যাদি সঙ্গে গাঁজা নৈবেদ্য হিসেবে থাকে। নারী, পুরুষ, যুবক নির্বিশেষে সকলেই পূজোয় অংশগ্রহণ করেন। গোরক্ষনাথের

গানের দলের সদস্যগণ অথবা মহিলা, যুবক ও বালকগণ গোরক্ষনাথের গান পরিবেশন করে থাকেন। গানগুলিতে পূজোর উপকরণ, নিয়ম, পূজোর স্থান সবেই উল্লেখ করেছেন লোককবিরা—

‘সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ
পূজা দিলোঙ তোরে।
পাঁচ পাঁচ খাতি কলা পাঁচ ভাড় পিঠা গোয়াইলের দুয়ারে।।
হাতিয়া ঢোঙাত সাজেয়া দিলোঙ।
মোলা মুড়ি খই।।
থরে থরে সাজেয়া দিলোঙ।
চিড়ে মিঠাই দই।।
ভাঙ দিলোঙ গাঞ্জা দিলোঙ আরো দিলোঙ নাটি।
ভরণ কূলা ধান দিলেক গিরির বউ বেটি।।
ধুপ ধুনা সাজেয়া দিলোঙ দিলোঙ ফুল জল।
তোমাক ঠাকুর গান শোনাইবে চাপড়ি মাগার দল।
সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ পূজা নেও হুস্তে।
ধনে বংশে বারুক গিরি থাউক সদা তুস্তে।।’^{৫৯}

সংগ্রাহক সুভাষচন্দ্র রায় মাথাভাঙ্গা মহকুমা এলাকার সিকটীবাড়ি গ্রামের অধিবাসী হোমেশ্বর বসুনীয়ার কাছ থেকে গোরক্ষনাথের এই গানটি সংগ্রহ করেছিলেন। উপস্থিত মানুষেরা গোরক্ষনাথের গান হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে থাকেন। বালকের দল বা গোরক্ষনাথের গানের দলের সদস্যগণ লাঠির বাড়ি দিয়ে শব্দ করে করে গান গেয়ে চলেন।

গোরক্ষনাথ পূজোর সময় হাততালি দিতে দিতে গোরক্ষনাথের গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই ধরনের গানে পূজোর স্থান, উপকরণ ও পূজোর বিধি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে—

‘গ্রাহস্ত পূজিল ঠাকুর গোরক্ষনাথ।
 কেমনে পূজিমো তোমাক কি দিমো পসাদ।।
 কোনঠে পূজিমো তোমাক কি তার বিধি।
 পূজিমো ভকতি ভরে ভক্তক বাধগ করেন যদি।।
 শোনরে গ্রাহস্ত বাপু-কন গোরক্ষনাথ।
 ঢোঙোলে সাজায়ে দিয়া মোলাখই দই চিড়ার পসাদ।।
 গোয়াইলে পূজিয়া মোক দিয়া পাঁচ খাতি।
 জনা কুড়ি আখোয়াল দাড়াইয়ে চারিভিতি।।
 হাতে তালি দিয়া গায়ইবে মোর গান।
 তাইহলে হৈবা তুমি গ্রাহস্ত ভাগ্যবান।।
 কেনে ঠাকুর গোরক্ষনাথ তোমাক গোয়াইলে পূজিমো।
 এই অপরাধে বুঝি হামরা নরকে মজিমো।।
 ভাল করিয়া কন ঠাকুর ভকতি ভরিয়া।
 তোমরা তো জানো বাপু বৃষ মোহ বাহন।।
 বৃষ হইতে হয় বৃদ্ধি সকল গোধন।
 গোধনে ধন বৃদ্ধি ক্ষেত্রে ফলায় ধান।।
 কোলার জাদুয়া বাড়ে ভর পূর্ণিমার চান।
 সেই বাদে গোয়াইলে দিয়া মোর পূজা স্থিতি।।
 পাঁচ ঘটে পঞ্চ-পল্লো বসাইবে ভিতিভিতি।
 সাক্ষীরূপ দিবা তুমি মোরে একটা নাটি।।
 জনা কুড়ি আখোয়াল দাঁড়াইবে চারিভিতি।

হাতে তালি দিয়া গাওয়ইবে মোর গান।।

তায়সে হইবে তুমি গ্রাহস্ত ভাগ্যবান।’^{৬০}

পাঁচালির মতো করে গোরক্ষনাথের গানটি গীত হয়ে আসছে। শিবযোগী তথা নাথযোগীর মূল বৃত্তি ছিল ব্রহ্মসংগীত গাওয়া। সময়ের পরিবর্তনে তাঁরা চাষবাস করতেও শুরু করেন। গোরুর সঙ্গে গোরক্ষনাথের সম্বন্ধ বেশি। নাথপন্থে গো-রক্ষা অর্থে গোরক্ষনাথ শব্দটি ব্যবহার হয় না। ‘গো’ শব্দের বৈদিক অর্থ জ্ঞান, যোগজ্ঞান। লৌকিক জীবনেও গোসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাঁচালির আঙ্গিকে গোরক্ষনাথের গানটিতে গোরক্ষনাথ পূজোর উপকরণ, বিধি, সময় যেমন এসেছে তেমনই গৃহস্থের বাড়িতে মঙ্গলের নিমিত্তে গোরক্ষনাথ পূজোর গানগুলি আজও প্রচলিত এবং রাজবংশী সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বোঝা যায়। অন্যান্য ব্রতের মতো ভুরিভোজনের বিরাট ব্যবস্থা নয় ভক্তের আন্তরিকতা ও সহজ সারল্যই গোরক্ষনাথ পূজোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

গোরক্ষনাথের পূজোতে গায়কের দলের সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গান পরিবেশন করেন। কিন্তু মূলগায়ক বা গীদাল ও দোহারগণ নিবেদন করার সময় অবশ্যই ‘হেচো’ নামক গানটি গাইবেন। এরকম একটি হেচো গান হল—

‘এই গাইয়ের দুই বাছুর – হেচ্ছ।

চিতকপাইল্যা দাদুর বাছুর -হেচ্ছ।

গাইয়ের নাম চ্যল্লামুড়ি- হেচ্ছ।

দুধ আয় আঠার কুড়ি- হেচ্ছ।

গাইয়ের নাম বাসবিজলী- হেচ্ছ।

দুধের মধ্যে চান্দে জিলি- হেচ্ছ।

গাইয়ের নাম কাঞ্চসুনা- হেচ্ছ।

গাইয়ের দুধে মধুর বাসনা- হেচ্ছ।

রাজায় খায় প্রজায় খায় - হেচ্ছ।

তবু দুধ গড়াগড়ি যায় - হেচ্ছ।^{৬১} -ঢাকা।

গোরক্ষনাথের হেচ্ছ গানগুলির বিষয়বস্তু, পরিবেশন পদ্ধতি, পূজোর রীতিনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোচবিহার জেলায় অধিকাংশ গানে গোরক্ষনাথকে শিবের লোকাবত রূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কিছুগানে গোরক্ষনাথকে গোরক্ষক দেবতা হিসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শিব ও কৃষ্ণ একাকার হয়ে গেল। বৈষ্ণবধর্ম নিজের প্রচারের স্বার্থে গোরক্ষনাথসহ নাথপন্থকে আত্মীকরণ করেছে। বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ সারা ভারতেই গোরুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লৌকিক ধর্মগুলিকে কুক্ষিগত করার জন্য কৃষ্ণের রাখালরূপকে জোরদার করে তুলেছিল। বালক কৃষ্ণের লীলাগুলিও গো-সম্বন্ধীয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে সেখানে সিদ্ধি বা ভাঙ পূজোর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। নৈবেদ্য হিসেবে উঠে এসেছে আতপ চাল, চিড়ে, খই, গুড়, দুধ, দই, চিনি, বাতাসা-

‘নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ যে রাধাবিলাস করে।

দিনে রাধার নামে কলঙ্ক যে বাড়ে।।

যশোদার কোলে কৃষ্ণ হারাইল যে চেতন।

যশোদা কান্দিয়া বলে নাই মোর বাছাধন।।

কালার নয়নে জটীলা কুটীলা আনন্দিত মন।

ছদ্মবেশে কবিরাজ রূপে দিল দরশন।।

কলস আনিয়া করে শত ছিদ্র তাতে।

সেই কলসের জলে স্নান করাও যদুনাথে।।

না পারিল জল আনিতে জটীলা কুটীলা।

রাধা গেল জল আনিতে ভরসা শ্যাম কালা।।

জল আনিয়া দিল রাধা স্নান করাইলো তখন।

ঐ দিনে রাধার হইল কলঙ্ক ভঞ্জন।।

সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ গারস্তক দাও হে বর।

ধনে বংশে বারুক গিরিটার চন্দ্র দিপঙ্কর।।’^{৬২}

গবেষক ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া মনে করেন, ‘কৃষ্ণরূপ গোরক্ষনাথ গো-রক্ষক দেবতা হিসেবে রাজবংশী সমাজে পূজিত। আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষায় মনে হয়েছে, গোরক্ষনাথের গানে যে স্তুতি, ভক্তি নিবেদিত তা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। তবে মনে হয়, যে অঞ্চলে শিব ঠাকুরের প্রভাব বেশি সেই সব অঞ্চলে বোধহয় শিবের লোকায়ত রূপ হিসেবে মশান, সন্ন্যাসী ঠাকুর, মহাকাল, মদনকাম ইত্যাদি দেবতার পাশে গোরক্ষনাথকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই অনেকে গোরক্ষনাথকে শিব হিসেবে পূজো করেন।’^{৬৩} নারায়ণবাবু শেষ পর্যন্ত গোরক্ষনাথকে শ্রীকৃষ্ণের লোকায়ত রূপ হিসেবে সিদ্ধান্ত করেছেন। যুক্তি হিসেবে বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য সংকলিত ‘শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথের পাঁচালী’-তে বর্ণিত কাহিনিকে উল্লেখ করেছেন। সেখানে গোরক্ষনাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে। যেমন—

‘কৃষ্ণ কহে পশুপতি বলহ বিস্তার।

কেবা সে গোরক্ষনাথ কি রূপ তাঁহার।।

কিভাবে তাঁহার পূজা করিবো সংসারে।

প্রসবান্তে গাভী শুদ্ধ হবে কি প্রকারে।।

কৃষ্ণের বচনে হাসি বলে পঞ্চগনন।

লক্ষ লক্ষ ধেনুগণে চরায় যে জন।।

যাহার বংশীর মাত্র ইঙ্গিত পাইয়া।

উর্ধ্বমুখে ধেনুবৎস আসে যে ধাইয়া।

উষার আলোক রেখা ফুটিলো গগনে।

হাম্মারবে সবে তোমা তাকায় সঘনে ।।
 গোষ্ঠে যাইবার জন্য সংকেত জানায় ।
 তুমি গোষ্ঠে নাহি গেলে যেতে নাহি চায় ।।
 তুমি ছাড়া গোরক্ষনাথ আর কোন জন ।
 শুনি মৃদু মৃদু হাসে শ্রীনন্দ নন্দন ।।’

শেষপর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কারণে বাংলায় শৈবধর্মের জায়গায় বৈষ্ণবধর্ম প্রভাব বিস্তার করার কারণে পশুপতি শিব শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। তারফলে গোরক্ষনাথ শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।^{৬৪} শুধু উত্তরবঙ্গের গোরক্ষনাথের গানে নয় পশ্চিমবঙ্গের নাথসাহিত্যের কাহিনিরও বৈষ্ণবতার প্রসারের জন্য জনপ্রিয়তা কমে আসে। তখনও অবশ্য উত্তরবঙ্গে নাথপন্থ জীবন্ত থাকে। শেষে নাথপন্থের দু’জন সিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ বৈষ্ণব ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে ঠাঁই পেলেন।^{৬৫} কারণ হিসেবে বলা যায় মোটিফের পুনর্নির্মাণের ফলে কৃষ্ণ শিবের নামে প্রচলিত লোকসমাজের নানা কাহিনিকে কাব্যসমাজই বিবর্তমান আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় গোরক্ষনাথ পূজোর যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় পূজোটি শৈবধারার সঙ্গেই যুক্ত। শ্রাবণ, ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি বা রবিবার রাত্রিতে গোয়ালে গোরক্ষনাথ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। পূজোর উপকরণ হিসেবে নতুন গামছা, কাটা ফল, দুধের চাঁচির (ক্ষীর) নাড়ু এবং আমের পল্লবসহ ঘট স্থাপন করে পূজো করেন ভক্তরা। কোথাও এই পূজো কৃষক ফুল দিয়ে করেন, কোথাও পুরোহিত ডেকে পূজো করানো হয়। পূজো শেষে ‘হ্যাচো’ গান গাওয়া হয়। কৃষক বা রাখাল সাধারণ পোশাক পরেন অথবা

চাষি বা রাখালের পোশাক পরেন। সঙ্গে তাদের টোকা বা ছাতা থাকে। মূল গায়ন গান করে,
দোহারকিরা ধুয়ো তোলে—

‘বল শিব শিব’ বলে।

হ্যাঁচো গানের বন্দনা হল—

‘বল ভাই শিব শিব,
হাসি, জসি ধবলী, শ্যামলী, মসি, কে
কোথায় আছরে।
কার বা খন্দ খাইবে আনা, আনা,
ফুলের কনা ফুলের কুড়ি গাই কিনলাম।
গাই এর নাম কপিলেশ্বরী
কি ঘাস খায় নলের কুড়ি।
ঘাস জল খেয়ে গাই দাঁড়ালো স্থির হয়ে
মামা দু’তে (দোহন) আসনাই আসে,
ভাগিনীর হাতে চাট কষে।
ও ভাগিনী তুই, আমার কথা শোন,
আল ভেঙ্গে পাট বোন।
রমনা বলদ, না জুড়লাম হাল
কুলী বলদ জুড়লাম হাল।
মাটি হোল আল আল।
গোঁড়ার ছাওটা কেটে, আগার ছাওটা কেটে,
মাঝের ছাওটা কেটে।
উত্তর থেকে এলো গরু, গরু বলে
আমি বড় বীর।
পাটের দড়ি বন্ধন করে, সে হল স্থির।

উত্তর থেকে এলো মোষ, মোষ বলে
আমি বড় বীর।

পাটের দটি বন্ধন করে, সে হল স্থির।’^{৬৬}

গান শেষ হলে ‘বাঘ নাড়ু’ খাওয়া হয়। ক্ষীরের নাড়ু থাকে। সঙ্গে গোবরের নাড়ুও ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভক্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে ক্ষীরের নাড়ু সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁদের ধারণা প্রকৃত ভাগ্যবান ও ভক্ত গোরক্ষনাথ পূজোর ক্ষীরের নাড়ু পাবে। অবশ্য যে গোবরের নাড়ু পায়, তাকে ক্ষীরের নাড়ুও দেওয়া হয়। গোরক্ষনাথের পূজো শুধু রাজবংশী সমাজের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও পৃথকভাবে প্রচলিত আছে। তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষীরের নাড়ুর পাশাপাশি গোবরের নাড়ু দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া দিনহাটা মহকুমা এলাকায় আলোকঝারী গ্রামের অধিবাসী দীপালীরাণী সাহার কাছ থেকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি গোরক্ষনাথের গান সংগ্রহ করেছিলেন—

‘ওরে ভাই নাবার কুরে
গরকুনাথ ঠাকুর এল ঘোরায়ে চরে।
আসুক গরকুনাথ নাহি ডর
কড়ি আছে কড়আ দর।
কড়া দরে কিনিলাম নাড়ু
হাতে দিয়ে এলাম সুবর্ণের থাডু।’

কড়ি নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ কারণে ব্যবহার হয়ে থাকে, এক ধরনের বরণীয় কৃষ্টি।
তিননাথের মেলায় তিনকড়ি দিয়ে তেল কেনার প্রসঙ্গ রয়েছে। এই ধরনের গোরক্ষনাথের

গান গুলিতে চাষবাসের বিভিন্ন বিষয় ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে গোরক্ষনাথ পূজোর রীতিনীতি প্রকাশিত হয়েছে—

‘মামা বলে ভাণা হেচ্চ
আমার কথা শুন – হেচ্চ
প্রথম বৈশাখে – হেচ্চ
পাট বুন – হেচ্চ
যখন পাটে ছাড়ল গাড়া—হেচ্চ
গুর্খোনাথ ঠাকুরে দিল বেড়া—হেচ্চ
যখন পাটে বাও খেলায়—হেচ্চ
গুর্খোনাথ ঠাকুর কাচি গড়ায়—হেচ্চ’^{৬৭} ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গে গোরক্ষনাথের গানের বাইরে রাজবংশী সমাজে গোরক্ষনাথ পূজোকে কেন্দ্র করে *আখোয়ালী* গান প্রচলিত আছে। আমন ধান ওঠার পর একদল ছেলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গোরক্ষনাথ পূজোর গানগুলি গেয়ে থাকেন। এই গানগুলিকে আখোয়ালী গান বলে। যারা গোরক্ষকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের ‘রক্ষপাল’ বা ‘রাখাল’ বলে। এই ‘রক্ষপাল’ শব্দ থেকে ‘আখোয়াল’ বা ‘আখোয়ালী’ শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়। হাতে তালি দিতে দিতে গৃহস্থের বাড়িতে গোরক্ষনাথের গান গেয়ে ছেলের দল দক্ষিণা পায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত গানগুলি মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। সুভাষচন্দ্র রায় বেশ কিছু আখোয়ালী গান কোচবিহারের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজ, সাধারণ মানুষ, তাদের জীবন-জীবিকা, লোকাচার, ধর্ম-সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ভাষা সবই আখোয়ালী গানগুলি থেকে জানা যায়। গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষেরা গানগুলি লালনপালন করে চলেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে গানগুলির অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে।

লোকজসংস্কৃতি নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসনের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। এইরকম কয়েকটি ‘আখোয়ালী গান’ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুভাষচন্দ্র রায় সংগ্রহ করেন—

(১)

হাঁইচাওরে কপিলি গাই।
 তোর কপালে দুধভাত খাই।।
 হাঁইচাওরে লাল বলদ।
 তোর কপালে ধান ঘরত।।
 শিবে নানা শিবে সাজে।
 জোড়া ধরিয়া জুমুর বাজে।।
 বাজুক জুমুর বাজুক তাল।
 সেই গিরিটা জগৎ ভাল।।
 জগৎ রে উনিঝুনি।
 সোনার বান্দোঙ পাইসটুনি।।
 সোনার নাঙল রূপার ফাল।
 ঘরঝেয়া জাঙোই বয় হাল।।
 হাল থো ফাল থো।
 চালোতে পেন্টি থো।।
 অন্তি থো তোর ঘরের কাজ।
 ওদিয়া যা তুই ঘরের পাছ।।
 কাটিয়া আনেক মানার পাত।
 মানার পাতত বল বলা ভাত।।
 বলবলা ভাত ডিকালি গাঞ্জি।
 পুরিয়া ওঠে বুকের মাঞ্জি।।

সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ
গ্রাহস্তুক দেও বর।।
ধনে বংশে বারুক গিরি
চন্দ্র দিবাৎকর।।
গোয়ালেতে বারুক গরু
ভাণ্ডারেতে ধান।
কোলার জারুয়া বারুক
ভর-পূর্ণিমার চাঁন।।
এমনি তো বাঁশের কুলা
জোড়া বেতের বান।
গোরক্ষনাথের বিদায় দিবেন
ভরন কুলা ধান।।
ভরন কুলা ধান দিতে
না হইবেন কাতর।
বাঘ ভাল্লুক না আসিবে
গোয়ালীর ভিতর।।
অতিথ নোমাই ফকির নোমাই
ভিক্ষা মাগি খাই।
চট করিয়া বিদায় আনো
অন্যের বাড়ি যাই।।

(২)

ট্যাপড়া গরুর ন্যাপড়া ঘাস।
ক্যানেরে গরু না খাইস ঘাস।।
আখোয়াল ক্যানেতে ঘাস না কাটে।

ক্যানেরে আখোয়াল ঘাস না কাটিস ।।
 আন্দুনি ক্যানেতে ভাত না আন্দে ।
 ক্যানেরে আন্দুনি ভাত না আন্দিস ।।
 হলুয়া ক্যানেতে পাত না কাটে ।
 ক্যানেরে হালুয়া পাত না কাটিস ।।
 কলার ক্যানেতে পাতে নাই ।
 ক্যানেরে কলা তোর পাত নাই ।।
 দ্যাওয়া ক্যানেতা বরষে না ।
 ক্যানেরে দ্যাওয়া বরষিস না ।।
 ব্যাঙ ক্যানেতা ডাকে না ।
 ক্যানেরে ব্যাঙ ডাকিস না ।।
 সাপ ক্যানে তা মোকে ধরে ।
 ক্যানেরে সাপ ব্যাঙক ধরিস ।।
 আধার ক্যানেতা কাটে না ।
 ক্যানেরে আধার জোটিস না ।
 হেণ্ডা বাড়িত শিব ।
 সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ
 গ্রাহস্তুক দেও বর— ।

(৩)

আইলাম রে অরণে ।
 মাও লক্ষ্মীর চরণে ।।
 মাও লক্ষ্মী দিলেক বর ।
 চাউল কাড়িয়া ঘর কর ।।
 চাউল না দিয়া দিলে কড়ি ।
 তাক করিম মুই নেড়িঝেড়ি ।।

নেড়িঝেড়ি করিম রে।
 সোনার চাইলন বানাইম রে।।
 সোনার চাইলনে রাইখবে মাছ।
 বিলাই নিলেক চার পাছ।।
 খায় দায় বিড়ালক দোষে।
 ভাল কাটাখানা আপনে চোষে।।
 ভাল কাটাখানা না পায়।
 বিলাইক মারিল থেবগেয়া।।
 বিলাই গেল রঙপুর।
 পিছি আছিল চাম্পাফুল।।
 চাম্পা নোমায় ভক্তমান।
 হাসিয়া হাসিয়া করো দান।।
 সত্য ঠাকুর গোরক্ষনাথ—
 গ্রাহস্তক দেও বর—
 অন্যের বাড়ি যাই।।

প্রথম *আখোয়ালী* গানটিতে শিবের কৃষক রূপের প্রকাশ ঘটেছে। গৃহী শিব নটরাজ মূর্তিতে যেন নৃত্য করছেন। প্রহেলিকার সাহায্যে গানটিতে গূঢ়তত্ত্বও প্রকাশিত হয়েছে। লাঙল, ফাল ইত্যাদি যৌগিক সাধনার প্রতীক। দেহের মধ্যে যেমন পরমাত্মা থাকে সেরকম দেহ রূপ ভূমিতে ঘরজামাই রূপ পরমাত্মা শিব অবস্থান করছেন। সোনার লাঙল ও রূপোর ফাল যথাক্রমে মন ও মোহমুক্তির প্রতীক। জীবাত্মা রূপী কৃষক পরমাত্মা রূপী শিবের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন যদি তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও মোহপাশ মুক্ত হতে পারেন।

দ্বিতীয় গানটিতে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে কায়াযোগ দর্শনের সনাতন ধারা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। হেণ্ডাবন আগাছা ক্ষেত। তাকে পরিষ্কার করে জমিকে চাষযোগ্য

করে তুলতে হবে। দেহক্ষেত্রটিকে সেরকম বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে সাধন উপযোগী করতে হবে সাধককে। ব্যাঙের-গর্জন নাদ ও সাপ কুণ্ডলিনীশক্তির যৌগিক দেহসাধনার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় গানটিতে সাধক ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মতো মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু বিড়াল রূপী শক্তিস্বরূপ আকর্ষক মাছকে কোথায় নিয়ে যায় বোঝা যায় না। কিন্তু সাধকের প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ না হলে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। গ্রাম্য কবিরা জীবনের গভীরে পৌঁছে সিদ্ধ জীবনের আকাঙ্ক্ষাই যেন প্রকাশ করছেন। গ্রাম্য কবিরা এসব গানে চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের অনুরূপ দেহতত্ত্বমূলক সাধনা প্রাধান্য দিয়েছেন। অসাধারণ তত্ত্বকথাকে তাঁরা সাধারণ সহজভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া নাথপন্থের গুরুবাদ ও দেহতত্ত্বমূলক কোচবিহারে প্রচলিত একটি গোরক্ষনাথের গানের উল্লেখ করেছেন সেটা ধর্মতত্ত্ববিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গান। মোহপাশ মুক্ত জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের পথ গানটির বিষয়বস্তু—

‘ঘ্যাগ বন্দোং ঘ্যাগ বন্দোং ঘ্যাগের চরণ
 ঘ্যাগের ভিতর ঢাকা খুইছে ডাকাইতের কারণ।
 ডাকাইত ব্যাটা আসি গেইল হ্রমুর করি
 ঘ্যাগ দিয়া পাটোল মল্লুং ধুপ্পুস করি
 একশো ডাকু মৈল তার তৈইশো চোর
 ঢাকা দিল্লীত নাগিল গণ্ডোগোল
 শাল বাড়িত গুয়া পকি গুয়া বাড়িত টিয়া

ছয় তালিগায় বাইজ বাজায় টুপি মাথায় দিয়া।^{৬৮}

এই ধরনের পদ নাথসাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। শ্বাস শান্ত করে অবধূতি ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধক প্রার্থনারহিত হন। তিনি জগতের মিথ্যা প্রপঞ্চ মধ্যেও ভয় পান না। প্রপঞ্চদোষ স্থালন করে শিবশক্তি রূপ মিলন আনন্দ লাভ করেন। ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ করে জীবাত্মা শুভবোধে চালিত হবে পরমাত্মা এই আশাপোষণ করে। প্রহেলিকাপূর্ণ এই রকম যৌগিক সাধনা সমন্বিত অসংখ্য গোরক্ষনাথের গান কোচবিহার থেকে উত্তরবঙ্গ এবং অন্যত্র প্রচলিত আছে।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর ‘গোসানী-মঙ্গল’ অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি কাব্যগ্রন্থ। আঞ্চলিক দেবী গোসানীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কাহিনি অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থেও নাথযোগীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোচবিহারের কান্তেশ্বর রাজ্য মুসলমান রাজারা আক্রমণ করলে কান্তেশ্বরের সৈন্যরা পরাজিত হয়। তখন সিদ্ধযোগী ভৈরব তাঁতি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে—

‘ভৈরব নামেতে তাঁতি জাতিতে সে যুগী।
দেখি সেনাগণ তারে জোলা বলি হাসে।।
ভাগি ফেলে তাঁত খোঁট ভৈরব রুষিল।
খুঁটা হস্তে করি তাঁতি যুদ্ধ আরম্ভিল।।
ভাগিল তাঁতির খুঁট কুঠার লইল।
কুঠার আঘাতে কত মোগল কাটিল।।’^{৬৯}

শেষে মোগল সৈন্যদের সমূলে বিনাশ করতে ভৈরব যোগী পূর্বমুখে এক স্থানে যোগসাধনা শুরু করেন। পরবর্তীতে সেই স্থানটির নাম হয় ‘যোগীদুর্গা’—

‘যোগ আরম্ভিল তাঁতি করি একমন।
যোগীদুর্গা নাম তার বলে সর্বজন।।

মোগলের সৈন্যগণ যথা পড়ে কাটা।

সে কারণে তার নাম হইল মোগলকাটা।।’^{৭০}

শেষপর্যন্ত কান্তেশ্বর যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাসত্ত্বেও ভৈরব যোগীর বীরত্বের পরিচয় স্মরণীয়। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন এই বীরত্ব সিদ্ধ পুরুষের আত্মিক সত্তার পরিচয় বহন করছে। যোগীদের নানারকম সিদ্ধির কথা জানা যায়—একে অষ্টসিদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভৈরব খড়্গ সিদ্ধিলাভ করে থাকবে। খড়্গ-সিদ্ধির সংবাদ আছে ‘জাতক’-র ‘বলি-পরশু’-র ধারণায়।^{৭১} ‘গোসানী-মঙ্গল’ গ্রন্থে মৎস্যোন্দ্রনাথ প্রবর্তিত যোগিনী কৌলধারার প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কামরূপে যোগিনী কৌলধারার অন্যতম পীঠস্থান ছিল, কোচবিহারের সংস্কৃতিকে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের কারণে তা প্রভাবিত করবে খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা—

‘প্রভাতে যোগিনীগণ গেল তার ঘরে।

নারীরূপে যোগিনী অলঙ্কার পরায়।।

বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া আশীর্বাদ দিল।

নিমেষে যোগিনীগণ অন্তর্দ্বান হ’ল।।’- গোসানীমঙ্গল- পৃ.৯

যোগিনী কৌলধারা অনুসারে যোগিনীরাও বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যা ও অলৌকিক ক্ষমতায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ড. কল্যাণী মল্লিক মনে করেন প্রাচীনকালে নাথধর্মীরা ‘কৌল’ নামেই পরিচিত ছিলেন। এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষার পরে ‘নাথ’ পদবি যুক্ত হয় বলে এঁরা ‘নাথযোগী সম্প্রদায়’ নামে পরিচিত।^{৭২} অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন—

The Natha Yogis were at one time all known as Kaulas, a special branch of the Tantriks, who were worshippers of the Goddess.^{৭৩}

কোচবিহারের পার্শ্ববর্তী অসমের গোয়ালপাড়া জেলার লৌকিক ধর্ম, পূজাপার্বণ ও লোকাচারে গোরক্ষনাথের গান উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলে গোরক্ষনাথ বেশ সুপরিচিত। কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ায় রাজবংশী সমাজের আশি শতাংশ জনসাধারণ হচ্ছে কৃষিজীবী। কৃষি, গবাদিপশুর সঙ্গে গোরক্ষনাথের যোগাযোগ থাকার কারণে গোয়ালপাড়াতেও গোরক্ষনাথের গান জনপ্রিয় হয়েছে—

‘আইলংরে অরণে মাওলক্ষী চরণে।
 মাওলক্ষী দিলেক বর ধান কাটিয়া চাউল কর।
 ধান দিয়া না দিলে কড়ি তাক করিম মুই নড়িঝড়ি।
 নড়িঝড়ি হইসরে সোনার কড়ি পাইমরে।
 সোনার কড়ি উপার ডালা এই দেখিবার ভালা।
 ঘরভালা কাটানি গিরতানি ভালা চাটানি।
 কেনে নিরতানি বিরস মন আমাক দিবেন কত ধান।
 আমরা কি মাঙ্গিয়া খাই গোরখনাথ পূজিতে চাই।
 গোরখনাথ গেইস গাঙ্গের কুল পিন্দিয়া আসিল চাম্পার ফুল।
 চাম্পা নোয়ায় ভর্তমান হাসিয়া হাসিয়া কর গান।’^{৭৪}

উত্তরবঙ্গে গোরক্ষনাথের *আখোয়ালী* গান থেকে জানা যায় গোসম্পদের গুরুত্বের কারণে পূজোর প্রচলন ঘটেছে। গোসম্পদের সঙ্গে নাথের যোগাযোগ অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকে। এখনো পশ্চিমবঙ্গের নাথসম্প্রদায়ের সব মঠে গোশালা দেখা যায়। রাঢ়বাংলায় ‘নাথ কবিরাজ’-দের দেখা যেত। ড. পঞ্চানন মণ্ডল হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত নকুঞ্জা গ্রাম থেকে চতুর্ভুজ নাথ কবিরাজের বাড়ি থেকে চৌরঙ্গীনাথ রচিত ‘প্রাণসঙ্কলি’ গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন—

‘প্রাণসঙ্কলি সান্ত্র সর্বত্র জয় জ্ঞান করি সার।

হেন তর্কে বিধি নিখে কায়ার নিস্তার।।’^{৭৫}

নাথসম্প্রদায়ের যোগীরা গোসম্পদের জন্ম-রক্ষা-রোগনিরাময় বিষয়েই জানতেন-এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে লৌকিক আচার প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের কারণে এসব কাহিনি দক্ষিণবঙ্গে জনপ্রিয়তা হারাতে বসলেও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে নি। পূর্ববঙ্গে গোরক্ষনাথের পূজা ও সিন্ধি দেবার লৌকিক আচার অধিকাংশ এলাকায় প্রচলিত আছে। ময়মনসিংহ জেলায় গরুর বাছুর জন্মবার দশ দিন পরে অনুষ্ঠান করার রীতি লক্ষ করা যায়। বাছুর জন্মেওয়া গরুর দুধের পায়েস, ক্ষীর, দুধ এবং চিড়ে, খই, নাড়ু, কলা ইত্যাদি কলাপাতায় সাজিয়ে গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় এবং গোরক্ষনাথের গান করা হয়—

‘গোরক্ষনাথ দেবকথা শুন দিয়া মন।

প্রথমে বন্দিয়া যাব সৃষ্টির পত্তন।।

অলক্ষিতে জন্মিল অনাদ্য পুরুষ।

তৎপর জন্মিল চাঁদ সুরুজ।।

তৎপরে জন্মিল ভোলা মহেশ্বর।

বেণু করে জন্মিলেন বিষ্ণুদেব বর।।’

উত্তরবঙ্গে গোরক্ষনাথের পূজার বিবরণ পাওয়া যায় ড. সুনীল পালের লেখায়। যেমন কুমোর ও গোরক্ষ পূজকের কথোপকথন নাটকীয় ভাবাত্মক হয়েছে। এই ছড়াগানগুলি মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত আছে—

‘কুমোর: গাঙয়ে বুর দিয়া জুইলাম মাটি।

বাওয়াইলাম ঐখানে কুমারহাটি।।

পূজক: কুমার রে ভাই কুমার রে ভাই
আমার গোরক্ষের লাগি পাতিল
আর ছিকর চাই।

কুমোর: তোমার গোরক্ষেরে কেমনে চিনি?

পূজক: হাতে নাড়ি মাথায় টোপা
সেই আমার গোরা ঠাকুর।।’

দেশভাগের কারণে মানুষজন ওপার বাংলা ছেড়ে উত্তরবঙ্গে এসেও গোরক্ষনাথের পূজো-ব্রত
ত্যাগ করেননি বলে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস মনে করেন।^{৭৬}

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন গোরক্ষনাথ এখানে ‘হাতে লড়ি মাথায় টোপর’
রাখালমাত্র, তাই তাকে গোরক্ষনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এ বিশ্লেষণ সমর্থন করা
যায় না। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বর্ণনা অনুসারে গোরক্ষনাথ স্থানীয় দেবতাও নয়। তাঁর
বহুরূপ দেবভাবনার পরিচয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে। ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি ‘পূজাচার
ও বৃষ্টিকামনা’ প্রবন্ধে বলেছেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময়
‘গোরক্ষনাথের মাগন’ নামক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। কয়েকজন বালক ও কিশোরকে
কৃষকের কাজে নিযুক্ত করে ছোট লাঙল ও ধানের চারা নিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে ধানচাষের
অভিনয়ের মাধ্যমে গান করে—

‘হাতি শুঁড়ে তুলে পানি
শুককান কাদ টানাটানি
শুককান কাদ ধান গেইক রোয়া
মাচা পাত ধান খোয়া—
মাচায় না করে ধান
গোরক্ষ নাথ কর দান।।’

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের মানুষের জীবনে অনুরূপ অনুষ্ঠান আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস দিনাজপুর অঞ্চলে পলিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ‘জনমাস্তনি’ বা জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয়সমাজে প্রচলিত ‘হুদুমদেও’ ব্রত বৃষ্টিকামনায় পালিত ব্রত বিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত বৃষ্টিকামনায় গোরক্ষনাথের গানেও কৃষি সহায়তাকারী ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ ময়মনসিংহ থেকে শুরু করে মেদিনীপুর পর্যন্ত এলাকায় গোরক্ষনাথ গোসম্পদ ও কৃষি উন্নয়নের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ গোরক্ষনাথকে প্রথমে গোরক্ষাকারী দৈবশক্তি (রাখালরূপ), পরে কৃষিকাজের সহায়ক ‘Rain charm’ র উদ্দীপক হিসেবে ভেবেছেন।^{৭৭}

কৃষিদেবতা ও কৃষি সম্পদের সঙ্গে নাথযোগীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের আরও যোগসূত্র ভবনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় কৃষিজীবী মানুষ গোরক্ষনাথকে যেমন গোসম্পদ রক্ষাকারী দেবতায় পরিণত করেছেন তেমনি কৃষিসম্পদ রক্ষার্থে বৃষ্টি আনয়নকারী দেবতা হিসেবেও কল্পনা করেছেন। ‘যোগীসেবা’ সেরকম আরেকটি গ্রামীণ ব্রত। নতুন গোয়াল তৈরির পর বা গোরুর অসুখ হলে গৃহস্থরা কোনো যোগীকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। যোগী স্নান করে তাঁর গোয়ালে উপস্থিত হলে গৃহস্থ যোগীকে নতুন বস্ত্র চাল ডাল, সবজি দিয়ে বরণ করে নেন। যোগী তার গোয়ালে উনুন তৈরি করে রান্না করেন এবং লোকচক্ষুর আড়ালে তা শিবের নামে নিবেদন করে থাকেন। ভুক্তাবশেষ কলার পাতায় মুড়ে গোয়ালের মধ্যে গর্ত করে মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেন। অনুষ্ঠান শেষে যোগী তিনবার ডমরু বাজিয়ে পেছনের দিকে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরে যান। রবিবার এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।^{৭৮} অর্থাৎ গোসম্পদ রক্ষা, বৃষ্টি আনয়ন ইত্যাদি লৌকিক আচার

অনুষ্ঠান নির্দেশ করছে নাথযোগীরা বাংলার গ্রাম সমাজের সঙ্গে কীভাবে অঙ্গঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং একথা বলা যায় বাংলার গ্রামীণ সমাজের মৌখিক পরম্পরার বিভিন্ন সত্য এবং জীবন্ত দিকগুলি নাথযোগীদের মাধ্যমে জানা যায়।

দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদেও গোরক্ষনাথের গান বা গোরক্ষনাথের পাঁচালি প্রচলিত আছে দেখা যায়। এই জেলায় কৃষিজীবী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত সদগোপ, গোয়ালা ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষজন গোরুর জীবন, ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য গোরক্ষনাথের ব্রত পালন করেন। নাথযোগী গোরক্ষনাথ গবাদিপশুর মঙ্গলসাধক হিসেবে গোরক্ষক বা গোদেবতা হয়ে উঠেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার লালগোলা, ভগবানগোলা এবং বহরমপুর মহকুমার নওদা-হরিহরপাড়া অঞ্চলে গোরক্ষনাথের গান বা হ্যাঁচো গান প্রচলিত আছে।^{৭৯} ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে এইসব এলাকার বিভিন্ন মানুষদের কাছে গিয়ে জানা গেল ১০-১২ বছর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনাথ পূজো ও হ্যাঁচো গান দেখা যেত। এখন বাড়িতে আলাদা করে গোয়াল রাখা বা গোপালন তেমন দেখা যায় না। তাই গোরক্ষনাথের গান বা পূজো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে পুরনো দিনের মানুষেরা মনে করতে পারছেন। এরকমই একজন বেলডাঙ্গার কুমারপুর গ্রামের অধিবাসী, এখন কর্মসূত্রে বহরমপুরে বসবাসকারী ভাস্কর দেবনাথ জানালেন তাঁদের ছোটবেলায় একদল মানুষ গোরক্ষনাথের কাল্পনিক মূর্তি নিয়ে খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে গোরক্ষক গোরক্ষনাথের গান গেয়ে যেতেন। গৃহস্থ গোয়ালঘরে ঘট স্থাপন করে গোরক্ষনাথের গানের দলকে ডাকলে, তাঁরা এসে গোরক্ষনাথ পূজোর উপকরণ সাজিয়ে গোরক্ষনাথের গান পরিবেশন করতেন।

সাধারণত গোরুর বাছুর জন্মাবার একমাস পরে রবিবার সন্ধ্যায় শুভদিন হিসেবে গোরক্ষনাথের পূজোর দিন পড়ে। এই পূজোয় মন্ত্র উচ্চারণ বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থ পূজোর দিন স্নান করে ভিজ়ে কাপড়ে গোরুর দুধ দুইয়ে শিবের মাথা ও গ্রামের কালীর থানে দেন। এরপর যেটুকু দুধ অবশিষ্ট থাকে তা তিনি গঙ্গায় উৎসর্গ করেন। গৃহস্থ সেদিন নিরামিষ খান এবং সন্ধ্যায় গোরক্ষনাথ পূজো করেন। তিনি পাড়ায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে দুধ সংগ্রহ করে এনে তারসঙ্গে নিজের বাড়ির দুধ যুক্ত করে জাল দিয়ে চাঁছি বা ক্ষীর তৈরির মধ্য দিয়ে নাড়ু প্রস্তুত করেন। এই চাঁছির নাড়ু গোরক্ষনাথ পূজোর প্রধান নৈবেদ্য। পাড়ায় বা আশেপাশের গ্রামে যাঁরা গোরক্ষনাথের গান জানেন তাঁদের গোরক্ষনাথের গান বা হ্যাঁচো গানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা নিমন্ত্রণ ফেরান না এবং কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই গৃহস্থের বাড়িতে এসে গোরক্ষনাথ পূজো ও গান পরিবেশন করেন। এই গানের দলে একজন মূলগায়ন থাকেন, অন্যরা দোহারের কাজ করেন। মূল গায়ন এক-দুটি পঙক্তি গাওয়া শুরু করলে দোহাররা একসঙ্গে ‘হ্যাঁচো’ বলে গেয়ে ওঠেন। তুলসীগাছ তলায় বা গোয়ালের দরজার সামনে আমশাখা জলপূর্ণ মঙ্গলঘটে স্থাপন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে গোরক্ষনাথকে কল্পনা করে পূজো অনুষ্ঠিত হয়। পূজো শেষে গোরক্ষনাথের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়ে থাকে। গোরক্ষনাথের গানের সংগ্রাহক দীপক বিশ্বাস মহাশয় এমন কিছু গোরক্ষনাথের গান পূর্বোক্ত ‘লোকশ্রুতি’ পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—

‘বলো হ্যাঁচো, হ্যাঁচো, হ্যাঁচো রে।

একবার বদন বলো হ্যাঁচো রে।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

চরণে সোনার নূপুর পরিধানে পাটের শাড়ি।
উঠলো গোক্ষনাথ গিয়ে মুকুট রায়ের বাড়ি।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
মুকুট রায় বলে, আয়রে সোনার ভাই।
দুই ভাই যুক্তি করে গোয়ালনগর যায়।।
হ্যাঁচো হ্যাঁচো... (সকলে)
মুকুট রায় বলে গোক্ষনাথ রে ভাই।
গোয়াল নগর গিয়ে মোদের কিবা কার্য হয়।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
গোক্ষনাথ বলে মুকুট রায়রে ভাই।
সত্যের পরীক্ষার জন্য গোয়ালনগর যাই।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো ... (সকলে)
পথে যেতে যেতে দু'ভায়ে কথোপকথন।
গোয়ালনগর গিয়ে দিল দরশন।।
হ্যাঁচো হ্যাঁচো... (সকলে)
শোন শোন গোয়ালের নারী বলি বাছা তোরে।
ক্ষুধায় আকুল তবু, দুগ্ধ পিয়াও মোরে।।
হ্যাঁচো হ্যাঁচো... (সকলে)
শোন শোন বলি বাছা, বলি তোমার ঠাই।
সত্য করে বলছি বাছা দুগ্ধ মোর নাই।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
সুবুদ্ধি গোয়ালার নারী কুবুদ্ধি ধরিল।
ঘরে দুগ্ধ থুয়ে বাছা আমান করিল।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
ঘরে দুগ্ধ থুয়ে যে জন আমান করিবে।

নবলক্ষ্মী ধেনুর পাল অধ:পাতে যাবে।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো...(সকলে)
শোন শোন গোয়ালের নারী মিথ্যা বল তুমি।
তোমার ঘরে দুগ্ধ আছে জানতে পারি আমি।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
শোন শোন গোয়ালের নারী, বলি বাছা তোরে।
সিকার উপর দুগ্ধ তোলা, আছে তোমার ঘরে।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
কথা বলে গোক্ষনাথ অন্তর্ধান হলো।
নবলক্ষ্মী পাল গোয়ালার কমিতে লাগিল।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
বাথানে ম'লো বাছার শুক চাঁদ বাছুর।
বাড়িতে ম'লো বাছার প্রধান ভাসুর।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
মর্ত হতে গরুর পাল স্বর্গে নিয়ে গেলো।
নবলক্ষ্মী পাল গোয়ালার অধ:পাতে হলো।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
আমি নারী চিনতে নারি, তুমি নিরঞ্জন।
মায়া করে ছললে ঠাকুর, এই অবলার প্রাণ।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
শোন, শোন ওহে ঠাকুর করি অঙ্গীকার।
করিব চরণ পূজা, দেব দুগ্ধ ধার।।
হ্যাঁচো, হ্যাঁচো...(সকলে)
সংসারে সুখ-দু:খ, দুঃখ হয় ভারী।
আর দু:খ দিয়ো নাকো সহিতে নারি।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো ...(সকলে)
 দীননাথ, দীনবন্ধু জগতের পতি।
 অবলাকে দিয়ে দুঃখ, তুমি গেলে কতি।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
 একই অন্ন, পঞ্চগশ ব্যঞ্জন, স্বর্ণ থালে খায়।
 ভিক্ষায় ভক্ষণ কারো, দুঃখে জনম যায়।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো...(সকলে)
 গলায় কাপড় দিয়ে গোয়ালের নারী পূজাতে বসিল।
 অন্তর্হিত গোরক্ষনাথ সব জানতে পারলো।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)^{৮০}

গোরক্ষনাথের গানগুলি এখানে অনেকটা মঙ্গলকাব্যের কাহিনির মতো গতানুগতিক ধারার পরিবেশিত হয়েছে। কাহিনিতে দেখা যায় গোরক্ষনাথকে অস্বীকার করার কারণে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও দুর্দশার শেষ নেই। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর কর্তৃক মনসার পূজা না করার কারণে দেখা গিয়েছে চাঁদের ছয়পুত্র মারা গিয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও দেখা যায় দেবী চণ্ডীর পূজো করতে রাজি না হওয়ায় কলিঙ্গদেশের প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার ঘটনা ঘটে। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত গোরক্ষনাথের গানেও সেইরকমভাবে দৈব-নিপীড়নের চিত্র লক্ষ করা যায়। কিন্তু গোরক্ষনাথ দেবতা নন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি নবম-দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।^{৮১} লোকায়ত সমাজে প্রচলিত কাহিনিতে তিনি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর পূজো না করায়, তাঁকে মিথ্যা কথা বলার কারণে গোয়ালিনীর গবাদিপশু মারা গেল, তাঁর ভাসুরের অকালে প্রাণবিয়োগের ঘটনা ঘটল। গোয়ালিনীর কুবুদ্ধি কাজ করায় তাকে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি গোরক্ষনাথকে স্বীকার করে নিয়ে বাড়িতে তাঁর পূজোর আয়োজন করলে গোরক্ষনাথ

অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাঁর সমস্ত গোরু, আত্মীয় স্বজনকে ফিরিয়ে দিলেন। গোরক্ষনাথ পুজোর প্রচলন হল। ভক্তদের বাড়িতে গোরক্ষনাথের কৃপায় গবাদিপশু ও চাষবাসের উন্নতি ঘটে। তাঁরা সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। গোরক্ষনাথ শুধুমাত্র দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন না, তিনি ভক্তদের নীরবে ক্ষমা করে দিয়ে একেবারে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ চরিত্র হয়ে উঠেছেন। নাথপন্থের ঐতিহ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম রূপ শিবের প্রতীক, তাঁর প্রসঙ্গও গানে এসেছে।

শেষপর্যন্ত শৈবযোগী গোরক্ষনাথ শুধু সাধারণ মানুষের দেবতায় পরিণত হলেন না, হয়ে উঠলেন গোরক্ষক দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে পশুপতি শিবের প্রতীক গোরক্ষনাথ হয়ে উঠলেন বৈষ্ণব ধর্মের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি দেবতা—

‘গরু লয়ে গোক্ষনাথ স্বর্গপুরে ছিল।
 জীবের কারণে গরু মর্তে ফিরাইল।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
 গোক্ষনাথ গরুকে বলে, সুখে করো বাস।
 পৃথিবীর ভার তোল খেয়ে বনের ঘাস।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
 পৃথিবীর ভার আমি বইবো, কেমন করে।
 মারবে পিঠে লাঠির বাড়ি যাব প্রাণে মরে।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
 দিনমান যে মার মারিবে, তা সহিব আমি।
 সন্ধ্যাকালে বেঁধেমার সহিব না আপনি।।
 হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)
 গরুকে যে খেতে দেন, তাতে ঠাকুর হন খুশি।

গরুর নাদে ভিজে আছে, খোল আর ভুষি।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

অমাবস্যায় পূর্ণিমাতে যে জন হাল বায়।

গোক্ষনাথের অভিশাপে বুকে শেল পায়।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

গরুকে যে বেঁধে রেখে আগে ভাত খায়।

গোক্ষনাথের অভিশাপে অধ:পাতে যায়।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

জলপান করিবারে ধেনু যায় সরোবরে।

যেইজন বাধা দেয় পথের ভিতরে।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

গোক্ষনাথ বলে সে বেদের বচন।

শত ব্রহ্ম-খাত পাপে লুপ্ত সেই জন।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

সকাল বেলায় ঝাঁট ঝাড় মা, সন্ধ্যাবেলায় বাতি।

তার ঘরে বিরাজ করে, লক্ষ্মী ভগবতী।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

আথালে মা ভগবতী, পাতালে যেন খেয়া।

জন্ম জন্ম করিবেন মাগো, গোক্ষনাথের সেবা।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)

গোক্ষনাথের পাঁচালি সমাপন হ'ল।

আনন্দে সবাই মিলে হরি হরি বল।।

হ্যাঁচো, হ্যাঁচো... (সকলে)^{৮২}

গোরক্ষনাথের পাঁচালি গানে গ্রামের মানুষের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রামবাংলার কিছু লোকাচার যেমন অমাবস্যা-পূর্ণিমায় লাঙল বিরতি, সকালে বাড়িতে ঝাঁট

দেওয়া বা সন্ধ্যাবেলায় তুলসীবাতি জ্বালানো আজও গ্রামের মানুষ কৃষ্টি হিসেবে পালন করেন। পাশাপাশি গোরুর পালের সারিবদ্ধভাবে জল খেতে পুকুর বা নদীতে যাওয়ার একান্ত বাস্তবানুগ চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মনুষ্যের প্রাণী বা অবলা পশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ভালোবাসার চিত্রে মূক পশুর প্রতি আন্তরিকতা গোরক্ষনাথের পাঁচালিতে পশু ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক ধরা পড়েছে।

নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অংশেও বহু লোকাচার ও উৎসব প্রচলিত আছে। সেরকম একটি উৎসব ‘গোরক্ষনাথের শিরনি’। গবাদিপশুর নিরাপত্তা ও গোরুর বেশি দুধ পাওয়ার আশায় ‘গোরক্ষনাথের শিরনি’ উৎসব পালিত হয়। ‘গোরক্ষনাথের শিরনি’ সম্বন্ধে তোফায়েল আহমদ বলেছেন—

উঠোনের একটা জায়গা পরিষ্কার করে লেপেপুঁছে নেওয়া হয়। সেখানে
বসিয়ে পাড়ার রাখাল ছেলেদের পায়ের খাওয়ান হয়। খাওয়া শেষে তাঁরা
এঁটো হাতে গরুর পিঠে কিল দেয়। তাতে গাভীর দুধ বাড়ে। এই শিরনির
সময় পাঁচালী হয়।^{৮০}

‘গোরক্ষনাথের শিরনি’ লোক উৎসবের কথা প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তীও উল্লেখ করেছেন, ‘গোবৎস জন্মবার এক বিংশতিতম দিবসে গাভী ও বৎসকে স্নানান্তে কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। ঐ গাভীর দুধ দ্বারা কয়েকখানা লাডু প্রস্তুত করতঃ সেই সমুদয় খে, চিড়া, দুগ্ধ, দধি, মিষ্টিদ্রব্য ও ফলফলারি একটি অগ্রপাতে স্থাপন করিতে হয়। সন্ধ্যায় এই নৈবেদ্য ও ধূপ-দীপ গোশালার সম্মুখে রাখিয়া প্রতিবেশীদের আহবান করিতে হয়। সকলে সমবেত হলে নৈবেদ্য নিবেদন করতঃ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি কথা বলিবেন। কথা সমাপ্ত হইলে প্রসাদ গ্রহণান্তর সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিবেন।’^{৮১} বাংলা একাডেমি থেকে সংগৃহীত ‘গুরুখের ধারের

পাঁচালী’ প্রসঙ্গে সংগ্রাহক আব্দুল রহমান ঠাকুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বর্ণনার কিছুটা অমিল লক্ষ করা যায়। তিনি লিখেছেন—

গাই বিয়ানের একুশ দিন পরে বিশেষ আয়োজন করিয়া গুণখের ধারের পাঁচালী বলা হয়। বয়াতী গোয়াল ঘরের মাঝ দুয়ারে বসিয়া পাঁচালী বলেন। রাখালেরা তাহার চারিদিকে বসিয়া হেচ্ছ বলিয়া দোহার ধরে। বয়াতীর সামনে একটা ঘটি থাকে, আরো থাকে পাঁচ প্রকার পাতা, যেমন আম, বেল, জাম, মান ইত্যাদির পাতা। ধান, ফুল, চন্দন তিল, আতপ চাউল, হরিতকী ইত্যাদিও দেওয়া হয়। অন্যত্র কলার মাইজ পাতায় থাকে পাঁচটা নাড়ু। আর একটা কলাপাতায় আরও পাঁচটা নাড়ু রাখা হয়। এগুলিকে বলা হয়, ‘বাগ নাড়ু’।...পাঁচালী বলার পর পাঁচজন রাখালে বাগ নাড়ু খায়। তারপর বয়াতী একজন রাখালকে গোয়ালঘরে যাইতে বলেন। রাখাল গোয়াল ঘরে গেলে বয়াতী তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। রাখাল গোয়াল ঘর হইতে প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়। সর্বশেষে বয়াতী রাখালকে গোয়ালঘর হইতে বাহির হইতে বলেন। তখন বাহিরের রাখালেরা জল ছিটাইয়া দিয়া তাকে খুব সাজা দিয়া থাকে।^{৮৫}

আচারের ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য একই থাকলেও এলাকাভেদে ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত পার্থক্যের কারণে বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা গিয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘গোরক্ষনাথের পূজা’-র আচারগত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন গোরক্ষনাথের পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রিত কৃষক ও রাখালেরা ছড়া আবৃত্তি করে।^{৮৬}

শরৎচন্দ্র মিত্র পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় গোরক্ষনাথের ব্রত পালনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে গোরুর বাছুর জন্মবার ত্রিশ দিনের দিন গাভীর দুধ দুয়ে তা সম্পূর্ণটাই চিনি মিশিয়ে জাল দিয়ে গাঢ় করা হয়। সেই ক্ষীর দিয়ে গোরু-বাছুরের মূর্তি, নাড়ু, স্বস্তিকা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। সন্ধ্যায় এটি রাখাল বালক একটি কলাপাতায় ভোগের দ্রব্য নিয়ে গোয়াল

ঘরের কোণে রেখে দেয়। লোকবিশ্বাস, গোরুর দেবতা গোরক্ষনাথ এসে এ ভোগের দ্রব্য গ্রহণ করেন। বালকটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলে অপর একটি বালক তাকে আশেপাশের কোন জলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে অনেক সময় হাতাহাতি হয়। এটা আসলে ভালো দেবতার সঙ্গে অপদেবতার সংগ্রাম। এরপর বালকেরা মিলে গোরক্ষনাথের পাঁচালি বলে।^{৮৭}

এছাড়া পূর্ববঙ্গে ‘কুলের মাগন’ নামে একপ্রকার আচার প্রচলিত ছিল। পৌষমাসের শুক্লপক্ষের শেষদিকে কয়েকদিন ধরে বালকেরা পীর ও গুরুনাথের দোহাই দিয়ে চাল সংগ্রহ করে। গোরক্ষনাথকে গোরক্ষক দেবতা বা পীর হিসেবে মানা হয়। চৈত্রমাসে বারুণীর সময়ে কিশোর রাখাল বালকের দল গামছা পেতে গোরক্ষের নামে শিরনি প্রার্থনা করে। একে ‘গোরখের লাই পাতা’ বলে। এই উপলক্ষে তারা গোরক্ষনাথের গান করে—

‘অক্ষি লো মেনা গাই
গোরখের নামে সিন্ধি চাই।
গোরখের লাই, গোরখের লাই।।
এক কড়া হইলে আমরা গোরখেরে বুঝাই।
হাটে যাও হাটুল্যা ভাই পছে সারি সারি।
গোরখের লাগি কিইন্যা আইনো অগ্নিপাটের শাড়ি।।
আমরা যে রাখুয়াল ভাই আমরা কিছু পাই।
চালিয়া চল্লিশ কড়া গোরখের বুঝাই।’^{৮৮}

পাবনা জেলায় গোরক্ষনাথ পূজোর লোকাচারটি পৌষমাসের সংক্রান্তির দিনে পালিত হয়। রাখালের দল সংগৃহীত মাগনের চালে ফিরনি ও চিতল পিঠে তৈরি করে নিজেরা খায় ও গোরুকে খাওয়ায়। ঐদিন সকাল বেলায় স্নান করে তারা গোরুকে পা ধুয়ে দেয়। পাবনা জেলায় লোকাচারটির নাম ‘গোরুকে পিঠে খাওয়ানো’।

পূর্ববঙ্গের বগুড়া অঞ্চলে নাথযোগীদের মধ্যে গোরক্ষনাথ পূজো এবং গোরক্ষনাথের গান এখনও প্রচলিত আছে। বগুড়ার মিঠুন দেবনাথ, বয়স- ৩২, গ্রাম উথলী, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া জানানেন যে বগুড়া অঞ্চলে নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কথিত আছে যোগীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে যোগীর ভবন মঠ দর্শন করতে হয়। ‘যোগীর ভবন’ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বাংলাদেশে নাথ সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ মঠ ছিল একসময়, এখন তার ভগ্নপ্রায় অবস্থা। তিনি আরও জানানেন বগুড়া অঞ্চলে গোরক্ষনাথ গোরক্ষক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। শুধু নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ নন, অন্যান্য মানুষেরাও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্ধ্যাবেলায় গোয়ালঘরে সংকীর্তন করে। তারা গোরক্ষনাথকে স্মরণ করে গোরক্ষনাথের নামে গান ও পাঁচালি পাঠ করে। গোরক্ষনাথকে উদ্দেশ্য করে লাড্ডু, কলা, খই, মুড়কি ও দুধের পায়ের উৎসর্গ করে হরির-লুট দেয়। শৈবযোগী গোরক্ষনাথ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বনের কারণে কৃষ্ণরূপে পূজিত হন। স্থানীয় মানুষ গোরক্ষনাথের নামে পাঁচালি পড়েন—

‘গোরক্ষনাথ প্রীতি প্রেমানন্দে হরি হরি বল—

রূপুন রাণী সুপুর সাজে।

কানাকড়ি ঝুমুর বাজে।।

বাজুক ঝুমুর বাজুক তাল।

এই ঘরখান জগৎ লাল।।

জগৎলালের রিনি ঝিনি।

সোনা বান্ধা পাঁচ কিনি।।

সোনারে কাঠুরা হার।

কাঠুরা হারে লাগলো ঘুন।

কে কে যাবা বাগানপুর।।

বাগানপুরের কালো পানি।

মা থুয়ে তার ছাও আনি ।।
মা গেল তার আলো ঝালে ।
বাপ গেল তার মরিচ গুণে ।।
মরিচ গছি আউল ঝাউল ।
তার মাঝে গোরক্ষনাথের বাউল ।।
গোরক্ষনাথের বাউল বাজনা বাজে ।
তাক দেখিয়ে মাগুর মাছ হাসে ।।
থাক থাক মাগুর তোর লাগাল পাম ।
এক মাগুর কাটিয়া সাত
(৭) ব্রাহ্মণকে খাওয়ামো ।
এক ব্রাহ্মণের হারে পেট
হারে পেটে মারণু বারি ।
পেট নিয়ে করে নড়ানড়ি ।।
এক ব্রাহ্মণের লম্বা গলা ।
তাই খায়ে গেল কুলার কলা ।
হাত ছিলে ভিউ চাষি ।
হাত ছিলে পাট বুনি ।।
হাত ছিলে পাট নিড়াই ।
হাত ছিলে পাট কাটি ।।
হাত ছিলে পাট ধুই ।
পাটে বলে মুই বড় বীর ।
এইঘর খান বান্ধা করনু স্থির ।।
প্রেমানন্দে গোরক্ষনাথে
হরি হরি বল ।।’

– (সংগৃহীত গোরক্ষনাথের গান)

মধ্যযুগের শুরুতে কৃষ্ণ-রাধা চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে। রামায়ণ, মহাভারত বাংলায় লেখার আয়োজন চলছে। শিবকে আড়াল করে কৃষ্ণকে প্রধান স্থানে বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারফলে দেহসাধনা ভিত্তিক ধর্মমতগুলি পেছনে পড়ে যায়। এ এক জটিল সামাজিক বিবর্তন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ইতোমধ্যে পশ্চিমভারত, মধ্যভারত ও উত্তর ভারতকে চারবর্ণের বিভাগে বেঁধে ফেলেছে। তারমধ্যে বাংলায় মধ্যযুগেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা ‘চাতুর্বর্ণ ধর্ম’ প্রবল হয়ে উঠেছে। তার দীর্ঘদিন বাদেও গোরক্ষনাথের এই গানটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে পুরোহিতের লোভ-লালসাকে ব্যঙ্গ করেছে। এখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে গোরক্ষনাথ কৃষ্ণ চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। গোরক্ষনাথকে শিবের অংশ মনে করা হয়। অবশ্য গুরু শিব ও কৃষ্ণ উভয়ের বাহন। পৃথিবী ও গুরু সমার্থক, শস্য সৃষ্টির মাধ্যম। বগুড়ার যুবক নীরবকুমার দেবনাথ জানালেন বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ করেন। তারসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে নাথ সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মঠগুলি পুরনো গৌরবময় ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।^{৮৯}

বগুড়ার মিঠুন দেবনাথের কাছ থেকে গোরক্ষনাথের ‘স্বপ্নতত্ত্ব’ বিষয়ক আরেকটি গান পাওয়া গিয়েছে। গানটিতে সাধারণ মানুষ কীভাবে রোগব্যাদির প্রকোপে রক্ষা থেকে শুরু করে, গবাদিপশু রক্ষা, চাষবাস করে ভালো ফসল তুলতে পারেন সেই লক্ষ নিয়ে গোরক্ষনাথের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

‘গোয়াল বন্ধ, গোয়াল বন্ধ
গোয়াল বন্ধময়।
তেরিশকোটি দেবতা বন্ধ
গোরক্ষনাথ কয়।।

কৈলাস হতে মহাদেব মর্তে পা দিলেন।
 প্রবর্তকালে মুনিঋষিগণ বলে।।
 কামধেনুকে মহাদেব ডাকে ঘন ঘন।
 মর্তলোকে যাও ধেনু পূজার কারণ।।
 জরা, মরা, ব্যাধি, ভয় কিছু নাহি রবে।
 মহানন্দে যাও ধেনু মর্তের আগারে।।
 জয় জয় গোরক্ষনাথ প্রণাম চরণে।
 কৃপা কর এইবার অধম সন্তানে।।
 গোরক্ষনাথের পাঁচালী শোন দিয়ে মন।
 স্বপ্নযোগের কথা আমি করিব বর্ণন।।
 স্বপ্নযোগে যেবা নারী অন্ন রন্ধন করে খায়।
 পেটের অসুখে সে যমলোকে যায়।।
 স্বপ্নযোগে যেজন নদী পাড় হয়।
 নিশ্চয় জানিবে তার বিপদ দূর হয়।।
 স্বপ্নেতে যে জন নদীর জলে হাবুডুবু খায়।
 নিশ্চিত জানিবে তার বিপদ কাছয়।।
 স্বপ্নযোগে যে জন ডাল ভেঙ্গে পড়ে।
 নিশ্চয় জানিবে তার ভাই মারা যাবে।।
 স্বপ্নেতে যেবা লোকের ঘর ভেঙ্গে যায়।
 নিশ্চিত জানিবে তার পিতা মারা যায়।।
 স্বপ্নযোগে যে নর দুঃখান্ন খায়।
 অবশ্য জানিবে তার কুষ্ঠরোগ হয়।
 স্বপ্নেতে যে নারী পুঁটিমাছ খায়।
 নিজ কর্মফলে তার পুণ্য সঞ্চয় হয়।।
 স্বপ্নযোগে যেজন বড় মাছ খায়।

নিশ্চয় জানিবে তার বংশের ক্ষতি হয়।।

পূর্ণকাঠা চাল আর দুর্বা গুয়াপান।

গোরক্ষনাথে তরে কিছু পয়সা করেন দান।।’

– (সংগৃহীত গোরক্ষনাথের গান)

গোরক্ষনাথের গান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং মেদিনীপুর জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং রাজশাহী জেলায় একপ্রকার পরিচিত এবং প্রচলিত লোকগান। গানগুলিতে নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি স্থান পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত কৃষিজীবী, গবাদি-পশুপালক মানুষের কাছে গোরক্ষনাথের গান বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিস্তারের কারণে গোরক্ষনাথের গানগুলি রচিত হলে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া নাথ সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মানুষ নাথ পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গোরক্ষনাথের গানের ক্ষেত্রে তা ঘটল না। বরং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক লোকগান, লোককথা, গীতিকা ইত্যাদি হারিয়ে গেলেও গোরক্ষনাথের গান বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। কোনো সাম্প্রদায়িক বোধজনিত অলৌকিকত্বের প্রচার ছিল না বলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও গোরক্ষনাথের গানগুলির প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও হারায় নি। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক-কর্মকাণ্ড, কৃষি-উৎপাদন, গবাদিপশুর নিরাপত্তা ইত্যাদি গ্রামীণ-সমাজের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গোরক্ষনাথের গানগুলি রচিত হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ তার মধ্যে

নিজেদের খুঁজে পান। সর্বোপরি সাধারণ গায়নের দলের মুখে মুখে গোরক্ষনাথের গানগুলি কয়েকশো বছর ধরে চলে এলেও মূল কাহিনির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি, বরং পাঠবৈচিত্র্য লাভ করেছে। গোরক্ষনাথের গানগুলি সমাজ-ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার ধর্ম বাংলার সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছে বলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়েছে। কৃষির অস্তিত্ব গোরক্ষ উপর নির্ভরশীল। তাই গোরক্ষক দেবতা হিসেবে গোরক্ষনাথ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উর্ধ্ব অসাম্প্রদায়িক চেতনা স্থাপন করেছেন। তারফলে পরবর্তীতে পীরের মাহাত্ম্য হিন্দু সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। নাথযোগী জাতি আদিকাল থেকেই যাজ্ঞিক-বৈদিকগণের চারবর্ণ বিভাজনের বিরোধিতা করে এসেছে। গোরক্ষনাথের গানগুলিতেও কৃষি, গোপালন ইত্যাদি কোনো কাজকে অশ্রদ্ধা না করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে সেগুলিকে সদ্ভাবে গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তারফলে ধর্ম, সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে বাংলার সর্বশ্রেণির মানুষকে গোরক্ষনাথের গানগুলি অসাম্প্রদায়িক বিভেদহীন মানবধর্মকে উপহার দিয়েছে। সর্বোপরি নাথসাধনা মূর্তি পূজোর থেকে দেহশুদ্ধি সাধনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে তা মুসলমানদেরও আকর্ষণ করেছে। ‘গোসানীমঙ্গল’-এ ভৈরব যোগীর বীরত্ব এবং গোরক্ষনাথের গানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গোরক্ষনাথের প্রভাব থেকে বোঝা যায় বৃহত্তর বাংলায় নাথপন্থের প্রভাব কতখানি পড়েছে। ‘গোরক্ষনাথের গান’-এ দেখা যায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধারার প্রভাব এড়িয়ে চলার সাহস দেখাতে পারছেন। এমনকি মুসলমান সংস্কৃতিকে শেষ পর্যন্ত নাথযোগী সম্প্রদায়ের পারিভাষিক শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়েছে। এই কারণেই হয়ত ড. সুকুমার সেনের মনে হয়েছে—

...their nonobservance of the Brahmanic social order put the members of the Yogi-caste outside the domain of the orthodox Hindu society.^{৯০}

স্বাভাবিক কারণে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলা ও অসমের নাথযোগী-সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রভাব অতিক্রম করে নিজেদের কুলাচার রক্ষা করতে পেরেছেন। এমনকি নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ চতুর্বর্গাশ্রমীর মত মানবগুরুর নামেও গোত্রপরিচয় দেন না।^{৯১} নাথপন্থে লক্ষ হল শিবের আদর্শ অনুসারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করে মহাযোগী হওয়ার চেষ্টা করা। ‘মুণ্ডকোপনিষদে’ও প্রাচীনকালের আথর্বন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম প্রথা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা যোগাচারের মাধ্যমে শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞ হতেন, এমনকি তাঁদের সন্তানেরাও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন— ‘ন অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ভবতি’ (৩/২/৯)। এখানেই নাথপন্থের যোগীদের সঙ্গে অন্য পন্থের যোগীদের পার্থক্য।

তথ্যসূত্র

১. প্রণবকুমার সাহা ও কেকা ঘোষ, *রাজমোহন নাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী*, পৃ. ৫২।
২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রাচীন খণ্ড- প্রাচীন যুগ, পৃ. ২৩।
৩. ক্ষিতিমোহন সেন, *বাংলার সাধনা*, পৃ. ৩৩।
৪. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম ভাগ, পৃ. ৭১-৭২।
৫. সৈয়দ আলী আহসান, মুখবন্ধ, কবি সুকুর মাহমুদ রচিত, *গুপ্তচন্দ্রের সন্ন্যাস*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), ভূমিকা পৃ. ২।
৬. Mohan Singh, *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*, p.18.
৭. *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রাচীন খণ্ড-প্রাচীন যুগ, পৃ. ২২।
৮. কামিনীকুমার রায়, *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার*, পৃ. ২।
৯. ঐ, পৃ. ২।
১০. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *নাথধর্ম ও সাহিত্য*, পৃ. ১১৬-১১৭।
১১. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি*, পৃ. ৫০।
১২. *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*, শ্লোক-১।
১৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *ব্রত ও আচার*, পৃ. ৪৯।
১৪. *নাথধর্ম ও সাহিত্য*, পৃ. ১১৮।
১৫. নাজমা নারগিস, *অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধ মনন ও বিন্যাস*, পৃ. ১৮।
১৬. গিরিজাশঙ্কর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ*, পৃ. ১০৯।
১৭. *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*, গোপীনাথ কবিরাজ (সম্পা.), পৃ. ৪০।
১৮. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব*, অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), *বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ*, পৃ. ৪৯।
১৯. *মীনচেতন*, নলিনীকান্ত ভট্টশালী (সম্পা.), ভূমিকা পৃ. ৮।
২০. আমানাতুল্লা আহমেদ খান চৌধুরী, *কোচবিহারের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।
২১. স্মরণিকা, কোচবিহার জেলা প্রদর্শনীর মুখপত্র, ১৯৭১, পৃ. ২৭।
২২. ঐ, পৃ. ১০৯।
২৩. সাক্ষাৎকার: যোগী অবন্তিকা নাথ, পাশুপত কৌলযোগী, গীর্গার গুজরাট, তাং ১৩ জুলাই ২০২৪।

২৪. গিরীন্দ্রনাথ দাস, *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা*, পৃ. ১৫।
২৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১২২।
২৬. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, পৃ. ৫১৬-৫১৭।
২৭. গোপালভট্ট রচিত *বল্লালচরিতম্*, শশিভূষণ ভট্টাচার্য (অনূদিত), উত্তরখণ্ড, শ্লোক ১১।
২৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার নাথসাহিত্য*, পৃ. ৫।
২৯. আব্দুল কাদির, *বাঙলার পঙ্কীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম*, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০।
৩০. H. Baverly, *Census report of Bengal (1872)*, Vol. 1, p.130.
৩১. চারুচন্দ্র সান্যাল, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী*, তৃপ্তি সান্না (অনূ.), পৃ. ২৭৩।
৩২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পৃ. ৬১-৬২।
৩৩. গিরিজাশঙ্কর রায়, *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ*, পৃ. ২৭৬-২৭৭।
৩৪. ঐ, পৃ. ৩০৫-৩০৬।
৩৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ. ২৬৪।
৩৬. দিলীপকুমার দে, *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৯৬।
৩৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৭।
৩৮. Sukumar Sen, *Vipradasa's Manasa-Vijaya*, Introduction p.VII.
৩৯. বিপ্রদাস পিপলাইয়ের *মনসামঙ্গল*, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.), পৃ. ১১২।
৪০. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০।
৪১. M. Martin's *Eastern India*, Vol. III, p. 409.
৪২. আমানাতুল্লাহ আহমেদ খান চৌধুরী, *কোচবিহারের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২-২৫।
৪৩. আহমদ শরীফ, *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, পৃ. ৩৭।
৪৪. ডম্বরুধর নাথ, *অসম বুরুঞ্জী*, পৃ. ৬২।
৪৫. *Song of Manik Chandra*, Introduction p. 5.
৪৬. *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান*, উপাসু (সম্পা.) ও সুভাষচন্দ্র রায় (সংগ্রহ ও রচনা), পৃ. ২-৩।
৪৭. গুরুদাস ভট্টাচার্য, *বাংলা কাব্যে শিব*, পৃ. ১০২।
৪৮. অর্জুনদেব সেনশর্মা, *হিন্দুবাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*, পৃ. ১৩৫।

৪৯. অনির্বাণ, বেদমীমাংসা- ১, পৃ. ১২২।
৫০. সনৎকুমার নস্কর, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, পৃ. ২৮৬।
৫১. উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান, পৃ. ৩।
৫২. গোপীচন্দ্রের গান, আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ভূমিকা অংশ।
৫৩. ঐ, পৃ. ৫১৩।
৫৪. উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান, পৃ. ৫।
৫৫. জীবন নাথ, নাথযোগের প্রাচীন ঐতিহ্য, পৃ. ৫।
৫৬. উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান, পৃ. ৩।
৫৭. ঐ, পৃ. ৪।
৫৮. ঐ, পৃ. ৫।
৫৯. ঐ, পৃ. ৬।
৬০. ঐ, পৃ. ৬-৭।
৬১. লোকসাহিত্য সংকলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৬; ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৯২।
৬২. নারায়ণচন্দ্র বসুনিয়া, গোরক্ষনাথের গান লোকপুরাণের আড়িনায় রাজবংশী জীবনকথা, পৃ. ২০।
৬৩. ঐ, পৃ. ২১।
৬৪. ঐ, পৃ. ২২।
৬৫. শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীভক্তমাল, পৃ. ১৫৭।
৬৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, পৃ. ১৪১।
৬৭. নারায়ণচন্দ্র বসুনিয়া, গোরক্ষনাথের গান লোকপুরাণের আড়িনায় রাজবংশী জীবনকথা, পৃ. ২৫-২৬।
৬৮. ঐ, পৃ. ৩২।
৬৯. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোসানী-মঙ্গল, পৃ. ৬৭।
৭০. ঐ, পৃ. ৬৭।
৭১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও ‘যোগী’-সাধন-প্রণালী একটি অভাবিত বিনিময়ের সূত্র, পৃ. ৭।
৭২. কল্যাণী মল্লিক, নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, পৃ. ১।

৭৩. Kalyani Mallik, *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*, p. 5.
৭৪. জলি বাগচী, *ইতিহাসের বীক্ষণে কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসঙ্গীত আধুনিক পর্ব*, পৃ. ২১৫-২১৬।
৭৫. গোর্খবিজয়, পৃ. ৫৭।
৭৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মৌখিক সংস্কৃতিতে নাথ ধর্মসাধনা*; বলরাম চক্রবর্তী, (সম্পা.), *শৈবনাথযোগিধারা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।
৭৭. ঐ, পৃ. ১১৯-১২০।
৭৮. ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১০৪।
৭৯. দীপক বিশ্বাস, *হ্যাঁচো গান বা গোরক্ষনাথের পাঁচালি*, লোকশ্রুতি পত্রিকা, মালিনী ভট্টাচার্য (সম্পা.), পৃ. ১৩৯।
৮০. ঐ, পৃ. ১৪০-১৪১।
৮১. Mohan Singh, *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*, p.21.
৮২. দীপক বিশ্বাস, *হ্যাঁচো গান বা গোরক্ষনাথের পাঁচালি*, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৮৩. *দিলরুবা* পত্রিকা, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৬৩, পৃ. ৩২২; ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৯১।
৮৪. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *ব্রত ও আচার*, পৃ. ৪৮।
৮৫. *লোকসাহিত্য সংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৬, খাতা নং ৬৫৬৬/৩৫২; ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পৃ. ১৯২।
৮৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৫।
৮৭. *On the Cult of Gorakshanath in Eastern Bengal*, JDL, Vol. XIV, p. 18-24.
৮৮. রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*, পৃ. ৮০-৮১।
৮৯. Partha Sarathi Nath, *Nath Pantha Shrines and Perpetual Tradition in Bangladesh*, pp. 200-201.
৯০. Sukumar Sen, *The Natha Cult, Cultural Heritage of India*, Vol. 4, p. 281.
৯১. *গোপীচন্দ্রের গান*, রাজমোহন নাথ (সম্পা.), পৃ. ১৬।

৫. ঘ. তিননাথের গান

তিননাথ বা ত্রিনাথ পূর্বভারতে বাংলা, অসম ও ওড়িশার জনপ্রিয় দেবতা। ত্রিনাথ উপাসনাকে পুজো না বলে ‘তিননাথের মেলা’ বলা হয়।^১ ড.ধরনীধর নাথ ওড়িশার ত্রিনাথ উপাসনার বিস্তৃত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিনাথ মেলা কটক, জগৎসিংপুর, আঙ্গুল প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিননাথ ঠাকুর রূপে পূজিত হন। সোমবার সন্ধ্যাবেলায় ত্রিনাথ মেলা পালিত হয়। তিনটে করে পান, গোটা সুপুরি এবং গাঁজা তিননাথ পুজোর উপকরণ। পুজোতে তিননাথ বা ত্রিনাথের ভজন কীর্তন চলে, শেষে ত্রিনাথের পাঁচালি পাঠ করেন ভক্তরা। ত্রিনাথ বা তিননাথের পুজো পারিবারিক ও সর্বজনীন দুই ভাবেই ওড়িশাতে প্রচলিত আছে। এমনকি শিশু জন্মানোর একুশ দিনের মাথাতে পূর্ণাগড় এলাকার মানুষেরা ত্রিনাথ পুজো করেন।^২ নাথপন্থে শিবের সঙ্গে পুজো হয় শিবলিঙ্গের, তিননাথ, নয়নাথ এবং চুরাশি সিদ্ধর। তিননাথের পুজোকে কেন্দ্র করে তিননাথের মেলা বসে। ড. জীবন নাথ মনে করেন ব্রাত্য শৈবধর্মের রুদ্র, ঈশান, মহাদেবই হিন্দুধর্মে ত্রিদেব-তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। নাথপন্থে তিননাথ হলেন আদিনাথ (মানবগুরু), মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ। ত্রিদেব অভিধানে থাকলেও ‘ত্রিনাথ’ নেই। লোকসংস্কৃতিতে তিননাথের পরিচয় পাওয়া যায়। জৈনধর্মে আদিনাথের মূর্তি পাওয়া গেলেও আজ পর্যন্ত মানবগুরু আদিনাথের মূর্তি পাওয়া যায় নি। নাথপন্থে আদিনাথ দেবগুরু ও মানবগুরু দুই-ই। যতদূর জানা যায় মানবগুরু আদিনাথ কজরীবনবাসী হয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন গৌড়দেশের মৎস্যেন্দ্রনাথকে। সেটা ষষ্ঠ শতকের কথা। এই গৌড় রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ নিয়ে।

ষষ্ঠ শতকে শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^৩ মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘যোগবিষয়ঃ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

‘গুরুভক্তিযুতো ধীমান স শিষ্য ইতি কথ্যতে।

অকুলেনাদিনাথেন কেজাপুবীন বাসিনা।।’ -শ্লোক ৪^৪

আদিনাথ স্বয়ং শিব, তাঁর বিশেষণ অকুল। কেজাপুবীন সম্ভবত কদলীবন হবে। কদলীরাজ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ রাজত্ব করেছিলেন। এই কদলীক্ষেত্রে সুবর্ণকদলী বনে আদিনাথ শিব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভার্গব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত এই শিবের পূজা করেছিলেন।^৫ ড. বারিদবরণ ঘোষ চট্টগ্রামের কক্সবাজারের মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত আদিনাথ মন্দির সংলগ্ন জায়গাকে কেজাপুবীন বলে মনে করেন।^৬ আদিনাথ হঠযোগের প্রথম আচার্য হিসেবে সম্মানিত হন—

‘শ্রীআদিনাথায় নমোহস্ত তস্মৈ যেনোপদিষ্ট্য হঠযোগবিদ্যা

বিভ্রাজতে প্রোক্তরাজযোগমারোঢ়ুমিচ্ছোরধিরোহিণীব।।’^৭

আদিনাথের নামে বাংলায় ‘আদিনাথ সম্প্রদায়’ গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান সিদ্ধ ছিলেন যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ শিবযোগী আদিনাথ ও নাথকৌল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিবযোগীদের মতো তাঁদের নাথ যোগদীক্ষার মন্ত্র হল ‘ওঁ নমঃ শিবায়’। বাংলায় এর বাইরে নাথ সম্প্রদায়ের অনেকে কপিলানি ও নটেশ্বরী পন্থের অন্তর্গত। জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথের সময়ে বাংলায় ‘পা’ পন্থেরও প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন যুগে নাথযোগীরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ১২ এবং অপর দলে ১৮ শাখা বা পন্থ অর্থাৎ মোট ৩০ পন্থ বা শাখা ছিল। ১৮ পন্থীরা শিবযোগী এবং ১২ পন্থীরা

গোরক্ষ যোগী বলে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে শিবযোগীদের ছয় পন্থ এবং গোরক্ষযোগীদের ছয় পন্থ সম্মিলিত হয়ে নাথপন্থে নতুন বারোটি পন্থ বা শাখার সৃষ্টি হয়।^৮

তিননাথের পূজোর উপকরণ সামান্য পান, সুপুরি ও এক কণ্ঠে গাঁজা। তার সঙ্গে ভক্তরা একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তিননাথের গান গেয়ে পূজো দেন। তিননাথের পূজোর দেবতার স্বরূপ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। গবেষকদের মতে এই তিননাথ হচ্ছেন আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন নাথ সম্প্রদায়ের গুরু ত্রিনাথ সম্পর্কে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ত্রিনাথ বলতে নাথধর্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাধক গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরীপাকে বোঝায়।^৯ ওয়াকিল আহমদ অবশ্য মনে করেন যে এখানে ত্রিনাথ নামটি পূরণবাচক, কিন্তু লোক-প্রচলিত ত্রিনাথ সংখ্যাবাচক। তিনি নাথত্রয়ের সমষ্টি নন, একই ব্যক্তি।^{১০} সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথকে তিননাথ বলেছেন।^{১১} মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত ‘গোরক্ষবিজয়’-র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রামের মুসলমান ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা কিছুদিন পূর্বেও গাইতেন— ‘দিনগেলে তিননাথের নাম লইও’।^{১২} যদিও ত্রিনাথের মেলা উচ্চ-নীচ সবশ্রেণির মানুষের বাড়িতেই হয়। গবেষক চিত্তরঞ্জন দেব মনে করেন—

কারও কারও মতে ত্রিনাথ অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ত্রিদেবতার উপাসনা। প্রকান্তরে বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনদেবতাই হিন্দুধর্মের তিনদেবতার খোলসের মাধ্যমে আত্মগোপন করে রয়েছে। নাথপন্থীরা বলেন, ত্রিনাথ প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি তিনজন শ্রেষ্ঠ ও প্রধান নাথ ধর্মগুরুরই কাহিনি।^{১৩}

ত্রিনাথ পূজোর তিনটি স্তর— ত্রিনাথ নিমন্ত্রণ, ত্রিনাথ পূজো ও ত্রিনাথ বা তিননাথের গান। প্রথমত তিননাথ বা ত্রিনাথ নিমন্ত্রণ করা হয়। দ্বিতীয়ত কোনো বাড়িতে বা পূজোর স্থানে তিননাথের আসন স্থাপন করে আসনের উপর ফুল, ফল ও মিষ্টি নিবেদন করেন পূজোর আয়োজকরা। ত্রিনাথ বা তিননাথের পূজোতে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ত্রিনাথ বা তিননাথের উদ্দেশ্যে ‘তিননাথের পাঁচালি’ পাঠ করেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা মহিলারা। তৃতীয়ত ‘তিননাথের আসর’-এ সারারাত ধরে নাথসম্প্রদায়ের কায়াসাধনার গান পরিবেশন করা হয়। Trinity Worship-র কথা অথর্ববেদেও পাওয়া যায়। সেখানে সবিতা, তৃষ্ণা ও প্রজাপতির সম্মিলনের কথা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পরমাত্মার তিনপদের কথা— ‘ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য’।^{১৪} অথর্ববেদের শুরুতে রয়েছে পরব্রহ্মের তিনস্বরূপ ও সপ্তলোকের কথা- ‘যে ত্রিষণ্ডাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ’^{১৫}। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড জুড়ে ব্রাত্যমহিমা প্রকাশিত হয়েছে। একেশ্বরবাদী ব্রাত্যের রুদ্র, ঈশান ও শিবই ত্রিদেবতত্ত্বের উৎস। এই তিনরূপ একব্রাত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ। বহুদেবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে একব্রাত্য শিবেরই হয় ত্রিগুণাত্মক নাম।^{১৬} প্রাগ্-ঋগ্বেদীয় যুগের দার্শনিক পটভূমিকার উপর ভিত্তি করে যেসব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্যে ‘ত্রিকারণতত্ত্ব’ ছিল অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুষ্রী হিন্দুর ত্রিদেবতত্ত্বের অনুকরণমাত্র।^{১৭} অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ত্রিদেবতত্ত্বের ধারণা ব্রাত্যসভ্যতারই অবদান। শুধু ভারতীয় হিন্দুধর্মে নয় মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলনীয় রোমান, গ্রিক, মিশরীয় ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ত্রিদেবতত্ত্বের ধারণা প্রচলিত আছে। ড. জীবন নাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসারিত ত্রিমূর্তিবাদের মূলে বেদের ত্রিরাত্র-মতবাদ কাজ করেছে বলে মনে করেন। রাত্রপূজারীদের ত্রিরাত্রতত্ত্বই প্রাচীন নৈষ্ঠিক মতবাদ।

‘পঞ্চরাত্রসংহিতা’ মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও কালই সৃষ্টির মূল কারণ। এই ধর্মমত এবং বেদ, পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য ত্রিমূর্তিবাদকে প্রভাবিত করেছে। বৈদিক যুগে ‘ত্রি’ ও ‘সপ্ত’ সংখ্যার জনপ্রিয়তা ছিল। এই ত্রিরাত্র মতবাদের সঙ্গে যোগেরও যোগসূত্র গড়ে ওঠে। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতিতে ত্রিব্যায়াম প্রাধান্য লাভ করেছে। মহেঞ্জোদারোর যোগীমূর্তির গায়ে ত্রি-অলংকার শোভিত ছিল। যোগীশিবও ত্রিনয়ন।^{১৮} ড. তারাপদ ভট্টাচার্যও অনুরূপ ভাবনার কথা বলেছেন—

It might have been most orthodox or earliest cult of the worshippers of the Ratras. The Pancharatra Samhitas attribute creation of three agents – Prakriti, Purusa and Kala. This and the triads in the Vedas, Purans and even in the Buddhist and Jaina texts were the foundations of the Triratna cult...The Mohenjodaro figure of the Yogin has a threefoil ornament on its body. Siva, the greatest of the Yogins, has three eyes. A Rigvedic passage has been explained by Sayana as referring to Tritas performing a Yoga.^{১৯}

পরব্রহ্মের তিনপদ হচ্ছে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। ত্রি-উপাসনার আদর্শ পূর্বভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ত্রিনাথের নামে মেলা ও পাঁচালির প্রচলন হয়। তিননাথ ও ত্রিনাথ এতটাই সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করে যে ত্রিনাথ বা তিননাথের ঐতিহ্য ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থেও স্থান লাভ করেছে-

‘এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে কৈলা আত্মসাৎ।

এ তিনের চরণ বন্দেঁ তিন মোর নাথ।’^{২০}

অবশ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিননাথ আমাদের আলোচ্য তিননাথ বা ত্রিনাথ নন। তিনি এখানে গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহনকে তিননাথ বলেছেন। অন্যত্র এই তিনজনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা নাথস্বরূপ বলে মনে করেছেন-

‘এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়িয়ার নাথ।’^{২১}

তারফলে বাজারে প্রচলিত ‘ত্রিনাথের পাঁচালি’-তে ত্রিনাথ বা তিননাথ হয়ে উঠেছেন শ্রীচৈতন্যদেব—

‘কলির জীবের পাপ নাহি যায়।

দেখি তাহা মহাপ্রভু ভাবেন উপায়।।

নবদ্বীপে ত্রিনাথ রূপ করেন ধারণ।

ভাবেন কিভাবে সবে করিবে পূজন।।’^{২২}

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিনাথ হয়ে উঠেছেন। ভক্তির কারণে বৈষ্ণবেরা যেমন বিষ্ণুর আসনে কৃষ্ণকে বসিয়েছেন তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবকে ত্রিনাথ ঠাকুরের আসনে বসিয়েছেন। ভক্তির আতিশয্যে প্রচলিত পাঁচালিগুলি বেদাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে গ্রাস করেছে। ঠিক যেভাবে শৈবযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বনের কারণে ভক্তমাল গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছেন।^{২৩} পাঁচালির কাহিনিতেও রূপকের আড়ালে বেদ এবং সাংখ্য দর্শনের ত্রিদেবতত্ত্ব এসেছে। কিছু পাঁচালিতে নাথযোগের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। তাই বলা যায় ত্রিনাথ ঠাকুরের করুণা-শক্তি অলৌকিক নয়, পুরোপুরি যোগলৌকিক। যোগসাধনার কারণে অষ্টসিদ্ধি লাভ যোগলৌকিক ক্ষমতারই পরিচায়ক। ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’-তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ত্রিনাথ বলা হয়েছে—

‘ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হলে একজন।

ত্রিনাথ রূপেতে প্রভু দিলে দরশন।।’^{২৪}

‘ত্রিনাথের পাঁচালী’-তে দুটি কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম কাহিনিতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের গরু হারিয়ে গেলে তিনি ত্রিনাথের কৃপায় ফিরে পেয়েছেন। দ্বিতীয় কাহিনিতে দেখা যায়

জনৈক গুরু ত্রিনাথের পূজোর ঘটে পা দিয়ে আঘাত করলে তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। শেষে শিষ্যের অনুরোধে গুরু ত্রিনাথ পূজো করে রক্ষা পান সেই কাহিনি স্থান পেয়েছে। পাঁচালির শেষে ত্রিনাথ পূজো-পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ত্রিনাথ উপাসনাকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা- বিষ্ণু- শিবের ত্রিদেবতত্ত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে –

‘ত্রিনাথ হে
আমি অতি মূঢ় মতি
না জানি ভক্তি স্তুতি
দয়াল ত্রিনাথ হে
ব্রহ্মা- বিষ্ণু-মহেশ্বরে
তিনে ত্রিনাথ নাম ধরে।’^{২৫}

ময়মনসিংহে প্রচলিত শশিভূষণ হোমচৌধুরী রচিত ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’-তে ত্রিনাথের জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে। শিবের সিদ্ধি না থাকায় দুর্গা তাঁকে দেহের ময়লা খেতে দিলেন। শিব ময়লাকে বড়ির আকারে তৈরি করলে তা থেকে ত্রিনাথের জন্ম হল—

‘নন্দী কন সিদ্ধি নাই পার্বতী কহিল।
সিদ্ধি বিনিময়ে এই মলা খেতে দিল।।
এত শুনি শীঘ্র করি মলা হাতে লয়ে।
বটিকা তৈয়ার কৈলা বিষণ্ণ হৃদয়ে।।
বটিকা হইতে হলো মূর্তি অপরূপ।
তিন বক্র ষড়্ভুজ কৃষ্ণবর্ণ রূপ।।’^{২৬}

শিব তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন—

‘ত্রিনাথ তোমার নাম রাজা কিংবা প্রজা।
জাতিবর্ণ নির্বিশেষে করিবেন পূজা।।’^{২৭}

‘ত্রিনাথের পাঁচালী’-র কাহিনির সঙ্গে ‘শূন্যপুরাণ’-র কাহিনির মিল লক্ষ করা যায়। শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে রয়েছে—

‘গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন।
রাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন।।
তিলেক পরমাণ মলা নিল নারায়ণ।
ঠাকুর উল্লুক দুহে কহিল বচন।।
সেই অঙ্গ মলা দিল বাসুকির মাথে।
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে।’^{২৮}

কবি শুকুর মাহমুদের ‘গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস’ গ্রন্থেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—

‘অনাদ্যের হাইম হতে চণ্ডিকা জন্মিল তাথে।
দুর্গা হইল পরম সুন্দর।।
অনাদ্যের টলিল মএ দেবী বাম হস্তে লএ।
তাহাতে জন্মিল তিনজন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই ছোট হৈল শিবাই।
লয়া গেল পাতাল ভুবন।’^{২৯}

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বঙ্গভূমিতে শূন্যবাদী একটি সৃষ্টিতত্ত্ব একদিন গণধর্মের সব ক’টি শাখাতেই গ্রহীত হয়েছিল এবং বঙ্গীয় লোকায়াত ধর্মজগতে ঐতিহ্য-রূপে বিরাজ করছিল। ফলে নাথসাহিত্য, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও মধ্যযুগের বহু মিষ্টিক কবিতায় বিষয়টি নানা পাঠান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।^{৩০}

অন্যদিকে মহেশচন্দ্র দাস ও সীতানাথ বসাকের ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’-তে বিপরীত ঘটনা স্থান লাভ করেছে। সীতানাথ বসাকের ত্রিনাথ ঠাকুর হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পীতবস্ত্র

ধারণ করে বৃন্দাবনে কদম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ত্রিনাথ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করাই ভক্তের কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেম আশ্বাদন করতে গৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন—

‘নবীন নীরদকায়

শিরেতে বেঁধেছে তায়

শিখাপুচ্ছ পরম যতনে।’^{১১}

এই কাহিনি থেকে পরিষ্কার যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ অনুসারে পাঁচালীকার পাঁচালিটি রচনা করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় কখনো গাঁজা ব্যবহার করেন না। তাছাড়া সিদ্ধি অনিমাди অষ্টসিদ্ধির প্রতীক। আদিনাথ শিব হলেন আদিসিদ্ধ। তাঁর শিষ্যরাও সিদ্ধি লাভ করে সিদ্ধ হিসেবে স্বতন্ত্র্য লাভ করেছেন। যেসব যোগী যোগে পূর্ণতা লাভ করেছেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ।^{১২} সুতরাং শৈব নাথসিদ্ধরাই তিননাথ বা ত্রিনাথ হবেন সন্দেহ নেই। ত্রিনাথের অধিকাংশ কাহিনি শিব বা নাথযোগ পরম্পরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বাভাবিক কারণে বলা যায় ত্রিনাথের পূজোর কাহিনির সঙ্গে পরবর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বৈষ্ণব পূজোর আয়োজন ত্রিনাথ পূজোর আয়োজনের মতো এত সামান্য নয়। সেই কারণে ভবনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন, ‘আমাদের মনে হয় পূর্ববঙ্গের এই ত্রিনাথ ঠাকুরকে জোর করে কৃষ্ণনামের নামাবলী পরালেও তাঁর পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্মকে লুকাতে পারা যায় নি।’^{১৩} ড. বেণীমাধব বড়ুয়া নাথপন্থের সঙ্গে আজীবিক ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত: উভয় ধর্ম সাধনায় তিনজন করে সিদ্ধ পূজিত হন। নাথ—আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ ; আজীবিক – নন্দ বৎস, কৃষ্ণ সাংকৃত্যায়ন ও সঙ্করিল গোশাল। দ্বিতীয়ত: উভয় সম্প্রদায়ে ধর্মভাবের প্রকাশে গানের

ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তৃতীয়ত: উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণায়াম ও হঠযোগ সাধনার ধারা প্রচলিত আছে। চতুর্থত: দুই ধর্ম সম্প্রদায়ই ঈশ্বর রূপে অবধূত ও নিরঞ্জন রূপের উপাসনা করেন। আজীবিকরা শেষপর্যন্ত খ্রিস্টীয় ১০ম কিংবা ১১শ শতাব্দীতে বর্ণাশ্রমপন্থী ব্রাহ্মণদের বিধিনিষেধের হাত থেকে বাঁচতে শৈব শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েন। সম্ভবত এই সময়ে প্রাচীন আজীবিক ধারা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথগুরুদের হাতে এবং যোগীপাল, মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন আকার ধারণ করেছিল।^{৩৪} ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত নাথ ও আজীবিক ধর্মের আপাত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক পার্থক্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন। অবশ্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ত্রিনাথের কল্পনা, পূজাপদ্ধতি ও লোকগাথাকে ড. বড়ুয়ার প্রথম সাদৃশ্য সমর্থন করে বলে উল্লেখ করেছেন।^{৩৫}

কিন্তু ত্রিনাথ উপাসনাকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যেগুলির সহজে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমত- ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য মনে করেন অসমের বরাক উপত্যকায় ত্রিনাথ উপাসনা সব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিনাথ পূজোর গায়ক ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বেশি।^{৩৬} স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ হঠাৎ করে কেন ব্রহ্মা- বিষ্ণু-শিবের উপাসনা শুরু করলেন? দ্বিতীয়ত- তিননাথের মেলায় ‘ত্রিনাথ নিমন্ত্রণ’, ‘ত্রিনাথের গান’ এবং ‘ত্রিনাথের আসর’ নামে আর এক ধরনের গান প্রচলিত আছে। ‘ত্রিনাথের আসর’ পর্যায়ের গানে কায়াসাধনার পদ্ধতির কথা রয়েছে। এইসব গানে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কায়াযোগ দর্শনের সনাতন ধারা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়—

ত্রিনাথ আসর গান:

শিষ্য দাড়া:

‘দেহ ঘরের খবর জানতে আমার বাসনা।
 কি দিয়ে গড়িছে গুরু এমন সুন্দর দেহখানা।।
 ব্রহ্মাণ্ডেত যাহা আছে দেহ ঘরে তাহা আছে গো।
 বেদ-পুরাণে লিখিয়াছে উভয়ের এক নমুনা।।
 গুরু গো বল গুরু
 দেহের ভিতর কোথায় আছে সপ্ত-সাগর গো।
 কুনখানে চন্দ্র-দিবাকর শুনে প্রাণ করি সান্ত্বনা।।
 মধুসূদন কয় কাতরে বল গুরু ব্যক্ত করে।
 এই বাসনা আমার অন্তরের পূর্ণ কর বাসনা।।’

গুরু দাড়া:

‘ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম
 দেহঘর তৈয়ার হইয়াছে এ পইঞ্চ ভূতে।
 হাড়ের খুলি চামড়ার ছানি জুইত গাথনী তাতে।
 মনরে সপ্ত-সাগর দেহেতে আছে
 লবণ সমুদ্র দেহব্যাপী রয়েছে।
 ইক্ষু সাগর মুখে দধি সাগর কণ্ঠেতে।
 মনরে সর্পি সাগর নাসিকা মূলে
 সুরা সাগর লিঙ্গমূলে তরঙ্গ খেলে।
 উদরেতে জল সমুদ্র দুগ্ধ সাগর স্তনেতে
 তালুমূলে সুধাকর স্থিতি।
 নাভিমূলে দিবাকর করেন বসতি।
 দীন মধু বলে দিবারাত্রি এই চলেছে দেহেতে।’^{৩৭}

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যোগতত্ত্ব ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’

বা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ‘যুগীকাচ’ গ্রন্থে অনুরূপ শিল্প-প্রকরণ লক্ষ করা যায়। নাথযোগীরা

নিজের দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান করেন। তাই তাঁরা দেহের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করেছেন। পিণ্ডে-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন নাথযোগধারার বৈশিষ্ট্য। তাঁরা দেহমধ্যে চক্রের সাধনা করে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের বা স্থূল-সূক্ষ্মের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ড. কল্যাণী মল্লিক মনে করেন—

এ যুগে এ সকল কথা অস্বাভাবিক মনে হলেও প্রাচীনকালে সন্ত
সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনকি পাশ্চাত্যদেশের রহস্যবাদীদের মধ্যেও পিণ্ডে
ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা প্রচলিত ছিল।^{৩৮}

নাথপন্থে দেহের শক্তিকে জাগ্রত করে উর্ধ্বমুখী করবার সাধনায় হল কায়াসাধনা। এর অর্থ বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখীকরণ। কুম্ভক যোগের সাহায্যে নাথেরা ষট্চক্রভেদের সাধনা করেন। ষট্চক্রভেদ সম্পূর্ণ হলে সিদ্ধযোগী জীবন্মুক্ত হন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে নাথযোগীদের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

‘যাবান বা আয়মাকাশস্তাবানে বোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ,
উভে অস্মিন দ্যাৱা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে,
উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্র নসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি
যচ্চাস্যেহান্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদাস্মিন সমাহিত্বিতি।’

সন্ন্যাসী ও গৃহস্থযোগীরা গুরুশিষ্য পরম্পরায় যোগসাধনা করেন। সন্ন্যাসীরা নাথযোগ দর্শনের উত্তরাধিকার বহন করছেন ঠিকই কিন্তু গৃহস্থরাও সংসারের কাজকর্ম করেও যোগসাধনা করেন, জ্ঞানচর্চা করেন এবং পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। রাজমোহন নাথ উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যেক নাথের পুত্রকন্যা বারো বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাথধর্মের শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নাথ হয়ে যান। গুরুদীক্ষা নেওয়ার অর্থই হল গুরুর গোত্রে প্রবেশ করা অর্থাৎ ‘গোত্র ভূ’ হওয়া। একই ধর্মে বিশ্বাসকারী, একই ধর্ম আচরণকারী, একই জ্ঞানভাণ্ডারের একই আলোক আহরণকারী হওয়া।^{৩৯}

যোগের সাহায্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ বায়ুকে বশীভূত করেন। তারপর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে মস্তিষ্কে নিয়ে গেলে সহস্র দল যুক্ত পদ্ব সহস্রাতে শিব-শক্তির মিলন ঘটে। তখন জড়দেহ দিব্যদেহে পরিণত হয়। এই যোগসাধনা বিষয়ক ‘ত্রিনাথ আসর’-র গান অসমের বরাক উপত্যকায় প্রচলিত আছে—

‘দেহের মাঝে আছে মানুষ বুঝ তাহার রীতি
গুরু পঞ্চ আত্মরূপে দেহে করেন বসতি।
চিনবে যদি মনের মানুষ জ্বালাও জ্ঞানের বাতি
মনরে আত্মারাম ও আত্মারামেশ্বর বুঝ তাহার আকুতি।
দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ পাবে পরম গতি
মনরে রেচকে পুরকে অজপাতে গতাগতি
মধু বলে মানুষ ধরা কুম্ভকে হয় স্থিতি।’^{৪০}

ত্রিনাথের স্বরূপ বিশ্লেষণে ‘ত্রিনাথ আসর’ বিষয়ক এই গানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গানগুলিতে যে সাধন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তা হল নাথপন্থের কায়সাধনা। স্বাভাবিক কারণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে তিননাথ নাথসম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তও মনে করেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিনাথ নন—

The present writer may speak of one function in honour of the Trinath in some parts of East Bengal. The function is known as Tennather Mela (the congregation of the three Nath) and is generally held with the purpose of preventing some family calamity and of gaining prosperity for the family or for an individual. In the function, however, the three Nath are confusedly identified with the trinity, viz, Brahma, Vishnu and Siva and three pipes of Ganja are offered to them... In the songs, however, the Trinath is regarded, as one deity.^{৪১}

এই মন্তব্য থেকে আমাদের মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়—

১. এই মেলা কি তিনজন নাথসিদ্ধের ধর্মসভা?
২. তিনজন নাথযোগী সিদ্ধকে কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর আগেই পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ‘মার্কণ্ডেয় পুরাণ’ অনুসরণ করে ত্রিদেবকে আনা হয়েছে। এই পুরাণের গল্প অনুসারে এক ব্রাহ্মণ মরণাপন্ন হলে তার স্ত্রীর প্রভাবে সূর্যোদয় বিলম্বিত হয়। তখন দেবতারা ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে ব্রহ্মা তাঁদের অত্রিমুনির স্ত্রী অনসূয়ার সাহায্য নিতে বলেন। অনসূয়ার পরামর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হলে পুনরায় সূর্যোদয় শুরু হয়। অনসূয়ার এই মহৎ কর্মে দেবতারা খুশি হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। অনসূয়া তখন বর চান যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব যেন তাঁর পুত্ররূপে আসেন। এই তিনজন দেবতা সেসময় অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শেষে দত্তাত্রেয় নির্গুণ পরব্রহ্মের সাকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব হয়ে ওঠেন। নাথসাহিত্যে এমন পরিচয় পাওয়া না গেলেও নাথধর্মের যোগগ্রন্থে দত্তাত্রেয় নাথসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

সিদ্ধ অবধূত মার্গ নাথযোগের পরমতত্ত্ব-অবধূত দত্তাত্রেয়ের নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ আদি নাথসিদ্ধদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ’ গ্রন্থে নাথপন্থকে সিদ্ধামৃতমার্গ এবং গুরুকে মঙ্গলময় এবং অবধূত স্বরূপ বলা হয়েছে—

‘অস্মিন্নার্গে সর্বশ্রেয়ো মূলভূতো গুরুদেব, স চ অবধূত এব নান্যঃ।’^{৪২}

নাথসম্প্রদায়ে যোগী দত্তাত্রেয়কে অবধূত রূপে সম্মান করা হয়। ‘নাথসিদ্ধ বাণী’-তে তাঁর স্তব করা হয়েছে—

‘জটা জুট বিভূতি ভূষণং। নম সয অখণ্ডিতং।।
বিস রজনবদেহলীলা। সোহহং দত্ত দিগম্বরং।।
মুকুট কেশ বসেষ বণিতা। বচন শ্রীমুষ অমৃতং।।
সম্মথং সব জোগ সম্মথ। সোহহং দত্ত দিগম্বর।।’^{৪৩}

পীতাম্বর দত্ত বড়থাল (সম্পা.) ‘গোরখবাণী’ (হিন্দি) সংকলন গ্রন্থে ‘জ্ঞানদীপবোধ’ বা ‘গোরখদত্তগুপ্তি’ সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থে নাথযোগমত এবং নাথযোগীদের সঙ্গে দত্তাত্রেয়ের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে—

‘গোরখ: স্বামী কি তুমহেঁ ব্রহ্মা কি ব্রহ্মচারী,
কি তুমহেঁ বাস্ফণ পুস্তক কি দণ্ডধারী।
কি তুমহেঁ জোগী কি জোগ জুগতা,
কৌণ প্রসাদৌং রমো ছন্দ মুকতা।।

দত্তাত্রেয়: অবধু ন অমহেঁ ব্রহ্মা ন ব্রহ্মচারী,
ন অমহেঁ ব্রাহ্মণ পুস্তক ন দণ্ডধারী।
ন অমহেঁ জোগী ন জোগ জুগতা,
আপ প্রসাদৌং রমৌং ছন্দ মুকতা।।’^{৪৪}

অর্থাৎ দত্তাত্রেয়নাথের উপর আরোপিত হয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের গুণ। তিনি ছাড়া কেউ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের গুণে ভূষিত নন। তাই দত্তাত্রেয়নাথই আমাদের আলোচ্য ত্রিনাথ মেলার ত্রিনাথ ঠাকুর। মুনিধারার উত্তরপুরুষ নাথদের দত্তাত্রেয়নাথ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে মানুষের পূজো পেয়ে আসছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের ১০/১৩৬ সূক্তে দেখা যায় বাতরশন বংশীয় মুনিরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে বায়ুর গতির অনুগামী হয়েছিলেন। ড. জীবন নাথ মনে করেন দত্তাত্রেয় ছিলেন সদাশিবরূপ অবধূত সংসার আসক্তিশূন্য বর্ণাশ্রম-চিহ্নহীন গৃহস্থ যোগী।^{৪৫} জি. ডব্লু. ব্রিগস বলেছেন—

The followers of Dattatreya, who was eminent in the practice of Yoga and who is held in high esteem by Yogis. In the ‘Dabistan’, he is described in a contest of Yogic power with Gorakhnath. He was an Aghori.^{৪৬}

পূর্বোক্ত ‘জ্ঞানদীপ’ গ্রন্থ অনুসারে গোরক্ষনাথ নাথপন্থের যোগজ্ঞান লাভ করেন দত্তাত্রেয়নাথের কাছে থেকেই। গুজরাটের গিরনার পর্বতের যে গুহায় গোরক্ষ-দত্তাত্রেয় সাক্ষাৎ ও যোগজ্ঞানের আদান-প্রদান হয় সেই স্থানটি ‘কমণ্ডলুতীর্থ’ নামে আজও পরিচিত। শুধু ‘জ্ঞানদীপ’ গ্রন্থ নয় গোরক্ষনাথের লেখা ‘দত্ত-গোরক্ষ-কবচ’, ‘দত্তাত্রেয়-গোরক্ষ-উপনিষদ’, ‘দত্ত-গোরক্ষ-গীতা’, ‘দত্ত-নাথবাক্য’, ‘দত্ত-অবিনাশী-সংবাদ’ প্রভৃতি গ্রন্থে দত্তাত্রেয়ের কাছে গোরক্ষনাথের যোগজ্ঞান লাভের কথা উল্লেখ রয়েছে। গোরক্ষনাথের দীক্ষাগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ হলেও দত্তাত্রেয়নাথই তাঁর শিক্ষাগুরু।^{৪৭}

লোকসাধারণের বিশ্বাস তিননাথের কৃপায় অমঙ্গল দূর হয়। জনসমাজে আদিনাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথ এই তিননাথের পূজো প্রচলিত আছে। এই পূজোকে তিননাথের সেবা বা তিননাথের মেলা বলা হয়। কাছাড় ও পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা এবং ত্রিপুরায় উক্ত মেলা বা সেবার আধিক্য লক্ষ করা যায়। অবশ্য এ সব আজ প্রায় লুপ্তপ্রায়। সন্ধ্যাবেলা মিঠাতেলের আলো জ্বালিয়ে পান, সুপুরি ও গাঁজা খেয়ে ভক্তবৃন্দ তিননাথের ভজন গান করেন।^{৪৮} তিননাথের ভজন গানগুলি হল—

‘সাধুরে ভাই –(ধুয়া)
দিনগেলে তিননাথের নাম লইও।
সারাদিন কৈররে ভাই সংসারের কাম,
সন্ধ্যা হইতে লইও তিননাথের নাম।

আমার ঠাকুর তিননাথ য়েবা করে হেলা,
 তার গলায় হবে গলগণ্ড চোখে বেরুবে ঢেলা।
 সাধুরে ভাই – (ধুয়া)
 আমার ঠাকুর তিননাথ য়ার বাড়ি য়ায়
 সর্দি-জ্বর মাথাব্যথা তরাসে পলায়।
 সাধুরে ভাই—(ধুয়া)
 আমার ঠাকুর তিননাথ য়ার বাড়ি য়ায়,
 এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কঙ্কি সাজায়।
 সাধুরে ভাই’—(ধুয়া)^{৪৯}

নিম্নলিখিত গানটি ত্রিপুরায় প্রচলিত আছে –

‘তিন পয়সায় হয় য়ার মেলা,
 কলিতে তিননাথের মেলা।
 এক পয়সার সিদ্ধি আনি তিন কলকি সাজায়,
 গাঁজায় দিয়ে দম বলছে বম ববম ববম বম ভোলা,
 সাধুরে ভাই কলিতে তিননাথের মেলা।
 এক পয়সার পান আনি তিন খিলি সাজায়,
 সাধুরে ভাই কলিতে তিননাথের মেলা।
 এক পয়সার তৈল আনি তিন বাতি সাজায়,
 বাতি জ্বালিয়া দিলে নিভে নারে এ কিরে আজব লীলা,
 সাধুরে ভাই কলিতে তিননাথের মেলা।’^{৫০}

ত্রিপুরার আগরতলার বাসিন্দা কৃষ্ণধন নাথ এখনও মুখে মুখে প্রাচীন তিননাথের গান অনর্গল গাইতে পারেন এবং শ্রোতাদের মোহিত করে দেন।^{৫১} সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন পূর্ববঙ্গে এই ত্রিনাথের মেলা বা পূজা হয়। সন্ধ্যার সময় পান, সুপুরি ও গাঁজা নিয়ে দলবল জুটিয়ে পূজা ও গান হয়, সঙ্গে সঙ্গে ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’ পাঠ করা হয়। বরিশাল থেকে খুলনায় এই উৎসব

সংক্রামিত হয় এবং কতজনের রচিত ‘ত্রিনাথের পাঁচালী’ আছে।^{৫২} তিনি আরও বলেছেন যে কিছুদিন পরে ফরিদপুর থেকে ‘ত্রিনাথের মেলা’ প্রবর্তিত হয়, এতে রাত্রিতে গাঁজা ও মিষ্টদ্রব্য দিয়ে বিনামূল্যে শিবের পূজো করা হত।^{৫৩} চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি মনে করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্রে ত্রিনাথ মূর্তি গ্রহণ করেন। ত্রিনাথ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সমীভূত সত্তা।^{৫৪} নাথ সম্প্রদায়ের ধারণা থেকে ত্রিনাথ শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। শূন্যপুরাণে ত্রিনাথের উল্লেখ আছে। চম্পক নগরে মাধাইয়ের মাধ্যমে তাঁর পূজো প্রচারিত হয়েছে।^{৫৫} কোথাও কোথাও ত্রিনাথ মিশ্রগুণের দেবতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রোগব্যাদির দেবতা হিসেবে গ্রাম্য ছড়ায় ত্রিনাথের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে—

‘আমার ঠাকুর তিনাথের যে করিবে হেলা।

হাত পা কইতরের নলা, চোখ দিয়া বেরুবে ঢেলা।’^{৫৬}

ভক্তিভরে ত্রিনাথের পূজো করলে অপুত্রকের পুত্র হয়, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসানের মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই পূজোর মানসিক করলে যেকোনো কার্যসিদ্ধি হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পীড়া ও দুর্বলতা দূর হয়। বসে যাওয়া পর্বত পর্যন্ত উঠে আসে। বোবাও বাকশক্তি পায়, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারে। প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ত্রিনাথের পূজো করলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারপ্রকার ফল লাভ হয়।^{৫৭} ত্রিনাথের মেলার উদ্দেশ্য বিভিন্ন লোকগানের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত রয়েছে –

‘কলিতে তিনাথের মেলা

খোড়ায় নাচে কানায় দেখে

বোবায় বলে বোমভোলা।’^{৫৮}

পূর্ববঙ্গে ত্রিনাথের মেলা বা ত্রিনাথের সেবা প্রচলিত ছিল। এমনকি মুসলমান সমাজেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। ত্রিনাথ মুসলমান সমাজে ‘ত্রিনাথ পীর’-এ পরিণত হয়েছে। কামিনীকুমার রায় বলেছেন, ‘উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া আসন, জলঘট, ধূপ, বাতি ও গাঁজা পূর্ণ কঙ্কি দিয়ে সকলে গান আরম্ভ করেন। গানের আসরে ত্রিনাথের কথা বলা ও গাঁজা খাওয়া হয়।... মুসলমানেরা নিজের বাড়িতে ত্রিনাথের মেলা দেন না। মানসিক সিদ্ধ হলে তিনি কোন গাঁজাসেবীকে গাঁজা কিংবা গাঁজার পয়সা, পান সুপারি ইত্যাদি দিয়ে দেন। ঐ ব্যক্তি আরও কয়েকজন গাঁজাসেবীর সঙ্গে ‘ত্রিনাথের মেলা’ দিয়ে থাকেন।’^{৫৯} ত্রিনাথের মেলা পূর্ববঙ্গের প্রায় সব স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছে, তার প্রথম ফরিদপুরের অন্তর্গত পালঙ্গ স্টেশনের অধীন নবীপুর গ্রামে উদ্ভব হয়। এখন এই স্থান কীর্তিনাশা গ্রাস করেছে।^{৬০} যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া, বাহেরকুচি প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্তী কোন কোন গ্রামের নমঃশূদ্র, যোগী প্রভৃতি হিন্দুগণকে ত্রিনাথের পূজা করতে দেখা যায়। ত্রিনাথ ভক্তগণ গাঁজা পানে বিভোর হয়ে সন্ধ্যার পর থেকে ত্রিনাথের গান গেয়ে থাকে। যথা—

‘সাধুরে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
 ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল যায় নারে তার বোঝা।।
 ওরে পাঁচটি পয়সা হলেই হয় ত্রিনাথের পূজা।
 ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা।
 তার গলায় হবে গলগণ্ড চউখ দিয়ে বের হবে ডেলা।।
 গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কূলে।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে।।
 হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী।
 আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি।।

বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হ'বে উপায়।
 কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায়।।
 আমরা তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানী জনে।
 মুখ্যলোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে।।
 শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।
 'ত্রিনাথ' নামে পূজা হইবে ধরায়।।
 তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে।
 পূজিলে কলির লোক তরিবে তুফানে।।
 এই সব কথা যারা না শনিবে কানে।

তারা ধনে পুত্র হবে নষ্ট রমাই ফকির ভণে।।^{৬১} ইত্যাদি

তিনি আরও বলেছেন যে বিক্রমপুর ছাড়াও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে এই ত্রিনাথের পূজো
 প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়।^{৬২} সুকুমার সেন মনে করেন পূর্ববঙ্গে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ
 ও সত্যনারায়ণ – তিনে মিলিত হয়ে ত্রিনাথ (অথবা ত্রৈলোক্যপীর) হয়েছে।^{৬৩} প্রফুল্লচরণ
 চক্রবর্তীর মতে 'এই তিননাথ হলেন গোরক্ষনাথ, মীননাথ এবং আদিনাথ বা শিব। তাঁরা
 স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে পূজিত হয়ে আসছেন। এদেশে পল্লি-অঞ্চলে 'ত্রিনাথের সেবা'
 দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হয়ে কোন বাড়িতে ত্রিনাথের আসন স্থাপন করেন।
 তার উপরে ফুল, মিষ্ট দ্রব্যাদি ও সিদ্ধি সজ্জিত করে যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি ত্রিনাথকে সমস্ত
 নিবেদন করে 'কথা' বলেন। তারপর 'বৈঠক'-র পুরোহিত ত্রিনাথ-শিবের নাম নিয়ে প্রসাদ
 ও সিদ্ধি গ্রহণ করে অপর মানুষকে নিবেদন করেন। সারারাত্রি গুরুশিষ্য পরম্পরায় দুই
 শ্রেণিতে দেহতত্ত্ব, দুঃখবাদ, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সাধনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, সিদ্ধমতবাদ বিষয়ে গান গীত
 হয়।'^{৬৪} তিনি এখানে গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও আদিনাথ শিবকে তিননাথ বললেও নাথ
 সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার ক্রম অনুসরণ করেননি। নাথপন্থের এই ক্রমটি হল যথাক্রমে

আদিনাথ-মীননাথ-গোরক্ষনাথ। অন্যত্র আবার তিনি বলেছেন যে ত্রিনাথ হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা।^{৬৫}

ব্রতগীত-পাঁচালি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। দেবদেবীর বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক পূজো-উৎসব উপলক্ষে দেবতার মন্দিরে অথবা পূজো-উৎসব ক্ষেত্রে কয়েকদিন ধরে গান করা হত। ব্রতগীত-পাঁচালি গানের আসর যেন দেবসভা,- এইরূপ কল্পনা থেকেই গানের আরম্ভে দেবতাদের অধিষ্ঠান এবং গানের শেষে তাঁদের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন গাইতে হত।^{৬৬} চর্যাপদ থেকে শুরু করে ধর্মমঙ্গল, মনসার কাহিনি হয়ে নাথপন্থীরা তাঁদের পুরনো ছড়ার গানের জের টেনে আসছেন।^{৬৭} নাথপন্থের যোগীরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের বাংলায় ছড়া লিখে গিয়েছেন।^{৬৮} ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে ব্রতকথাগুলি প্রধানত গদ্যেই আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এদের গদ্যরূপ কবিতাকারে পরিবর্তিত হয়েছে। গদ্যে আবৃত্তির ভেতর কথার (tale) যে একটি বিশিষ্ট রস প্রকাশ পায়, কবিতার বাঁধাধরা ও একঘেয়ে ছন্দের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায় না। মৌখিক সাহিত্যধারার অন্তর্গত গদ্য ব্রতকথাগুলি যখন লিখিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তাদের গদ্যরূপ ত্যাগ করে বৈচিত্র্যহীন পয়ার- ত্রিপদী বা পাঁচালি-লাচাড়ি ছন্দে কবিতাকারে সেগুলি লিখিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিল। তখন তা গদ্যেই শুনতে পায়, কিন্তু যখন কোন লিখিত রূপ পাঠ করতে শুনি, তখন তা কবিতাতেই শুনতে পায়। আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালি বলত। সেই অর্থে ব্রতকথার পদ্যরূপকে পাঁচালি বলা হলেও কালক্রমে এটা একটা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এইশ্রেণির তিনটে পাঁচালি মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে—তা সত্যনারায়ণের পাঁচালি, শনির পাঁচালি এবং ত্রিনাথের পাঁচালি। ব্রতকথার

দেবতা প্রধানত স্ত্রীজাতীয়, কিন্তু এঁরা সকলেই পুরুষ। সত্যনারায়ণ, শনি এবং ত্রিনাথ পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।^{৬৯}

নাথসম্প্রদায়ের ত্রিনাথ সম্পর্কে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত পূর্ববাংলায় বিভিন্ন সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ত্রিনাথ বলতে নাথধর্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাধক যথা গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরীপাকে বোঝায়। প্রয়োজনমত এঁদের যে সেবা বা পূজো দেওয়া হয়।^{৭০} তাতে নিম্নলিখিত গানগুলি শুনতে পাওয়া যায়—

(১)

‘আসরেতে কর আগমন,
 (ত্রিলোকের জীবন প্রভু) কর আগমন।
 আমি অতি মৃঢ়মতি না জানি ভজন।
 তিননাথ রূপে প্রভু বসিলেন আসনে,
 জয় জোকার দেও সবে তোমরা নারীগণে।
 এ দেহ জলের বিষ কখন জানি মরি,
 ত্রিনাথ আনন্দে ভাই বল হরি হরি।
 তোমার তাল তোমার মন্ত্র কর এসে খেলা,
 অধম বালকে দিছে তিন নাথের মেলা।
 যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে,
 যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র কখনও না বাজে।’ -ঢাকা।^{৭১}

(২)

‘এল রে তিন নাথ ঠাকুর জগতে।
 আজগুবি তামাসা হল কলিতে।
 কলিতে হরি সর্বময়,
 পুবেতে পাগলের আশ্রয়,

চিটুইলাতে শম্ভুচাঁদ আপনি উদয়।

ডেকরা বইটার সিদ্ধেশ্বরী ধামরাইর মাধব রথেতে।’- ঢাকা।^{৭২}

ত্রিনাথের পুজোকে ‘সেবা’ কিংবা ‘মেলা’ বলা হয়। এর প্রধান উপকরণ গাঁজা। ঠাকুরকে নিবেদন করে ভক্তগণ তা প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে।^{৭৩}

(৩)

‘তিন পয়সাতে হয় যার মেলা,

কলিতে তিন নাথের লীলা।

এক পয়সার পান সুপারি তাতে নাই মশলা,

খেয়ে, পানের খিলি সাধু মিলি গায় আর বাজায় একতালা।

এক পয়সার তেল দিয়ে তিন বাতি সাজায়ে,

মেলা দিচ্ছে তার চেলা।

বাতি জ্বলছে ধীরে নিবে না রে, একি এক আজব লীলা।

(ঠাকুর তিননাথের মেলার মাঝে)

বাতি জ্বলছে...।

এক পয়সার গাঁজা দিয়ে তিন কলকি সাজায়ে

মেলা দিচ্ছে তার চেলা।

গাঁজায় মারছে দোম বলছে বোম

ববম ববম বোম ভোলা।’ - ঢাকা।^{৭৪}

ত্রিনাথের পাঁচালি কেবল নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ত্রিনাথের মেলা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। পাঁচালির কাহিনিও অকিঞ্চিৎকর নয়। কাহিনিতে রয়েছে বেদাগত এবং সাংখ্য-সমর্থিত ত্রিগুণ তত্ত্বের কথা। পাঁচালি বিশেষে রয়েছে নাথযোগের কথা, যা অনেকটা চর্যাগীতির মতো হৈয়ালিপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিনাথের মেলার তিনটি গান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ-

প্রথম গান:

রাগ: ভাটিয়ালি। তাল: ছপকি
 ‘এলো রে ত্রিনাথঠাকুর জগতে,
 এবার আজব লীলা হবে কলিতে।
 কলিতে ত্রিনাথ সর্বময়,
 মহাক্ষেত্র মাতাপুরে ত্রিনাথ উদয়।
 চন্দ্রদ্বীপে মীনের আশ্রয়
 বাসলীতে গোর্খ মহাশয়।
 মহানাদে জটেশ্বর,
 ভক্তিভরে কর পূজা ভোলা মহেশ্বর।
 ও ভোলা মন রে আমার...।।
 বৈদ্যনাথের শ্রীনাথজীর আসন
 বিশালকের গোরখ- বিমলাসন।
 হুগলি মহানাদের মহানাথ আর তারকেশ্বর,
 সিউড়িতে দ্যাখ রে ওই বক্রেস্বর।।
 কালীনগর গোরক্ষবংশীয় গোরক্ষনাথ,
 চল দেখি গে একসাথ।
 আর দ্যাখ না গাঢ়ানন্দ নিরঞ্জন মূর্তি,
 এসব দেখে করিস রে তুই ফূর্তি।
 মহানিদ্রার গোরক্ষকূপ
 গোরখগুহার চরণকমল রূপ।
 যোগিভবন তীর্থে নাথের চরণচিহ্ন।
 কাজ কী রে তোর নানা ফন্দির?
 উৎকলে দ্যাখ ভুবনেশ্বর মন্দির।
 নগ্নাখ্যদেশে ওঁকারেশ্বর আদিনাথ।।

এসব তীর্থরে ভাই ভিন্ন ভিন্ন।
চল বারো তীর্থ দেখি গে অবিচ্ছিন্ন।।
ও ভোলা মন রে আমার!
ঢাকায় আছে ঢাকেশ্বরী,
বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী।।
রূপগঞ্জে ওই রঘুনাথের দেবালয়
হাওড়ায় গড়েন পঞ্চগনন তাঁর আলয়।
কাজ কী রে তোর ফিকির-ফন্দির?
বগুড়াতে দ্যাখ যোগীর ভবন
আর গোরক্ষনাথ শিবমন্দির।।
ও ভোলা মন রে আমার!
দাঙ্গদ্যোখরি যোগাশ্রম,
রাণাপিঙ্গে কাজলাশ্রম।।
কপিলগ্রামে বাগনাথের সমাধি হয়,
চেতলাতে শম্ভুনাথ আপনি উদয়।।
ও ভোলা মন রে আমার!
নাগার্জুণীর সিদ্ধেশ্বর
কাশীতে কাশীবিশ্বেশ্বর।।
বৈদ্যনাথের নাথকুঞ্জ,
আশী সিদ্ধার নগরপুঞ্জ।।
রাজসাহী-মৈনমের শিবলিঙ্গ
আর শিবালয় উল্টাডিসিতে।
এবার আজব লীলা হবে কলিতে।।
কত তীর্থ হল রে এই জগতে
আজগুবি তামাসা দ্যাখ কলিতে।।^{৭৫}

পূর্বভারতে নাথপন্থের সিদ্ধ পীঠগুলির কথা গানটিতে এসেছে। পূর্ববঙ্গের মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত আদিনাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য, এখানে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের জীবনের আদিপর্ব কেটেছে বলে গবেষকগণ মনে করেন। দমদমের গোরক্ষবাসী গোরক্ষনাথের স্মৃতি বিজড়িত মঠ ও যোগসিদ্ধপীঠ। হুগলির মহানাদ, হংসেশ্বরী, তারকেশ্বর মন্দিরের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনই আছে পূর্ববঙ্গের বগুড়ার যোগিরভবন, ঠাকুরগাঁয়ের গোরকুই, নওগাঁর যোগির-ঘোপা, বিমলা-গোরক্ষনাথ সাধনপীঠের কথা। আছে খুলনার কপিলাশ্রম ও বাগনাথের সমাধি মন্দির প্রসঙ্গ। এককথায় গানটিতে নাথসম্প্রদায়ের প্রাচীন মঠ মন্দিরের প্রসঙ্গ থেকে পূর্বভারতে নাথধর্ম কতদূর প্রসারিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। ড. কল্যাণী মল্লিক মনে করেন একদা প্রবল পরাক্রান্ত যোগীজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্বভারতে প্রভুত্ব করে গিয়েছেন। এঁরা রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগদান করতেন আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করতেন। রংপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক যোগীর বাস।^{৭৬}

দ্বিতীয় গান:

‘তিন পয়সায় হয় যার খেলা
কলিতে ত্রিনাথের এ-মেলা।।
এক পয়সার তৈল দিয়া তিনবাতি সাজাইয়া
বসে আছে সব চেলা।
সাধু ভাই, ও সাধু ভাই রে
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।
বাতি জ্বালিয়ে দিলে নিভে না রে এ কী আজব লীলা।
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।

একপয়সার পান-সুপারি তাতে নাই মশলা।
 সাধু রে ভাই, সাধু ভাই,
 কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।
 এক পয়সার পান আনি তিনখিলি সাজায়।
 খেয়ে পানের খিলি সাধু মিলি একতারা বাজায়।।
 এক পয়সার গাঁজা আনি তিনকঙ্কি সাজাইয়া
 বসে আছে তাঁর চেলা।
 সাধু রে ভাই, সাধু ভাই,
 কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।
 গাঁজায় দিয়ে দম বলছে বম
 বোবায় বলে বম ভোলা।
 কলিতে ত্রিনাথের মেলা।।^{৭৭}

অর্থাৎ ত্রিনাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা বলে অনেক অসাধ্য সাধিত হতে পারে। বোবা কথা বলতে পারেন। অন্ধ দেখতে পান, খঞ্জ পথে চলেন, বধির কানে শুনতে পারেন ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। আবার ত্রিনাথ সামান্যতেই খুশি হন। গানটিতে ত্রিনাথের অপার মহিমা ও ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় গান:

‘সাধু রে ভাই,
 দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।
 সারাদিন করবে ভাই সংসারের কাম,
 সন্ধ্যা হইলে লইয়ো সাধু, ত্রিনাথের নাম।।
 মোদের ঠাকুর ত্রিনাথ যার ঘরেতে যায়
 কোনো অভাব থাকে না রে সুখে দিন যায়।।
 সাধু রে ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।।

আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যেবা করে হেলা,
 তার গলায় হয় রে গলগণ্ড চক্ষু বেরয় ঢেলা।।
 সাধুরে ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।
 আমার ঠাকুর ত্রিনাথ দেখে না নামায় যে মুণ্ড
 তার মুণ্ড পড়ে যায় নরকের কুণ্ড।।
 সাধুরে ভাই, দিনগেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।
 আমার ঠাকুর ত্রিনাথ দেখে যে বা আড়চোখে তাকায়।
 তাম্রশলা দিয়ে চক্ষু হানে রে যমরায়।।
 সাধুরে ভাই, দিনগেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।।
 আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যার বাড়িতে যায়
 একপয়সার গাঁজা দিয়া তিনকল্লি সাজায়।।
 সাধুরে ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।।
 ত্রিনাথের নাম লইয়া যে বা বনজঙ্গলে যায়।
 সাপে তারে দংশে না রে বাঘে নাহি খায়।।
 সাধুরে ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।।
 তামা নয় রে কাঁসা নয় রে সিদ্ধ হয়ে যাবে।
 ত্রিনাথের নাম লইলে তুমি শুদ্ধ সোনা পাবে।।
 সাধুরে ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইয়ো।।^{৭৮}

গানটিতে ত্রিনাথের লোকজীবনে মহিমা ও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে ওঠার কাহিনি স্থান
 পেয়েছে। ত্রিনাথ ঠাকুর ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করার পাশাপাশি সব বিপদ থেকেও রক্ষা
 করেন।

নাথযোগীদের একটি অন্যতম ধর্মীয় সংস্কৃতি ‘ত্রিনাথের মেলা’। ‘তিননাথের গান’ ও
 ‘ত্রিনাথের মেলা’ এক নয়। গল্প বা ঘটনা এক হলেও তিননাথের গান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ

ও গোরক্ষনাথের গল্প বা গান। অন্যদিকে ত্রিনাথের মেলা দত্তাত্রেয়নাথের পূজো। তিননাথের গানে আদিনাথ মনে হয় মানবগুরুই। যদিও তিনি শিবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিশে গিয়েছেন। তিননাথের গান শুধু নয়, কাছাড়ের লোককথায়ও মানবগুরু আদিনাথের সন্ধান পাই—

‘আদিনাথেরে আদিনাথ।
 আদিনাথে দিলা বর।
 এই ঘর সুবন্নির ঘর।
 সুবইন ঘরে তুলছে মাটি।
 এই ঘর হইছে কুমারআটি।
 কুমার আটির কুমার ভাই।
 তোমার লাগাল কেমনে পাই।।’^{৭৯}

স্বাভাবিক কারণে কাছাড় ও চট্টগ্রামের মহেশখালী দ্বীপ সন্নিহিত অঞ্চল আদিনাথের ভূমি হওয়া সম্ভব। নাথযোগ সাহিত্যে ত্রিনাথ, তিননাথ, নবনাথ, তেত্রিশনাথ ও চুরাশি নাথের কথা রয়েছে। ত্রিনাথ দত্তাত্রেয়নাথ, তিননাথ শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু স্বরূপ আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। নবনাথ ও চুরাশি নাথসিদ্ধের বেশ কয়েকটি তালিকা পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই নাথসিদ্ধদের মধ্যে তিনজন বিশিষ্ট গুরু হচ্ছেন আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। তাঁরা মানবগুরু হয়েও দেবগুরুর মতো সম্মানিত হন। এখানে আদিনাথ মানবগুরুই, দেবগুরু শিব নন। আদিনাথের কিংবদন্তি থাকলেও কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না বলে তিনি কল্পিত দেবগুরু শিব হয়ে উঠেছেন। আদিনাথ দীক্ষা দেন মৎস্যেন্দ্রনাথকে এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ দীক্ষা দেন গোরক্ষনাথকে। তাঁরা তিননাথ কিন্তু ত্রিনাথ নন। আদিনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের আলাদা পাঁচালি না থাকলেও গোরক্ষনাথ ও তিননাথের পাঁচালি রয়েছে।

এখন নাথ সম্প্রদায়ের ‘তিননাথের পাঁচালি’ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। তিননাথের ভক্তরা সাধারণ সামান্য মানুষ। তাঁরা মামলায় জয়লাভ করলে বা হারানো দ্রব্য ফিরে পেলে তিননাথের পূজো দেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন দিন গেলে একবার তিননাথের নাম নিলে গৃহের সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। আর তিননাথের পূজোর খরচ মাত্র তিন পয়সা। এক পয়সার পান, এক পয়সার তেল এবং এক পয়সার গাঁজা। এতে দেবতাও খুশি হন এবং ভক্তরা সামান্য খরচ করে মনের আনন্দে সারারাত তিননাথের গান গেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। তিননাথের পাঁচালির শুরুতে ‘তিননাথের বন্দনা’ করা হয়েছে—

‘সদগুরু অধিপতি অগতির সদা গতি
 অবধূত হও অবতার।
 অনাথেরে নাথ করো কৃপা করি হাল ধরো
 নাদবিন্দু হই যেন পার।।
 সংসারে আসিয়া মোরা স্থূলদেহে পোড়া পোড়া
 দাও গোঁসাই সিদ্ধির কণা।
 মহাজ্ঞান হবে লাভ ভূত দেহে জরা-তাপ
 ভুলে যাব সকল যাতনা।।
 তুমি কৃপা কর যদি পার হই ভাণ্ড-নদী
 ব্রহ্মাণ্ড যে দূরে নাহি থাকে।
 পঞ্চদেহ দয়াময় দাও নাথ পদাশ্রয়
 রক্ষা করো দ্বন্দ্বের বিপাকে।।
 আদি-মচ্ছ-গোর্খসবে অবতরি দীন ভবে
 দয়া করো দয়াল ত্রিনাথ।
 অনন্ত মহিমা তব কেমনে করিব স্তব
 রাঙা পায়ে কোটি প্রণিপাত।’^{৮০}

নাথপন্থে সদগুরু পরমপদ প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। অবধূত নাথপন্থে শ্রেষ্ঠ নাথ রূপে বিবেচিত হন। সদাশিব প্রকৃত অবধূত হলেও গোরক্ষনাথকে ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ সহ বিভিন্ন যোগগ্রন্থে অবধূত বলা হয়েছে। নাদবিন্দু তথা ওঁ-কার সাধনা নাথযোগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাদরূপে ব্যাপ্ত পরমাত্মা যখন কৃপাবশত সিদ্ধের শ্রুতিগোচর হতে থাকেন, তখন অনাহত নাদের মোহিনী শক্তির প্রভাবে সিদ্ধ বা সাধকের চিত্তবৃত্তিসমূহ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই সময় সিদ্ধ বা সাধকের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে সুষুমা পথে চলাচল করতে থাকে আঞ্জাচক্রে অবস্থিত পরমাত্মা-পরম শিবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। এই মিলনের নাম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। একেই যোগসিদ্ধি বলে। যে নাদ বা ধ্বনি শুধু শ্রুতিগোচর হওয়ার কথা তা কিন্তু নিজের প্রকাশ শক্তিতে জ্যোতির্ময় ও তরঙ্গায়িত হওয়ার ফলে সাধকের জ্ঞানদৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় বলে সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধ যোগবিজ্ঞানীগণ ঐ পরা-নাদকে পশ্যন্তি বলে উল্লেখ করেছেন।^{৮১} শুধু ‘তিননাথের পাঁচালি’ নয় নাদবিন্দু সাধনা বিষয়ে বিভিন্ন গান ও পদ নাথপন্থে প্রচলিত আছে—

‘সাবধানে সাধন করিবা নিত্য নিত্য।
 যাবৎ নাদের মধ্যে লয় না হয় চিত্ত।।
 অতঃপর তত্ত্বকথা কহি সব শুন।
 প্রাণ অপান ব্যান সমান উদান।।
 রস রক্তে রক্ষা করে দেহের সংস্থান।।
 হৃদয়ের পিণ্ড পুনঃ রক্তের আধার।
 পরমাত্মা পঞ্চপ্রাণ তাহাতে প্রচার।।
 এই পঞ্চবায়ু ক্রিয়া রোধ করি মন।
 অলিরূপে হৃদিপদ্মে প্রবেশে যখন।।

বিষয়ের বিষময়ী বিষম ভাবনা।
 দূরে যায় নাহি রহে জল্পনা কল্পনা।।
 তখন জানিবে শিষ্য শুন বিবরণ।
 হৃদি মধ্যে ব্রহ্মধ্বনি শুনিবে তখন।।
 ইহা শুনি হয় যদি সমাধি উদয়।
 জীবাত্মার জীবত্বের তখনি বিলয়।।
 জীবত্ব অভাবে পুনঃ দেবত্ব সঞ্চরে।
 আনন্দ পীযুষ ধারা ক্ষরে অনিবারে।।
 সে আনন্দ একতান বিকল্প রহিত।
 সহস্র সংসার বিশ্ব তাহাতে প্লাবিত।।
 ছেদ নাই ছিদ্র নাই নাই ভেদাভেদ।
 বহমান একতান বীত পরিচ্ছেদ।।
 সাধন সমাধি ফলে জীবাত্মা যখন।
 সেই পুণ্য প্রেমরাশি করে অরজন।।
 পরমেষ্টি স্বরূপেতে এক হয়ে যায়।

সংসারের পানে পুনঃ ফিরিয়া না চায়।।^{১৮২}

অর্থাৎ চিৎ-রূপা পরানাদ সাক্ষাৎ চিন্ময়ী পরমাপ্রকৃতি ব্রহ্মময়ী মা। নাদে চিন্তলয়ের কারণে
 লব্ধ সমাধিই দিব্যজীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র। সিদ্ধ নাদের মাধ্যমে বার বার সমাধি মগ্ন হয়ে
 দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদেহ লাভের পথে এগিয়ে যান। এভাবে ধীরে ধীরে সিদ্ধ সর্বজ্ঞানের অধিকারী
 হয়ে অমরত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে অষ্টসিদ্ধি নাথ যোগসাধনার যোগলব্ধ আরেকটি ঐশ্বর্য।
 নাথপন্থের বিভিন্ন গ্রন্থে সিদ্ধিপিণ্ড বা মুক্ত শরীরের কথা রয়েছে। অন্যদিকে ‘মহাজ্ঞান’ শব্দের
 প্রথম প্রয়োগ বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া গেলেও নাথসাহিত্যে ময়নামতির কথায়
 একাধিকবার শব্দটি শোনা যায়। জীবাত্মা ভাণ্ড, পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড; গোরক্ষনাথের ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-

পদ্ধতি' গ্রন্থের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য বিষয়। আদি-মচ্ছ-গোর্খ হলেন যথাক্রমে নাথসিদ্ধ আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। অর্থাৎ 'তিননাথের পাঁচালি' গ্রন্থ নাথযোগ সাহিত্যের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে বলা যায়।

‘তিননাথের আবির্ভাব’ অংশেও নাথপন্থের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে –

‘আদি দেব আদিনাথ	অলখ গড়ন।
প্রণমন্ত নত শিরে	তাঁহার চরণ।।
নাহি দিবা নাহি রাত্রি	নাহি রবি-শশী।
তিমির ভঞ্জন রূপ	নাথ অবিনাশী।।
যদা নাস্তি স্বয়ং কর্তা	কারণ ও কুল।
আছিলেন পরব্রহ্ম	নাহি তার তুল।।
কেহ বলে নিরঞ্জন	অথবা অনাদ্য।
কীভাবে বর্ণিব তাঁরে	নাহি মোর সাধ্য।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর	কেহ ভাবে তাঁরে।
তিনে এক একে তিন	প্রচারিছে যাঁরে।।
আদি দেব কৈলা কৃপা	নিজের ইচ্ছায়।
আদিরূপ শক্তি এবে	দিলা নাথে তাঁয়।।
শ-ই-ব মনে তাঁহার	তাই শিব নাম।
সৃষ্টি হেতু বিরাজেন	কৈলাশের ধাম।।
পশুপতি শিব যিনি	তিনি আদিনাথ।
চরণ-কমলে তাঁর	কোটি প্রণিপাত।।
শিব নামে আদিনাথ	নিজে নিজে হৈলা।
কৈলাশে শক্তিরে লয়ে	লীলা সদা কৈলা।।
প্রথমে বন্দনা করি	শ্রীনাথ চরণ।

অনাদির আদি সব	কারণাকারণ ।।
যাঁহার স্মরণমাত্র	হয় দ্বন্দ্বনাশ ।
কায়াদেহে সুখ অস্তে	পরমে নিবাস ।।
এই শিব আদিনাথ	লয়ে কত কীর্তি ।
মহাবিশ্ব সদাশিব	হরিহর মূর্তি ।।
শিবায়নে ভট্টাচার্য	করেন কীর্তন ।
শিব নাই কীর্তি নাই	শিব সংকীর্তন ।।
কাশীরাম-মালাধর	কিসের কারণ ।
শিব-বিশ্ব এক করে	একের শরণ ।।
দলে দলে চলারা যে	ব্রহ্মা-বিশ্ব সেবে ।
নয়নাথ আশি সিদ্ধা	পূজ্যপাদ এবে ।।
ত্রিনাথের নাম কেহ	নাহি জানে লোকে ।
ত্রিশরণ না লয়ে যে	সবে মরে শোকে ।।
আদিগুরু আদিনাথ	স্মরিলেন সবে ।
কীরূপেতে এ-সমস্যা	সমাধান হবে ।।
আদিনাথ শিষ্য তিনি	আছে চারিধাম ।
চর্যা-পূজা আর গুপ্ত	তাঁর বহু নাম ।।
কীর্তিনামে খ্যাত তিনি	মৎস্যেন্দ্রনাথ ।
ধ্যানরত পুতলকে	মলয়ের সাথ ।।
আদির স্মরণে তাঁর	সমাধি ভাঙিল ।
এতেকে গৌরিশ গুরু	শিবেরে ভেটিল ।।
আদেশ করি পিপ্ললী	আদেশ মাগিল ।
মনের কথা এখন	ভৈরবে বলিল ।।
বীরানন্দ বলে, ‘প্রভু,	শোনে বচন ।
চারিদিকে চারিমঠ	করিব রচন ।।

কদলীতে যাব গুরু	যাব বিজয়াতে।
আজ্ঞা করো নাথধর্ম	বিতরি চৌভিতে।।
শিষ্যের বচন শুনে	প্রভু হরষিত।
তিননাথের পাঁচালি	হবে সুরচিত।।
বিজয়া-বকুল তলে	গোর্থ অবধূত।
আদিনাথ-নাতি আর	মচ্ছীন্দ্রের পুত।।
তথা হৈতে গেলা প্রভু	কৈলাশের ধাম।
খড়মেতে ভর দিয়া	সুন্দর সুঠাম।।
আদেশ করিয়া গোর্থ	করজোড়ে কহে।
কী কারণে স্মর প্রভু	মন মোর দহে।।
এত শুনি ভৃঙ্গীপাদ	কহেন কারণ।
যাহাতে ত্রিনাথ হয়	পূজাতে স্মরণ।।
এই কথা শুনি গোর্থ	কহে করজোড়ে।
হিমালয় ভারত-পারে	যাব ঘুরে ঘুরে।।
রাঢ়-বঙ্গে যাব গুরু	তোমাদের বরে।
উঁচু -নিচু জাতি-বর্ণ	সকলের ঘরে।।
চাষা-ভূষা জাতি-পাতি	না করি বিচার।
মোদের ধর্মের কাছে	কুল কী ছার।।
গোর্থের বচন শুনি	আদিনাথ হাসে।
মৎস্যেন্দ্র হরষিত	মহানন্দে ভাসে।।
এতক্ষণে আদিনাথ	বাণী দেয় তাঁর।
কেমনে পূজাদি হবে	করিবে প্রচার।।
মানাত নগরে দীন	করেন বসতি।
দিন আনে দিন খায়	দীন যোগী অতি।।
মিলিব বকুল গাছে	বেলতলা মাঠ।

প্রতিবুধে বসে সেথা	মস্ত বড় হাট।।
দীনাই খুঁজিবে গোরু	স্মরি নাম গুরু।
এথায় মোদের কাজ	পূজা হবে গুরু।।
করিব পূজক তাঁরে	প্রচার কারণ।
চল সবে তিনে মিলি	ভবের তারণ।।’ ^{৮৩}

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে হারিয়ে যাওয়া গোরুর প্রসঙ্গের অনুরূপ কাহিনি ড. জীবন নাথ সংগৃহীত তিননাথের পাঁচালি গ্রন্থেও রয়েছে। শিবযোগী তথা নাথযোগীর পেশা হল ব্রহ্মগীত পরিবেশন করে নাথ যোগতত্ত্ব প্রচার করা। কিন্তু এখানে অর্থনৈতিক কারণে চাষবাসের প্রসঙ্গ এসেছে। গোরুর সঙ্গে গোরক্ষনাথের সম্বন্ধ অতি নিকট। তবে ‘গো’ শব্দের বৈদিক অর্থ জ্ঞান বা যোগজ্ঞান। এখানে দীননাথ যোগতত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ। নাথপন্থের সৃষ্টিতত্ত্বে নাথযোগ দর্শনের ত্রিপাদতত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অলখনিরঞ্জন (অলখনাথ)–অনাদিনাথ—আদিনাথ, অর্থাৎ এক শিবের তিননাথ-অবস্থা। এটাই নাথতত্ত্বের দর্শন। অথর্ববেদের ২/১-২ মন্ত্রের বক্তব্যের সঙ্গে এই ত্রিপাদতত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়-

‘ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য।’^{৮৪}

নাথপন্থের এই দর্শন যাঁরা মানেন তাঁরাই নাথযোগী।

নাথপন্থে মানুষের মাথাতে অবস্থিত সহস্রাকে কৈলাশ বলা হয়েছে। এখানে শিব বাস করেন। সিদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এখানে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। সহস্রধারার জ্ঞান হল অনন্ত জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা পরম পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এই অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সবজ্ঞানই খণ্ডজ্ঞান। শক্তিযুক্ত শিবের সাধনায় পূর্ণ জ্ঞানের কথা গোরক্ষনাথও বলেছেন-

‘খণ্ডজ্ঞান লৈয়া কেন যুদ্ধ করি মর।

জানিবা পরম পদ জ্ঞান হৈতে পর।।’^{৮৫}

এছাড়া রামেশ্বর ভট্টাচার্য ‘শিবায়ন’ কাব্যে শিবকে কৃষক চরিত্র রূপে দেখিয়েছেন তার প্রসঙ্গ ‘তিননাথের পাঁচালি’-কাররা এনেছেন। শিবের কোচনী-প্রীতির প্রসঙ্গ রামেশ্বর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। এর উৎস অবশ্য ষোড়শ শতকের ‘যোগিনীতন্ত্র’। নাথপন্থের বিখ্যাত নবনাথ ও চুরাশি নাথসিদ্ধের কথা এসেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের চর্য্যাম, পূজ্যনাম ও গুপ্তনামের প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথের লেখা ‘শাবরচিন্তামণিঃ’ গ্রন্থে তাঁর ৪০টি নাম পাওয়া যায়।^{৮৬} নাথযোগীদের অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনে উচ্চারিত শব্দ ‘আদেশ’-র ব্যবহার ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে ঘটেছে। গোরক্ষনাথের মতে আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনই হল আদেশ—

‘আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।

ত্রয়াণামেক সংভূতি, ‘আদেশঃ’ ইতি কীর্তিতঃ।’^{৮৭}

নাথযোগী গুরুশিষ্য পরস্পরকে জীবাত্মা, আত্মা বা পরমাত্মার অতীত ‘আদেশ’ বলে বিবেচনা করেন। সেইজন্য ‘আদেশ আদেশ!’ উচ্চারণ করেন। ঋগ্বেদে ‘আদিশ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে— ‘বিষুং ন স্তুষ আদিশে’ (৬/৪৮/১৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ‘আদেশ’ ৬/১/৪-৬; ৬/২/১ শব্দটি সং ও অসং শব্দের যা অতীত তাকেই বলা হয়েছে ‘আদেশ’। প্রসঙ্গক্রমে গোখবিজয় গ্রন্থে উল্লিখিত বিজয়ানগর, কদলীরাজ্য, মানাতনগর বা মহানাদ, রাঢ়দেশ প্রভৃতি নাথতীর্থ ও যোগসিদ্ধপীঠের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখ্য নাথমার্গের সাধনায় চারটি পীঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কামাখ্যা, জালন্ধর, পূর্ণগিরি(পুরী) এবং উড্ডীয়ান। এছাড়া অসংখ্য উপপীঠ রয়েছে। নবনাথের নির্দেশেই সমস্ত যোগপীঠ ও যোগ-উপপীঠ স্থাপিত হয়েছে—

‘গচ্ছ ত্বং ভারতবর্ষে অধিকারায় সর্বতঃ।

পীঠোপপীঠ ক্ষেত্রে কুরু সৃষ্টিমনেকধা।।

শ্রদ্ধা মৎস্যেন্দ্রবাক্যং তু প্রহৃষ্টো ভগবান শিবঃ।

গচ্ছ পুত্র পৃথিব্যাং ত্বং ত্রৈলোক্যং চোদ্ধারিষ্যসি।।^{৮৮}

আদিনাথ নির্দেশিত তিননাথের পূজো পদ্ধতি পেয়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ হরষিত হয়েছেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’ গ্রন্থে অবশ্য বাহ্য পূজো নয়, মানস পূজোর কথা বলেছেন—

‘পঞ্চমন্তু ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ত্রোদধিনির্জিতম।

সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্তু জ্ঞানপুষ্পন্তু অষ্টমম।।

এতত পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অর্চয়েল্লিঙ্গমানসম।।^{৮৯}

এখানে লিঙ্গ অর্থে বিন্দুকে বোঝাতে চেয়েছেন। ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ গ্রন্থের চতুর্থ পটলে

মৎস্যেন্দ্রনাথ মন্ত্রযোগে মিস্টিক শক্তিলাভের কথাও বলেছেন।

‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থে তিননাথের আবাহন সঙ্গীতটি উল্লেখযোগ্য, পুরাণকাহিনি

ও ভক্তিরসের সংস্পর্শে মিস্টিক অনুভূতি লাভই গানটির বিশেষত্ব—

‘এসো হে দয়ালঠাকুর তিনজন—

তিননাথরূপেতে করো ঘটেতে আরোহণ।।

আমি জপ-তপ জানি না হে।

তোমাদের নামগুণে করি নিবেদন –

তিন নাথরূপেতে করো ঘটে আরোহণ।।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপে তা।

ওগো তিননাথ হও একাত্মা।।

আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না হে।

তোমাদের নামগুণে করব পূজন।

তিন নাথরূপে করো ঘটে আরোহণ।।^{৯০}

ড. জীবন নাথ সংগৃহীত ‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থে কাহিনিতে দীর্ঘস্থান জুড়ে আছে দীননাথের তিননাথ পূজোর উপাখ্যান। দীননাথের যোগবিভূতি বা যোগসিদ্ধির কথা এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাতঞ্জল ‘যোগদর্শন’ থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে ম্যাজিক বা যোগলৌকিক ক্ষমতার কথা জানা যায়। এখানেও নাথসিদ্ধদের যোগলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

‘রাঢ়দেশে ফলেশষ্যে	মনোহর ধাম।
যোগী-ভোগী করে বাস	মানাত সে গ্রাম।।
দীননাথ শিবযোগী	ভক্ত দীনহীন।
চাষবাস করি কাটে	কোনোমতে দিন।।
সকাল সন্ধ্যায় স্মরে	পশুপতি শিব।
ভগবানে মতিগতি	সরল সজীব।।
একদা দৈবের চক্রে	ত্রিনাথের লীলা।
সুহালের গাই-গোরু	কোথা হারাইলা।।
হারায়ে হালের গোরু	দুঃখ নাহি ধরে।
অনাবাদি খেতে আর	আবাদ না পড়ে।।
বেঙ্গের সংসারে নিতি	অভাব বাড়িল।
মায়ে-পোয়ে কটু কহে	এ কেমন হৈল।।
দুঃখের কথা সকল	গুরুরে কহিল।
কেমন অভাবে দীন	সকল সহিল।।
ঈড়াতে বহিলে শ্বাস	দক্ষিণে যাইবে।
পিঙ্গলাতে বহে যদি	উত্তরে ধাইবে।।
অথবা মঙ্গলে উষা	ও বুধের বাঁও।
প্রভাতে উঠিয়া যথা	ইচ্ছা তথা যাও।।

কহিলাম তত্ত্বকথা	যাহে হয় হিত।
গুরুবাক্য নহে আন	জানিয়ো নিশ্চিত।।
এতেক শুনিয়া দীন	আদেশ করিল।
গুরুবাক্য শিরোধার্য	মনেতে ধরিল।।
বুধের উষায় দীন	প্রভাতে উঠিল।
ইড়াতে বহিল শ্বাস	দক্ষিণে ছুটিল।।
মানাতের দক্ষিণেতে	বেলতলা মাঠ।
প্রতিবুধে বসে সেথা	মস্ত বড় হাট।।
বুধের প্রভাতে দীন	বস্ত্র কান্ধে করি।
ক্রোশ দুই বাঁয়ে হাটে	শিব নাম স্মরি।।
সর্বত্র খুঁজিয়া গোরু	কোথা না পাইল।
ইতিউতি যথাতথা	সবেগে ধাইল।।
ক্ষুধাতৃষ্ণায় দীন	হইল কাতর।
অচল হইল অঙ্গ	পড়ি তেপান্তর।। ^{৯১}

নাথসংস্কৃতির সম্মিলিত দানে বাঙালির সমাজজীবন আজও সঞ্জীবিত হচ্ছে। বাংলায় যোগীরগান, যোগীনাটক ও ত্রিনাথের গানের মধ্যে দিয়ে নাথসাহিত্যের যুক্তধারা নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আপন খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ড. পঞ্চগনন মণ্ডল বলেছেন-

এরূপ প্রাচীন ও আধুনিক নানা কাহিনি ও ঘটনাবলিস্থিত এবং প্রচলিত লোকগীতির আকারে নানা ঐতিহ্য লাঞ্ছিত বাঙালির এই লৌকিক ধর্মগাথাগুলি ‘মোহ-মোচন-বাণী’ শুনিয়া সারা ভারতীয় জনপদে অধ্যাত্মমার্গের যোগক্ষেম বহন করেছিল তা আমাদের পরম গৌরবের কথা সন্দেহ নেই।^{৯২}

‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থের শুরুতে শিববন্দনা, মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত অনুরূপ কাহিনি এবং মানাদ বা মহানাদ মঠ কেন্দ্রিক রাঢ়দেশীয় নাথসংস্কৃতি উদ্ভূত ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

নাথসিদ্ধদের কায়াসাধনার কথা, হঠযোগ প্রভৃতি বিষয় ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে। নাথযোগীদের হঠযোগ দর্শন, তান্ত্রিক ও বৈদিক ঐতিহ্য সম্বলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন, লোকবিশ্বাস ও নাথসিদ্ধ পীঠস্থান ও আচার-অনুষ্ঠানে নাথযোগপন্থের একটি সংহতরূপ ধরা পড়েছে। রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগী-সম্প্রদায়ের সংযোগ ও সমন্বয়ের কারণে নাথযোগীরা পার্থিব জগৎ জয় করে যে অমরত্বের সন্ধান করেন তা ‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থেও লক্ষ করা যায় –

‘তিননাথের মেলা তুমি	করো এইক্ষণে।।
মানত করিতে পূজা	বাঁচিল জামাই।
দয়াল ত্রিনাথ সম	আর দেব নাই।।
ত্রিনাথ ত্রিনাথ বলো	ত্রিনাথ স্মরিয়া।
মহানন্দে ভবসিদ্ধ	যাও উতরিয়া।।
ত্রিনাথ মাহাত্ম্য গীত	করিয়া শ্রবণ।
আদেশ আদেশ বলে	ললিত নন্দন।।
তিননাথের পাঁচালি	যার ঘরে রয়।
ত্রিদেব সন্তুষ্ট সদা	তার প্রতি রয়।।
অতএব ভক্তগণ	শুনহ বচন।
ভক্তিভরে এ পাঁচালি	করিবে পঠন।।
সকল বিপদ হতে	পাবে পরিত্রাণ।
নাথযোগ সাহিত্যে যে	আছে এ-প্রমাণ।।
তিননাথ তিননাথ	বলো ভক্তগণ।
তেরশো একাশি সনে	গ্রন্থ সমাপন।’ ^{৯৩}

তিননাথের পাঁচালি-র মতো শরীরের দুঃখনাশ এবং সর্ব অভীষ্ট লাভে মন্ত্রযোগে পূজা এবং যোগসাধনার গুরুত্বের কথা মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর লেখা ‘মৎস্যেন্দ্র সংহিতা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

‘শরীরদুঃখশমনং সমস্তাভীষ্টসাধকম।

সর্বমন্ত্রময়ং শুভ্রং সর্বযোগময়ং শিবম।।’^{৯৪}

‘গোখবিজয়’-এ দেখি গোরক্ষনাথের সিদ্ধপীঠ বিজয়ানগরের বকুলতলা, ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে সিদ্ধনাথের সিদ্ধপীঠ মানাদ বা মহানাদের বেলতলা এবং ‘সিদ্ধ বকুল’ দুইয়ের-ই উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাচীন শিবপীঠে বেলগাছের পরিবর্তে বকুলগাছ দেখা যায়। এটা প্রাচীন নাথপন্থের সূচনা করছে।^{৯৫} ‘গোরক্ষবিজয়’ ইত্যাদি গ্রন্থে নাথসিদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্যনির্ভর সাধনা স্থান পেলেও তিননাথের পাঁচালি গ্রন্থে মূলত গৃহস্থ নাথ-যোগীদের মন্ত্রসাধন, গুরুবন্দনা ও হঠযোগের প্রাথমিক ধারণা প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে উপনিষদের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সমন্বিত সাধনপ্রণালী নাথপন্থে স্থান পেয়েছে—

‘দীননাথ জানে জাদু

বাঁচন-মরণ।

আনি তুরা প্রাণভিক্ষা

তাঁহারে যাচিবে।

তাহার গুণেতে সব

পুত্ররা বাঁচিবে।।

বৃদ্ধের বচন শুনি

কেহ ঠাট্টা করে।

গড়াগড়ি যায় কেহ

কেহ টিকি ধরে।।

চেতন পাইয়া গুরু

চলিল তুরায়।

শিষ্যেরে লভিয়া গুরু

ভূমিতে লুটায়।।’ ইত্যাদি^{৯৬}

নাথযোগীরা হঠযোগ সাধনা করেন। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং দীর্ঘজীবন লাভ ছিল হঠযোগের একদিক। আরেকটি দিক হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। যাকে রাজযোগ নামে অভিহিত করা হয়। গৃহযোগী প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাসী নাথযোগী সিদ্ধগুরুর সান্নিধ্যে থেকে যথোপযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করে মূলাধার-স্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্নাপথে চালিত করে আঞ্জাচক্রে পরমাত্মা বা পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করতে সাধনা করেন।^{৯৭} ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে অবশ্য গৃহযোগীর যোগসাধনার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি সন্ন্যাসী নাথযোগী সিদ্ধদের যোগসাধনা প্রসঙ্গও এসেছে—

‘অনাবাদি খেতে আর	আবাদ না পড়ে।।
বেঙ্গের সংসারে নিতি	অভাব বাড়িল।
ইড়াতে বহিলে শ্বাস	দক্ষিণে যাইবে।।
পিঙ্গলাতে বহে যদি	উত্তরে ধাইবে।’ ^{৯৮}

অবশ্য গৃহস্থ যোগীর সাধন প্রণালী মন্ত্রযোগ, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও কিছু মুদ্রা অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরানুভূতি লাভ করে কীভাবে এ জীবন সার্থক করা যায়, সেটাই হল গৃহস্থ যোগীর একমাত্র ভাবনা। সেকারণে যোগী পুষ্করনাথজী তাঁর শিষ্য অশ্বিনীনাথকে বলেছিলেন, ‘সংসারে থেকে সাধন করা তো দুর্গের ভেতর থেকে যুদ্ধ করা চারিদিকে প্রতিরোধ থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হয়ে সাধন করা যেন খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা। চারিদিক অরক্ষিত। যে কোনও দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। আরে বাবা গৃহী সাধকদের জন্য সাতখুন মাপ। গৃহী সাধক একগুণ সাধন করলে চারগুণ ফল। সন্ন্যাসী

চারগুণ সাধন করলে একগুণ ফল পাবে।^{১৯৯} নাথপন্থে যোগসাধনায় মনের নির্মলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অনেক ক্ষেত্রে উপনিষদ ও গীতাকে মান্য করা হয়েছে। কঠোপনিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ধারণা হল যোগ।^{২০০} পরশুরাম চতুর্বেদী মনে করেন নাথসম্প্রদায়ের সাধনাপদ্ধতির মূলধারায় উপনিষদের যোগধারা তথা আগমধারার সমন্বয় ঘটেছে। যৌগিকপ্রক্রিয়া তত্ত্বমন্ত্র রূপে মুনি পরম্পরা থেকে শ্রমণ ধারা ও আগম ধারা রূপে দ্বিধা বিভক্ত রূপে বিভাজিত হয়েছে। ঋগ্বেদের ব্রাত্যযোগীরা রুদ্রের উপাসনা করতেন এবং তাঁরা প্রাণায়াম ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়ার মহত্বের কথা বলেছেন। এঁরা সাধনা শক্তিতে মৃত্যুকে জয় করে যজ্ঞাদি কর্ম থেকে দূরে থেকে অরূপ-বস্তুর ধ্যানে নিয়োজিত থাকতেন।^{২০১} বাস্তবে প্রত্যক্ষ জগতে গতিশীল শক্তির একই তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিশ্বে ব্যাপ্ত আছে। কিন্তু সব গতিশীল বস্তু দেবশক্তির অনুপ্রেরণায় রয়েছে। জগতের সব প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ রয়েছে। যাকে নিয়মিত আলাদা বা এক করতে পরোক্ষ শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, যে বিশ্বাস ঋগ্বেদের কাল থেকে চলে আসছে-

‘একৈবোদাঃ সর্বমিদং বিভাতি।

এক বেদং বিভুব সর্বম।’^{২০২}

উপনিষদে এই তত্ত্বকে ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যোগী পুষ্করনাথজী একই ভাবনাকে ‘জাগরণী সঙ্গীত’ গানে উল্লেখ করেছেন-

‘ওহে যোগীগণ কর দৃঢ় পণ

স্বজাতি গৌরব করিতে রক্ষণ।

জাগাও কুণ্ডলিনী মহাপ্রাণায়ামে

ডাকরে সবে ঈশান ঈশান।

যোগ কর সার হৃদয় মাঝার
 যোগে দেহ ঢালি এদেহ প্রাণ।
 দেখিবে অদূরে সদা বিরাজেরে
 জাতীয় গৌরব উন্নতি বিধান।
 জানিলে যাহার সব জানা যায়
 জানরে তাহার অমৃত সন্তান।
 অতুষ্ট হয়ে মৃত প্রায় রয়ে
 অজপা ভুলিলে কেন মতিমান।।
 অষ্টাঙ্গ যোগেতে হইয়ে নিরত
 নাশিবে অশিব কলুষ যত।
 ধরম করম যতনে মরম
 কর সংস্কৃত ওহে যোগীগণ
 ভুলি দলাদলি করি কোলাকোলি
 উন্নতির পথে হও আগুয়ান
 উড়িবে আকাশে বিজয় নিশান
 জ্ঞান অসি ধরি যুঝারে ধীমান।^{১০৩}

অনুরূপ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় ‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থেও—

‘আদিদেব কৈলা কৃপা	নিজের ইচ্ছায়।
আদিরূপ শক্তি এবে	দিলা নাথে তাঁয়।।
শ-ই-ব মনে তাঁহার	তাই শিব নাম।
সৃষ্টিহেতু বিরাজেন	কৈলাশের ধাম।।
পশুপতি শিব যিনি	তিনি আদিনাথ।
চরণ-কমলে তাঁর	কোটি প্রণিপাত।।
শিব নামে আদিনাথ	নিজে নিজে হৈলা।
কৈলাশে শক্তিরে লয়ে	লীলা সদা কৈলা।। ^{১০৪}

বৌদ্ধযুগের অবসানে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে শ্রেণিবৈষম্য, জাতপাতের বিভাজন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে উথাল-পাথাল অবস্থা, জাতপাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ও ছুৎমার্গের কারণে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। এইরকম পরিস্থিতিতে জাতপাত, বৈষম্যহীন সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথের অভ্যুদয় এবং তাঁদের দ্বারা প্রবর্তিত নাথপন্থ এই পরিস্থিতির উপযোগী ছিল। নাথপন্থ জাতি ব্যবস্থা, উচ্চনীচ ভেদ ও ছুৎমার্গের কুরীতির বিরুদ্ধে ছিল। বিশেষত গোরক্ষনাথ নাথপন্থের যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছিলেন তার মূল লক্ষ ছিল একদিকে ঈশ্বরবাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া, দ্বিতীয়ত ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং কুপ্রথা দূর করা। তিনি ধর্মীয় অনুদারতা ও জাতপাতের বিভাজনের বিপরীতে ত্যাগ-তপস্যা, সহনশীলতার বার্তা দিয়েছিলেন। নাথসিদ্ধ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধরা যোগমার্গের এক সহজপথের কথা বলেছেন। তাঁরা মনে করেন ভেদ-ভাব বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব এবং যাঁরা এই পথে চলেন তাঁরা মোক্ষলাভ করতে পারেন। ‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থেও নাথসিদ্ধ-যোগীরা সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য অস্বীকার করেছেন—

‘এই কথা শুনি গোর্থ	কহে করজোড়ে।
হিমালয় ভারত পারে	যাব ঘুরে ঘুরে।।
রাঢ়-বঙ্গে যাব গুরু	তোমাদের বরে।
উঁচু-নিচু জাতি-বর্ণ	সকলের ঘরে।।
চাষা-ভূষা জাতি-পাতি	না করি বিচার।

মোদের ধর্মের কাছে কুল কী ছাড়।।
 গোথের বচন শুনি আদিনাথ হাসে।
 মৎস্যেন্দ্র হরষিত মহানন্দে ভাসে।।^{১০৫}

সাহিত্য হিসেবে ‘তিননাথের পাঁচালি’ কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়। বিশেষত প্রতীক ও রহস্যবাদী প্রতীকের বহু ব্যবহার ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে ঘটেছে। কবিতা বা গানে প্রতীক ব্যবহার করা হয় কাব্য-সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে। এখানে যোগের প্রসঙ্গে প্রতীকের ব্যবহার হয়েছে। ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে কাব্য পরম্পরা, লোক পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরাগত প্রতীক লক্ষ করা যায়। যেমন- ‘হাল’ এখানে লাঙল নয়, দশা বা অবস্থা। ‘গো’ রক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, জ্ঞান বা যোগজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ‘দীননাথ’ও প্রতীক মাত্র, দীন নয়; যোগতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। গোরক্ষনাথের ‘খড়ম’ পায়ের জুতো অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, যোগসিদ্ধির প্রতীক রূপে শব্দটি ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে এসেছে। আবার ‘পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড’ তত্ত্ব অনুসারে ‘ভাণ্ড’ জীবাশ্ম এবং ‘ব্রহ্মাণ্ড’ পরমাশ্মার প্রতীক। মাথায় অবস্থিত সহস্রা নাথযোগের কৈলাশ। অন্যত্র বলা হয়েছে-

‘দীননাথ জানে জাদু।’^{১০৬}

‘জাদু’ এক্ষেত্রে যোগ-বিভূতির প্রতীকাত্মক রূপ লাভ করেছে। যোগবিভূতি যারা জানেন তারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। তারফলে -

‘অন্ধজনে আলো পায়।’^{১০৭}

বাইবেলেও এমন অলৌকিক ঘটনাগুলি যোগবিভূতির মত প্রকাশিত হয়েছে। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদি শব্দের প্রতীকাত্মক যৌগিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।^{১০৮} যোগসাধন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রতীকের পর্যাপ্ত প্রয়োগ ঘটেছে ‘তিননাথের পাঁচালি’ গ্রন্থে। তান্ত্রিক

পদ্ধতির প্রভাবে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষেতিক শব্দ ধর্মীয় ও সাধনাত্মক পরম্পরা থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন – নাদবিন্দু, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড, পঙ্কদেহ, রবি-শশী, অনাদ্য, অলখ, আশি-সিদ্ধা, আদেশ, ইড়া-পিঙ্গলা, সদগুরু, অবধূত ইত্যাদি। এই প্রতীকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকজীবন থেকে সংগৃহীত হয় নি। এগুলি অধিকাংশ নাথসম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সাধনাত্মক প্রতীকী শব্দ।

রূপক, ব্যঞ্জনা, উৎপ্রেক্ষা, অন্য সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার, লক্ষণা, বিরোধাভাস ইত্যাদির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায় ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে। এমনকি সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগ ঘটেছে তিননাথের পাঁচালি গ্রন্থে—

‘হারায়ে হালের গোরু দুঃখ নাহি ধরে।
অনাবাদি খেতে আর আবাদ না পড়ে।।’^{১০৯}

এক্ষেত্রে সাহিত্যিক ভাষা অপেক্ষা রমতায়োগীদের মৌখিক ভাষা বেশি করে প্রাধান্য লাভ করেছে। ড. রামচন্দ্র শুল্লা এই ভাষাকে ‘সাধুন্ধড়ী ভাষা’ বলে উল্লেখ করেছেন।^{১১০} তারফলে নাথসাহিত্য ও বিষয় সামগ্রীতে সন্ন্যাসপ্রধান পাশুপত ধারার সম্বন্ধ ধরা পড়েছে। নাথসাহিত্য ও বিষয় সম্পূর্ণত বৌদ্ধ মত থেকে ভিন্ন।^{১১১}

‘তিননাথের পাঁচালি’-তে আদিনাথ শিবকে ‘অলখ নিরঞ্জন’, ‘নিরঞ্জন’, ‘অনাদ্য’, ‘মহাবিশু’, ‘সদাশিব’, ‘হরিহর’ নামে বা প্রতীকে সম্বোধন করা হয়েছে—

‘আদিদেব আদিনাথ অলখ গড়ন।
কেহ বলে নিরঞ্জন অথবা অনাদ্য।’^{১১২}

গোরক্ষনাথ ‘গোরখবাণী’ গ্রন্থে আদিনাথ শিবকে ২২ প্রকার নামে সম্বোধন করেছেন। যথা- পরমপুরুষ, অলখপুরুষ, নাথ, সদগুরু, জগন্নাথ, সদাশিব, নিরঞ্জন ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে পরমশিবকে বুঝিয়েছেন। যোগসাধনায় আদিনাথ শিব হলেন নির্বিকার নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা নাথযোগের পরম লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ ‘নিরঞ্জন’-র স্বরূপকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন-

‘উদৌ ন অস্ত রাত ন দিন সরবে চরাচর ভাব ন ভিন্ন।

সোই নিরঞ্জন ডাল ন মূল, সর্বব্যাপিক সুষম ন অস্থূল।’^{১১৩}

আবার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করতে ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে লৌকিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি গৃহস্থ নাথ পরম্পরায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দও এসেছে। কিন্তু সব শব্দই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন -

লৌকিক শব্দ

১. মীন

২. মন

৩. ব্রহ্মাণ্ড

৪. ভাণ্ড

৫. সিদ্ধি

৬. বিন্দু

৭. নবনাথ

‘মহার্ণব তন্ত্র’ গ্রন্থে নবনাথের তালিকার উল্লেখ রয়েছে।

যথাক্রমে - গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ, নাগার্জুন, সহস্রার্জুন, দত্তাত্রেয়,

দেবদত্ত, জড়ভরত, আদিনাথ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ।^{১১৪}

৮. নাদ

আধ্যাত্মিক শব্দ

লক্ষ্য-তত্ত্ব, মৎস্যেন্দ্রনাথ

ইন্দ্রিয়

পরমাত্মা

জীবাত্মা

মুক্তশরীর

শুক্ল, কামবাসনা

ওঁ-কার

৯. কৈলাশ	সহস্রা
১০. পুতলক	ব্রহ্মরন্ধ, যোগসিদ্ধপীঠ
১১. গোরু	যোগজ্ঞান
১২. হংস	প্রাণবায়ু, সিদ্ধ, জীবাত্মা
১৩. আদিশক্তি	মায়া, কুণ্ডলিনী
১৪. সমাধি	ব্রহ্মানুভূতি, সহজানুভূতি।

লোককবিরা ‘তিননাথের পাঁচালি’-তে প্রকৃতি-জগৎ থেকেও প্রতীক, উপমা ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি মানব জীবনের বন্ধু। লোকজীবন থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন শব্দ নাথসিদ্ধরা প্রাকৃতিক উপকরণের প্রতীকে পরিণত করেছেন—

‘তরুছায়া এক ঠাঁই কোণেতে মিলিল।
বকুলের তলে দীন বিশ্রাম লইল।।’^{১১৫}

নাথসংস্কৃতি কেন্দ্রিক পরিভাষা লক্ষণীয়। নাথসাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি কাব্যপ্রতিমা হিসেবে উঠে এসেছে। নাথধর্ম, দর্শনের বিভিন্ন প্রতীক, চিত্রকল্প নাথসিদ্ধরা কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন –

‘যোগী-ভোগী করে বাস মানাত সে গ্রাম।
দীননাথ শিবযোগী ভক্ত দীনহীন।।
সকাল সন্ধ্যায় স্মরে পশুপতি শিব।’^{১১৬}

শুধু ভাষাশৈলী শিল্পপ্রকরণ নয়, অলঙ্কার প্রয়োগেও লোককবিরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন –

‘তীর্থমধ্যে পরমতীর্থ হয় যে রে যোগতীর্থ।
যেথায় বসে ধ্যান-জ্ঞান হয় রে নিত্য।।
এখানেতেই যোগীশ নামে মহাদেব লিঙ্গ।
চল যাই দেখে আসি না করি বিলম্ব।।

তারপরও দ্যাখ মুক্তিতির্থ ওই যে যোগকুণ্ড।

হেথায় দেবদেব মহাদেব সদা রাখেন মুণ্ড।।^{১১৭}

তিননাথের পাঁচালি যোগকাব্য হওয়ার কারণে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার খুব একটা লক্ষ করা যায় না। তবু দু-একটি প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশ ব্যবহার করে কবির কাব্যভাষায় স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করেছেন। দীননাথের যোগজ্ঞান প্রকাশ এবং তিননাথের পূজো প্রসঙ্গে যে পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন লোককবির—

‘অথবা মঙ্গলে উষা ও বুধের বাঁও।

প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা তথা যাও।।^{১১৮}

যোগী দীননাথ কর্তৃক তিননাথের মেলা আয়োজন উপলক্ষে পয়ার ছন্দে রচিত পদগুলি সুষ্ঠু ও ভাবপ্রকাশক যথার্থ কাব্যভাষার সহায়ক হয়ে উঠেছে ছন্দসমীক্ষা থেকে উপলব্ধি করা যায়। পয়ার ছন্দ নির্মাণ ও প্রকাশে তিননাথের পাঁচালি-র কবির মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। যেমন –

‘গুরুর বাড়িতে এবে প্রতিদিন পূজা।

দীনেরে পূজারী করি নিজে হয় কুঁজা।।

দীনেরে দিলেন গুরু জমিজমা ঠাই।

দুস্থ দীন সুস্থ হইল পেল আর গাই।।

একদিন সবে মিলি কানা-কুষ্ঠী-খোঁড়া।

ত্রিনাথ মেলাতে যায় হয়ে জোড়া জোড়া।।^{১১৯}

ত্রিপদী ছন্দেরও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন –

‘কুষ্ঠরোগী নিরাময় অপুত্রকের পুত্র হয়

সর্বহারা লভে যে সম্পদ।।^{১২০}

পশ্চিমবঙ্গে উত্তর চব্বিশপরগণা, নদীয়া, হুগলি এবং উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ত্রিনাথ ঠাকুর স্মরণে তিননাথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষেরা বিশ্বাস করেন তারা যদি জীবনের সঙ্কটকালে ‘ত্রিনাথ’কে স্মরণ করেন তাহলে তারা বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। সেটা তাদের পরিবার ও সমাজের পক্ষে হিতকর হয়।^{১২১} ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে দৈনিক ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—

ত্রিনাথ উপাসনায় পাঁচালি ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধভক্তি ও একাগ্রমনে যে কেউ তিননাথের পূজো করতে পারেন। নাথধর্মের বৈশিষ্ট্য হল যে তারা অন্যধর্মের মানুষদের নিজ নিজ দেবতাদের পূজো করতে অনুমতি দেন। তথাকথিত তিননাথের মেলায় যেসব দেবতার উপাসনা করা হয় তাঁরা আসলে নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। যেমন আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ। নাথগুরুদের পূজো করার কারণ হল তাঁরা একসময় সমগ্র দেশজুড়ে অভূতপূর্ব সম্মান পেয়েছিলেন। এটা প্রমাণিত সত্য ত্রিনাথের মেলায় যে তিননাথের উপাসনা করা হয়, তা একসময়ের প্রভাবশালী নাথধর্মের এক অবশিষ্টাংশ।^{১২২}

আদিনাথ শিব এবং গোরক্ষনাথের উপাসনা নানা মন্দির ও মঠে দেখা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে নানান গ্রামীণ মেলা, যেমন শিব-চতুর্দশী, তিননাথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটা প্রমাণ করে নাথ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আজও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়।^{১২৩} গবেষক মানচিত্র পাল তাঁর সংগৃহীত ত্রিনাথের গানগুলিকে ভাব অনুযায়ী শৈব ও বৈষ্ণব-এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।^{১২৪} গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য মনে করেন ত্রিনাথ মেলার প্রধান অঙ্গ

ত্রিনাথের গান। গানের মাধ্যমেই ত্রিনাথ উপাসনা সম্পন্ন হয়। ত্রিনাথ উপাসনার স্বরূপ সন্ধানের কাজে গানগুলি প্রধান অবলম্বন। কোনো কোনো সময় ত্রিনাথের মেলায় ‘ত্রিনাথ আসর’ নামে শিষ্য-গুরুর প্রশ্নোত্তরমূলক এক ধরনের গান পাওয়া যায়। শিষ্য প্রশ্ন করেন, গুরু উত্তর দেন। এই ধারার ত্রিনাথের গানে যোগসাধনার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন—

শিষ্য: দেহ ঘরের খবর জানতে আমার বাসনা
 কি দিয়ে গড়িয়ে গুরু এমন সুন্দর দেহখানা।
 ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে দেহ ঘরে তাহা আছে গ
 বেদ পুরাণে লিখিয়াছে উভয়ের এক নমুনা। ...
 গুরু: ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম
 দেহ ঘর তৈয়ার হইয়াছে এ পইঞ্চভুতে।
 হাড়ের খুলি চামড়ার ছানি
 জুইত গাথনি তাতে। ...

এই ধরনের গান নাথপন্থার সঙ্গে ত্রিনাথের সংযোগের ইঙ্গিত বহন করছে।^{১২৫}

‘তিননাথের গান’ ও ‘ত্রিনাথের মেলা’ এক নয়। গল্প বা কাহিনি এক হলেও তিননাথের গান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের গল্প ও গান। ত্রিনাথের পূজো দত্তাত্রেয়নাথের পূজো। তিননাথের সমাগম অর্থে তিননাথের মেলা ব্যবহৃত হয় নি। ত্রিগুণের মিলন অর্থেই ত্রিনাথের মেলা। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের মিলন প্রাধান্য পেয়েছে বলে ত্রিনাথের মেলা। নাথযোগীদের তিনজন বিশিষ্ট সিদ্ধ হলেন আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। তাঁরা মানবগুরু হয়েও দেবগুরুর মতো সম্মানিত হন। এখানে আদিনাথ মানবগুরুই, দেবগুরু নন। আদিনাথের কিংবদন্তি থাকলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে কল্পিত হয়েছেন দেবগুরু

শিবরূপে। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ তিননাথ কিন্তু ত্রিনাথ নন। নাথযোগ সাহিত্য প্রাগবৈদিক যুগের মুনিধারার ব্রহ্মবাদের সংস্করণ। সন্ন্যাসী শ্রেণির নাথযোগীরা একসময় ব্রহ্মগীত পরিবেশন করে মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন। বর্তমানেও একশ্রেণির মাধুকরীবৃত্তির নাথযোগী ‘অলখ নিরঞ্জন’ উচ্চারণ করে ব্রহ্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকল—এই চেতনায় ব্রহ্মজ্ঞান। রাজমোহন নাথ মনে করেন, ‘নাথপন্থে বিধান হল শিব দেবতার আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করেও মহাযোগী হওয়া। মুণ্ডকোপনিষদেও প্রাচীন আত্বর্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম প্রথা ছিল বলে উল্লেখ আছে। তাঁরা ছিলেন যোগাচারবশত শুদ্ধসত্ত্ব যতি ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম। তাঁদের সন্তানেরাও ব্রহ্মবিৎ হতো— ‘ন অস্য কুলে অব্রহ্মবিৎ ভবতি’ (৩/২/৯)^{১২৬} নাথযোগীদের একাংশকে ভিত্তি করে নাথধর্ম সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়। কারণ নাথধর্মে কৌল বা মৎস্যেন্দ্রনাথী, গোরক্ষনাথী, নাথ অঘোরী, কাহ্ন বা কানুপানাথের কাপালিক পন্থ ইত্যাদি শাখা রয়েছে। এমনকি নাথধারায় গৃহস্থও বজ্রব্রহ্মচারী হতে পারেন। অবশ্য তাঁকে সহজোলী যোগমুদ্রা দ্বারা মৈথুনে উর্ধ্বরেতা সাধনা আয়ত্ত করতে হয়। গোরক্ষপন্থী যোগীরা ব্রহ্মচর্য যোগ সাধন করলেও কৌল নাথযোগীরা যুগল সাধনায় বিশ্বাসী। তবে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের সাধনায় বাহ্যত পার্থক্য থাকলেও অন্তর্নিহিত পার্থক্য নেই। দত্তায়েয়নাথ তান্ত্রিক পরম্পরার প্রবর্তক হলেও শেষে তা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রচার করলেন। গোরক্ষনাথ পাশ্চপত ও কৌল ছিলেন। কৌল পরম্পরায় তাঁর নাম ছিল মহেশ্বরানন্দনাথ—

‘তত্ত্বা নিত্যশুদ্ধৌ গুরোশ্চরণৌ মহাপ্রকাশাস্য (মৎস্যেন্দ্রস্য)।

গ্রথনাতি মহার্থমঞ্জরিমিমাং সুরহিং মহেশ্বরানন্দঃ।।’^{১২৭}

পাশুপত ও কৌলধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী দুই-ই নাথপন্থে স্বীকৃত। ভৈরবী বা সাধনসঙ্গিনী প্রতীকী এবং বাস্তব দুটোই প্রচলিত আছে। আদিতে নাথপন্থ সিদ্ধধারা নামেই পরিচিত ছিল। অবধূত হল সাধনস্তর বা পর্যায়। কাশ্মীরের ত্রিক-দর্শনও নাথপন্থের দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। কানুপানাথ ও জালন্ধরনাথের কাপালিক তান্ত্রিকধারা, মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারা এবং গোরক্ষনাথের পাশুপত ও সিদ্ধধারা পাশাপাশি নাথপন্থে প্রচলিত রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের ‘শাবরচিত্তামণিঃ’ এবং গোরক্ষনাথের ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গ্রন্থে নাথপন্থের সমস্ত ধারণা ও দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ নাথসিদ্ধমতে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগীশ্বরী আদি মতকে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেকারণে নাথসম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতিতে বৈদিক, অবৈদিক, তান্ত্রিক, দক্ষিণাচারী, বামাচারী তত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। নাথপন্থের বিরোধীরা অনেকে নাথমতকে অবৈদিক বললেও নাথসাধন ও দর্শনে অর্বাচীনকালে রচিত উপনিষদের ভাবনায় বিকশিত হয়েছে। সেই কারণে ড. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় মনে করেন যে কেবল বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্বীকার না করার জন্য ভারতের অনেক ধর্ম, দর্শন অবৈদিক এবং বেদবাহ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যতদূর তান্ত্রিকতার প্রশ্নে, পাশুপত শৈবধারায় তান্ত্রিক মত পাওয়া যায়। তান্ত্রিকমত নাথ ও দশনামীদের মধ্যেও রয়েছে। বাস্তবিকই বেদ এবং তন্ত্রের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তান্ত্রিকদের সাধনপদ্ধতি ও দর্শন অধিকাংশ বেদে পাওয়া যায়।^{১২৮} নাথকৌল সন্ন্যাসী যোগী সৎপুরানন্দনাথ মনে করেন—

নবনাথদের মধ্যে কেবল যোগী গোরক্ষনাথ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের
মৈথুনসাধনাকে অস্বীকার করে এই সাধনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।
তাই গোরক্ষনাথের ধারায় দর্শনী নাথযোগীগণ কৌপিনাদি বাহ্য ব্রহ্মচর্য

রাখতে বাধ্য হন। নাথধারা এবং নাথকৌলধারায় কোথাও বাহ্য ব্রহ্মচর্য স্বীকৃত নয়। বজ্রোলা মুদ্রা দ্বারা একক সাধনায় ব্রহ্মচর্য অথবা সহজোলা মুদ্রা দ্বারা যুগল সাধনায় বজ্রব্রহ্মচর্যই বিহিত আদেশ। নাথযোগী যুগলসাধনা বা একক সাধনা যেকোনো একটিতেই যোগ্যতা অনুসারে সাধনা করতে পারেন। যুগলসাধনা সন্ত্রীক(শৈববিবাহ অনুযায়ী) অথবা যোগিনী (ভৈরবী) বরণ করে সাধনা করতে পারেন। কৌলক্রম নাথ সম্প্রদায়ের আবশ্যিক সাধনা। কৌলসাধনায় দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-শূন্য ক্রমে পাঁচটি স্তরের সাধনায় হঠযোগ -ক্রিয়াযোগ- রাজযোগ - সাম্রাজ্যযোগ-সহজযোগ সাধনার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে কাপালিক সাধনা বলা হয়েছে। কারণ তা কপাল বা মাথা বা মেধার যোগসাধনা। যোগিনীক্রম নাথপন্থের প্রকৃতিক্রম-উমানাথ, জয়ন্তীনাথ, ভানুমতী, লীলাবতী প্রমুখ যোগিনীক্রম। ৮৪ নাথসিদ্ধদের অধিকাংশই যুগল শিবস্বরূপ।^{১২৯}

পূর্ব ভারতের অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) এবং উত্তরবঙ্গে তিননাথের গান ও ত্রিনাথের মেলা এখনও জীবিত ও প্রবহমান। কিন্তু উত্তরবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিননাথের গান ও ত্রিনাথের মেলা প্রচলিত থাকলেও পূর্ববঙ্গ(বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে নাথসম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তা প্রচলিত আছে। অথচ ‘তিননাথের পাঁচালি’ অঞ্চল বিশেষে নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে পূর্বভারতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। মূলত অমঙ্গল দূর করতে তিননাথ বা ত্রিনাথের জন্ম হয়। অমঙ্গল থেকে অনুরূপ সাহিত্যের জন্মকথা আরও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। পরমেশ্বরই বিশ্বাত্মা, বিশ্ব তাঁরই আশ্রিত। তিনি প্রীত হলেই সংসার প্রীত হয়। এখানে তিননাথ মানবগুরু হয়েও দেবগুরু বা পরমেশ্বর হয়ে উঠেছেন। অতএব তাঁদের সন্তুষ্ট করলে এবং তাঁদের আরাধনাতে সকল জীবের মঙ্গল হয়। তাঁদের পূজোর প্রধান উপকরণ হল যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং ভক্তি। তারফলে এই অপূর্ব ধর্মসাহিত্য

ও সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে। গানগুলি সর্বসাধারণের কাছে উপভোগ্য। এগুলির প্রতি ভদ্রলোকের দৃষ্টি ছিল না। যোগীর গানের মত তিননাথের গানও খুবই জনপ্রিয়। প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে তিননাথের গান ও ত্রিনাথের মেলা সকল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছে। এর অন্তরে যে গভীর অধ্যাত্মরস আছে, হৃদয়-মন-প্রাণে ভক্তরা তার সন্ধান করেন।

তথ্যসূত্র

১. অমলেন্দু ভট্টাচার্য, *নাথদর্শনের ঐতিহ্য বরাক উপত্যকার জনপ্রিয় দেবতা ত্রিনাথ বা তিন্মাথ*, স্মরণিকা, আদিনাথ শিক্ষাভাণ্ডার, পৃ. ৭।
২. ধরনীধর নাথ, *আঙ্গুলের ধর্মধারা লোকদেবতা জনযাত্রা ও পূজাপার্বণ*, পৃ. ৭৪৫-৭৪৭।
৩. জীবন নাথ, *নাথযোগের প্রাচীন ঐতিহ্য*, স্মরণিকা, আদিনাথ শিক্ষাভাণ্ডার, পৃ. ৫-৬।
৪. Kalyani Mallik, *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*, p. 45.
৫. ভরদ্বাজ সংহিতা; ভোলানাথ নাথ, *ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয় পরিচয়*, পৃ. ১৫৫।
৬. বারিদবরণ ঘোষ, *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*, পৃ. ৩৪।
৭. সাত্তারাম যোগী রচিত *হঠযোগ প্রদীপিকা*, শ্লোক ১।
৮. রাজমোহন নাথ, *বারপন্থ; বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি*, পৃ. ২৩৩।
৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৩।
১০. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ২৩৩।
১১. *রাজগুরু যোগিবংশ*, পৃ. ১৪৪।
১২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪, পৃ. ২।
১৩. অমলেন্দু ভট্টাচার্য, *নাথদর্শনের ঐতিহ্য বরাক উপত্যকার জনপ্রিয় দেবতা ত্রিনাথ বা তিন্মাথ*, পৃ. ৭।
১৪. অথর্ববেদ, ২য় কাণ্ড, ১ম অনুবাক, ১ম সূত্র. ২।
১৫. ঐ, ১ম সূত্র. ১।
১৬. Radhakrishna Choudhary, *Vratyas in Ancient India*, p. 35.
১৭. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol. II, p. 353.
১৮. জীবন নাথ, *ত্রিনাথের মেলা*, পৃ. ভূমিকা এঃ।
১৯. Tarapada Bhattacharya, *The Cult of Brahma*, p. 35-42.
২০. কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সুকুমার সেন (সম্পা.), আদিখণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২।
২১. ঐ, অন্ত্যখণ্ড, বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫১২।
২২. শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, *শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালী*, পৃ. ৬।

২৩. শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী, *শ্রীশ্রীভক্তমাল*, পৃ. ১৫৭।
২৪. *শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালী*, পৃ. ১১।
২৫. *ঐ*, পৃ. ১১।
২৬. শশিভূষণ হোমচৌধুরী, *ত্রিনাথের পাঁচালী*, পৃ. ২-৩।
২৭. *ঐ*, পৃ. ৩।
২৮. *শূন্যপুরাণ*, শ্লোক ১০৬-১০৮।
২৯. *গুপ্তচন্দ্রের সন্ন্যাস*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), পৃ. ২৭০।
৩০. *শূন্যপুরাণ*, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), পৃ. ৩৩।
৩১. ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১২২।
৩২. যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ*, পৃ. ৩৬।
৩৩. ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১১৩।
৩৪. বেণীমাধব বড়ুয়া, *বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্মস্থল প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি*, পৃ. ২৭-২৯।
৩৫. গোপীমোহন সিংহরায়, *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা*, পৃ. ৮২।
৩৬. *নাথদর্শনের ঐতিহ্য বরাক উপত্যকার জনপ্রিয় দেবতা ত্রিনাথ বা তিন্মাথ*, পৃ. ১১।
৩৭. *ঐ*, পৃ. ৯-১০।
৩৮. কল্যাণী মল্লিক, *নাথপন্থ*, পৃ. ২৬-২৭।
৩৯. রাজমোহন নাথ, *নাথযোগীতত্ত্ব*, পৃ. ২৬।
৪০. *নাথদর্শনের ঐতিহ্য বরাক উপত্যকার জনপ্রিয় দেবতা ত্রিনাথ বা তিন্মাথ*, পৃ. ১০-১১।
৪১. Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, p. 201.
৪২. *গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ*, পৃ. ১।
৪৩. *নাথসিদ্ধবাণী*, শ্লোক ৩৪-৩৫।
৪৪. *জ্ঞানদীপ বোধ*, শ্লোক ১-২, *গোরখবাণী*, পীতাম্বর দত্ত বড়ুয়াল (সম্পা.), পৃ. ২৪৬।
৪৫. *ত্রিনাথের মেলা*, পৃ. ভূমিকা দ।
৪৬. G. W. Briggs, *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, pp.74-75.
৪৭. *ত্রিনাথের মেলা*, পৃ. ৮-৭।
৪৮. *রাজগুরু যোগিবংশ*, পৃ. ১৪৫।
৪৯. *ঐ*, পৃ. ১৪৫।

৫০. ঐ, পৃ. ১৪৬।
৫১. সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণধন নাথ, আগরতলা, ত্রিপুরা।
৫২. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫২।
৫৩. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।
৫৪. চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী, ত্রিনাথের উপাখ্যান, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮, পৃ. ২৫।
৫৫. রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), পৃ. ১৩৩।
৫৬. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪৬৭ পাদটীকা।
৫৭. চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী, পৃ. ২৬।
৫৮. কামিনীকুমার রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৫২, পৃ. ৩৬।
৫৯. ঐ, পৃ. ২২৯।
৬০. আনন্দ রায়, ফরিদপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
৬১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃ. ৩৭২।
৬২. ঐ, পৃ. ৩৭৩।
৬৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০।
৬৪. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, নাথধর্ম ও সাহিত্য, পৃ. ১১৫।
৬৫. ঐ, পৃ. ১১৬।
৬৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৬৭. ঐ, পৃ. ১৯৭।
৬৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য (সম্পা.), পৃ. ৩৬০।
৬৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১১৫-১১৬।
৭০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৩-৫১৪।
৭১. ঐ, পৃ. ৫১৪।
৭২. ঐ, পৃ. ৫১৪।
৭৩. ঐ, পৃ. ৫১৪।
৭৪. ঐ, পৃ. ৫১৪-৫১৫।

৭৫. ত্রিনাথের মেলা, পৃ. ১৬-১৮।
৭৬. কল্যাণী মল্লিক, নাথপন্থ, পৃ. ১৪-১৫।
৭৭. ত্রিনাথের মেলা, পৃ. ১৮-১৯।
৭৮. ঐ, পৃ. ১৯-২০।
৭৯. প্রভাষচন্দ্র নাথ, বরাক উপত্যকায় লোকছড়া, আকাদেমি পত্রিকা, তুষারকান্তি নাথ (সম্পা.), ২০১১-২০১২।
৮০. জীবন নাথ, তিননাথের পাঁচালি, পৃ. ৭।
৮১. অশ্বিনীনাথ যোগী, যোগের পথে নাদ, পৃ. ১-৩।
৮২. ঐ, পৃ. ১৭-১৮।
৮৩. তিননাথের পাঁচালি, পৃ. ৭-১০।
৮৪. অথর্ববেদ ২/১-২।
৮৫. রাজমোহন নাথ, উপনিষদে সাধনরহস্য, পৃ. ১৪।
৮৬. নিত্যানাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ, শাবরচিত্তামণিঃ, পৃ. ৩।
৮৭. সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, শ্লোক ৬/৯৬।
৮৮. মহেশ্বরনাথ, চন্দ্রাবলোকনম্, ভোলানাথ নাথ, ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয়, পৃ. ১৫৩।
৮৯. মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, ৩য় পটল, শ্লোক ২৬-২৭।
৯০. তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ১৯।
৯১. ঐ, পৃ. ১০-১১।
৯২. গোখবিজয়, পৃ. ৫৮।
৯৩. তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ১৮।
৯৪. Csaba Kiss, The Yoga of the Matsyendra-Samhita, 8th Patala, Sloka 26.
৯৫. সুকুমার সেন, নাথপন্থের প্রাচীন ঐতিহ্য, গোখবিজয়, পৃ. ৭৭।
৯৬. তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ১৬।
৯৭. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, শ্রীমৎ পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও উপদেশাবলী, পৃ. ৩৪-৩৫।
৯৮. তিননাথের পাঁচালী, পৃ. ১০।

৯৯. শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ যোগী, *যোগবিদ*, পৃ. ২৪।
১০০. *কঠোপনিষদ*, ২/৩/১১।
১০১. পরশুরাম চতুর্বেদী, *উত্তরভারতের সত্ত পরম্পরা*, পৃ. ৫৬-৫৭।
১০২. ঋগ্বেদ ৮/৫৮/২।
১০৩. *সিদ্ধসাধক গাথা ও যোগাশ্রম কথা*, প্রভাষচন্দ্র নাথ (সম্পা.), পৃ. ৪২।
১০৪. *তিননাথের পাঁচালী*, পৃ. ৮।
১০৫. ঐ, পৃ. ৯।
১০৬. ঐ, পৃ. ১৬।
১০৭. ঐ, পৃ. ১৭।
১০৮. *চর্যাগীতিকোষ*, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী (সম্পা.), পৃ. XXII.
১০৯. *তিননাথের পাঁচালী*, পৃ. ১০।
১১০. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *নাথ অউর সত্ত সাহিত্য: তুলনাত্মক অধ্যয়ন*, পৃ. ৬০৭।
১১১. ঐ, পৃ. ৬১২-৬১৩।
১১২. *তিননাথের পাঁচালী*, পৃ. ৭।
১১৩. *গোরখবাণী শব্দী*, শ্লোক. ১১।
১১৪. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, *নাথ সম্প্রদায়*, পৃ. ২৭-২৮।
১১৫. *তিননাথের পাঁচালী*, পৃ. ১১।
১১৬. ঐ, পৃ. ১০।
১১৭. ঐ, পৃ. ২০।
১১৮. ঐ, পৃ. ১০।
১১৯. ঐ, পৃ. ১৭।
১২০. ঐ, পৃ. ১৭।
১২১. রঞ্জিত দেব, *উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে ব্রত ও পূজা উৎসব কথা*, পৃ. ৬০।
১২২. Kamal Biswas, *The Yogi Caste of Bengal: History and Evolution (1872-2011)*, pp. 226-227.
১২৩. Ibid, p.234.
১২৪. মানচিত্র পাল, *লোকদেবতা ত্রিনাথ*, পৃ. ৫০-৯১।

১২৫. অমলেন্দু ভট্টাচার্য; মানচিত্র পাল, *লোকদেবতা ত্রিনাথ*, পৃ. মুখবন্ধ।
১২৬. *গোপীচন্দ্রের গান*, রাজমোহন নাথ (সম্পা.), পৃ. ১৭।
১২৭. মহেশ্বরানন্দ নাথের *মহার্থমঞ্জরী*, ব্রজবল্লভ দ্বিবেদী (সম্পা.), পৃ. ৩।
১২৮. নগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, *গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায়কে পরিপ্রেক্ষে মের্*, পৃ. ৭৯।
১২৯. সাক্ষাৎকার, কুলাবধূত সৎপুরানন্দনাথ যোগী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে নাথপন্থ ও নাথসংস্কৃতির পরিচয় উদ্ভূত হতে থাকে। তবে নাথধর্মকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের আধুনিক ভাষ্য রচনায় লক্ষ্য। এইভাবে প্রাচীন-মধ্যযুগে নয়, এমনকি আধুনিক যুগে এসেও নাথপন্থকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্য ধরা পড়ল। নাথপন্থকে কেন্দ্র করে এই সময়েও সাহিত্যের নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ চলছে। আহমেদ মাওলার ‘ময়নামতী উপাখ্যান’, মোহিত কামালের ‘লুইপা’র কালসাপ’, শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, রিয়া মুখার্জীর ‘অঘোরী মা ষোড়শীনাথ’, দেবনাথ বকসীর ‘অঘোরীর আনন্দকানন’, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’, কালিকানন্দ অবধূতের ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’, মিরাজুল ইসলামের ‘মুঘল গীবত’, ব্রজেন মজুমদারের ‘সন্ধ্যা দীপের শিখা’, কৃষ্ণ দেবনাথের ‘রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ’, প্রেমময়ী পার্বতী’ প্রভৃতি উপন্যাস ও সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ প্রভৃতি ছোটগল্প এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পূর্ণচন্দ্র’ ইত্যাদি নাটকে নাথপন্থের যোগধর্ম, সাধনপ্রণালী, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

১. ময়নামতী উপাখ্যান: আহমেদ মাওলা

আহমেদ মাওলা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। শৈলীবিজ্ঞান তাঁর বিশেষ বিষয়। ফলে সাহিত্যের নির্মিতিতে স্বতন্ত্র ভাবনা থাকবে অনুমান করা যায়। বাস্তবে দেখা গেল একটি স্বতন্ত্র ভাবনা আছে। উপন্যাসে লেখক বলছেন— “এটা ইতিহাস গ্রন্থ নয়, উপন্যাস।”

এটা লেখকের বিনয়মাত্র। ইতিহাস গ্রন্থ না হত, শুধু উপন্যাসই হত তাহলে কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে তথ্য পেয়েছেন, এই উপন্যাসের প্লট-সাবপ্লট নির্মাণ করেছেন; কনটেক্সট-কো-কনটেক্সট উল্লেখ করেছেন, সেটা তিনি উল্লেখ করতেন না। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখছি তিনি বলছেন নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব’, দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বৃহৎবঙ্গ’, ভবানী দাসের ‘ময়নামতীর গান’, কৈলাসচন্দ্র সিংয়ের ‘রাজমালা’, আবুল কাশেমের ‘কুমিল্লার ইতিহাস’, সাইমন জাকারিয়ার ‘ময়নামতীর জ্ঞান’ এই জায়গা থেকে তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যে তথ্য পেয়েছেন সেই তথ্যকে তিনি একজন সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে, বিশ্লেষক হিসেবে একটা প্লটের মধ্যে সুবিন্যস্ত করেছেন। এই সুবিন্যস্ত করার কৌশলে তিনি কোথাও ফ্ল্যাশ-ব্যাককে গ্রহণ করেছেন, কোথাও মনোবিচরণ করেছেন। তারফলে একটা অদ্ভুত প্লট নির্মিত হয়েছে। এটা উপন্যাস, এই উপন্যাসে কী আছে? যদি উপন্যাসে কী আছে দেখি তবে মূলত বোঝা যাবে ময়নামতী একজন নারী ও তাঁর জীবন কথা। তবে তার জীবনকথা বলতে গিয়ে তৎকাল অর্থাৎ ময়নামতীর সমকালের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, সাধনপদ্ধতি সবকিছুই এসেছে। অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক এই উপন্যাসের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। লেখক আসলে ইতিহাস নির্মাণ করতে চাইছেন কতকগুলি ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশনের মধ্য দিয়ে। ময়নামতীর কালের একটা সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসের মধ্যে। আমরা এই উপন্যাসের গল্পটা তো জানি। সেই গল্পের মধ্যে লেখক কি কি খুঁজে পেতে চাইছেন? তিনি খুঁজে পেতে চাইছেন এই সময়ের অর্থাৎ ময়নামতীর কালের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান এবং নানারকম জ্ঞানের যে কাণ্ড এই সময়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, বিরাজ করেছে তার একটা তথ্যনিষ্ঠ অন্বেষণ এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা দেখি।

এবার আমাদের যে আলোচ্য গবেষণার জায়গা, সেটা হল এর মধ্যে কোথায় আছে নাথপন্থা, নাথধর্ম, নাথদর্শন, তাদের সংস্কৃতি তার ইঙ্গিতটি আমরা এই উপন্যাস থেকে পেতে চাই—

নাথপন্থের যোগিনী সিদ্ধ ময়নামতীর জীবন, সাধনা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। মূলত সমতটে অবস্থিত কমলাঙ্ক বা কুমিল্লার রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজমাতা যোগিনী ময়নামতীর কাহিনি উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে এসেছে। উপন্যাসের প্রথম প্লটে নাথপন্থের কাহিনি না থাকলেও পরবর্তী প্লটে রাজা মাণিকচন্দ্র, রাজমাতা ময়নামতী এবং রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবন প্রসঙ্গে নাথপন্থ স্থান পেয়েছে। রাজা মাণিকচন্দ্রও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খোঁজ-খবর রাখতেন। হরিকেল রাজ্যের অদূরে প্রাচীন ‘কদলীপত্তন’ দেশ অবস্থিত। নাথসাহিত্যের কদলীরাজ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মীননাথ যোগিনীকৌল সাধনার কারণে নারীরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। যোগিনীকৌল সাধনায় যুগলসাধনা স্বীকৃত রয়েছে। ঔপন্যাসিক কদলীরাজ্যের বর্ণনায় বাংলাভাষায় রচিত নাথসাহিত্যের ‘মীনচেতন’ ও ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যকেই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তিনি লোকপ্রচলিত কিংবদন্তি অবলম্বন করলেও অনেক নৈতিহাসিক ঘটনা ও প্রসঙ্গের আমদানি করেছেন। তারফলে ইতিহাস, কিংবদন্তির সঙ্গে সাহিত্যরসের সমাবেশ ঘটেছে।

অন্যদিকে রাজা মাণিকচন্দ্রের তৃতীয় বিয়ের আসরে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধভিক্ষুকদের সঙ্গে নাথযোগীরাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন। মনের দুঃখে রাণী ময়নামতী ফেরুসানগরে নির্বাসনে চলে গিয়েছেন। হঠাৎ রাজা মাণিকচন্দ্রের অসুস্থতার খবরে ময়নামতীকে রাজবাড়িতে ফিরে আসতে হল। রাজার আয়ু বেশিদিন থাকবে না শুনে রাণী ময়নামতী তাঁকে নাথধর্মের মহাজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) শিখে নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে নারীর

কাছে, বিশেষত স্ত্রীর কাছে মহাজ্ঞান শিখতে রাজা মাণিকচন্দ্র রাজি হলেন না। এ তো পুরুষের পরাজয়! রাজা মহাজ্ঞান লাভের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন—

নিজের স্ত্রীকে গুরু বলে স্বীকার করে জ্ঞান শিখবো? –প্রাণ থাকতে

নয়। - পৃ.১৭

নাথদেবের মধ্যে অনেকেই ভেষজ ও রসায়নবিদ্যায় কৃতবিদ্য রয়েছেন। রাজা মাণিকচন্দ্রের রাজবৈদ্য সুবীরনাথ তেমনি একজন ব্যক্তি। তিনি সমস্ত চেষ্টা করেও রাজার প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না। রাজা মাণিকচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে উঠছেন। তখন তিনি ক্ষীণকণ্ঠে স্ত্রী ময়নামতীকে বললেন—

ময়নামতী তুমি নিজে মেঘনা নদী থেকে একঘড়া জল নিয়ে আসো।

তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি। এ আমার অন্তিম ইচ্ছা। পৃ.১৭-১৮

ময়নামতী জল আনতে মেঘনা নদীর পথে যাত্রা করলেন। এখান থেকে কাহিনি নাথসাহিত্য থেকে পৃথক পথে হাঁটা শুরু করেছে। ময়নামতীর যোগলৌকিক ক্ষমতা এখানে প্রাধান্য লাভ করেনি। বরং ময়নামতী রক্তমাংসের মানুষের চরিত্রে পরিণত হয়েছেন উপন্যাসের স্বাভাবিক নিয়মে।

শেষে রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুতে কমলাঙ্ক নগরে শোকের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। রাণী ময়নামতী শোকে ভেঙে পড়েছেন। এই বিষাদঘন পরিবেশে নাথসংস্কৃতির প্রসঙ্গ উপন্যাসে আসছে—

মন্দিরে নাথযোগীরা আচারব্রতে নিমগ্ন। - পৃ.২০

শোকাক্ত পরিবারকে আশ্বস্ত করতে হাড়িসিদ্ধ জালন্ধরনাথের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর সাজপোষাকে নাথসন্ন্যাসীর পরিচিত বেশভূষা—

হাড়িসিদ্ধা তার উত্তোলিত হাতে একটা ধূসর রঙের হাড় ধারণ করে
আছে। হাড়িসিদ্ধকে সবাই চেনে, শালবন বিহারের ধর্মগুরু। গায়ে
সন্ন্যাসী পোষাক, দাড়িগোঁফে কখনো ক্ষুর লাগায় নি, পেছনে লম্বাচুল
বেণী করে বাঁধা। কথাগুলি যেন বেদবাক্য।—পৃ.২২

গোপীচন্দ্রের আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে। এখন তাঁকে রাজ্যপাট ত্যাগ করে বারো
বছরের জন্য সন্ন্যাসব্রত পালন করতে হবে। তা না হলে মৃত্যু অনিবার্য— এই প্রসঙ্গেও
নাথসাহিত্যকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁকে নাথগুরু দীক্ষা দেবেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র
সন্ন্যাস নিতে অস্বীকার করলে ময়নামতী পুত্রকে হাড়িসিদ্ধ জালন্ধরনাথের যোগলৌকিক
ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে নাথসাহিত্যের প্রচলিত কাহিনির
বিপরীতে পদুনা স্বামী গোপীচন্দ্রের সঙ্গে এখানে স্বামীগতপ্রাণা মানসিকতার পরিচয় দিয়ে
তার অনুগামী হতে চেয়েছেন। কোনো প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের রাস্তায় তিনি হাঁটেন নি—

প্রাণনাথ, তুমি যদি যোগী হও আমি হবো যোগিনী।

ভিক্ষা অল্পে দু'জন কাটাবো দিবস রজনী।—পৃ.৩৩

‘মহাজ্ঞান’ লাভ প্রসঙ্গে রাজা গোপীচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় নাথসাহিত্যের ‘ময়নামতীর গান’ ও
‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে। মহাজ্ঞানের পরীক্ষার পর ময়নামতীর পুত্র
গোপীচন্দ্র হাড়িসিদ্ধাকে গুরু স্বীকার করে সন্ন্যাসব্রতে যাত্রা করেছেন। গোপীচন্দ্র গৃহত্যাগ
করে ‘মহাজ্ঞান’ তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করলেন। ঔপন্যাসিক
সেইপ্রসঙ্গে নাথপন্থের সাধনধারা উল্লেখ করছেন—

নাথযোগীদের প্রধান আগুবাণ্য ‘কায়াসাধ’। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শাসন কর,
ইন্দ্রিয় শাসনের মাধ্যমে মোহ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। দেহের
পঞ্চইন্দ্রিয় তপ-জপ-কর্মের মাধ্যমে সাধন-পাতন করতে হয়।
সংসারযাত্রার অনিত্য, অনিবার্য সঙ্গী নারী, নাথযোগীরা নারীকে
‘চেতনগুরু’র মর্যাদা দিয়ে থাকেন। দেহতত্ত্বে পঞ্চইন্দ্রিয়ের
‘কায়াসাধ’ তাই নাথধর্মের প্রধান ভিত্তি।—পৃ.৪২

ঔপন্যাসিক মীননাথ তথা মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের কথা বর্ণনাতে ‘মীনচেতন’ ও ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যের সাহায্য নিয়েছেন—

শিবপার্বতী যেখানে বসে মহাজ্ঞানের কথা বলছিলেন, সেখানে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির নিচে মীননাথ বসে তপস্যা করছিলেন, মীননাথ তপস্যারত অবস্থায় শিবের মহাজ্ঞানের তত্ত্ব শুনে ফেলেন। ‘মহাজ্ঞান’ সাধনা করে নিজেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠেন। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিলেন মহাজ্ঞান। নতুন ধর্ম প্রবর্তন করলেন, এ ধর্মের নাম হয় ‘নাথধর্ম’। মীননাথকে কোথাও কোথাও মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। মীননাথ কয়েক বছরের মধ্যে শিবের এই জ্ঞান হাড়িপা, কানুপা, গোরক্ষনাথ প্রমুখ শিষ্যদের শিখিয়ে দেন।

—পৃ.৪৯

দুর্গা তথা মহামায়া কর্তৃক নাথসিদ্ধদের চারিত্রিক মহিমা প্রকাশের পরীক্ষাও অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। একমাত্র গোরক্ষনাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেবী দুর্গাকে তিরস্কার করেছেন। তারফলে দেবতা নয় মানুষ গোরক্ষনাথ নাথসাহিত্যের মত এই উপন্যাসেও প্রাধান্য লাভ করেছেন—

তুমি মা দুর্গা। তোমাকে আমি চিনি। মা হয়ে ছেলেকে ছলনার জালে বন্দি করার এ কোন ফাঁদ পেতেছ তুমি? ছিঃ। -পৃ. ৫১

‘গোরক্ষবিজয়’-র কাহিনি উপন্যাসের প্লটে বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে উপন্যাসটি এক অনুপম ভাষ্য হয়ে উঠেছে—

কায়াসাধন, শরীরের ইন্দ্রিয়দমন, অরণ্যপ্রকৃতির ছায়াঘন শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ, প্রকৃতির উদার আর বিস্তৃত পাঠশালা থেকেই তারা দীক্ষা নিয়েছিলেন, যে জ্ঞান ছিল মৌলিক, দর্শন নির্ভর। কোনো ধার করা বিদ্যা নয়। শূন্যতত্ত্ব অর্থাৎ জন্মের আগে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না, আবার মৃত্যুর পরও মানুষ অস্তিত্বহীন। -পৃ. ৫৯

মাঝখানে লেখক নায়কের আত্মজিজ্ঞাসায় বৌদ্ধস্থাপত্য নগরী শালবন বিহার ও দুই-আড়াই হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির কালে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন।

২. লুইপার কালসাপ: মোহিত কামাল

মোহিত কামালের ‘লুইপার কালসাপ’(২০১৯) উপন্যাসে স্বাতী ও ময়ূরী চরিত্রের কথনে চর্যাপদের গীতিকার সিদ্ধদের ভাবভাবনা ও কাহিনি বিষয়বস্তু হিসেবে উপন্যাসে উঠে এসেছে। ১৬টি পর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসে প্রতিটি অধ্যায়ে চর্যাপদের কাহিনি, সহজসাধনা, শ্রেণিহীন সমাজ, ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনাচার স্থান লাভ করেছে। উপন্যাসটি চর্যাপদের সময়ে বাঙালির যাপিত জীবন ও সংস্কৃতির অনুপম রূপালেখ্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক লুইপাকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বললেও তিনি বাস্তবে নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ। চর্যাপদের গানে নাথসিদ্ধ ও বৌদ্ধসিদ্ধদের গান সমান্তরালভাবে সাঙ্গীতিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। লেখকের অসচেতন মনের ভাবনায় নাথপন্থের বিভিন্ন অনুষ্ণ উপন্যাসে এসে পড়েছে।

প্রধান চরিত্র স্বাতীর মনোবীণার আত্মকথনে লুইপার অস্তিত্ব, তত্ত্বকথা, সাধনধারা জীবন্ত রূপ লাভ করে। চর্যাপদের সময় ভেদ করে একালের জীবনবোধ, জীবনাচরণ ও মূল্যবোধকে লেখক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে স্বাতীর কখনশৈলীতে লুইপার চিত্তচাঞ্চল্য জনিত কারণে মনে কালসাপ প্রবেশ করার ঘটনা ঘটে। পঞ্চপ্রাণ-পঞ্চইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভব অন্তরাত্মাকে সুখী ও স্থির হতে বাধা সৃষ্টি করে। সেইপ্রসঙ্গে নাথপন্থের যোগসাধনার কথায় মনে হয়েছে—

যোগসাধনার পথ বেছে নিতে হবে, বললেন লুইপা। তো
যোগসাধনার সঙ্গে আমাদের এ জমানার মেডিটেশনের পার্থক্য কী?
পার্থক্য নেই, সেযুগ আর এযুগ তো একই কথা বলছে।-পৃ.৩১

অর্থাৎ মূলকথাটা হল মানুষ সুখের চাহিদা ও প্রত্যাশায় অসুখী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কুম্ভক যোগের সাহায্যে চিত্তকে সমাধিস্তরে নিয়ে যেতে পারলে সহজ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। কুম্ভকযোগে শ্বাসবায়ু স্থির হলে সাধক বা সিদ্ধ পরিশুদ্ধ নাড়িকে জাগ্রত করে সমাধিস্তরে যেতে পারেন। এটাই সহজ-সমাধি। লুইপা এই সহজ সাধনার কথা বলে স্বাতীকে কৌতূহলী করে তোলেন। স্বাতীও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হয়—

মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাব তোমার সময়কালে। চ্যালেঞ্জ
তোমাকে। যুগের অজেয় স্রোতে ভেসে আমিও ধরে ফেলব
তোমাকে।-পৃ.৩৮

স্বাতী লুইপার যোগলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে তার জগতে প্রবেশ করে ময়ূরীর সঙ্গে পরিচিত হয়। ঔপন্যাসিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে গণধর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিলেন স্বাতীর সঙ্গে। এদের অনেকে কাপালিক ও তান্ত্রিক। নাথসিদ্ধ জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথ বা কারুপার সাধনপন্থা অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের মানুষ। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা চর্যার নারীদের মধ্যে লক্ষণীয়। খোঁপায় ময়ূরপালক, গলায় গুঞ্জফুলের মালা, কোমরে মেখলা, পায়ে নূপুর, হাতে কেয়ূর, গালে-মুখে চন্দন চর্চিত হয়ে সে অপরূপ হয়ে উঠেছে। নিজের দেহকে সে মন্দিরই মনে করে। অতএব মন্দিররূপী দেহকে ভয় কেন—

এ সাজ ব্রাহ্মণ নেকড়ের জন্য নয়। মনের রাউত, কল্পনার রাজপুত্রের
জন্য। কৃষ্ণপা, বাস্তবের কানু কাপালির জন্য।-পৃ.৫৮

এটা ময়ূরীর জীবন। জীবনকে উপভোগের জন্যই এই দেহসৌন্দর্য্য। স্বাতীও ময়ূরীর সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হয়ে পারে না—

মায়াঘাতিনী ময়ূরী। তোকে ছাড়া কীভাবে বাঁচি? তুই লো ডোম্বী,
আমি কানু। তোর জন্য হাড়ের মালা পরেছি গলায়। -পৃ.৬৫

সাধারণত কানুপার মত নাথসিদ্ধরা জাগতিক মায়ায় আচ্ছন্ন হন না। অথচ তার মধ্যেও আত্মা প্রবেশ করলো। সংসার ত্যাগের ইচ্ছায় ময়ূরীর ঘরে প্রবেশ না করে তিনি ভবের জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

ময়ূরী ও স্বাতী চর্যাপদের ইতিহাস মন্থন করে সমকালীন ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আধুনিক যান্ত্রিকতার অনুষ্ণ থেকে চর্যাপদের জগতে তারা অবাধে পদচারণা করলেন। সেই কারণে লেখকের ভাবনায় লুইপা বলে উঠছেন—

আমাদের সিদ্ধাচার্যগণ তোমার ময়ূরী আপার মতো জীবনের মূল
নির্যাস, যৌনতা আর প্রেরণাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা
ভোগবাদী ইন্দ্রিয়কে বিলোপ করতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের মূলাধার
চিত্রকে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু সুখের যে চেতনা, আনন্দের
যে চেতনা মানুষের জীবনে সদা জেগে থাকে, তাকে বিনষ্ট করতে
চান নি। -পৃ.৮৪

তারফলে স্বাতী ভাবজগতে পরিবর্তন সাধন করে চর্যাপদের জগতে ফিরে গেলেন। কানুপা সেখান থেকে পালাতে বললেও স্বাতী একচিলতে জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। সে দৃষ্টকণ্ঠে ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষাকে স্বাধীন করতে যুদ্ধঘোষণা করতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লুইপা তাকে শান্ত করতে বলেন যে বাংলার আদি-অধিবাসীদের ধর্ম আর্যধর্মই ছিল। তখন শিবপূজা, সূর্যপূজার সঙ্গে আর্যদেবদেবীদের চলও শুরু হয়। তবু তারা মর্যাদা রক্ষা করতে ছুটে চলেন সামনের দিকে, কালসাপও তাদের পিছু নেয়। শেষে রৌদ্র চৌধুরীকে ময়ূরী যে অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেছে তাতেও দেহকেন্দ্রিক সাধনার মাধ্যমে দেহমুক্ত হওয়ার নাথপন্থের অজরামরামুক্তি সাধনার দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য ঘটেছে—

তো। যোগসাধক হোন। মোহমুক্তি ঘটে যাবে। স্বাতীকে জিজ্ঞেস
করুন। ও বলে দেবে কীভাবে পার্থিব মোহ ছিড়ে বিলীন হওয়া যায়
অসীম শূন্যতার মধ্যে। -পৃ.১১৪

সেসময় নিরাসক্ত যোগিনীর উপরও নিপীড়ন চলত, রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মানুষেরা এইসব অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরাই তো আসলে কালসাপ। তাই লুইপা স্বাতীকে জিজ্ঞাসা করছেন—

কী, স্বাতী; কালসাপ কী, বুঝতে পারছ? -পৃ.১২৭

স্বাতীও শেষবারের মত চোখ খুলে সামাজিক নিপীড়নের প্রমাণ রেখে গেলেন— কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিবাদে নয়, ডোমনীর প্রবল মর্মস্তদ আত-চিৎকারে।

সিদ্ধান্ত:

ক) লেখক মনোবিশ্লেষক হিসেবে স্বাতীকে হাজার বছর আগে ধ্যানের মাধ্যমে চর্যাপদের সময়ে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তিনি কাহু, লুই এঁদের চিত্তসাধনার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছেন ডোম্বীর মনোলোকে, মহাবোধিচক্রে। স্বাতীর চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রসাধনার গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব এবং নাথপন্থের কায়াসাধনা। সাধনপ্রণালী, নিঃস্বভাবিকীকরণ ও চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে কীভাবে মোক্ষদায়িনী, নির্বাণের দেবী নৈরামণির সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব তার স্বরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে মনোবিদ লেখকের শৈল্পিক প্লট নির্মাণে। পাশাপাশি নাথসিদ্ধ লুইপা বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, কাহু বা কানুপানাথের দর্শনও সক্রিয় রয়েছে।

খ) মেডিটেশনের মাধ্যমে একালের স্বাতীর সঙ্গে চর্যাপদের সময়ের লুই, কাহু ও ডোম্বীর সাক্ষাতে বাজ্রায় হয়ে উঠেছে বৌদ্ধ ধর্মদর্শন-নাথদর্শনের স্বরূপ। প্লানচেটের মাধ্যমে হরপ্রসাদ ও শহীদুল্লাহের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রকাশ পেয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টির আনন্দময় অভিব্যক্তি। আর আবিষ্কারক ও বিশ্লেষক হরপ্রসাদ, শহীদুল্লাহের আবেগঘন ভালোলাগার মুহূর্ত।

গ) প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের প্রকারান্তরে কোনো পার্থক্য নেই। এটা ঔপন্যাসিক বলতে চাইলেন-শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের চিত্র সবকালে, সবসময়ে একই।

৩. প্রদোষে প্রাকৃতজন: শওকত আলী

‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ (২০১৮) শওকত আলীর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয় তুর্কি আক্রমণের পূর্ববর্তী সময়ে সেনরাজাদের অত্যাচার, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান, অত্যাচারিত-নিপীড়িত নাথযোগী ও সদ্ধর্মীদের আত্মরক্ষার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালকে নিবিড়ভাবে উপস্থাপন করেছে। তুর্কি আক্রমণের আসন্ন সময়কে প্রদোষ এবং তখনকার বাংলার বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাথপন্থীদের সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতজন বলা হয়েছে। ইতিহাসে তাদের নাম নেই, হয়ত তারা অন্য নামে বেঁচে আছেন। উপন্যাসের চরিত্র জনৈক নাথপন্থী মঠবাসী বসন্তদাসকে বলছেন—

বড়ো অনিশ্চিত আমাদের বর্তমান, আজো সামন্তপতির দুই অনুচর
এসেছিলেন মন্দিরে।....ওরা সদ্ধর্মীদের চায়, নাথযোগীদের চায়,
সূর্যোপাসকদের চায়—প্রত্যেকেই তাদের সন্দেহ।-পৃ.১০৬

সেনরাজাদের শাসনের শেষপর্বে বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। গণধর্মের বিপরীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিয়ন্ত্রক ধর্মে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। সাধারণ মানুষ এই সময়ে দিশাহীনভাবে চলতে থাকেন। সেনরাজারা বাধ্য হয়েছেন ক্ষমতারক্ষার কারণে এতদিন ধরে যে সমস্ত সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন করেছেন তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে রাজতন্ত্রের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে।

‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসটি ২৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়ে একটি অখণ্ড কাহিনি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায়ে প্রদোষে প্রাকৃতজনের

চিত্র বাঙ্কায় করে তোলা হয়েছে। একাদশ থেকে ষড়বিংশ অধ্যায়ে ইতিহাসের বিপর্যয়কালীন চিত্র এবং ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র ধরা পড়েছে—

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কে আলাদা করে বলা যাচ্ছে না। তবে একাধিক চরিত্র প্রধান চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে—শ্যামাঙ্গ, লীলাবতী, মায়াবতী, বসন্তদাস, মিত্রানন্দ প্রমুখ। এরা সকলে বাংলার প্রদোষকালের প্রতিনিধিত্ব করছে। বৌদ্ধ আধিপত্য শেষ হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেনরাজারা নিপীড়ন করছে সাধারণ বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাথধর্মাবলম্বীদের। তারা চতুর্বর্ণ ধর্মের আশ্রয়ে যেতে রাজি নন। তারা স্বতন্ত্র পরিচয়ে বাঁচতে চান।

খ) উপন্যাসের পাতায় পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে অত্যাচারিত, আশ্রয়প্রার্থী বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী ও নাথদের কথা। তারা আত্মরক্ষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বারবার স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ বিদ্রোহ করছে। কেউ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। কেউ বহিরাগত যবনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে অস্থির সময় অতিক্রম করতে। কেউই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরম্পরা ছাড়তে রাজি নয়।

গ) সেনরাজাদের সামন্ত-জমিদারেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ করছেন। তারাই তাদের শত্রুপক্ষ। কিন্তু এসবের কি কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? না সবই নিছক কল্পনার বিষয়? শেষপর্যন্ত লেখক সেসব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন—

এসব চরিত্রের পরিণতি ইতিহাসে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ।
বিপুল সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণ... উল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে
কারও কারও বিলুপ্তি এবং কারও কারও আবার শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত
বৈষ্ণব ভাবধারার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ.... সুধীমিত্র, হলায়ুধ মিশ্র

প্রমুখের উত্তরাধিকার যে পরবর্তীকালে স্মার্ত রঘুনন্দনের টোল এবং
চতুষ্পাঠীতে লালিত এবং প্রচারিত হয়েছে। -পৃ.১৯৬-১৯৭

মধ্যযুগের প্রদোষকালে ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাদের কার্যক্রম কার্যকর করতে শুধু নিপীড়ন
নির্যাতন চালায়নি, ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনও চালিয়েছে। এসমস্ত কিছু
স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসে।

ঘ) সামাজিক, ধর্মীয় ও স্থানিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও
জনপদের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধন, আদ্রৈয়ী-করতোয়া-পুনর্ভবা নদী,
বিষ্ণুগ্রাম, বরেন্দ্রভূমি, আম্রপাউলি, উজুবট, পিপ্ললীহাট সবই উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত। যাকে
স্থানিক মানচিত্রে বরেন্দ্রভূমি বলা হয়েছে। দীর্ঘদিন এসব অঞ্চল বৌদ্ধ-নাথ অধ্যুষিত
এলাকা ছিল। উপন্যাসে দেখা যায় বিরুদ্ধবাদীরা শিব উপাসক নাথযোগী এবং
অন্যলোকেরাও শিবের অনুসারী ছিলেন—

হয়তো প্রাকৃতজন ওদের ভয়ের কারণ—প্রাচীন মন্দিরগুলিই তো
প্রাকৃতজনের সঙ্গে যুক্ত, বিষ্ণুমন্দির তো সেদিনকার ঘটনা—বৈষ্ণব
আর কয়জন? -পৃ.১০৬

ঙ) উপন্যাসের প্রেক্ষিতে মন্দিরের বাহ্যিক কারুকার্য ও অলঙ্করণশৈলী কথক উল্লেখ
করছেন। সেখানে বরেন্দ্রভূমির মৃৎশিল্পীরা মৃৎফলকে উৎকীর্ণ করেছেন জনজীবনের
দৃশ্যমালা ও যোগীভিক্ষুর প্রসঙ্গ। উত্তরবঙ্গের জনজীবনের সঙ্গে যোগী সন্ন্যাসী এবং
যোগীরগানের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল। যোগীভিক্ষা একটি সামাজিক রীতি, জীবিকা নয়।
কথক সেকারণে প্রাকৃতজনের হয়ে রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন
করছেন—

ব্রাত্যের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার না থাকলে তাদের প্রসঙ্গ কেমন
করে মন্দিরগাত্রের মৃত্তিকাপটে উৎকীর্ণ হতে পারে বলো? -পৃ.১০

নাথসম্প্রদায়ের একাধিক ব্যক্তিনামের মিছিল উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। দিবানাথ, দীননাথ, ভীমনাথ, শীলনাথ, যোগী সিদ্ধপা প্রমুখ। বহির্বঙ্গের যোগীদের বরেন্দ্রভূমিতে আসা যাওয়া ছিল। সেরকম দু'জন নাথযোগীর আচার আচরণে নাথযোগীসুলভ সাংস্কৃতিক পরিচয় যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি তারা বরেন্দ্রভূমির উজুবট গ্রামে পৌঁছে বুঝতে পারে সামন্তপতি ও তার অনুচরেরা ভীষণভাবে নাথযোগী বিদ্বেষী। শ্যামাঙ্গের সঙ্গে যোগীসন্ন্যাসী দু'জনের কথোপকথনে তাদের পরিচয় এবং সামাজিক জীবনে প্রচলিত যোগীবিদ্বেষ লক্ষ করা গিয়েছে—

দু'জন যোগীর সঙ্গে অতি সম্প্রতি তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পশ্চিমদেশাগত— সে উজুবট যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। সঙ্গী যোগীটি প্রকৃতই যোগী; সকল ব্যাপারেই তার সীমাহীন অনাসক্তি। আগন্তুক যোগী স্থানীয় ভাষা বিলক্ষণ বুঝতে শিখেছে, সে এখন বলে, উজুবটের গ্রামপতি এবং তার অনুচরেরা ভয়ানক যোগীবিদ্বেষী, একবার যদি আয়ত্তের মধ্যে পায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। - পৃ.৬৩

তার অব্যবহিত পরে নাথযোগীর যোগলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তি প্রকাশেও লেখক বাস্তবোচিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন—

উজুবট গ্রামে কোনো সিদ্ধা বা যোগী আছে এমন সংবাদ শ্যামাঙ্গ পূর্বে কখনও পায়নি। শুনলো, ঐ গ্রামে যোগীগুরু সিদ্ধপা অবস্থান করছেন। সিদ্ধপা অসাধারণ শক্তিমান যোগী—যোগবলে তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। চক্ষুর নিমেষে তিনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন, সর্প-মারী-ভয় তাঁকে দেখে শতহস্তে দূরাৎ পলায়ন করে— আরও আশ্চর্য, আকাশচারী দেবগণ পর্যন্ত অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর উপর দিয়ে গমনাগমন করতে পারেন না—তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। -পৃ.৬৫

নাথযোগীরা বৌদ্ধ ও সদ্ধর্মীদের সঙ্গে সমকালীন রাজন্যবর্গ ও তাঁদের অনুগৃহীত সামন্তশ্রেণির মানুষের বিরাগভাজন শ্রেণিতে পরিণত হন। তাই তাদের বিরুদ্ধে রোষের

কারণে বারবার তারা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিরাশ্রয় ও ছিন্নমূল জীবনে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি কোনোভাবেই বিসর্জন দেননি। সেই কারণে তাদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়—

পঞ্চকাল পূর্বে এক যোগীর সঙ্গে দু'টি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক
এই মন্দিরে রাত্রিযাপন করে গেছে— পরিচয় জানায়নি। তবে
সন্দেহ, তারা কোনো আক্রান্ত গ্রামের লোক। -পৃ.১০৩

এইরকম বিনষ্টিকালে মানুষের মধ্যে জৈবিক অস্তিত্ব, বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রাধান্য লাভ করবে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সেন শাসন থেকে স্থলিত হচ্ছে দেশ, তুর্কি আক্রমণ আসন্ন। তবু সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচার লাগামহীনভাবে চলছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাকৃতজনেরা বিদ্রোহ করে। শাসকের আক্রমণ তাদের উপর নেমে আসে। তাদেরই একজন তাই প্রশ্ন করে—

দেখো, এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই,
কেবলই প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে—এর শেষ কোথায়? এ
জীবন কী যাপন করা যায়? বলো, কতদিন এভাবে চলবে?—
আনিসুজ্জামান, ভূমিকা অংশ।

শওকত আলী ভীষণ যত্নের সঙ্গে তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রাকৃতজন নাথদের সংস্কৃতি ও সাধনাকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন। সিদ্ধধারা থেকে নাথপন্থে যোগাচার চলে আসছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলসাধনায় যুগলসাধনা প্রচলিত আছে। লেখক ইঙ্গিতে যোগাচারের বস্তুনিষ্ঠ অভিমুখ নির্দেশ করেছেন—

আমি যোগব্রত নিয়েছি কিনা—আমাকে তাঁর সাধনসঙ্গিনী করতে
চান। আগামী অমাবস্যা শীলনাথ যোগাচারে প্রবেশ করবেন।
শ্যামাঙ্গ যোগাচারের প্রক্রিয়া কী জানেনা। তবে শুনেছে, নানান
ক্রিয়াকাণ্ড থাকে ঐ আচারের অনুষ্টানাদিতে। নারীসঙ্গের একটি

কুৎসিত ব্যাপারও নাকি ঐ আচারের আবশ্যিক অঙ্গ। সে বললো,
লীলা, এবার তোমাকে মনস্থির করতে হবে। -পৃ.১১১

এছাড়া শ্যামাঙ্গ-লীলাবতীর সঙ্গে নাথযোগী সিদ্ধপার কথোপকথন প্রসঙ্গে যোগব্রতের কঠোর সংযম শিক্ষা, রিপু জয়, কামাচারমুক্ত যোগসাধন প্রক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণের জন্য সাধনাক্রম এবং কায়াসাধনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। নাথ যুগলসাধনায় সাধকযোগী যোগিনী ধারণ করতে পারেন। নাথযোগী সিদ্ধপা শ্যামাঙ্গকে সেই ভাবনারই ইঙ্গিত দিয়েছেন—

শ্যামাঙ্গ, লীলাবতীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম, ওকে তুমি রক্ষা করো। তোমাদের বিবাহ হবে না— কেননা শাস্ত্রের কোনো বিধান নেই যে তোমাদের বিবাহ হয়—এ বড় দুষ্কাল বৎস, জানি, তোমাদের সংসার হবে না—তথাপি আমি তোমাদের মিলিত করে দিলাম—পারলে যোগব্রত পালন করো, শিব তোমাদের মঙ্গল করুন।

-পৃ.১১৪

শেষপর্যন্ত লীলাবতীর আচরণে সিদ্ধ যোগিনীর মতন শরীর-মন-মোহ-রিপু জয়ের সংযম ধরা পড়েছে।

গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী দুই-ই নাথপন্থে স্বীকৃত। ভৈরবী বা সাধনসঙ্গিনী প্রতীকি বা বাস্তব দুইধারায় বর্তমানে প্রচলিত আছে। ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসে দেখা যায় যোগী-যোগিনী সম্পর্ক সমাজ মানতে চায় না। এমনকি কৌল নাথ-সম্প্রদায়ে গৃহস্থেরও বজ্রব্রহ্মচারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। শ্যামাঙ্গ জনৈক যোগী দম্পতিকে যোগসাধনার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে যে বিষয়ে জানতে চাইছেন তাতে যুগলসাধনার প্রসঙ্গ চলে আসে—

আপনারা যোগী। যোগসাধনায় সঙ্গিনীর অবশ্যই প্রয়োজন.... শ্যামাঙ্গ
বিভ্রান্ত বোধ করে।... আমার গৃহে রাত্রিকালে যোগসাধনা করবেন?-

পৃ.১৫৪

কামরূপ-কামাখ্যা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনীকৌল সাধনার পীঠস্থান। যোগিনীদের পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের জাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক এবং যৌগিক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। নাথযোগীর বেশভূষার বর্ণনাও চিত্তাকর্ষক ও বাস্তবোচিত হয়েছে বলা যায়। আগন্তুক যোগীসন্ন্যাসীর বেশভূষা লীলাবতীর কথায় বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে—

আগন্তুক শাশ্রুধারী, প্রৌঢ়। তাঁর হাতের যষ্টিটি বন্ধিম, সম্ভবত
হেমতালের। গ্রীবায় প্রস্তর-খণ্ডাবলীর মালা, পরিধেয় অত্যন্ত
অপরিস্কার। ...সংসারে থাকেন না। -পৃ.৩৮

শেষপর্যন্ত ইতিহাস, সমাজ, শিল্পবোধ ও লোকাচার সবকিছু মিলেমিশে উপন্যাসে বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামের আগমনে বিপুল সংখ্যক মানুষ অস্তিত্বরক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অন্যরা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভে সচেষ্ট হয়েছে। অন্য আরেকটি অংশ স্মার্ত রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেছে। এককথায় মধ্যযুগের প্রদোষকালে ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাদের ধর্মীয়বিশ্বাস রূপায়ণ করতে যাবতীয় নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ চালিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে লেখক প্রাকৃতজনের অসহায়তাকে দেখাতে চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক। তাই শেষপর্যন্ত ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসটি জীবনবোধের গভীরতার বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

৪. অঘোরী মা ষোড়শীনাথ: রিয়া মুখার্জী

‘অঘোরী মা ষোড়শীনাথ’(২০১৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রিয়া মুখার্জী রসোদগার করেছেন। নাথধর্ম, সাধনতত্ত্ব ও সংস্কৃতির রসোদগার। গৃহী হয়েও নাথসাধনধারাকে আত্মদান করছেন। পাপিয়া নামক একটি চরিত্র নিজের অস্তিত্ব দিয়ে নাথধর্মকে উপলব্ধি করেছে, আত্মীকরণ করেছে। আত্মীকরণের ফলে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি ভক্ত, পাঠক, শ্রোতা বা দর্শককে জানিয়েছে। লেখক তাঁর জীবনদর্শনকে ব্যাখ্যা করতে করতে নাথধর্ম,

দর্শনকে তুলে ধরছেন। ধর্মটা প্রাচীন, ধর্মীয় দর্শনটিও প্রাচীন। কিন্তু সেই ধর্মীয় দর্শনের ব্যাখ্যা হয়েছে একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে। একুশ শতকের আধুনিক জীবনদর্শনে বিশ্বাসী একজন মেয়ে, যিনি তাঁর যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে নাথপন্থার বিস্তার সাধন করছেন। নাথপন্থের বিস্তার ঘটছে, জনসমাজে তার প্রভাব পড়ছে। এই নাথপন্থ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন কোন প্রতিবন্ধকতা আসছে, সেই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের পর তিনি সেই বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন। গোটা উপন্যাসটি আত্মকথনের ভঙ্গিতে বিস্তার লাভ করেছে। সেখানে আত্মকথনে নিজের পরিবারের কথা, সমকালের কথা যেমন এসেছে তেমনি সমাজ-ধর্ম-দর্শন প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নাথমঠ, নাথযোগীসাধকদের সংস্পর্শে আসার অভিব্যক্তি, রসানুভবকে একালের বাক্যভঙ্গিতে এবং কখনো ফ্ল্যাশব্যাক ভঙ্গিতে পুরো উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন।

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের প্রেম কাহিনি এসেছে কিন্তু বন্ধনে তিনি জড়ান নি। সন্ন্যাস জীবনকে ধ্রুবতারার মতো গ্রহণ করেছেন। পাপিয়া যা দেখেছে তাই পাঠক, শ্রোতার সামনে প্রকাশ করছেন। প্রেম দৈহিক নয়, শেষপর্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রেমে উন্নীত হয়েছে—

খুব মজার মজার কথা বলেছিল শিবানন্দ, ওর নাকি প্রচুর প্রেমিকা ছিল। কিন্তু সেই সাধনার প্রেমে পড়ে আর কিছু উপভোগ করত না। আমাদের মতন অল্প বয়সে যারা সাধক-সাধিকা হয়েছে তারা বোঝে এই দোটারের কী যন্ত্রণা। তবে আমার মন শক্ত হয়ে গিয়েছিল দীপকের মৃত্যুর পরে।-পৃ.১৭

নাথপন্থের অঘোরসাধনা ও সংস্কৃতি অবলম্বনে ‘অঘোরী মা ষোড়শীনাথ’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পাপিয়া কলকাতার নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থেকে কীভাবে নিবৃত্তিমার্গের সিদ্ধ হয়ে উঠলেন তারই কাহিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

নাথসম্প্রদায়ের ১২ পন্থের অন্তর্গত নটেশ্বরী পন্থের অঘোরধারার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করে পাপিয়া অঘোরী মা ষোড়শীনাথ হয়ে উঠছে। তার সহজ স্বীকারোক্তি—

আজ প্রায় দশ বছর হয়েছে বাড়ি ছেড়েছি। আমার সম্পত্তি বলতে একটা চিমটা,
আমার ত্রিশূল আর একটা খপ্পর।-পৃ.১

উপন্যাসের ঘটনা প্রেক্ষিতে নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, যোগী গোরক্ষনাথের সাধনদর্শন এবং অঘোরধারার সাধনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। অঘোরী সাধকের পোশাক, ব্যবহার্য বস্তু, পূজো-উপকরণ, সাধনা, আচরণ সবই পাপিয়ার আত্মকথনে বর্ণিত হয়েছে। অঘোরযোগীর কালোরঙের পোশাক নির্দিষ্ট রয়েছে। তাদের হাতে থাকে খপ্পর, ত্রিশূল, ডমরু। এমনকি তারা সাধনায় নরমুণ্ড ব্যবহার করেন। ধুনি বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে তাদের সাধনা করতে দেখা যায়। তারাপীঠ মহাশ্মশানে কথক পাপিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার আলোকেই উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে—

নাথ সম্প্রদায় কী জানিস?’ ঘাড় নাড়িয়ে না বললাম। ‘গোরক্ষনাথের নাম শুনেছিস?’ উনি বললেন, ‘গোরক্ষনাথ শিবের এক অবতার হয়ে এসেছিলেন পৃথিবীতে। উনি শুরু করেছিলেন এই নাথ-সম্প্রদায় এবং এই নাথ-সম্প্রদায়ের সাধকদের অঘোর বলে। -পৃ.৬

অবশ্য শিব বা আদিনাথকে নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। আর নাথসম্প্রদায়ের সাধনার প্রাথমিক পর্যায় হল অঘোরসাধনা এবং সাধককে অঘোর বলে।

উপন্যাসে এরপর সাধনাপ্রসঙ্গে একের পর এসেছে নাথসম্প্রদায়ের দীক্ষাপ্রকরণ, শাবরমন্ত্রসাধনা, শবসংস্কার বা শবসাধনা, দশমহাবিদ্যা সাধনা, মন্ত্রদান-পদ্ধতি, তারাসাধনা, শ্মশানসাধন, বগলামুখী-শবসাধনা, কালভৈরব সাধনা, প্রেতযোনী মুক্তিসাধনা, অশুভ শক্তিনাশের পূজোপদ্ধতি, কারণচক্র, চিতাসাধন, পিশাচ সাধন, ডামরতন্ত্রসাধনা,

যোগের সাহায্যে কুণ্ডলিনী জাগরণ, কাপালিক সাধনা, যোগিনী পূজা প্রসঙ্গ উপন্যাসে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বিশ্বস্তভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। পাপিয়াকে নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধগুরু দীক্ষা দেবেন। অতএব গুরু পরম্পরায় শিষ্যকে সমস্ত সংস্কার ও সাধনপদ্ধতি জানতে হবে। তিনি সব কিছু পার করে অঘোরী মা ষোড়শীনাথ হয়ে উঠলেন। এই আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে সাফল্য অনায়াসলভ্য ছিল না। কঠোর অনুশাসন, অনুশীলন, সংযম, নিষ্ঠা ও একাগ্র যোগসাধনার মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে—

ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাবা দুটো পাণ্ডুলিপির মতন পুঁথি দিলেন। উনি বললেন, এতে লেখা আছে সমস্ত অঘোর ও নাথ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে। মৎস্যেন্দ্রনাথের কত অবদান, গোরখনাথ গুরু করেছিলেন সবর-মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রের কোনও ভুল হলে তাতে ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু সবর-মন্ত্র সহজভাষায় লেখা। -পৃ.৭

পাপিয়া ওরফে অঘোরী মা ষোড়শীনাথকে তার গুরু ভৈরবমন্ত্রের সঙ্গে গোরখ্ধ্যান, গুরুমন্ত্র (শাবরমন্ত্র) দিলেন। দশমহাবিদ্যার সাধনা সম্পূর্ণ হল। এরপর একে একে পাপিয়াকে তারাসাধনা, শ্মশান সাধনা, বগলামুখী শবসাধনা আয়ত্ত করতে দীর্ঘ আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করতে হল। মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক অনুভূতি ভেদ করে আধ্যাত্মিক মার্গের গূঢ়রহস্য ভেদ করতে কাপালিক সাধনা, পিশাচবধ সাধনা, চিতাসাধনা ভীষণ রহস্যময় ও কঠোর সাধনার অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। যোগ ও তন্ত্রের সাধনপথে পঞ্চমুণ্ডি সাধন ও কুণ্ডলিনী জাগরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে পাপিয়া মোক্ষাভিলাষী সংসার-বিরাগী অন্তরঙ্গ যোগসাধক হয়ে উঠছেন। যোগসাধনা ও জ্ঞানসাধনার অধিকার লাভ করে অঘোরী মা ষোড়শীনাথ হয়ে ওঠার রাস্তা খুব সোজা ছিল না। সেই কারণে যে বা যিনি শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করেন, সাধারণ মানুষও সেইশাস্ত্রের অনুবর্তন করে। নাথপন্থে শিব ও শক্তি তত্ত্বত অভিন্ন। হিন্দু শাক্তধর্মেও মহাশক্তির বিভিন্ন রূপকে একসঙ্গে মাতৃকা রূপে অভিহিত

করা হয়। মাতৃকাদেবীর সংখ্যা কোথাও সাত কোথাও বা আট বলা হয়েছে। উপন্যাসে মাতৃকাশক্তির সাধনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাতৃদেবীর প্রসঙ্গ এসেছে। এঁরা হলেন—ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, ইন্দ্রানী, কৌমারী, বরাহী, চামুণ্ডা বা নরসিংহী। পরম জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যময়ী পরমানন্দময়ী নিত্যজননী মহাশক্তিকে অন্তর-বাইরে দর্শন করে সাধক-সাধিকা যোগী নিজের অহং সত্তাকে নিবেদন করে দেন। পাপিয়াও সমস্ত জগৎ সত্তা ও চেতনাকে মন থেকে নির্বাসিত করে সর্বোত্তমাবে শিবশক্তিময় হয়ে উঠেছে—

অহং ভাঙলে মহাকাল, না ভাঙলে পরকাল। পরমাত্মার থেকে দূরে করার
যে প্রাচীরগুলি আছে তার মধ্যে অহংকার একটি। যারা সেই প্রাচীর
ভেঙে অগ্রসর হতে পারে তারাই পরমাত্মাকে পায়।- ২য় খণ্ড, পৃ.৬০

যে সাধনার সংস্কার বিশুদ্ধ, সংকল্প সুদৃঢ় ও তীব্র সংবেদসম্পন্ন, দেহ ইন্দ্রিয়মনের অনুকূল সেই সাধনাতেই পাপিয়া অঘোরী মা ষোড়শীনাথ হয়ে উঠেছে। বিশ্বপ্রাণ বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে অহং-র বিলয় সাধন করে পরমানন্দ রস আনন্দন করছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে মানুষের কাছে এসব দার্শনিক ভাবনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তারা ভূত-প্রেতের অভিজ্ঞতা জানতে চায়, রহস্য-রোমাঞ্চ লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য। সাধনা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নানান জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হলেও পাপিয়ার মত মানুষের কাছে আজও মনে হয় আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান হলেও জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে শ্রীগুরু করুণা ব্যতীত কোনো অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে আত্মার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন না। গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসজীবন লাভ করা যায় না। উপযুক্ত উত্তম সংস্কার থাকলেই সন্ন্যাসী হওয়া

সম্ভব। পাপিয়ার শরীর ও মন সর্বাংশে সন্ন্যাস জীবন-যাপনের উপযুক্ত হওয়ার পর তবেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। এই সত্যটি তার জীবন ও সাধনার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে।

অঘোরী সাধকেরা সাধনা অনুযায়ী সাদা, কালো, লাল রঙের পোশাক পরেন। তাদের কাঁধের ঝোলাতে চণ্ডাল, ত্রিশূল, ধূপ-ধুনো, খপ্পর থাকে। গুরু প্রদত্ত শূকরের দাঁত তারা গলায় পরেন। সাধারণ মানুষ তাদের ভয়ের চোখে দেখে। লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে বিদেশিরা অঘোরসাধনায় বিশেষ আগ্রহী। অঘোরীদের খাবার-দাওয়ারের মনোজ্ঞ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পাপিয়ার আত্মকথনে নাথ কাপালিক ও অঘোরসাধনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অঘোরী জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লেখক ওয়াকিবহাল। সমকালীন সময়েও পাপিয়ার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত একজন মেয়ের এভাবে নাথ অঘোরী সিদ্ধ হয়ে ওঠা আশ্চর্যজনক মনে হলেও অনেক শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে নাথদর্শন ও সাধনপ্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তা আয়ত্ত করতে আগ্রহী পাপিয়ার অঘোরী মা ষোড়শীনাথ হয়ে ওঠার গল্পে লেখিকা চিহ্নিত করলেন। তারাপীঠ, বক্রেস্বরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের নাথ যোগসাধনা প্রত্যক্ষভাবে বহমান এবং প্রাসঙ্গিক বলা যায়। যে সাধনধারা ও দর্শন সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে তা নাথসিদ্ধ অঘোরীমা ষোড়শীনাথের যাপিত জীবন ও দর্শন থেকে প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি অঘোরীদের একাংশের মাধ্যমে একশ্রেণির সাধারণ মানুষের প্রতারিত হওয়ার ঘটনাও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। নাথসংস্কৃতিতে প্রচলিত বিভিন্ন সাক্ষেতিক শব্দের ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের অন্তর্ব্যয়নে নানা ঘাত-প্রতিঘাত জটিলতা থাকলেও বাইরে নাথ অঘোরীধারার সাধন, দর্শন ও সংস্কৃতি যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। তবে অঘোরী মা ষোড়শীনাথ শেষপর্যন্ত নাথ অঘোরী ষোড়শীনাথ রয়ে গেলেন না গৃহস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন তা পাঠকের জানা হল না। পরিণতিতে টানটান

উত্তেজনা ও সাসপেন্সে পাঠক রয়ে গেলেন। সেখানে দেবপর্ণের সঙ্গে পাপিয়ার পূর্বাশ্রমের প্রেমের সম্পর্ক কোথায় গিয়ে কোন সম্পর্কে বাঁক নেবে সে বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে লেখক কোনো দিকনির্দেশ করলেন না। সাসপেন্স রেখে গেলেন। তবে অঘোরী জীবন ও সাধনকে দরদ দিয়ে দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন বলে পাঠক দুর্গিবার আকর্ষণ বোধ করেছে। পাশাপাশি ব্যক্তি চরিত্রের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেম-অপ্রেমের জটিল মনস্তত্ত্ব উপন্যাসে বৈচিত্র্যে পূর্ণ বলা যায়। অতএব আধ্যাত্মিক জগতের নির্মাণ প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতেই এবং তা সম্পূর্ণত মানবচেতনা সম্ভূত।

৫. অঘোরীর আনন্দকানন: দেবনাথ বকসী

দেবনাথ বকসীর ‘অঘোরীর আনন্দ কানন’ (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে জীবনবেদ স্বরূপ। নাথপন্থের নটেশ্বরী পন্থের অঘোরীধারার প্রবাদপ্রতিম যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর যোগদর্শন, সাধন পরম্পরা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক হৃদয়জ সম্পর্ক অবলম্বনে অনুপম জীবন আলেখ্যমূলক উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সুখপাঠ্য উপন্যাসটি পাঠে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন—

অঘোরীর ‘আনন্দকানন’ একখানি অসাধারণ বই, যেমন
কৌতূহল-উদ্দীপক, তেমনি রহস্যময় ও ভাবুকতাপূর্ণ। এই পৃথিবী
ভাবেই সৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবান ও ভাব লইয়াই
আনন্দকাননের কারবার।-পৃ.৩

‘অঘোরীর আনন্দকানন’ নামটি দিয়েছিলেন ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ উপন্যাসের রচয়িতা প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী সাধারণ মানুষের কাছে ‘অঘোরীবাবা’ নামেই পরিচিত। অঘোরীর আনন্দকানন যোগসিদ্ধপীঠটি বীরভূমের দুবরাজপুর শহরের প্রান্তসীমায় বক্রেস্বর রোডে অবস্থিত। স্থানীয় মানুষেরা এই স্থানটিকে

ওস্তাদজির আশ্রম নামেই চেনেন। যোগী রামনাথ অঘোরীবাবার শিষ্য তপস্বী যোগী নিত্যরঞ্জন উপাধ্যায় ওস্তাদজী নামে পরিচিত। আনন্দকাননে যোগী রামনাথ অঘোরীবাবার কারণচক্র অবস্থিত। এখানকার মাটি স্পর্শ করে ভক্তরা অঘোরীবাবার জটাসমাধি ও সাধনবেদীর মাহাত্ম্য লাভ করেন। অঘোরীবাবা ভক্ত-শিষ্যদের কাছে ‘জটেবাবা’ নামেও পরিচিত। আনন্দ-কাননে তপোবনের আশ্রমিক পরিবেশের প্রশান্তি ও শোভা বিরাজমান। পাখি, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি আশ্রমিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এসব নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে। লেখকের বর্ণনায় স্থানটির মাহাত্ম্য অপার ও অনির্বচনীয় রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে—

এটা জটেবাবার আটন। তিনি মাঝে মাঝে বক্রেশ্বর থেকে এসে এখানে থাকতেন। ঐরই নাম অঘোরীবাবা। -পৃ.১৩

অঘোরীবাবা ভক্ত-শিষ্যদের চোখে দিব্যকান্তি মহিমা লাভ করেছেন। লেখক তাঁর মিষ্টভাষী সদালাপী চরিত্র ও লোকোত্তর মহিমাকে বোঝার জন্য ইঙ্গিতে সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। তারফলে রামনাথ অঘোরীবাবার আধ্যাত্মিক জীবন বিচারশীল ও হৃদয়বান ধর্মপিপাসুদের কাছে সহজে বোধগম্য হয়েছে। আজকের দিনে পৃথিবীতে স্থূলভাবে উপস্থিত না থেকেও অঘোরীবাবা কিভাবে করুণা বিতরণ করছেন, বিদেহ হয়েও কিভাবে মুমূক্ষুকে অভয়বাণী ও প্রেরণা দান করছেন ‘অঘোরীর আনন্দকানন’ তারই পরিচয়বাহী সঙ্গ্রহ স্বরূপ উপন্যাস।

দেড় শতাধিক বছর পূর্বে পূর্বাশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র পাণ্ডে বীরভূমের তারাপীঠের কাছে বিহারের পাকুড় অঞ্চলে আবির্ভূত হন। খুব অল্প বয়সে স্বপ্নে তারাপীঠ- ভৈরব শ্রী শ্রীবামদেবের দর্শন ও সিদ্ধ তারামন্ত্র লাভ করেন। পরবর্তীকালে বামদেবের সান্নিধ্যে তান্ত্রিক মন্ত্রের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। শেষে আধ্যাত্মিক দর্শনে মনোনিবেশ করে

নাথপন্থের ১২ পন্থের অন্তর্গত অন্যতম পন্থ নটেশ্বরী পন্থ বা ধারার সিদ্ধযোগী সুন্দরনাথের কাছে অঘোরদীক্ষা লাভ করেন। অবশেষে দর্শনী নাথযোগী হিসেবে গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথ মঠের মহাযোগী গম্ভীরনাথের কাছে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর নাম হয় যোগী রামনাথ। নটেশ্বরী পন্থের নাথযোগীধারাকে অঘোরীধারাও বলে। তাই তিনি যোগী রামনাথ অঘোরী নামে পরিচিত। পরিব্রাজক জীবনে তিনি ভারতবর্ষ, নেপাল, তিব্বত, পাকিস্তানে যোগসাধনা ও যোগধুনি স্থাপন করে নাথপন্থের প্রসার ঘটান। ১৯৮০ খ্রি.-র ৬ই জানুয়ারি কলকাতায় ইহজীবন লীলা সঙ্গ করে সমাধিতে ব্রহ্মলীন হন এই মহান নাথযোগী সন্ন্যাসী।

ঔপন্যাসিক সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগী রামনাথ অঘোরীর অন্তর্জীবনকে উপন্যাসে আলোকিত উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। ওস্তাদজী, ভৈরবী ও অন্যান্য সাধুসন্তের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সাধুসঙ্গে প্রাপ্ত সূত্রাবলীকে আশ্রয় করে লেখক অঘোরীবাবা ও অন্যান্যদের তত্ত্বনির্ভর সাধনধারাকে উপস্থিত করছেন। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র নাথপন্থে সীমাবদ্ধ বলে নাথপন্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি আলোচনায় আনতে চেষ্টা করেছি। লেখক উল্লেখ করেছেন ওস্তাদজী ওরফে নিত্যরঞ্জন উপাধ্যায় যখন ছোট ছিলেন তখন রামনাথ অঘোরীবাবাকে দেখেছিলেন। একটি নরকপাল তাঁর সঙ্গে থাকত, ধরাবাঁধা কোন খাদ্য তাঁর ছিল না। ওস্তাদজীর আত্মকথনে তত্ত্বসাধনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ-চক্রসাধনা, ভৈরবীচক্র, কারণচক্র, শবসাধনা, শ্মশান সাধনা, ভূতসিদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে যেগুলি নাথ অঘোরীধারার সঙ্গে যুক্ত সাধন পদ্ধতি বিশেষ। চক্রের প্রভাবে অনেক কঠিন সাধনাতত্ত্বের সমাধান হয়। আছে চক্র শেষে ভৈরবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ—আনন্দ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব ইত্যাদি। নাথ অঘোরীদের ভৈরবী ছাড়াই চক্র সম্পন্ন হতে

পারে। তারা প্রকৃতির নিয়মে চলেন। তাদের জাতিভেদের বাছ-বিচার নেই, উচ্ছিষ্ট নেই।

এসব তত্ত্বশাস্ত্র সম্মত বিষয়। লেখক উল্লেখ করছেন—

জগন্নাথদেবের চক্র আজও শেষ হয় নাই। সুতরাং সেই নিয়মেই
চলতে হয়। পুরীর বৃদ্ধ পাণ্ডাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের তথ্য
পাবেন। কোনও কোনও ক্ষণে সেখানে ভৈরবী চক্র হয়, ‘প্রবর্তে
ভৈরবীচক্রে সর্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ’।- পৃ.২২

ঔপন্যাসিক আধ্যাত্মিক আবরণে গুরুমুখী তান্ত্রিক সাধনাসমূহ, ভূতপ্রেত প্রসঙ্গ, সূক্ষ্মশরীরে যোগী-মুনিদের গমনাগমন যোগলৌকিক ভাবনায় অভিসিঞ্চিত করে উপস্থাপন করেছেন। কিঞ্চিৎ হাস্যরস, কোথাও অলৌকিকতা, কোথাও কল্পনার আশ্রয়ে সাহিত্যের আঙিনায় রচনাটিকে দাঁড় করিয়েছেন—

ভূত কি দেখা যায় না? দেখা না গেলে কি তাদের অস্তিত্ব নাই?
দেবতাও তো দেখা যায় না, তা বলে কি দেবতা নাই? ওঁদের সূক্ষ্ম
শরীর, দেখা দিবার ইচ্ছে হলে স্থূল শরীর ধারণ করে দেখা দিতে
পারেন। ভূত যদি আপনাকে দেখা দিব মনে করে, আপনাকে মানুষ
আকারেই দেখা দিতে পারে। -পৃ.২৫

উপন্যাসে অঘোরীবাবার লৌকিক ও যোগলৌকিক ক্ষমতাসহ একাধিক সিরিয়াস বিষয়ের ফাঁকে এরকম কিছু হাস্যরসাত্মক বিষয় নিয়ে এসে মানসিক রিলিফ দানের ক্ষেত্রে ভীষণ কার্যকরী হয়েছে। তারফলে কাহিনির প্রতি পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। নিছকই উপন্যাসটি নীরস আধ্যাত্মিক বিষয় হয়ে থাকেনি। উপন্যাসের পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল সমানে থেকেছে, তা নষ্ট হয়ে যায় নি। সঙ্গে উপন্যাসে রয়েছে তান্ত্রিক-কাপালিক নাথ অঘোরী সাধকদের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত প্রভাব।

তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন স্তর, বিশেষত পশ্চাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষের অনুভূতিরাজ্যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রমতে মানুষ জন্মগতভাবে পশু। পশু চেতনার অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয়ে। বীর মানে মানুষ। বীরাচারে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নেই, মনের সাহায্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগৎ গড়ে ওঠে। মন বা বুদ্ধি দিয়ে দিব্যাচারের সাধনা। দিব্যাচারের সাধনায় সাধক-যোগী তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হন—

চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলে আসমানেতে বানায় ঘর।

প্রেমিকের স্বভাব স্বতন্ত্র।-পৃ.২৭

এসব বর্ণনার সাহায্যে পাঠক তন্ত্রসাধনার দুর্জয় জগতে প্রবেশ করে সহজে জ্ঞানচৈতন্য ও রসময় চিত্ততন্ময়তা লাভ করেন। তন্ত্রতীর্থ বক্রেশ্বর, সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন, বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনা এবং নাথপন্থের উল্টোসাধনা জনৈক ভৈরবীর আত্মকথনে লেখক উল্লেখ করছেন।

যোগী রামনাথ অঘোরীর জীবন ও সাধনার অনেক অজানা প্রসঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। যে বিষয়গুলি পরবর্তী সময়ে একটি অখণ্ড প্রামাণিক নথি হিসেবে কাজ করতে পারে। রামচন্দ্র পাণ্ডে থেকে কীভাবে তিনি তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, নিমতলা মহাশ্মশান, দেওঘর ইত্যাদি স্থানে সাধনা করতে করতে যোগী রামনাথ অঘোরী হয়ে উঠছেন তার ঘটনা বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য রসসিক্ত বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। তারাপীঠে রামনাথ অঘোরীর সঙ্গে সাধক বামাক্ষ্যাপা, সিদ্ধ রঘুনাথ গোস্বামীর সাক্ষাৎ সবকিছুর মধ্যে লেখক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সন্ধান করেছেন, অন্যদেরও আনন্দলাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। নিজের অস্তিত্ব দিয়ে সাধকজীবনকে দর্শন করছেন। তাতেই তিনি তৃপ্তি বোধ করেছেন। নিজেও

বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। তারাপীঠ, বক্রেস্বরের তন্ত্রভূমিতে নিজের পছন্দের মাটির সন্ধান করেছেন। কথায় আছে যোগীর সংস্পর্শে হিংস্র পশুরাও হিংসা ভুলে যায়। অঘোরীবাবার সঙ্গে এক ব্যাঘ্র-শাবকের খেলার ঘটনা এবং মা বাঘিনীর আগমন ও অঘোরীবাবার সঙ্গে কথাবার্তা অস্বাভাবিক ঘটনা মনে হলেও উপন্যাসে এক বিস্ময়কর মজার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—

একটি সুন্দর নদর বাঘের বাচ্চা রাস্তার ধারেই খেলা করছিল।
অঘোরীবাবা দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।
বাঘিনী গোঁ-গোঁ করতে করতে হাজির। অঘোরী ইসারা করে বাঘিনীকে
সরে যেতে বললেন। মুখে বললেন, - তোর সুন্দর বাচ্চাকে আদর
করছি মা, যা। বাঘিনী সন্তান ফেলে চলে গেল। -পৃ.৪১

মূক পশুকে কেন্দ্র করে এভাবে জীবনরস পরিবেশনের মাধ্যমে উপন্যাসে অসাধারণ নান্দনিক মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

এর বাইরে আছে বক্রেস্বরে অঘোরীবাবার বেদীতে বসে শ্মশান-সাধনা, রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গে কথোপকথনের নানাবিধ ঘটনা। লেখকের ভাবনায় এভাবে তিনি মুক্তপুরুষ হয়ে উঠেছেন। এছাড়া গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনা থেকে শুরু করে, তান্ত্রিক যৌগিক পূজো-অর্চনা, ধুনি প্রজ্জ্বলন ও বক্রেস্বরের মাহাত্ম্য বিষয়ে নির্ভরযোগ্য পৌরাণিক সূত্র উপন্যাসে রয়েছে—

পাপহরার উত্তর পাড়ের উপরে মা মহিষমর্দিনীর ও শিবের মন্দির।
মহিষমর্দিনীর মন্দিরে পাণ্ডুরা সতীর দ্রু দেখান, কেউ কেউ বলেন
বক্রেস্বরের চার ক্রোশের মধ্যে। তার উত্তরে সাধকদের স্থান, এদিকে
শ্মশান নাই। দক্ষিণ দিকে শ্মশানে একমাত্র অঘোরীবাবাই থাকতেন। -
পৃ.৪৫

বক্রেশ্বরে অঘোরীবাবার সাধনা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, ভাঙরা দিয়ে তাদের খাওয়ানো, জাতিভেদ, শ্রেণিভেদের উর্দ্ধে মানবিক ভেদমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসে বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়েছে। অঘোরীবাবার অভেদ-দর্শন, বেদ ও তন্ত্রধারা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় আধ্যাত্মিক মিস্টিক চেতনা, বাউলের ধর্মসাধনা, সাধুসঙ্গ, ভক্তিভাবনা, সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য এবং মাতৃসাধনায় অন্তরঙ্গ সিদ্ধিলাভ প্রসঙ্গ এমন কতকিছুই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে মূল ঘটনার বাইরে সজীব ও প্রাণময় হয়ে উঠেছে—

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী, অষ্টমী ও সংক্রান্তি- এইগুলি শক্তিপূজার
প্রশস্ত দিন। মা যে নিষ্ঠুর, সাধক যে গুণে তাঁর আরাধনা করেন সেই
গুণই তাতে আরোপিত হয়। তিনি গুণাতীতা আবার গুণময়ী।
ব্রহ্মসাধকের কাছে কিছু ভেদ নাই। -পৃ.৯১

আন্তরিক ভাবভঙ্গিতে মিস্টিকভাষায় আধ্যাত্মিক যৌগিক মার্গদর্শন পল্লবিত হয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তু অগ্রসর হয়েছে।

অন্তরঙ্গ সাধনায় গুরু নির্দেশিত পথে সিদ্ধযোগী ভাবমুখী হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। মন্ত্রসাধনার কার্যকারিতা নাথ অঘোরী সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাধ্যসাধন তত্ত্ব, অঘোরাচার, হঠযোগ, শ্মশান সাধনা ইত্যাদি বিষয় তন্ত্র ও ত্রিক-দর্শন নির্ভর নাথ যোগসাধনা ‘অঘোরীর আনন্দকানন’ উপন্যাসে বিন্যস্ত বিশ্লেষণাত্মক ধারাটি নবমাত্রা পায়। লেখক যোগী রামনাথ অঘোরীর দর্শন, সাধনধারা, মানবিক মহিমা এবং রসসাহিত্যের প্রসঙ্গ অবলম্বন করে তাঁর সমকাল ও বর্তমান সময়ের বন্ধন দৃঢ়ভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনের মানুষেরাও নিশ্চিতভাবে বুঝবেন সহজ-সরল জীবন ও অগাধ জ্ঞান না থাকলে ধর্ম থেকে বিজ্ঞান পর্যন্ত সব বিষয়েরই প্রকাশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে অহং-এর রূপ ধরে। তখন অধরা থেকে যায় অনাবিল আনন্দ। তাই লেখক শেষপর্যন্ত অতীত ও বর্তমানকে একসূত্রে বাঁধতে মহাযোগীর জীবনকথায় কিছু স্থিরচিত্রের মাধ্যমে

যোগীসাধক জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উপন্যাসে সিদ্ধযোগী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত সহজ সাবলীল।

৬. তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ: প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক না হলেও ভ্রাম্যমাণ সাধক জীবনের সান্নিধ্যে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)-র মত সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এটি মূলত ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাস থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেনাপাওনা’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প,’ এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ নাটক থেকে প্রমাণিত হয় বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তান্ত্রিক-কাপালিক সাধনার একটা ধারাবাহিক প্রবাহ রয়ে গিয়েছে। আলোচ্য ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ উপন্যাসে তন্ত্রসাধনা প্রসঙ্গে নাথপন্থের অঘোরীধারার সিদ্ধযোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর তন্ত্রাচার, তন্ত্রের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক, তান্ত্রিক পরিভাষা ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা, পঞ্চমুণ্ডি আসন, ভৈরবীসাধনা প্রভৃতি বিষয় অঘোরী তান্ত্রিকের আত্মপ্রেক্ষণে লেখক আমাদের ধর্মাভিভূত জীবনকে আলোকপাত করেছেন।

মূলধারার ধর্মের ক্ষেত্রে তন্ত্রনির্ভর ধর্মসাধনা অনেকক্ষেত্রে ব্রাত্য ছিল। কিন্তু তন্ত্রের আগমধারার সাধনা বিষয়ে মানুষের কৌতূহল কোন কালেই কম ছিল না। লেখক বিভিন্ন মঠ-মন্দির, তীর্থক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে তন্ত্রের নিগূঢ় সাধনরহস্যকে জেনে তাঁর সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিপরীতে থাকা মানুষদের সাধনায় সুযোগ করে দিতে তন্ত্রসাধনা লোকাভ্যন্তরীণ ধর্মধারায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এই উপন্যাসে লেখক সাধুদের সংসারবিমুক্ত জীবনপথের

অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কোন বহিরঙ্গ চটকে নয়, সাধু- যোগী-সন্ন্যাসীদের জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দিলেন। ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ রচনায় অবশ্য বিভিন্ন সাধুসঙ্গের প্রসঙ্গে যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর সাধনদর্শন ও তাঁর লোকোত্তর মহিমা প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখক তাঁর নাম সরাসরি উল্লেখ করেন নি। অঘোরী নাম এবং তাঁর সাধনা প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় ইনি নাথপন্থের যোগী ডা. রামনাথ অঘোরী। এছাড়া বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘মহাপীঠ তারাপীঠ’ (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে তন্ত্রাভিলাষী সাধক ও লেখক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃৎস্বর শ্রাশানে যোগী ডা. রামনাথ অঘোরীর নিগূঢ় চক্রানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন—

অঘোরীবাবা বক্তৃৎস্বর মহাশ্রাশানে বহুব্রার নিগূঢ় চক্রানুষ্ঠান করেন। বাংলা
১৩১৭ সালে বর্ষাকালে তাঁর এই চক্রানুষ্ঠান তাঁর কৃপাধন্য তন্ত্রাভিলাষী,
সাধক ও শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেন।-পৃ.১১৩

সনাতন হিন্দুধর্মে চার সম্প্রদায়কে প্রধানভাবে মান্যতা দেওয়া হয়। যথা-নাথ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও উদাসীন। নাথ অঘোরী বা অঘোর কোন পরম্পরা নয়, এটা সাধক যোগীর সাধনার অবস্থা মাত্র। একে দশা বলা হয়। অঘোরপীর চক্রসাধনায় (যোনিচক্র) ভৈরবী নিতে পারেন। যোনিচক্র সাধনা করতে পারেন। কিন্তু এই সাধনায় বীর্যের উর্ধ্বরেক বাধুনীয়, অধঃপাত হলে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। নাথপন্থে কঠোরভাবে উর্ধ্বরেক সাধনার কথা বলা হয়েছে। চক্রসাধনায় দর্শনী নাথযোগীদের ভৈরবী সাধনা নেই। তাঁরা দেহস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়িকে যোগিনী মনে করে সাধনা করেন। সুষুমা নাড়ি মূলত যোগিনী নাড়ি। কিন্তু বহু অঘোর সাধক নাথপন্থের অনুশাসন ভঙ্গ করে তন্ত্রের অপপ্রয়োগ করেন। অচিরেই তারা নাথপন্থ থেকে বহিষ্কৃত হন। ‘অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা’ তাদের নাথযোগী হিসেবে স্বীকৃতি বাতিল করেন।

তারা নাথ সম্প্রদায়ের ‘জমাত’ বা ‘নবনাথ বুণ্ডিয়াত্রা’-য় অংশগ্রহণ করতেও পারেন না। যোগী রামনাথ অঘোরীর আত্মকথনে লেখক প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন যে তন্ত্রে আত্মজ্ঞান বা মুক্তির সাধনায় মুখ্য, অভিচারাদি গৌণ। তন্ত্রের পথে কতিপয় রজঃ ও তমোগুণের সাধক ঢুকে পড়েন। তারা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গোপনে অভিচারের পথে যায়। তখন সাধনায় অহং শক্তিমান হয়ে ওঠে। মোক্ষসাধন বা ইষ্টলাভ হয় না। সেই কারণে যোগী রামনাথ অঘোরী মনে করেন তন্ত্রসাধনায় তান্ত্রিক ভৈরব বা কাপালিকদের শরীরের ক্ষুধা ও রিরংসার কারবার যাদের মুখ্য নয় তারাই উর্ধ্বরেতার ফলাফল ভোগ করতে পারেন। উর্ধ্বরেতা হয় বলে তাদের সঙ্গে নারী বা যোগিনী থাকলেও ইন্দ্রিয়সুখের প্রয়োজন হয় না। তারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করে জগৎবাসীর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে যান। স্থূল শরীরে মৈথুনের যে সুখ তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

যোগী রামনাথ অঘোরী বর্ণাশ্রমীদের ভণ্ড মনে করেন বলে ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ উপন্যাসে লেখক উল্লেখ করছেন। বর্ণাশ্রমীরা বেদ ও তন্ত্রের সহাবস্থান ঘটিয়ে কীভাবে ধর্মজীবনকে কলুষিত করছেন সে বিষয়ে লেখক নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি বৈদিকধর্ম থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শেষে তন্ত্রনির্ভর বাংলার নিজস্ব ধর্মভাবনার নির্যাসকে তন্ত্রের গুহ্য সাধনধারা প্রকাশের মাধ্যমে তন্ত্রসাধনার প্রামাণিক যুক্তিসঙ্গত অভিমুখ নির্দেশ করেছেন। রামনাথ অঘোরীর দৃঢ় অভিমত তন্ত্র শরীরতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধনাবিশেষ—

সাধন ত শরীর নিয়েই, কাজেই সুস্থ শরীর সুস্থ মন না হলে সাধনের
মানে হয় না। বিকৃত শরীরে সাধনের মানে শরীরের চিকিৎসা। -পৃ.২১২

সেই কারণে বীরাচারের প্রতিটি স্থান তান্ত্রিক সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলে অধিকাংশ মহাপীঠস্থান শ্মশান সংশ্লিষ্ট।

নাথ অঘোর সাধনায় যুক্ত মানুষেরা নিজেদের ‘সহজ মানুষ’ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। ভৈরবী মহেশ্বরী মায়ের কথায় নাথ বিপরীত সাধনা বা উল্টোসাধনার প্রসঙ্গও ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রামনাথ অঘোরী প্রসঙ্গে কথককে বলছেন—

অঘোরীর কাছে যা দেখবেন তার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর কোন গুহ্য
নাই, তিনি সিদ্ধযোগী। ওঁর কি সে সব ভাল লাগবে? হয়ত বিপরীত
ধর্ম, অনাচার, এসব মনে হতে পারে।-পৃ.২৩১

অঘোরী সাধনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভীতি ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেই যোগিনী মহেশ্বরী ইঙ্গিত করেছেন। পাশাপাশি যোগিনী পূজো, চক্রসাধনা, যুগলসাধনা, পঞ্চ ম-কার সাধনা বিষয়ে সাধারণ মানুষ গ্রন্থটি থেকে সঠিক দিশা লাভ করতে পারেন। পঞ্চ ম-কার সাধনায় প্রত্যক্ষকল্প নয়, দিব্যকল্প প্রয়োগের উপরই যোগী রামনাথ অঘোরী জোর দিয়েছেন। তবে প্রত্যক্ষকল্প প্রয়োগ অস্বীকারও করেন নি। চক্রসাধনায় যোগ-মুদ্রা ব্যবহার হওয়ায় লেখক অঘোরীবাবার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। এসমস্ত যোগমুদ্রাগুলি চারিত্রিক সংযম রক্ষায় সাহায্য করে। সময়ের বিবর্তনের পথ ধরে বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি গ্রহীত হওয়ার পর থেকে তন্ত্রের স্বাভাবিক উপযোগিতা মেনে নিয়ে বিবাহিত বা যুক্ত জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা এবং অবিবাহিত কুমার জীবনে বৈদিক দীক্ষার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল। স্ত্রী ও পুরুষ ছাড়া মানুষের মধ্যে অপর কোন জাতির অস্তিত্ব তন্ত্রধর্মে নেই। সেদিক থেকে তন্ত্রধর্ম বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের যেমন প্রতিবাদ তেমনি তার উদার জাতপাতমুক্ত মনোভাব প্রশংসনীয়। যোগী রামনাথ অঘোরী কথককে বলছেন—

দশবিধ সংস্কারগুলিতে বজায় রহিল বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব, আর বিবাহের পর
তান্ত্রিক কুলগুরুর কান-ফুঁকের মধ্যে রহিল তান্ত্রিকত্ব। এই ত বাঙ্গলার

বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশের তান্ত্রিকধর্ম, তাহার মধ্যে কেহ কেহ বংশ
হইতে বাহির হইয়া তান্ত্রিক কৌলগুরুর শিষ্য হইয়া ভৈরবী লইয়া সাধন-
জীবন আরম্ভ করিয়াছেন।-পৃ.২৫৩

তিনি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করতে চেয়েছেন যে বৈদিকধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের কোন বিরোধ
নেই। এমনকি বেদ পুরনো না তন্ত্র প্রাচীন সে বিষয়েও সাধকের কোন আগ্রহ বা প্রয়োজন
থাকে না। তিনি এও বলতে চেয়েছেন যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত আগম, নিগম, তন্ত্রসার
ইত্যাদি তন্ত্রগ্রন্থ বেদের ছাঁচে গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিষ্য তৈরির জন্য তারা
তার ব্যবহারও শুরু করেছেন। কিন্তু তন্ত্র ভারতের প্রাচীনধর্ম হলেও ব্রাহ্মণদের ধর্ম নয়।
তন্ত্রে সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, বেদান্তের ভাবসমূহ গৃহীত হয়েছে। বাংলার ব্রাহ্মণ
সমাজের মানুষেরা কৌলদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই যোগী রামনাথ অঘোরী কথককে
জানিয়েছেন।

বৈদিক আর্ষধর্মের বিপরীতে ব্রাত্য-শৈব পরম্পরা ও যোগসিদ্ধধারা আর্ষরা গ্রহণ
করেছেন। শিবের এই যোগপন্থার নামই হল তন্ত্রধর্ম। পাশাপাশি মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত
কৌলধারা, কৌলের কুল বা বংশরক্ষার প্রয়োজনে সন্তানধারণের যৌক্তিকতা এবং
নাথসিদ্ধধারা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় ও লোকপ্রচলিত ধারণা সম্পর্কে যোগী রামনাথ অঘোরী
কথককে অবহিত করে যুক্তিনিষ্ঠ সম্যক পরিচয় প্রদান করেছেন—

আমরা কৌল তান্ত্রিকের শিষ্য। তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধবস্থা হলেই কৌল, স্ত্রী
পুরুষের যুক্ত জীবনই সম্পূর্ণ জীবন, তন্ত্রের অধিকারে প্রথম প্রবর্তকের
একা একা সাধনা হয় না। তন্ত্রে স্ত্রী বা নারীজাতিই শক্তি। স্ত্রীগ্রহণ বলে
না, বলে শক্তিগ্রহণ।-পৃ.২৬২

তন্ত্রেই সর্বপ্রথম পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান গুরুত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজে
যে যে অবস্থায় পুরুষ নিভীক, কর্মশক্তিমান—বীর নারীও ঠিক সেই ধারায় গুণবতী,

শক্তিমতী। কিন্তু ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পুরুষের ইন্দ্রিয় সুখকে বড় করে দেখেছে। তারফলে নারী যে শক্তি সেটা তারা ভুলে গিয়ে সমাজে যথেষ্টভাবে শক্তির অপব্যবহারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে বলে যোগী রামনাথ অঘোরী উদ্ভা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কথক তথা লেখককে তিনি শেষপর্যন্ত বলতে চেয়েছেন যে শৈব-তন্ত্রধর্মের আশ্রয়ে বাংলার সমাজ মুক্ত জীবনচেতনা লাভ করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে তন্ত্রনির্ভর শৈবধর্ম সংকীর্ণ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করে। তারফলে শৈবধর্মের অবক্ষয় ঘটে। অবশেষে তন্ত্রধর্মের ব্যাভিচারের প্রতিক্রিয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করলেও বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসনকে অগ্রাহ্য বা অতিক্রম করতে পারে নি।

এর পাশাপাশি চীনাচার, বিভিন্ন যৌগিক পূজো প্রকরণ, অঘোরসাধনা, দশমহাবিদ্যাসাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণায় তন্ত্রধর্মের সামগ্রিক সাধনাপ্রক্রিয়া, তন্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের পরিচয় ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ উপন্যাসে প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে। শিব ও শক্তিতত্ত্বের যুগ্মভাব বা অভেদধারণা বা অদ্বৈতধারণা স্তরে পৌঁছানোই তান্ত্রিক সাধকের লক্ষ্য। যা সূক্ষ্মচেতনাস্তরের উপলব্ধির মাধ্যমে লাভ সম্ভব। লেখক প্রশ্নোত্তরশৈলীতে কথোপকথনের মাধ্যমে যোগী রামনাথ অঘোরীর মনোভাব ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ববর্তী সময়ের তন্ত্রধর্ম থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত তন্ত্রাচারের বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে তিনি তন্ত্রের চরিত্র, বিষয়ভাবনা ও ধর্মমতের অনুভূতি প্রকাশে সমাজজীবন দর্শনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসে শুধু যোগী রামনাথ অঘোরী চরিত্র নয়, অন্য চরিত্ররাও জীবন্ত সচল হয়ে উঠেছেন। বিশেষত ভৈরবী বা যোগিনীদের কার্যকলাপকে লেখক অনায়াস দক্ষতায় তান্ত্রিক রহস্যময়তার আবরণে প্রকাশ করেছেন। তারফলে তন্ত্রাচারের গল্প-ঘটনাবলি, ভ্রষ্টাচারের প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মণ্য

হস্তক্ষেপ অত্যন্ত বাস্তবোচিত হয়েছে। বিশেষত নাথযোগী রামনাথ অঘোরীর সাধকজীবনকে দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভারতীয় যোগী সাধকজীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে উপলব্ধির চেষ্টা এবং তন্ত্রধর্মসাধনার অন্তরালে গজিয়ে ওঠা ভ্রষ্টাচারকে চিহ্নিত করে যথার্থ সাধন পরম্পরাকে সাহিত্য আঙ্গিকে লেখক পরিবেশন করেছেন। সেদিক থেকে ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ খুব উঁচুমাপের সাহিত্যগ্রন্থ হয়ে না উঠলেও তন্ত্রদর্শন ও সাধনধারাকে লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও সরস ভাষায় বর্ণনা করে সর্বসাধারণের উপলব্ধির বিষয়ে পরিণত করেছেন। নানারকম অভিচার ও নিয়মের কারণে তন্ত্রসাধনা দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যাবৃত এবং নেতিবাচক ভাবনার আবরণে আবৃত ছিল। কিন্তু লেখক বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র, শ্মশান, যোগপীঠ ভ্রমণ করে বিভিন্ন সাধুসঙ্গ লাভ করে সত্যকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তারফলে তন্ত্রনির্ভর সাধনা যা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা অচেনা ছিল, তাকে তিনি জ্ঞান-ভক্তির আধারে সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে তান্ত্রিকেরাও সাধনার গূঢ় রহস্যকে প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেন। কিন্তু লেখক তাঁদের নিগূঢ় সাধনার সারবত্তাকে যেমন তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তেমনি মানুষের কৌতূহলকে উস্কে দিয়ে পাঠককে তন্ত্রসাহিত্যের রসতীর্থে অনায়াসে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়।

৭. মরুতীর্থ হিংলাজ: কালিকানন্দ অবধূত

কালিকানন্দ অবধূতের ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) নিছক ভ্রমণকাহিনি হয়ে থাকে নি। এটি কাহিনিতে আদ্যোপান্ত একটি উপন্যাস। হিংলাজ যাত্রাপথের ভয়ঙ্করতা অতিক্রমের কথায় এখানে বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু লেখক বিষয়বস্তুকে ভ্রমণের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখেন নি। তাঁর জীবনসাধনা ও ধর্মসাধনার এক

রসময় অনুভূতি বিষয়বস্তুকে গতিময়তা দান করেছে। ইতিহাস, দর্শন ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য, সুখ-দুঃখের সমন্বয়ে গঠিত নানা ইতিহাস হিংলাজ দর্শনের কাহিনিতে জড়িত রয়েছে।

উপন্যাসের সূচনায় করাচিতে নাগনাথের আশ্রমের প্রাচীন দালানে আশ্রয় নিয়েছিলেন হিংলাজ যাত্রী কয়েকজন পুণ্যার্থী। এই নাগনাথের আশ্রম নাথসম্প্রদায়ের সাধুরা স্থাপন করেন। হিংলাজ যাত্রাভিলাষী সাধুসন্ত ও ভক্তদের আশ্রয়ের জন্যই মঠটি স্থাপিত হয়। হিংলাজ দর্শনার্থীদের মনে স্বাভাবিক কারণে হিংলাজের পুরাণ ও ইতিহাস প্রসঙ্গ এসেছে। দীর্ঘ যাত্রাপথের দু'পাশে রহস্য, রোমাঞ্চে পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের মুহূর্মুহ হাতছানি অপেক্ষা করছে—

ঘুম ভেঙে গেল একটা বুম বুম আওয়াজে। চোখ চেয়ে দেখলাম আকাশে
কে যেন এক পোঁচ আলকাতরা লেপে দিয়ে গেছে, একটি তারাও দেখা
যায় না। বুক কাঁপানো আওয়াজটা আসছে বহু দূর থেকে। আসছে সমুদ্র
থেকে—সমুদ্র গর্জাচ্ছে। এখন যত শীঘ্র নেমে পড়া। -পৃ.৫৩

চন্দ্রকূপ দেবতার ধুনিতেও ঈশ্বরবিশ্বাস, অলৌকিকতা এবং প্রতিকূল পরিবেশের ভয়ঙ্করতা ধরা পড়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মন্দিরে ধুনি গুরুত্বপূর্ণ। অগ্নিসাধনার কারণে ধুনির ব্যবহার হয়। লেখকের সরস বর্ণনা নৈপুণ্যে তা হৃদয়গ্রাহী রূপ লাভ করেছে—

সৃষ্টির কোন্ আদিকালে এই অখণ্ড অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নি জ্বালা হয়েছে, আজও
তা জ্বলছে সমানে। অনাগত অন্তহীন ভবিষ্যৎ জুড়ে জ্বলতে থাকবে এই
ধুনি। কখনও কোনও কালে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হবে না এই বৈশ্বানরের।
নিরবচ্ছিন্ন হবিঃস্রোত চাই আহুতির জন্যে। -পৃ.১৯৫

অঘোর নদীর নিস্তরঙ্গ জলধারায় অবগাহন করে পুণ্যার্থীদের পবিত্র হওয়ার প্রসঙ্গ আধ্যাত্মিকতা ও প্রতিকূল পরিবেশের ভয়াবহতায় চিত্তাকর্ষক কাব্যিক প্রকাশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। পথে বিভিন্ন মঠের বর্ণনায় নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড লেখক উল্লেখ করেছেন। মঠের মোহান্তদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'পীর' উপাধি ব্যবহার,

মহারাজ সম্বোধন, কানে কুণ্ডল কানফাটা নাথযোগীদের বিশেষত্ব। এছাড়া অঘোরযোগী, নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন পন্থ সম্পর্কেও লেখক জ্ঞাত ছিলেন বলে মনে হয়—

কানফাটিয়ে নাথ সম্প্রদায়ের সাধুদের কানে ছেঁদা করে একটা কিছু
পরতে হয় কানে— গেরুয়া পরে লম্বা কঙ্কে সম্বল করে, মাত্র আটাশ
বছর বয়সে নাথসম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী হিংলাজ দর্শনে এসে রয়ে
গেলেন অঘোর নদীর কূলে। লাসবেলা রিয়াসতের সর্বত্র এখন ইনি
'কোটরী পীর' বলে বিখ্যাত। আর করাচীর নাগনাথের আখড়ার
ছড়িওয়ালারা ডাকে 'অঘোরী বাবা' বলে। -পৃ. ২৬০-২৬১

মঠের বর্ণনা, আগত তীর্থযাত্রীদের হিংলাজ দর্শনে সাহায্যকারীর ভূমিকায় নাথসাধুদের তৎপরতা এবং সেবার ভূমিকা লক্ষ্য করে লেখক তাকে মানবসেবার ধর্ম বলে উল্লেখ করছেন। এখানকার সরকার প্রতিবছর এদের সাহায্য করে। হিংলাজ মন্দিরে আগত ভক্তরা সর্বপ্রথম মোহান্ত মহারাজের পূজো করেন। নাথসম্প্রদায়ে মন্দির বা মঠের প্রধানকে মোহান্ত বলা হয়। তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন, তা লেখক উল্লেখ করছেন—

কোটরী পীরের অসীম ক্ষমতা। এখানকার লোকে বিশ্বাস করে যে ইনি
মরা বাঁচাতে পারেন। পৃ.২৬১

অঘোরীবাবার কাহিনি, অঘোর নদীর বর্ণনা দিতে দিতে লেখক নিজেই শেষপর্যন্ত অবধূতে পরিণত হয়েছেন, নিজেকে রূপান্তর করছেন। অবধূতমার্গ গোরক্ষনাথের ধর্মদর্শনের সঙ্গে যুক্ত সাধনধারা। স্বাভাবিক কারণে নিজের ভালোলাগা ধর্মদর্শনকে প্রকাশ করতে নাথসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তাদের পূজো-পদ্ধতি, যোগলৌকিক ধারণা ইত্যাদি বিষয় উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

৮. জলের উপর পানি: স্বপ্নময় চক্রবর্তী

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাস (২০২৩) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে পাঠককে যে দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবন, জীবিকাসূত্রে এক জীবনবোধের অনন্যমাত্রা লাভ করেছে উপন্যাসটি। বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি উপন্যাসটির কথামুখ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় বিভাজন ভেদ করে জীবনে বেঁচে থাকা, জীবনসংগ্রাম, সংস্কৃতি এটাই তো মানুষের চিরায়ত সংস্কৃতি। সেইসূত্রে দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, ধর্মের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের কথা উপন্যাসে এসেছে। এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের কাহিনিরই নির্মাণ হল উদ্বাস্তু জীবনের ভেতর থেকে। ছিন্নমূল জীবনের মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিকে লেখক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

কাহিনিতে একাধিক চরিত্রের ভিড়ে বাংলার নাথসম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা উপন্যাসে অনেকটা স্থান জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। কৈলাস দেবনাথ নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ, শৈবযোগী সম্প্রদায়ের নেতা এবং সমাজসেবার কাজে যুক্ত আছেন। নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে বহন করে চললেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। গুণধর দেবনাথের উদ্বাস্তু কলোনিতে দিনযাপনের চিত্রে নাথসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত শিবপূজো ও শিবলিপ্তের আরাধনা প্রসঙ্গ লেখক বর্ণনা করেছেন। তাদের ঘরবাড়ির বিশেষ প্যাটার্ন-শৈলীর মত সাধারণ বিষয়ও লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষ শিবশক্তির সাধনায় বিশ্বাসী—

দেবনাথদের ঘরে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের নির্গত জিহ্বা মহাকালী সব
গুনলেন। -পৃ.২৬

তারা শৈব। ঘরের ঈশান কোণে তাই বেলের চারা লাগিয়েছে—

ঈশান কোণ শিবের স্থান। দ্যাখেন, ওই যে, বড়সড় হইছে। জানেন
তো আমরা দ্যাবনাথ। শৈব। দরকারে ব্যালপাতা নিব কিন্তু, বইল্যা
রাখলাম।-পৃ.৬০

নাথসম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মানুষদের মনোভাবকে লেখক
বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। তারা তাদের তুচ্ছতাচ্ছল্য করে ও অবজ্ঞার চোখে দেখে—

নাথ-দেবনাথদের ‘যুগী’ বলা হত। কাউকেই যোগসাধনা করতে দেখেন
নি অনঙ্গমোহন, তবু কেন ওদের ‘যুগী’ বলা হয় জানা নেই।-পৃ.৬৩
কৈলাসের বাবা বৈকুণ্ঠ নাথসম্প্রদায়ের পুরোহিত। নাথদের উপনয়ন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মণ্যবাদের
কারণে বল্লালসেনের রাজত্বে তাদের পতিত হওয়া, যোগসাধনার প্রতি অনাগ্রহ, শৈব
থেকে বৈষ্ণবধারায় উত্তরণ কোন কিছুই তাদের প্রসঙ্গে অনালোচিত ও অনালোকিত থাকে
নি। সময়ের অগ্রগতিতে নাথেরা শিবপূজার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছে। ব্রাহ্মণেরা তাদের
অধিকার কেড়ে নিয়েছে—এই সমস্ত সামাজিক খুঁটিনাটি বিষয়কে ঔপন্যাসিক স্বল্পটানে ও
কথায় বর্ণনা করে নাথসম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থানকে চিহ্নিত
করেছেন—

গুণধররা শিবপূজারি, তারই তো নিত্য শিবপূজার অধিকার। অথচ
পূজাটি করে অনন্ত চক্রবর্তী। ওই গাছতলাতেই ছোট চালা মতন করে
তার গলায় শনিদেবতার মূর্তি বসিয়ে রেখেছে। এই পূজাটাও অনন্ত
চক্রবর্তী বাগিয়েছে। সেই কবে, কোন জন্মে বল্লাল সেন ব্যাটা কী কল
করে গেছে।-পৃ.৯২

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কাহিনি উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করলেও শেষপর্যন্ত বিভিন্ন
সম্প্রদায়, মানুষের জীবনকাহিনি ও সংস্কৃতির সার্বিক পরিচয় উপন্যাসে সমন্বিত হয়ে
অসাধারণ নান্দনিক মহিমা লাভ করেছে।

অন্যদিকে মিরাজুল ইসলামের ‘মুঘল গীত’ (২০১৯) উপন্যাসে নাথসম্প্রদায়ের
এক কানাফাটা যোগীর আকবরের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে পোষা কুকুর নিয়ে বসে

থাকার চিত্র লক্ষ করা যায়। কুকুর বিশ্বস্ততার প্রতীক হলেও কালভৈরবের বাহন হিসেবে নাথসন্ন্যাসীরা সঙ্গী করেন। মুঘল আমলের সামাজিক- সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক খণ্ডচিত্র হিসেবে রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত উপস্থিত বৈদ্যের পোশাকেও নাথ কবিরাজের চিহ্ন মনে হতে পারে। ব্রজেন মজুমদারের ‘সন্ধ্যা দীপের শিখা’(২০১৯) উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় সোনা, রফিক চরিত্রের কথোপকথনে দেশভাগের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উঠে এলেও শেষপর্যন্ত সোনা দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে এদেশে চলে আসছে। এপার বাংলায় সোনার বড়ো হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নাথসম্প্রদায়ের যোগদর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নায়কের আত্মদর্শনে নাথপন্থের উদ্ভব, দর্শন, পরবর্তী সময়ে নাথপন্থের মানুষদের বৈষণ্য সম্প্রদায়ে চলে যাওয়ার ঘটনা উপন্যাস জুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। কৃষ্ণ দেবনাথের ‘রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ’(২০১৩) উপন্যাসে কুমিল্লার পালবংশীয় রাজা দেবপালের পুত্র গাভুরসিদ্ধ কীভাবে সিদ্ধযোগী চৌরঙ্গীনাথ হয়ে উঠছেন তারই কিছু প্রাচীন কাহিনির ফসল উপন্যাসটি। বাংলার অতীত ইতিহাস ও কিংবদন্তি বিশদে কাহিনিতে বিধৃত রয়েছে। উপন্যাসটি রচনায় কালপেঁচার বঙ্গদর্শন, চিত্রশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর চৌরঙ্গীনাথ সম্বন্ধীয় লেখা এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটক প্রভাবিত করেছে বলে লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর অন্য একটি উপন্যাস ‘প্রেমময়ী পার্বতী’ (২০১২) -তে শিব-পার্বতীর অনুভূতিপ্রবণ প্রেমকথা ঐশ্বরিক ভাবনায় অগ্রসর না হয়ে একেবারে রক্তমাংসের মানব-মানবীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে অতি সাধারণ যোগী-যোগিনী শিব-পার্বতীর কাহিনি লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে এক অনুপম রূপালেখ্য হয়ে উঠেছে।

৯. আলোর পথে: সুমনা সাহা

‘মীনচেতন’ বা ‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্যে দেখা যায় গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ কদলীরাজ্যে গিয়ে সেখানকার নারীদের ও নারীদেহের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে সাধনার পথ থেকে সরে এসে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবনকে বেছে নেন। অথচ নাথসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ ‘গোরক্ষবিজয়’-র মূল কথা হল, মানুষের মধ্যে শারীরিক সুখভোগের যে বাসনা থাকে তাকে উপদেশের মাধ্যমে দেহাতীত স্তরে পৌঁছে দেওয়া। সাধনমার্গের এমন একটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া যেখানে মন সহজানন্দে ভরে যায়। এখানেই চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে নাথযোগী সিদ্ধদের ভাবনাগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঠিক এই কনসেপ্টকে কেন্দ্রীয়শক্তি করে সুমনা সাহা তাঁর ছোটগল্প ‘আলোর পথে’ (২ এপ্রিল ২০২৪, ‘দেশ’ পত্রিকা) লিখেছেন। নাথপন্থের সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য ভর্তৃহরির তিনটি কাহিনিকাব্যের প্রভাব এ গল্পে আছে। গল্পটিতে যে চারটি অংশ আছে তার প্রথম তিনটিতে নাথযোগী ভর্তৃহরির লেখা তিনটি বইয়ের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি চতুর্থ অংশে আছে সাম্প্রতিক জীবন। সেখানে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম জীবনকে প্রভাবিত ও প্রতিভাসিত করে। ভাললাগা, ভালবাসা এমনকি জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ফেসবুকের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখিকা। ভারতীয় সাহিত্যে একাধিক ভর্তৃহরির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রাজা ভর্তৃহরি বা বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তৃহরি বা শতকদ্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরি এঁদের সকলের লক্ষ্য ছিল পারফেকশন্, জার্নি টুয়ার্ডস পারফেকশন।

সুমনা সাহা ‘আলোর পথে’ গল্পটি শুরু হয়েছে এক বসন্তদিনের দ্বিপ্রহরে। উজ্জয়িনী নগরীর রাজা কেশব শর্মা তাঁর মধ্যমপুত্র ভর্তৃহরিকে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্য মনে করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই যোগ্য মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রথম স্ত্রী সীতারানী

মারা যাবার পরে পিঙ্গলার দেহের আকর্ষণ ভর্তৃহরিকে সমস্ত নীতিবোধ, দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পিঙ্গলাকে প্রতিনিয়ত ভোগ করার বাসনায় রাজা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। পিঙ্গলা প্রেম থেকে নয়, ভয় থেকে মিলিত হতেন রাজার সঙ্গে; তার মন পড়েছিল এবং পুড়েছিল রাজসারথি সুধন্যর প্রতি। সুধন্য ও পিঙ্গলার প্রেম ছিল পারস্পরিক। কিন্তু রাজার কারণে তা ত্রিকোণ সঙ্কটে পরিণত হয়েছিল। ভাই বিক্রমাদিত্য সব জানতেন। জেনেও তাঁর কিছু করার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে ভর্তৃহরি রাজকাজ ফেলে শতককাব্য ‘শৃঙ্গারশতক’ রচনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যে লেখার উৎস ছিল নারীর দেহসৌষ্ঠব, ছলাকলা, কামকলা। সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ গল্পে প্রথম অংশে ভর্তৃহরির সংবেদনশীল মানসিকতা, প্রেমের নেপথ্যে বিরহ, নারীর প্রতি দুর্বলতা ও দুর্নিবার আকর্ষণ এবং পুরুষের চঞ্চলমতি মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আছে নাথসাহিত্যের মূল স্পিরিট।

কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা থেকে রাজা ভর্তৃহরির বোধোদয় এবং উত্তরণ ঘটে। সংসারে থেকেও কীভাবে সংসারের প্রতি নিস্পৃহ থাকতে হয় সেটা মাথায় রেখেই তিনি লিখলেন ‘নীতিশতক’। এখানে যে জীবনচরিত অনুসৃত হয়েছে তা নাথযোগীদের নির্দেশিত জীবন। নির্বিকল্প নিরাসক্ত নীরব হয়ে যথাযথ আচরণ করার কথা বলা হয়েছে ‘নীতিশতক’ কাব্যে। নাথপন্থের যে আবেদন সে আবেদন বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে জীবনচর্চা করা উচিত তার একটি প্রতিফলক হয়ে উঠেছে ‘নীতিশতক’ কাব্য। নাথপন্থের মূল আবেদনকে যথাযথ মান্যতা দিয়েছে এই কাব্য।

ভোগ, বিশ্বাসভঙ্গ দায়িত্বে অবহেলা এ সবই রাজা ভর্তৃহরির ট্রান্সফরমেশন ঘটায়। যার অব্যবহিত ফল ‘বৈরাগ্যশতক’। ‘বৈরাগ্যশতক’-এ আছে সংসারত্যাগী মানুষের জীবন

অভিজ্ঞতা। রাজা ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার দিয়ে একান্তে তপস্যায় যেতে চান। বিক্রমাদিত্য রাজি হন। তিনি বুঝতে পারেন কোনও এক গভীর বিতৃষ্ণা তাঁর দাদা ভর্তৃহরিকে চেতনার পথ দেখিয়েছে। এই বৈরাগ্য বা এই চেতনাই রাজা ভর্তৃহরির মুক্তির পথ। যে পথের সন্ধান নাথসাহিত্যের পাতায় পাতায় আছে। নাথযোগীদের অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন এ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। লেখা হয় ‘বৈরাগ্যশতক’। ‘আলোর পথে’ গল্পের চমক তার শেষ অংশে ‘আলোর পথে’। প্রেক্ষাপট আধুনিক। কিন্তু নৈতিকতা তার পরম্পরা মেনেই চলে। এখানে আলোর পথযাত্রী দু’জন না-থামার সংকল্প নিয়েছে। আর্নল্ড হুইটম্যান ওরফে অনি এবং আলোলিকা ওরফে আলো বসে আছে ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর উজ্জয়িনীতে। তারা কখনও শারীরিকভাবে মিলিত হয়নি তবু তাদের একের প্রতি অপরের কি টান। প্রতি মুহূর্তে একে অন্যকে হারিয়ে ফেলার ভয়। এখানে তো ভোগ নেই, তাহলে কী আছে? প্রেম। এই প্রেমই যুগ যুগ ধরে সবার জন্য জেগে আছে। ‘বৈরাগ্যশতকে’ ভর্তৃহরি লিখলেন আমরা যত ভোগ করি ভোগ আমাদের তত শেষ করে দেয়। রাজা ভর্তৃহরি থেকে আর্নল্ড পর্যন্ত যে জীবন সেখানে বৈরাগ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কাম। এই কামকে জয় করে আসে বৈরাগ্য। কিন্তু প্রেম তো শেষপর্যন্ত শরীরের কথা বলে। তাই চুম্বনে গল্পের শেষ হয়। রাজা ভর্তৃহরি সবই দেখেন। দেখেন কাম প্রেম মোহ বৈরাগ্য সব যুগেই একইরকম। নাথযোগীরা তাদের সাহিত্যে যে শুদ্ধ সহজ মায়াহীন জীবনের কথা লিখে গেছেন, সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ ছোটগল্প আমাদের সেই জীবনবোধকে উস্কে দেয়।

১০. পূর্ণচন্দ্র: গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক। এখানে বৃহৎ নাটকের পুষ্টি সাধনের উপযোগী কাহিনিবৃত্ত রয়েছে। মূল কাহিনি এক নির্জনবাসী মাতা-পুত্র ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্রের। এই কাহিনির সূত্রপাত প্রায় সতেরো বছর আগে। তখন ইচ্ছা ও তাঁর স্বামী রাজা শালিবান নিঃসন্তান দম্পতি। যোগী গোরক্ষনাথের কৃপায় তাঁরা পুত্রসন্তান লাভ করেন। কিন্তু ব্রতপালনে ত্রুটির কারণে যোগীর নির্দেশে বারো বছর পিতা ও পুত্রকে পৃথক থাকতে হবে। নাটকের শুরুতে দেখা যায় দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত... রাজদূত অপেক্ষা করছেন রাজপুত্র পূর্ণচন্দ্রকে রাজধানীতে পিতৃসকাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সুতরাং মাতা-পুত্রের নির্জন নিশিন্তবাসের শেষদিনে কাহিনিবৃত্ত শুরু। নাটকের শেষে দেখা যাবে ... মাতা ও পুত্র আর একত্রে থাকবে না বটে, কিন্তু নিশ্চিততা থাকবে, শান্তি থাকবে।

মূলকাহিনিতে বারংবার উৎকণ্ঠা ফিরে ফিরে এসেছে...প্রথমত বিমাতা লুনার চক্রান্তে পূর্ণচন্দ্রের কী বা পরিণতি হবে, সেখানে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত গুরু যোগী গোরক্ষনাথ কর্তৃক পূর্ণচন্দ্রের উদ্ধার হওয়ার পর পূর্ণচন্দ্রের চিন্তাভাবনা, কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল। তৃতীয়ত নাটকে অশুভশক্তির চক্রান্তজাল কীভাবে ছিন্ন হবে, তা নিয়ে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা ছিল। এই উৎকণ্ঠার মুহূর্তগুলিকে নাটকীয় করে তোলার কাজ সার্থকভাবে নাটকে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ণচন্দ্রকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার পর ইচ্ছাকে উন্মাদাগারে প্রেরণের দৃশ্যে এই উৎকণ্ঠার পূর্ণরূপ প্রকাশ পেয়েছে। আরিস্টটল-কথিত ‘কম্পলিকেশন’ এখানে চরম আকার ধারণ করেছে। নাটকের শেষ অংশে সন্ন্যাসীবেশে পূর্ণচন্দ্র নিজ পিতা শালিবানকে ঔষধ প্রদান করে সুস্থ করেন। একই সঙ্গে তিনি সেবাদাসের সহায়তায় জম্মু-লুনার চক্রান্তজাল ভেদ করেন।

এখানেই ফলিং অ্যাকশনের মাধ্যমে শালিবান-ইচ্ছা-পূর্ণচন্দ্রের জীবনে শান্তি ফিরে এসেছে। পূর্ণচন্দ্র নিশ্চিন্তে বৈরাগ্যসাধনের জীবনে ফিরে যান। ক্যাটাসট্রফিতে এভাবেই শুভশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে।

‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকের পরিসরে একাধিক উপকাহিনি-শাখাকাহিনি আছে। প্রথমেই দেখা যায়, রাজা শালিবান বারো বছর নিজ স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বসবাস করেননি। সুতরাং পরিবারগত হিসেবে রাজা শালিবান-লুনা-জম্মু একটি পৃথক উপকাহিনি হয়ে ওঠার দাবি রাখে। এরপর, সেবাদাস-লুনা-জম্মুর পূর্বকাহিনিটিও একইভাবে পৃথক উপকাহিনি যা নাট্যকারের নিপুণ দক্ষতায় নাটকের শেষ অঙ্কে গিয়ে শালিবান-লুনা-জম্মুর কাহিনিতে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে। ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সেবাদাস যে বিষের সন্ধান পেয়েছিল, সেই বিষ ব্যবহার করেই জম্মু রাজা শালিবানকে তিলে তিলে হত্যা করছিল।

আরেকটি উপকাহিনি সুন্দরা-সারীর কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। সুন্দরা প্রকৃত যোগীপুরুষের সন্ধান করতে গিয়ে বহু ভেকধারী ভণ্ডের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, দামোদরও তাদের একজন। এই উপকাহিনি পূর্ণচন্দ্রের মূল কাহিনিতে মিশে যায় তৃতীয় দৃশ্যের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে...যখন পূর্ণচন্দ্র ভিক্ষার জন্য সুন্দরার কাছে যায়। নাটকে সুন্দরা-সারীর উপকাহিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই নাটকের শাখাকাহিনিটি- অর্থাৎ দামোদরের কাহিনি এখানেই গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে। দামোদরের কথা পরবর্তী প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

নাটকের আর একটি উপকাহিনি হল নাথসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথ এবং শিষ্যবর্গের কাহিনি। গোরক্ষনাথ সিদ্ধ নাথযোগী। মানবচরিত্র থেকে ওষধি, ভবিষ্যৎদর্শন থেকে পথপ্রদর্শন-সবক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ। এই উপকাহিনি পূর্ণের জন্মের অনেক পূর্ব

থেকেই শালিবান-ইচ্ছার দাম্পত্যজীবনে আশীর্বাদ সঞ্চার করেছে। গোরক্ষনাথের উপকাহিনি থেকে দামোদরের শাখাকাহিনি জন্মলাভ করেছে। গোরক্ষনাথের শিষ্য কুটিল দামোদরের ভোগলিঙ্গা এবং প্রতিশোধ স্পৃহার কাহিনিটি সুন্দরা-সারীর উপকাহিনির সঙ্গে মিশেছে। নাটকের শেষ অঙ্কে গিয়ে দামোদর পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

উল্লিখিত প্রতিটি কাহিনির ক্ষেত্রে নিজস্ব এক বা একাধিক উৎকণ্ঠা – মুহূর্ত আছে।

যেমন—

১. লুনা-জম্বুর কাহিনিতে উৎকণ্ঠা চরমে ওঠে যখন নাটকের শেষদিকে বিষপ্রয়োগের ফলে অবসন্ন রাজা শালিবানকে দেখা যায়।
২. সুন্দরা-সারীর উপকাহিনিতে চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সুন্দরা মালা গাঁথে পূর্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। প্রেমে ব্যাকুলা নারীর উৎকণ্ঠার সেটাই চরম ক্ষণ।
৩. পূর্ণচন্দ্র যখন সুন্দরার নিকট ভিক্ষা নিতে যায়, তখন গোরক্ষনাথের কাহিনিতে স্বয়ং গোরক্ষনাথের উৎকণ্ঠা চরমে। পূর্ণচন্দ্র কি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? ইত্যাদি।

সুতরাং প্রশংসাতীত দক্ষতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাহিনি বিন্যাসের সময় নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে উৎকণ্ঠা-বিন্দুগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে নাটক হয়ে উঠেছে গতিময় এবং আনন্দ্য।

এই নাটকে বহির্দৃষ্ট ঘটেছে সংসারের অশুভ শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরমুখিনতার শুভশক্তির; অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের; ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সত্যের। কিছু উদাহরণ যেমন—

১. পূর্ণের প্রতি লুনার আসঙ্গলিঙ্গার বিরুদ্ধে পূর্ণের বিবেক।
২. লুনার প্রতিরোধস্পৃহার বিরুদ্ধে পূর্ণের ঈশ্বরনির্ভরতা।

৩. দামোদরের কামিনী- লালসার বিরুদ্ধে সুন্দরার প্রকৃত পুরুষের অনুসন্ধিৎসা।

৪. সুন্দরার প্রণয়ের প্রত্যুত্তরে পূর্ণের বৈরাগ্য।

৫. জম্মু-লুনার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গোরক্ষনাথের মহিমা।

অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে সেবাদাস চরিত্রে। অতীতে নিজের অশুভকর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তার আত্মগ্লানি নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেবাদাস জম্মু- লুনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার প্রণয় উৎপাদনে সুরার ভূমিকা সারীকে যখন শিথিয়েছে, তখন তার মধ্যে পাপবোধ দেখা যায় নি। যাইহোক, এতে নাটকের গতিপথ পাল্টায় নি। কেননা অনাবিল ভালোবাসায় বিশ্বাসী সুন্দরা ঐ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

রাজা শালিবানের চরিত্রটি অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়াপুত্তলিকা। এটা চরিত্রের দুর্বলতা হিসেবে দেখলে চলবে না- বস্তুত এই রকমটাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। মহাদেবের মহিমা প্রচারে রাজা শালিবান চরিত্র একটি উপযুক্ত জমি তৈরি করেছে। সেজন্যেই শালিবান দ্বন্দ্বময় এবং দুর্বল। পূর্বে রাজা শালিবান ইচ্ছার ভালোবাসায় মোহিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মৃগয়ায় গিয়ে তিনি জম্মু চর্মকারের কন্যা লুনাকে দেখেন—

‘ছুঁড়ি পাতকোর জল তুলছিল, রাজা মৃগয়া কণ্ঠে গিয়া দেখেই মোহিত।’

(১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

পূর্ণের প্রতি বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও লুনার সামান্য প্ররোচনায় তিনি বিচারনীতি ভুলে যান...অভিযুক্ত পূর্ণের বক্তব্য শোনেননি। নাটকের শেষে তিনিই আবার সাক্ষ্যপ্রমাণসহ জম্মু-লুনার কীর্তির প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করেন।

পূর্ণচন্দ্র চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে-

‘করিব, মা, ঈশ্বর প্রত্যয়

সংশয়ে না দিব স্থান।’ (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

কিছুক্ষণ পর বিমাতার চক্রান্ত প্রত্যক্ষ করে তার বিমর্ষ অবস্থা...

‘কুৎসিত সংসার; / পিশাচের আনন্দের ধাম! / ভীষণ- নরক হ’তে শত গুণে মাতা’
(১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

পরে যোগী গোরক্ষনাথের কৃপায় পূর্ণচন্দ্রের যেন দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁর মধ্যে আর কোন বিচলন কখনো দেখা যায় না। পূর্ণচন্দ্রের চরিত্রের শুভ্রতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে সংসারের লোভ-শঠতা-কুটিলতার প্রতীক দামোদর এবং জম্মু। তাদের চরিত্রে ক্ষণিকের জন্যও পবিত্রতার ছায়াপাত ঘটে না। চরিত্র বিন্যাসের এই দক্ষতায় নাটকের সর্ব অবয়বে দ্বন্দ্বময়তা সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানেই নাট্যরস সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের সার্থকতা।

এই নাটকে সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষতার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায্য হবে। নাটকে ছন্দোবদ্ধ (অসম- চরণবিশিষ্ট প্রবহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দ/ গৈরিশ ছন্দ) এবং গদ্য-দুই রীতিতে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্তরালে আছে নাট্যকারের অভিপ্রায়। যেমন—

১. রাজা শালিবান, যোগী গোরক্ষনাথ এবং পূর্ণচন্দ্রের সংলাপ পদ্যছন্দে রচিত। অবশ্য ভিক্ষার সময় পূর্ণচন্দ্রের সংলাপ গদ্যরীতির। ইচ্ছা যেখানে পাগলিনী, সেখানে তার সংলাপ গদ্যে রচিত। সুতরাং যোগী গোরক্ষনাথ, পূর্ণচন্দ্র যেহেতু নাটকে বক্তব্যের বাহক, সেহেতু তাঁদের সংলাপ পদ্যরীতির। এখানেই বোঝা যায় রাজা শালিবানের চরিত্রটি একই কারণে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২. সারীর সাহচর্যে সুন্দরার সংলাপ পদ্যময়। অথচ সুন্দরা যখন যোগী গোরক্ষনাথ বা পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে, তখন সেই সংলাপ পদ্যরীতির। সামাজিক উপভাষায় বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ ভাষায় কথা বলার ধারণাটি স্বীকৃত। ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের যুগ থেকেই ভাষার বিশেষায়ন রয়েছে। গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

৩. জম্বুর সঙ্গে লুনা কথা বলে গদ্যভাষায়। শুধু তাই নয়...লুনার ভাষায় সামান্য সংস্কৃতায়নের সন্ধান পেয়ে জম্বু তাকে শাসায়...

‘আমি দশবার বারণ কল্লুম ফের পণ্ডিত কথা কচ্ছিস, পোড়ারমুখি?’

(১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

অর্থাৎ লুনা ও জম্বুর পারস্পরিক সংলাপে স্থানীয় ভাষারীতি এবং পেশাগত উপভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন—

‘সুয়ান ভাতার, জুতা খাকি, কেজিয়া, ঝাড়ুখাকি।’

গিরিশচন্দ্রের প্রখর শ্রেণিচেতনার বৈশিষ্ট্য এইখানে প্রকাশিত হয়েছে। আবার খলচরিত্রের উপযুক্ত ভাষার প্রয়োজন মিটে গেল এইভাবে।

৪. দামোদরের মুখের ভাষাও গদ্য। তবে জম্বু চর্মকারের গদ্য একরকম, দামোদরের ভাষা অন্যরকম। দামোদরের ভাষায় কলকাতাই ইয়ারবাজ মোসাহেবের ভাষারীতি ব্যবহার করেন গিরিশচন্দ্র—

‘সাধুর পুত্র সাধু গোরোকনাথের পুত্র একটা কিছু দিগ্গজনাথ!’

(১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

‘মাইরি বলছি, আমার কুড়ি বছর বয়স, ফাঁকতালে দুটি শূন্য লাগিয়ে ছিলুম।’

(২য় অঙ্ক, ২য় গভাঙ্ক)

‘আমি বেশি চাইনি, সুধু মাগী- বশকরা অযুধটি আমায় শিখিয়ে দাও।’

(৩য় অঙ্ক, ১ম গভাঙ্ক)

পরিশেষে একটি প্রসঙ্গ আলোচনা দরকার। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকে অসাধারণ দক্ষতায় বিপ্রতীপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে নাটকের প্রাণস্পন্দন প্রকট করে তুলেছেন। দুটি নারী চরিত্রের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে: লুনা এবং সুন্দরা। উভয়ের সংলাপে গদ্যরীতির পাশাপাশি পদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষারীতির দ্বৈত অস্তিত্বে উপলব্ধি করা যায় যে লুনা চরিত্রে দুটি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত। পিতার সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে লুনা হয়ে ওঠে মূর্তিমতী শয়তান—আর রাজা শালিবানের সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে লুনা ভদ্রতা, সম্ভ্রমবতী নারীর প্রতিমূর্তি। অন্যদিকে সুন্দরাও যখন যোগী গোরক্ষনাথ অথবা পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে, তখন পদ্যভাষা ব্যবহার করে। নচেৎ সারী অথবা দামোদরের সঙ্গে গদ্যরীতি ব্যবহার করে। সুতরাং, সুন্দরার মধ্যেও দ্বৈতসত্তা বর্তমান। শঠ, ভণ্ডের সঙ্গে সে দুষ্ট আচরণ করে। এখানে লুনা ও সুন্দরার পার্থক্য বুঝতে হবে। সুন্দরা সৎ উদ্দেশ্য পূরণে দুষ্টমি করে এবং লুনা অসৎ উদ্দেশ্য পূরণে দুষ্টমি করেছে। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দুষ্টমির যে গৌরব, তা গিরিশচন্দ্রের চেয়ে বেশি ভালো কেই বা জানবে? সুতরাং সুন্দরা যদি গিরিশচন্দ্রের আত্ম-প্রক্ষেপণ হয়ে থাকে; যোগী গুরু গোরক্ষনাথ হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রক্ষেপণ। গুরুই জানেন মানব চরিত্র। কেউ বারো বছর গুরুর সেবা করেও ফল পায় না; আবার গিরিশচন্দ্র দুষ্ট কর্ম করেও শুদ্ধ চিত্তের জোরে গুরুকৃপা এক লহমায় অর্জন করেন।

‘পূর্ণচন্দ্র’ আইডিয়াধর্মী নাটক। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন পূর্ণচন্দ্র ভগবতবিশ্বাসমূলক নাটক। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকের আখ্যান রচনা

করেছিলেন হিন্দি নাটক ‘পূরণ ভকত’ অবলম্বন করে। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবে প্রচলিত যোগী গোরক্ষনাথ এবং রাজা রসালুর লোককথা অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছিল। নাট্যকার মূল কাহিনির ক্ষেত্রে নিজস্ব কল্পনামূলক কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনা যোগ করে পূর্ণাঙ্গ নাটকটি রচনা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে যোগী গোরক্ষনাথের ইন্দ্রিয় আসক্তিহীনতা গিরিশচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বলা যায়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁকে মঙ্গলময় রূপে উপাসনা করার শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ নাটকের কাহিনিতে যুথবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। পাশাপাশি বাংলায় প্রচলিত যোগী গোরক্ষনাথ এবং যোগী চৌরঙ্গীনাথের কাহিনিও তাঁর অজানা ছিল বলে মনে হয় না। ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন যে গিরিশচন্দ্র ধর্মমূলক নাটক রচনার সময় ধর্ম জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় নানা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও চিন্তায় বিভোর থাকতেন। শুধু তাই নয় ধর্ম সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উদারতা ছিল। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ—সবকিছু সম্বন্ধে নাটক রচনা করেছিলেন।^১ উল্লেখ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্ণচন্দ্র হলেন যোগী চৌরঙ্গীনাথ। গিরিশচন্দ্রের জীবনচেতনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে তিনি নাটক লেখার আগে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনি সবকিছুই পড়তেন। এবিষয়ে অপরেণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেন তখন তিনি যে বিষয়ে যাহাকিছু
ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য সমস্তই পাঠ করিতেন। ...অনেক সময়
নূতন নাটক লেখা প্রসঙ্গে কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ‘লিখব কি
পড়বারই সময় পাচ্ছি না’।^২

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর (১৮৮৪ খ্রি.) থেকে মহাপুরুষদের জীবন-দর্শন বিষয় অবলম্বন করে নাটক রচনা শুরু করেন। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব চরিত,

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ইত্যাদি রচনার পর গিরিশচন্দ্র ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকটি লেখেন। ১৮৮৮ খ্রি. ১৭ মার্চ এমারেন্ড থিয়েটারে পূর্ণচন্দ্র নাটক প্রথম অভিনীত হয়। দামোদর, ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি ও গোলাপসুন্দরী। ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর। ইন্দ্রিয়- আসক্তি অতিক্রম করা প্রকৃত সাধক ও যোগী জীবনের আদর্শ। গিরিশচন্দ্র ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকে পূর্ণচন্দ্র ও সুন্দরা চরিত্রের সাহায্যে আদর্শগুলিকে নাটকে প্রকাশ করলেন। জিতেন্দ্রিয় পূর্ণচন্দ্র আদর্শ চরিত্র, তাঁর চরিত্রে কোনো কালিমা নেই। নাট্যকার এই রকম একটি আদর্শবান যোগী পূর্ণচন্দ্রকে সন্ন্যাসব্রতধারী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখাবেন খুবই স্বাভাবিক। তাই পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার প্রেম নিবেদনের সময় বলেন—

‘দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ,
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন
আনন্দের লীলা অবিরাম ;
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
এক আত্মা হব দুইজনে,
চিরদিন রবে,
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে,’

[৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

নাথপন্থে বলা হয়েছে যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তিনি আমি বা আত্মা। এই আমি বা আত্মা চিদ আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ সত্তা। গোরক্ষনাথ বলেছেন—

‘ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথঃ মনোনাথস্তু মারুতঃ।’

[হঠযোগ প্রদীপিকা, ৪/২৯]

পূর্ণচন্দ্র নাটকেও মনে হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ দৈহিক মিলন অতিক্রম করে আত্মার মিলনই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই পূর্ণচন্দ্র সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক নয়। যোগী গোরক্ষনাথের আদর্শ পূর্ণচন্দ্রের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র হলেন বাস্তবের বা ইতিহাসের যোগী চৌরঙ্গীনাথ চরিত্র। ড. কল্যাণী মল্লিক মনে করেন যে পাঞ্জাবের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী সালবাহন-পুত্রের নাম পূরণ-ভগত, চৌরঙ্গীনাথেরই পূর্বনাম পূরণ। গিরিশচন্দ্রের ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটক ঐকে অবলম্বন করেই রচিত।^৭ পূর্ণচন্দ্রকে কামিনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। নাটকে অন্ত্যজ কন্যা বিমাতা যুবতী লুনা পূর্ণচন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়েছে। নাট্যকার অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে লুনার প্রেমের ব্যর্থতা ও প্রতিহিংসাকে তুলে ধরেছেন। নাটকীয় সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণচন্দ্র চরিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারফলে হিন্দি নাটক ‘পূরণ ভকত’ গিরিশচন্দ্রের নাট্য মানসে আকর্ষণ করলেও নাটকের দেহে পাঞ্জাবের কাহিনি থাকলেও নাটকের আত্মায় কিন্তু বাংলার নাথপন্থের কাহিনি স্থান লাভ করেছে।

নাটকের পূর্ণচন্দ্র নাথপন্থের চৌরঙ্গীনাথ। চৌরঙ্গীনাথের ‘প্রাণসংকলী’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনি পাওয়া যায় তার সঙ্গে ‘গোখবিজয়’ গ্রন্থে উল্লিখিত অনুরূপ কাহিনির মিল লক্ষ করা যায়।^৮ বাংলা নাথসাহিত্যে তিনি গাভুর সিদ্ধ নামে পরিচিত। দেবী দুর্গার অভিশাপে তিনি শালবান রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সৎ মায়ের প্রতি আসক্তির অভিযোগে রাজা তাঁর হাত-পা কেটে দেন। হিন্দি ‘পূরণ ভকত’ নাটকেও অনুরূপ ঘটনা স্থান লাভ করেছে। তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য এবং গোরক্ষনাথের গুরুভাই ছিলেন। ‘গোখবিজয়’ গ্রন্থের একাধিক স্থানে তার উল্লেখ রয়েছে।^৯ আর্যাবর্তের ভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত দুই কাহিনির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ড. পঞ্চানন মণ্ডল চৌরঙ্গীনাথ ও গাভুর সিদ্ধকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।^{১০} তিনি আরও বলেছেন—

গোর্খ-বিজয়, ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর মতো গাভুর চৌরঙ্গী- সৎমা কাহিনীটিও যে একদা বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়া আর্য্যাবর্তের ভিন্ন প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল প্রাণ- সংকলীর উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে তাহার বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।^৭

এমনকি আজও বাংলায় ধর্মঠাকুরের পুজোয় চৌরঙ্গীনাথকে নিবেদন করে ফুল দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

পূর্ণচন্দ্র নাটকের কয়েকটি গান, ‘এসেছে নবীন সন্ন্যাসী’, ‘আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি’, ‘ধরা ত দেয় না হাওয়া’ প্রভৃতি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্যদিকে নির্বিকল্প সমাধি রূপের জীবন্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়- ‘যোগাসনে মধ্যধ্যানে মগ্ন যোগীশ্বর’ গানটিতে। যোগীগণ সংযমের সাহায্যে দেহের পাশ-সমূহকে অতিক্রম করেন। এক সময় যোগী পূর্ণ রূপে উপাস্য পরমশিবের অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই পূর্ণ অহংরূপ সত্তা যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন শিব-শক্তির সামরস্য ঘটে। সিদ্ধযোগী সর্বপ্রকার জাগতিক সম্বন্ধ ত্যাগ করে ঈশ্বরে পূর্ণ সমাহিত থাকেন। প্রথম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে দামোদর ও সেবাদাসের কথোপকথনে সেবাদাস চিত্তচাঞ্চল্য দূর করার কথা বলে গুরুমহাত্ম্যকে প্রকাশ করেছেন যা আসলে নাথপন্থের যোগসাধনা পদ্ধতির অংশ। অন্যদিকে দামোদর ভণ্ড শিষ্য, সে গুরুনিন্দা করেছে। আবার নিজেকে গোরক্ষনাথ বলে পরিচয়ও দিয়েছে। সুন্দরা বুঝতে পারে সে ভণ্ড সন্ন্যাসী। সারী ও সুন্দরার সংলাপেও দামোদরের শঠতা ধরা পড়েছে। দামোদর চরিত্রের মতদ্বৈধতা ও শঠতা রূপের পরিচয় অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এইখানে গোরক্ষনাথের মহাত্ম্য ও নাথপন্থের যোগধারার বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন জনের সংলাপে। দামোদর সুরার সংলাপের প্রত্যুত্তরে বলেছে...

‘দা। দেখ, আমি স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নি; তবে, তোকে কৃপা করেছি; আমি
গোরক্ষনাথ - জানিস সাক্ষাৎ শিব।’

(১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

নাথপন্থে গোরক্ষনাথী ধারায় স্ত্রী-সংসর্গ বর্জিত কায়াসাধনা বা যোগসাধনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। গোরক্ষনাথকে আদিনাথ শিবের অবতার হিসাবেও নাথপন্থে ধরা হয়। সবকিছু মিলিয়ে পূর্ণচন্দ্র ভগবত-বিশ্বাসমূলক নাটক হলেও তখনকার দর্শক সমাজের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘রেজ এন্ড রাইয়ৎ’ পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন—

এক ‘পূর্ণচন্দ্রে’ গোপালবাবুর (গোপাললাল শীলের) বিশহাজার
টাকার উপর আদায় হইয়াছে।^৮

‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটক ১২৯৪ বঙ্গাব্দ ৫ই চৈত্র প্রথম অভিনীত হয়। ‘এমারেন্ড থিয়েটারে’ ‘পূর্ণচন্দ্র’ অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত একটি কবিতা মহেন্দ্রলাল বসু পাঠ করে শোনান। কবিতাটি হল—

‘সঞ্চালিত বাসনায় মত্ত মন সদা ধায়,
বারণ না মানে হয় প্রমত্ত বারণ!
অবহেলি প্রতিবাদ যখন যা উঠে সাধ,
আশার ছলনে ভুলি করি আশ্বাদন।
আছে যার ধন জন রসহীন সে জীবন-
প্রেমের কাঙ্গালী কেবা তার সম হয়!
বিসর্জন প্রেম-আশে স্বার্থ- আশে সবে আসে,
বিড়ম্বনা - বুঝিবে কি অন্ধ সে ঈর্ষায়!
প্রতারণাপূর্ণ হাসি, নহি আর অভিলাষী,
পরিতৃপ্ত-তিক্ত বোধ হয়য় সমুদয়;
বিমল কবিত্ব রসে অন্তর আনন্দ রসে
রস-বশে রঙ্গালয় করেছি আশ্রয়।
দেখায়ে প্রাণের ছবি, ভাবে ভোর গায় কবি;
প্রাণ খুলি ধরি তুলি চিত্রে চিত্রকর।

ভাঙ্গিয়া কালের দ্বার, প্রকাশে ঘটনা হার,
হাওয়ায় নূতন সৃষ্টি করে নটবর।’ ইত্যাদি....

‘ঈশ্বর মঙ্গলময়, শিক্ষার নিমিত্ত তিনি মানবকে দুঃখ দেন,— অসংশয় চিত্তে ভগবানে বিশ্বাস রাখো’— গিরিশচন্দ্র ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন।^৯ গিরিশচন্দ্র কবিতাটিতে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের জীবন আগাগোড়াই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞান মানুষের জীবনে তত্ত্বজ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি করে। তাই অবিদ্যা নাশ করে তাতে মন ও বাসনার অবসান সাধন গোরক্ষনাথের সাধনার লক্ষ্য। এই তত্ত্বজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান বা মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত জ্ঞান। সাকারবাদী গিরিশচন্দ্র রচিত কবিতাটির সঙ্গে এই তত্ত্বজ্ঞানের সৌসাদৃশ্য অনেকটাই লক্ষ করা যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও মনে করতেন ‘মন ও মুখ এক করাই সর্ব সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন’। সেই কারণে হয়ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন—

তোমার হৃদয়-আকাশে অরুণোদয় হয়েছে, নইলে কি ‘চৈতন্যলীলা’

লিখতে পারো, শীগগির জ্ঞান-সূর্য প্রকাশ পাবে।^{১০}

যাই হোক ঠাকুরের কৃপালাভ করে ‘বুদ্ধদেব’, ‘বিল্বমঙ্গল’, ‘রূপ-সনাতন’, ‘পূর্ণচন্দ্র’, ‘পাণ্ডবগৌরব’, ‘শঙ্করাচার্য’ প্রভৃতি নাটকে তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রকাশ লক্ষ করা গেল বা খুলে গিয়েছিল বলা চলে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে গোরক্ষনাথ, শিষ্য সেবাদাস ও অন্যান্য শিষ্যগণের আবির্ভাব ঘটেছে। সেবাদাস উল্লেখ করেছেন যে গোরক্ষনাথ শৈবযোগধর্মের সাধু এবং তিনি শিবের অংশ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন। গোরক্ষনাথের সংলাপে নাট্যকার বলেছেন—

‘ধরাধামে যোগধর্ম করিতে প্রচার
শিব- অংশে মহা শৈব জ্যোতির্ময় বপু!’

(৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

সেবাদাস গোরক্ষনাথের ২য় শিষ্যের গুরুলীলা জানতে চাওয়ার প্রসঙ্গে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তাতে গোরক্ষনাথের যোগলৌকিক সিদ্ধির কথাও নাটকে এসেছে—

‘সে। ছাড়, ছাড়, বৈস কেবা কূপের ভিতর?
যে হও, সে, হও, হিত যদি চাও -
তাজ রজ্জু, বারি লই আমি,
পিপাসিত গুরুদেব ;
প্রেত, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, ভৈরব,
টুটিবে গৌরব যদি রোষণে শ্রীগুরু।’

(৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

যোগ সাধনায় নারী প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ সেবিষয়ে সেবাদাসের একাধিক সংলাপ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ নাট্যকার নাথপন্থের দর্শন ও সাধনপ্রণালী বিষয়ে সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। গিরিশচন্দ্র ব্যক্তি জীবনে ১৯০৮ সালের পর কিছুদিন কাশীতে কাটান, সেসময় তিনি বেদান্ত চর্চা করেন। তখন ভক্তিমার্গ নয়, জ্ঞানমার্গ তাঁকে প্রভাবিত করে।

৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে গোরক্ষনাথ ও পূর্ণচন্দ্রের সংলাপ নাটকীয় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যোগী গোরক্ষনাথ যোগীর পালনীয় আচরণের কথা বলেছেন পূর্ণচন্দ্রকে—

‘গো। শুন বৎস!
কঠিন এ সন্ন্যাস- আশ্রম।
তুমি আজীবন যতনে লালিত,
এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল?’

আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
দারুণ আশ্রম, কভু অর্দ্ধাসন,
অনশনে যাবে কভু,
সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিদুপানে।
শীত, গ্রীষ্ম, ভীষণ তাড়ন,
ঝঞ্জাবাত, ঘোরতর বারিবরিষণ
তরুসম সহিতে হইবে।
বিহীনসম্মল, শয্যা- ধরাতল,-
বসন- বঙ্কল,
আচ্ছাদন- বিভূতি কেবল,'

শুধু তাই নয় যোগাভ্যাসের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত এবং যোগসাধনার প্রতিবন্ধকতা
বিষয়েও পূর্ণচন্দ্রকে জানানো হয়েছে—

‘যোগাভ্যাস বিজন কাননে,
ভীষণ গজ্জনে
ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ,
কোটা কোটা মশকদংশন—
মনোস্থির হবে কি তোমার?’

নাথসম্প্রদায়ের ‘হঠযোগ প্রদীপিকা’ গ্রন্থেও যোগাভ্যাসের অনুরূপ পরিবেশের পরিচয়
পাওয়া যায়—

‘এবংবিধে মঠে স্থিতা সর্বচিত্তাবিবর্জিতঃ।

গুরুপদিস্তিমার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ।।’ -১/১৪

নাটকে শেষপর্যন্ত কূপ থেকে পূর্ণচন্দ্রকে উদ্ধার করে গোরক্ষনাথ তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান
করেছেন। তাঁর শিষ্যগণ সমবেত কণ্ঠে নিরাকার ব্রহ্মসাধনার জয়গানে মুখর হয়েছেন—

‘যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর।

শিশু শশী নাহি আর, অঙ্ককার নিরাকার,
এক নাহি দুই আর প্রকৃতি নিখর।।
কাল বদ্ধ বর্তমানে, বোম কেশ ব্যোম পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর।।’

(৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন সব নিরাকার হয়ে যাবে তখন শিব ছাড়া সবকিছুই অজ্ঞান স্বরূপ, এই দৃষ্টিতে পৌঁছাতে পারলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় – নাথপত্নের এই দর্শনকেই নাট্যকার ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকে প্রকাশ করলেন। তবে পূর্ণচন্দ্র ধর্মমূলক নাটক হলেও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কাহিনি বিশেষ গতিময়তা লাভ করে চিত্তচাঞ্চল্যের উদ্বেক করেছিল। পুত্রসম পূর্ণচন্দ্রের কাছে বিমাতার নগ্ন ও সমাজবিরুদ্ধ প্রেম নিবেদন এবং পিতার হৃদস্পন্দন অবরুদ্ধ করে দেওয়ার মতো বাস্তব ঘটনা গিরিশচন্দ্রের খুব কম নাটকেই দেখা যায়। কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সুন্দরা, গোরক্ষনাথ প্রমুখ চরিত্র স্বাতন্ত্র্যবোধ অর্জন করেছে। নাটকের শেষে ধর্মভাব প্রবল হয়ে উঠেছে ঠিকই, তবুও বলা যায় বিষয় যথেষ্ট নাটকীয় ভাবাত্মক হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

আধুনিক মানুষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিড় টান এই ধরনের সাহিত্য রচনার মূলে কাজ করেছে। একালের চিন্তাশীল সৃজনশীল মানুষেরা সেকালের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছেন একালের পাঠকদের। কোথাও দায়, কোথাও বা ভালোবাসা বোধ থেকে রচিত হয়েছে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পের জটিল প্লট যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে হাজির হয়েছে নাথপত্নের বিচিত্র রূপ।

এখানে যে উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকগুলি বিশ্লেষিত হল তার সবগুলি সরাসরি নাথধর্মকে কেন্দ্র করে নয়। বেশকিছু রচনায় মূলত চর্যাপদ ও বৌদ্ধসাধনতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে নাথসংস্কৃতি। ‘অঘোরীমা ষোড়শীনাথ’ উপন্যাসে একালের পাপিয়া জীবন উপলব্ধিতে প্রাপ্ত নাথধর্মের সারাৎসারের রসোদগার দেখা গিয়েছে। ‘ময়নামতীর উপাখ্যান’ উপন্যাসে নাথযোগিনীর জীবনালেখ্যে সাধনার রহস্যময় তত্ত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে। উপন্যাসের প্লট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের। ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নাথসিদ্ধ যোগী চৌরঙ্গীনাথ। নাটকটিতে যোগী গোরক্ষনাথের ইন্দ্রিয় আসক্তিহীনতা গিরিশচন্দ্র ঘোষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ ছোটগল্পে যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য নাথযোগী ভর্তৃহরির সৃষ্টিশীলতা, বৈরাগ্য ও সাধনা প্রধান বিষয় হিসেবে অভিনবত্ব লাভ করেছে। কিন্তু লেখকেরা ফ্যাশব্যাক, যোগধারা, মেডিটেশন, প্ল্যানচেট, আত্মস্মরণে নাথধর্ম, সাধনা ও সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছু উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যে সমকালের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত দৃষ্টি দিয়ে নাথপন্থের রহস্যে আলোকপাতের প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের বয়ানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বাইরের সাধারণ মানুষদের সমন্বিত করা ও সাধনার সুযোগ করে দিতেই নাথপন্থ সাহায্য করছে এবং প্রবহমান রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৯।
২. গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য, (সম্পা.), পৃ. ২৬।
৩. কল্যাণী মল্লিক, *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, পৃ. ৭৫।
৪. গোর্খবিজয়, *পঞ্চগানন মণ্ডল* (সম্পা.), পৃ. ১১।
৫. ঐ, পৃ. ৬২, ৭৩।
৬. ঐ, পৃ. ৪১-৪২।
৭. ঐ, পৃ. ৪৩।
৮. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *গিরিশচন্দ্র*, পৃ. ২৩৬।
৯. ঐ, পৃ. ২৩৪-২৩৫।
১০. ঐ, পৃ. ২৩৫।

উপসংহার

বৃহত্তর বাংলায় নাথযোগী পরম্পরা প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে। মূলত অথর্ববেদে বর্ণিত ব্রাত্য-শৈব উপাসনা, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগসাধনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সংশ্লেষ হিসেবে কালক্রমে নাথযোগ-ধারা আত্মপ্রকাশ করে। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথের পূর্বেই নাথপন্থের উদ্ভব ঘটলেও তাঁদের সময়ে তার পূর্ণতা ঘটে। উঁচু-নীচু ভাবনাবর্জিত নাথযোগ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন যোগী গোরক্ষনাথ, অন্যদিকে মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথযোগ পরম্পরার সঙ্গে তন্ত্র অর্থাৎ কৌলধারাকে যুক্ত করেছিলেন। আদিতে নাথপন্থে ছিল কৌল, শাক্ত, ত্রিক এবং সিদ্ধধারা। বর্তমানে যে নাথসম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তা হল গোরক্ষনাথীধারা। ভক্তি আন্দোলনের কারণে শিব-শক্তি পূজো ব্যাপকভাবে নাথপন্থে গৃহীত হওয়ায় নাথদর্শনে পরিবর্তন ঘটেছে। গোরক্ষনাথ যে বামমার্গকে অস্বীকার করেছিলেন তা কাপালিক, বৈষ্ণব নাথদের মধ্যে অনুসৃত হতে থাকে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, জালন্ধরনাথ, গোরক্ষনাথ উভয়েই কৌল নাথসিদ্ধ ছিলেন। শুধুমাত্র পুরাতন কৌলশাস্ত্রে এই সিদ্ধদের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র নয়। বাম, দক্ষিণ এবং কৌলমার্গ একই সময়ে বর্তমান ছিল। এই নামগুলি শক্তিকর্ম উপাসনা থেকে এসেছে, যার অর্থ তাঁরা ছিলেন কৌলমার্গের উপাসক। শিব, ভৈরব ও শক্তির তাঁরা উপাসনা করেন। বিগত ৩০০-৪০০ বছরে নাথদর্শনের ইতিহাস ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। তার কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাথসম্প্রদায়ের মানুষের বৈষ্ণব হওয়া এবং নাথদের বিপরীত ধারায় চলে যাওয়ায় এই সমস্যার কারণ। কৌল বাহ্যিকরূপে বৈষ্ণব কিন্তু সেই সম্প্রদায় কখনোই বৈষ্ণব নয়। তাঁরা প্রকৃতিগত ভাবে নাথসম্প্রদায়। তাঁদের আরাধ্য দেবতা—শিব,

শক্তি এবং নারায়ণ। কবি জয়দেবও কৌলই ছিলেন। তিনি অন্তরে শাক্ত, বাহ্যত শৈব এবং সমাজের চোখে ছিলেন বৈষ্ণব। এমনকি লাকুলীশ ধারা বর্তমানে হারিয়ে গেলেও নাথপন্থের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। লাকুলীশ রাওয়ালপন্থী হয়ে নাথধারায় মিলিত হয়েছে।

মহাভারতে পাশুপাত ধারার কথা বলা হয়েছে যা শৈবধর্মের আদিনাম। এখানে পশু, পাশ ও পতির দর্শন অনুসরণ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে যোগ ও তন্ত্র রূপে বিকশিত হয়েছে। গুজরাটের গিরনারের নাথযোগী সন্ন্যাসী অবন্তিকানাথ পাশুপত কৌলধারায় দীক্ষিত এমন একজন নাথসন্ন্যাসী। পাশুপত কৌলধারা আজও নেপাল, কাশ্মীর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে অব্যাহত ও প্রবহমান রয়েছে। এঁরা প্রাচীন শিব-শক্তির সাধনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে যোগী সৎপুরানন্দনাথ, নেপালে কৌলান্তকনাথ বা যোগী সত্যেন্দ্রনাথ মহারাজ এখনকার সময়ের অন্যতম কৌল নাথযোগী। নাথপন্থে বালরূপে পূজিতা শ্রীকুরুকুল্লাদেবী হলেন যোগমায়া। তিনি গোরক্ষনাথের নারীরূপ, দক্ষিণামূর্তির মতো আদিনাথ থেকে শিব পর্যন্ত সকলেই এই পর্যায়ে পড়েন; এমনকি বর্তমান সিদ্ধরা। তাঁরা শিব ছাড়া আর কেউ নন। বিভিন্ন লীলার কারণে কুরুকুল্লা এবং দক্ষিণামূর্তি পৃথক রূপ ধারণ করেছেন। দক্ষিণামূর্তি হলেন শিব, কুরুকুল্লা তাঁর পার্শ্বদেবতা। দেবী কালী, বজ্রযোগিনী, ছিন্নমস্তা, তারার সঙ্গে কুরুকুল্লার সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলার সাধক সমাজে দেবী কালী, তারা, ছিন্নমস্তা পরিচিত হলেও দেবী কুরুকুল্লা ও তাঁর সাধনাক্রম হারিয়ে যেতে বসেছে। বজ্রযানী সম্প্রদায়ে এই বিদ্যার সাধনা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ সহজ ও বজ্রসাধক হওয়ায় নাথ কৌলধারায় কুরুকুল্লা সাধনাক্রম কমবেশি লক্ষ করা যায়। তবে একান্তভাবেই গুরুমুখী সাধনাক্রম হওয়ার কারণে সর্বসাধারণের সঙ্গে এই সাধনাক্রমের তেমন যোগাযোগ নেই। মৎস্যেন্দ্রনাথ শ্রীবিদ্যাসাধনায় কামরূপে কাদিবিদ্যারও সাধনা

করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ কাদিবিদ্যা ও জালন্ধরনাথ হাদিবিদ্যা (হাড়িবিদ্যা) সিদ্ধ ছিলেন। গোরক্ষনাথ ব্রহ্মচর্য নির্ভর সিদ্ধ-যোগমার্গের প্রবর্তন করেন। কানুপানাথ বা কাহুপা বামমার্গের নাথসিদ্ধ ছিলেন। সারা ভারতেই গোরক্ষনাথের সিদ্ধ যোগধারার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। কৌলরূপের পরিচয় গোরক্ষনাথেরও রয়েছে, তবে তিনি মুখ্যত শৈব পাশুপত যোগী ছিলেন। অন্যদিকে নাথ অঘোরীধারার নটেশ্বরীপন্থে শ্মশানসাধনা, শবসাধনা, যোগিনীসাধনা, ব্যোমসংস্কার, পিশাচসাধনা ইত্যাদি কাপালিক ও বামমার্গের সাধনার অস্তিত্ব বর্তমানেও অংশত প্রচলিত রয়েছে। নাথঅঘোরীপন্থ বাস্তবিকভাবে একটা ভিন্ননামে নিবৃত্তিমার্গ। যোগিনী কৌলমার্গের গৃহস্থধারার গৃহীত ধারণা ও প্যাটার্নগুলিকে ঘুরিয়ে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নাথ অঘোরীধারা শৈব-কৌলমার্গ। অবশ্য নারীর কামিনীরূপ ত্যাগ করে মাতৃরূপ বা জননীরূপের সাধনা স্বীকৃত হয়েছে। বজ্রযানী ধারার সঙ্গে নাথধারার কৌল ও অঘোরীধারার বর্তমান সময়েও পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভাবের আদান-প্রদান ও সাধন-প্রক্রিয়াগত সমান্তরাল সহাবস্থানের চিত্র লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্যোমশঙ্কর অঘোরী বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। অথচ তাঁর সঙ্গে নাথযোগীদের ভাবের আদান-প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগী রামনাথ অঘোরীর সঙ্গে তাঁর বক্তৃৎস্বরে সাক্ষাৎ এবং সাধনার ক্ষেত্রে নেপালে উভয়ের পারস্পরিক সহাবস্থানের চিত্র সেই সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতীয় নাথ সন্ন্যাসীরা তাঁকে (ব্যোমশঙ্কর অঘোরী) অঘোরী বলে ডাকতেন। নাথ অঘোরীদের সাধনাক্রমে একটি অন্যতম পর্যায় কাপালিক সাধনা। কাপালিক সাধনাকে সাধারণ মানুষ ভীতিকর মনে করলেও তারা সহজ ও শুদ্ধমার্গের সাধক। কিন্তু সাধনাক্রম ভীষণ শক্তিশালী ও রহস্যময়। শুধুমাত্র নাথ অঘোরীধারায় নয় অন্য ধারাতেও দর্শনীয়োগীর কাছে অঘোরযোগী (কাপালিক হয়ে) সহজসাধনা ও সরলতার চর্চা করেন। মনের সরল প্রকৃতি থেকে মৃত্যুর রহস্যভেদ

শিক্ষায় তাঁদের সাধনার লক্ষ্য। তাঁরা খোলা বইয়ের মত নিজের হাতের তালুতে বিশ্বসংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এই নাথগুরুরা সকলেই গৃহস্থদের সাধনায় সঙ্গে রাখতে চান, তার কারণ গৃহস্থরা যাতে পথভ্রষ্ট না হন। তাই গৃহস্থ নাথদের অনেকেই সমাজে একা থেকে যান জোগী হিসেবে নন, যোগী হিসেবে। উল্লেখ্য যাঁরা যোগদর্শন ধারণ করেন তাঁদের *যোগী* বলা হয়, অন্যদিকে জঙ্গমের বৈরাগীদের *জোগী* বলে। শেষপর্যন্ত নাথসন্ন্যাসীদের লক্ষ্য থাকে নাথ গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী কেউ যেন আদর্শ-ভ্রষ্ট না হন। আর যোগসাধনার কষ্টসাধ্য পথে তাঁরা পূর্বজন্মের কর্মফল ও পাপ মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর থাকেন।

বর্তমান নাথপন্থেও অনেক শাখা বা পন্থ রয়েছে। যেমন—মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধকৌলমত, যোগিনী কৌলমত, গোরক্ষনাথের পাশুপত শৈব-যোগমত, প্রাচীন আইপন্থ বা আদিনাথমত। এছাড়া জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথের বামমার্গ এবং লাকুলীশ মত রয়েছে। এইভাবে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগধারা, পাশুপত, রসেশ্বর, কাশ্মীরি শৈবধারা (ত্রিকমত) নাথমতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এইসব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈদিক, অবৈদিক সাধনতত্ত্বও নাথপন্থে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মত নাথপন্থকে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ নাথপন্থ শৈবমত থেকে বিকশিত হলেও পরবর্তী সময়ে অনেক বৈদিক, অবৈদিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে নাথমত যৌগিক মত হয়ে গিয়েছে। গোরক্ষনাথ আবার পরবর্তীকালে নাথমত পুনর্গঠনের সময়ে নাথপন্থে পাশুপত ও আগমধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ আবার গৃহস্থকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে যুগলসাধনা প্রবর্তন করলেন। গৃহস্থকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে এককসাধনা চলে না। সেই কারণে মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগিনী

কৌলমত চালু করেন। গোরক্ষনাথ ধারায় অবশ্য ব্রহ্মচর্য সাধনা অর্থাৎ একক সাধনায় রয়ে গেল।

নাথপন্থের সাধনায় ‘দ্বৈতাদ্বৈতবাদ’ মান্য সিদ্ধান্ত বিশেষ। অবধূত মতই হল নাথমত। অবধূত সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ রয়েছে। নাথপন্থে যোগহীন জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ণ সাধনপথ। আবার কৌলসাধনার কারণে নাথপন্থে প্রাচীন শক্তিপ্রধান শৈবমতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ ভৈরবীর কাছ থেকে এই মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। নাথপন্থে তান্ত্রিক মতের সঙ্গে কাশ্মীরি শৈবমতের (ত্রিকমত) সংমিশ্রণ ঘটেছে। ওঁ-কার সাধন, নাদানুসন্ধান, অজপা জপ, ষট্চক্রসাধনা, কুণ্ডলিনী যোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ও তান্ত্রিকযোগের প্রভাব নাথধর্মে পড়েছে। নাথসিদ্ধ পরম্পরায় ভোগের মাধ্যমে যোগের অস্তিত্ব মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌল পরম্পরায় থাকলেও কিন্তু গোরক্ষনাথ ভোগের মাধ্যমে যোগের দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করেন নি। তবু তন্ত্রের যোগ ভোগবাদের কিছু কিছু বিষয় স্বীকৃত রয়েছে। তান্ত্রিক সাধনায় (বিন্দুসাধনায়) বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী মুদ্রা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এর বাইরে নাথপন্থে পঞ্চতত্ত্বধারণা, শিবশক্তি সামরস্য, শিবশক্তিযোগ, বজ্রদেহত্ব বা পঞ্চদেহ, প্রণব উপাসনা, সোহহং জপ, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ, শক্তিসাধনা, কৌলাচার, নাড়ীযোগ, শব্দব্রহ্মবাদ, প্রতীক উপাসনা ইত্যাদি সাধনা স্বীকৃতি লাভ করেছে। শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের সমতুল্য শিবের অর্ধাঙ্গিনী শক্তি বা গৌরীর পূজা আজও প্রচলিত আছে। এই কারণে শিবের যোনিলিঙ্গ আরাধনা লক্ষ করা যায়। নাথসম্প্রদায়ের মানুষ অবশ্য শিবের বাণলিঙ্গ উপাসনা করেন। যোনি এবং লিঙ্গ তান্ত্রিক আচার্যদের মতে শক্তি ও শক্তিমানের (পার্বতী এবং শিব) প্রতীক। নাথযোগী সম্প্রদায়ে শক্তি উপাসনায় বাম এবং দক্ষিণ দুই-

মার্গেরই উপাসনা প্রচলিত আছে। এককথায় নাথধর্ম শৈব-পাশুপত ধারার সঙ্গে তন্ত্র, যোগধারা, কৌল, কাপালিকমত, সিদ্ধধারা ও যৌগিক রসায়নবিদ্যা মিলিত হয়ে এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় ঐতিহ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সামাজিক বিন্যাসে নাথযোগীরা সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। তাঁরা বৈদিক মুনিধারার অনুসরণকারী বলে গায়ত্রীসাধনা ও যোগাভ্যাস তাঁদের ধর্মের অঙ্গ। বৈদিক মুনিধারার মত তাঁরা বর্তমানে গোপালন, হলকর্ষণ, বস্ত্রবয়ন করেন। বেদ-অধ্যয়ন, দৈবকর্ম, দেবপূজা, গুরুগিরি, নাদ-উপবীত ধারণ তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড। আদিবৈদিক যুগের মুনিধারার আলোকেই নাথযোগী সমাজের আচার-আচরণ বিচার্য, পরবর্তী কালের বর্ণবৈষম্যদুষ্ট দৃষ্টিতে নয়। প্রাচীন যোগপন্থীর বিধান মতে নাথেরা ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনাকারী আদিব্রাহ্মণ। সাবিত্রী গায়ত্রী-দীক্ষা ও উপবীত গ্রহণ করে নাথসম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত হয় এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য সকল নাথযোগী নাথগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ওঁ-কার জপ করেন, জ্ঞানচর্চা করেন এবং যোগসাধনা করেন। সন্ন্যাসী- যোগীগণ নাদ-জনেউ বা নাদ উপবীত গ্রহণ করেন। নাথ যোগদীক্ষার আগে বর্ণব্যবস্থা থাকে, কিন্তু যোগদীক্ষার পরে তাঁদের একটিই পরিচয় তাঁরা প্রত্যেকেই ‘নাথ’। এমনকি যোগদীক্ষার পর নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধনায় সমান অধিকার লাভ করেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ‘শাবরমন্ত্র’ অনুসারে তাঁরা শাস্ত্রীয় আচার আচরণ পালন করেন। নাথধর্ম সন্ন্যাসপ্রধান ধর্ম, স্বাভাবিকভাবে স্মার্তরা তাকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। নাথসম্প্রদায়ের মানুষও ব্রাহ্মণ্যধারার কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেন নি। নাথসন্ন্যাসীরা সামাজিক বর্ণবিভাগ মানেন না। নাথগৃহস্থ যোগীরা সমস্ত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সামবেদের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করেন। কিছু ক্ষেত্রে যজুর্বেদের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু সামবেদ ব্যবহারই এঁদের কৌলিক রীতি। নাথযোগ সাহিত্যে

সূক্ষ্মবেদ বা সুষ্মবেদ কথাটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটা আদিবৈদিক যুগের নিবিদধারার বেদের গূঢ়-রহস্যার্থসূচক এবং সাধন-সঙ্কেতমূলক বেদ বা জ্ঞান। নাথযোগীদের কাছে এটা সঙ্কেতশাস্ত্র বা শূন্যশাস্ত্র।

পূর্বভারতে গৃহস্থ নাথধারা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারা ও প্রাচীন শিবযোগী আদিনাথ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা, অসম, ত্রিপুরায় এখনও গৃহস্থ নাথদের মধ্যে আদিনাথ সম্প্রদায়ের পূজোবিধি, সংস্কার ইত্যাদি রয়ে গিয়েছে। আদিনাথ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ নাথযোগীগণ মনে করেন তাঁরা পরমাত্মা শিবের বিন্দুতে জাত বলে শিবগোত্রীয় যোগী সম্প্রদায়। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমীর বেশকিছু সামাজিক আচার-সংস্কারের যৌক্তিকতা লক্ষ করে দশবিধ সংস্কারের কতকগুলি বিধান গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম যোগমতে সম্পন্ন হয়। ‘শাবরমন্ত্র’ তাঁদের কাছে সিদ্ধমন্ত্র বিশেষ। সন্ন্যাসী নাথযোগীর উপস্থিতি ও স্বীকৃতি মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যে দেখা গিয়েছে। তবে ব্রাহ্মণ হিসেবে নয়, যোগী হিসেবেই নাথসম্প্রদায়ের খ্যাতি সর্বত্র লক্ষ করা যায়।

আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের সভ্যতায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের বড়ো অবদান হল যোগশাস্ত্র বা যোগবিজ্ঞান। এই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি নাথসম্প্রদায়ের সাধুরা আজও অব্যাহত ও সচল রেখেছেন। নাথমঠ ও মন্দিরগুলি যোগচর্চা করে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগ-তপস্যায় দীক্ষিত নাথসাধুরা যোগীশ্বর, জ্ঞানীশ্বর, ত্যাগীশ্বর আদিনাথ শিব ও তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রদায়িনী মহাশক্তির সাধনধারা প্রচার করেছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর-তত্ত্বগুলিকে সরল, সরস করে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চনের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ মানুষের

মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিস্তার সাধন করেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৃহী, সন্ন্যাসী, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নিগুণবাদী সকলেই নাথমন্দির-মঠ-নাথধারাকে নিজের বলে মনে করতে পারেন। বাংলায় নাথধর্ম জীবিত ও প্রবহমান রয়েছে নাথসন্ন্যাসীদের কল্যাণে। অন্যদিকে গৃহস্থ নাথদের অনেকেই স্বধর্মবিমুখ হলেও বলা যায় নাথধর্মের একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ রয়েছে। তার উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছিল সত্য, কিন্তু তার ভিত্তি কখনোই শিথিল হয়ে যায় নি। এই ভিত্তিটি আদি-বৈদিকযুগের মুনিধারা থেকেই গড়ে উঠেছে।

নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসাহিত্যে কায়াসাধনা বা দেহতত্ত্ব লক্ষ করা যায়। ‘তনের বারমাসি’ ও ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বভারতীয় সিদ্ধসাহিত্যের ভাব-ভাবনা ও সাধনার প্রকাশ ঘটেছে। নাথদর্শনের ব্যাখ্যামূলক সাক্ষেতিক ভাষা ‘তনের বারমাসি’ গানের বিশেষত্ব। প্রতীক বা সাক্ষেতিক ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে ‘তনের বারমাসি’ সিদ্ধসাহিত্যের অভ্যন্তর অর্থ ও রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে। নাথসিদ্ধরা দেহতত্ত্বের রূপকে অতিসহজে যা বোঝেন, অন্যকেও গানগুলির মধ্য দিয়ে তা বোঝাতে পারেন। নাথযোগীরা যোগের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কর্মফল ভোগ এবং পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি প্রত্যাশা করেন। কায়াসাধনার এই লক্ষ নিয়েই সিদ্ধসাহিত্যের ধারায় ‘তনের বারমাসি’ ও ‘মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। নাথসম্প্রদায়ের জীবনুজ্জীবাদের তত্ত্বটি অন্যান্য সাহিত্য ও লোকগীতির মত এখানেও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আদি-বৈদিকযুগ থেকে গণসমাজে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মীয়-বিশ্বাস ও সাধনপ্রণালীর সংকেত রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার সমাজজীবনে কায়াসাধনামূলক এই সাহিত্যধারা আজও প্রচলিত আছে। এমনকি গৃহস্থ নাথেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর কাছে বিষয়গুলি আয়ত্ত করে নিজের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পথ সন্ধান করেন।

সর্বোপরি কায়াসাধনা, উল্টোসাধনা, ষট্‌কর্মসাধনা, চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব, বিন্দুসাধনা নাথপন্থের মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী বলে স্থূলবেদের যাগযজ্ঞের বিধানে আগ্রহী নন। তাঁরা যোগের সাহায্যে শরীর, আত্মা ও পরমশিবের সংযোগসাধন সম্ভব বলে মনে করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ এখানে অমনস্ক যোগের কথাও বলেছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ কথিত ও প্রবর্তিত নাথমত সন্ন্যাসী যোগী, গৃহস্থযোগী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যই অব্যাহত ছিল। তাঁর উপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অব্যয় এবং বিভেদমুক্ত যোগপরম্পরা—এই দিকটিও ‘মীন-মহুন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ’ গ্রন্থে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সর্বোপরি ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও শব্দ ব্যবহারের কারুকার্য ও কখনশৈলীর নাটকীয়তায় সিদ্ধসাহিত্যধারা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় সহজে উত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়।

এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই যোগীযাত্রা ‘চম্পাবতী’ গ্রামীণ নাটক হিসেবে ২৪ পরগণার সুন্দরবন, মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন ওড়িশায় প্রচলিত আছে। সেখানে ‘চম্পাবতী’ যাত্রায় ভিলেন চরিত্র হিসেবে ছিলেন একজন দরজি। পরবর্তী সময়ে দরজির জায়গায় উঠে এসেছে যোগী বা যুগী চরিত্র। নাটকটি লোকসমাজে সম্পাদিত হওয়ার কারণে এই যোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি যোগী নাটকের কোনো লিখিত বা মুদ্রিত রূপ ছিল না, মৌখিক সাহিত্য হিসেবে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। তার কারণে ২৪পরগণার সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক নামে যোগীযাত্রা নাটক অভিনীত হয়। কোথাও ‘বাঘাম্বর কর্তৃক যুগীনাথবধ’ বা ‘চম্পাহরণ পালা’ নামে যোগীযাত্রা অভিনীত হত। তবে যোগীযাত্রার সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না বলে আমাদের অভিমত। মেদিনীপুরে আবহমান কাল ধরে যোগীরগান প্রচলিত আছে। তারফলে গ্রামীণ সমাজে তাদের সেই প্রভাবের কারণে যোগীযাত্রার বিভিন্ন পালায় নাথযোগী চরিত্রের

অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তাছাড়া মুসলমান শাসকদের আমলে সুফি ও ফকিরি ধারার সঙ্গে নাথযোগীদের যোগধারার একটা আপোষ সমন্বয়ের কারণে নাথপন্থের কথা-কাহিনি সেখানে মিশে গিয়েছে।

অন্যদিকে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য নাথসিদ্ধদের যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বনে নাথসাহিত্যে বহু যোগীর গান রচিত হয়েছে। এখনও এই ধরনের যোগীর গান রচিত হচ্ছে এবং গাওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন পূজা, অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উমা, মেনকাকে অবলম্বন করে যোগের যে সমস্ত কাহিনি ও আচরণ প্রচলিত আছে সেইসব বিষয়েও যোগীর গান রচিত হয়। প্রাচীন সঙ্গীতের রস আশ্বাদনের জন্য যোগীরগান আবহমান কাল ধরে মানুষের মনের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। গ্রামীণ লোকগানের সুর, কোথাও ভাটিয়ালি গানের সুরে ত্যাগ-বৈরাগ্যের চেতনার সঞ্চারণ ঘটানোই যোগীরগানের মূল লক্ষ্য। যোগীরগান এখন কেবল নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্য সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষেরা এগুলিকে কথকতা বা নাটকের মত করে পরিবেশন করেন। পূর্ববঙ্গে যোগীরগানের এই রকম নাট্যরীতির পরিবেশনা দেখা যায়। তবে মাধুকরী ও ব্রহ্মসঙ্গীত পর্যায়ে যোগীরগানগুলির মাধ্যমে নাথপন্থের যোগীগণ আজও সাধারণ মানুষকে নিবৃত্তিমার্গে অনুপ্রাণিত করেন। গৃহস্থ নাথযোগীরাও নির্দিষ্ট সুরে এই গানগুলি গেয়ে সাধারণ মানুষকে তার সুরে বিমোহিত করেন। নাথসন্ন্যাসীরা নিয়মিত নির্গুণ ভক্তিসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত চর্চা করেন, লেখেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এমনকি নাথমঠে নিয়মিতভাবে সঙ্গীতের রস-ভাব আশ্বাদন করে সাধারণ মানুষ নাথযোগ পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হন। আদিনাথপন্থী যোগী রাজচরণনাথ, কৌলযোগী সৎপুরানন্দনাথ, গোরক্ষনাথপন্থী যোগী আনন্দনাথ, নাথ অঘোরীধারার সাধক যোগী বাসুদেব মহারাজ রচিত যোগীরগানগুলি নাথপন্থের সজীব ও প্রবহমান ধারার দৃষ্টান্ত বহন করছে।

গোরক্ষনাথের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি গোরক্ষনাথের গানে স্থান পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোরক্ষনাথের গান জনপ্রিয় হয়েছে। কেবলমাত্র নাথসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিস্তারের উদ্দেশ্যে গোরক্ষনাথের গান রচিত হলে তা নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া নাথসম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মানুষের নাথ-পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা ঘটে নি। তার কারণ গোরক্ষনাথের গান বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় নাথসম্প্রদায়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এছাড়া কোনো সাম্প্রদায়িক বোধজনিত অলৌকিকত্বের প্রচার ছিল না বলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও গোরক্ষনাথের গান এতটুকুও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। বরং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন সংগ্রাম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, কৃষি উৎপাদন, গবাদিপশুর নিরাপত্তা ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গানগুলি রচিত হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ তার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পান। সর্বোপরি সাধারণ গায়নের দলের মুখে মুখে গোরক্ষনাথের গানগুলি কয়েকশো বছর ধরে চলে এলেও মূল কাহিনির কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি, বরং পাঠবৈচিত্র্য লাভ করেছে। গোরক্ষনাথের গানগুলি সমাজ-ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার ধর্ম হিসেবে বাংলার সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছে বলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়েছে। গোরক্ষনাথ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উর্ধ্ব অসাম্প্রদায়িক চেতনা স্থাপন করেছেন। এই ধরনের গানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গোরক্ষনাথের প্রভাব থেকে বোঝা যায় বৃহত্তর বাংলায় নাথপন্থের প্রভাব কতখানি পড়েছে। এও দেখা যাচ্ছে নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধারার প্রভাব অতিক্রম করে চলার সাহস দেখাতে পেরেছেন। এমনকি

মুসলমান সংস্কৃতিকে কিছুক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত নাথযোগী সম্প্রদায়ের পারিভাষিক শব্দ ও প্রকাশভঙ্গী গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে বাংলা, অসম ও ত্রিপুরায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রভাব অতিক্রম করে নিজেদের কুলাচার রক্ষা করতে পারছেন।

‘তিননাথের গান’ ও ‘ত্রিনাথের মেলা’ এক নয়। নাথসম্প্রদায়ে তিননাথের গান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের গল্প ও গান। ত্রিনাথের পূজো আসলে দত্তাত্রেয়নাথের পূজো। ত্রিগুণের মিলন অর্থেই ত্রিনাথের মেলা। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের মিলন প্রাধান্য পেয়েছে বলে ত্রিনাথের মেলা। তিননাথ ও ত্রিনাথকে কেন্দ্র করে যে নাথযোগ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কাজ করেছে প্রাক-বৈদিকযুগের মুনিধারার ব্রহ্মবাদের প্রভাব। পূর্বভারতে অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) এবং উত্তরবঙ্গে তিননাথের গান এবং ত্রিনাথের মেলা এখনও জীবিত ও প্রবহমান। উত্তরবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে তিননাথের গান ও ত্রিনাথের মেলা প্রচলিত থাকলেও পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে নাথসম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তা প্রচলিত রয়েছে। অথচ ‘তিননাথের পাঁচালী’ অঞ্চল বিশেষে নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে পূর্বভারতে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এখানে তিননাথ মানবগুরু হয়েও দেবগুরু বা পরমেশ্বরের মহিমা অর্জন করেছেন। এঁদের পূজোর প্রধান উপকরণ হল যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ভক্তি। তারফলে এই অপূর্ব ধর্মসাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভলগ্ন থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যেও নাথপন্থ ও নাথসাহিত্যের পরিচয় উদ্ধৃত হতে থাকে। তবে নাথধর্মকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে নয়,

প্রাচীন ঐতিহ্যের আধুনিক ভাষ্য রচনায় এখানে লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে। এইভাবে প্রাচীন-মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ে এসেও বাংলাসাহিত্যে নাথপন্থকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। আহমেদ মাওলার ‘ময়নামতী উপাখ্যান’, মোহিত কামালের ‘লুইপা’র কালসাপ’, শওকত আলীর ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, রিয়া মুখার্জীর ‘অঘোরী মা ষোড়শীনাথ’ দেবনাথ বকসীর ‘অঘোরীর আনন্দকানন’, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’, কালিকানন্দ অবধূতের ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘জলের উপর পানি’, মিরাজুল ইসলামের ‘মুঘল গীবত’, ব্রজেন মজুমদারের ‘সন্ধ্যাদীপের শিখা’, কৃষ্ণ দেবনাথের ‘রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ’, ‘প্রেমময়ী পার্বতী’ প্রভৃতি উপন্যাস ও সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ প্রভৃতি ছোটগল্প এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পূর্ণচন্দ্র’ ইত্যাদি নাটকে নাথপন্থের যোগধর্ম, সাধনপ্রণালী, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করেছে। লেখকেরা ফ্ল্যাশব্যাক, যোগধারা, মেডিটেশন, প্ল্যানচেট, আত্মস্মরণে নাথধর্ম, সাধনা ও সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছু উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যধারায় সমকালের অভিজ্ঞতার নিরিখে নাথপন্থের রহস্যে আলোকপাতের প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে।

আজও নাথসম্প্রদায়ের সমস্ত রীতিনীতি, সাধনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। সেই কারণে প্রত্যক্ষবাদের মানদণ্ডে গুরুবাদী এই আধ্যাত্মিক পরম্পরা ও সাহিত্যকে উপলব্ধি করা এককথায় অসম্ভব বলা যায়। যোগদর্শন অন্তর্বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের সমীকরণবাহী একপ্রকার সাধনমার্গ।

গৃহস্থ নাথসম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব-স্মৃতি ছাড়া নাথসংস্কৃতি, দর্শন খুব-বেশি চোখে পড়ে না। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন নাথমঠে আজও

নাথপন্থের সাধনধারা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত ও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের শিষ্য গৃহস্থ নাথেরা অবশ্য নাথযোগী পরম্পরা মেনে চলেন ও জানেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলায় নাথযোগী সন্ন্যাসী পরম্পরা অতীত গৌরব অব্যাহত ও প্রবহমান রেখে চলেছেন। অথচ বাংলায় নাথপন্থের গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু নাথধর্মের সাহিত্য ও যোগপরম্পরা মঠ থেকে গৃহস্থ নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, সেই বিষয়টি আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। স্বাভাবিক কারণে বর্তমানেও বাংলায় নাথপন্থের মঠ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে লিখিত অগ্রস্থিত সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার বিস্তৃত অবকাশ রয়ে গিয়েছে বলা যায়।

ভারতবর্ষে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ সহ অন্যান্য নাথসিদ্ধগণ ‘দ্বৈতাদ্বৈত’ নামে এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই কারণে ‘সিদ্ধপদ্ধতি’-কে সিদ্ধমত, সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগপন্থ, অবধূতমত, গোরক্ষনাথী, মৎস্যেন্দ্রপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন মত এবং মার্গ নাথপন্থে সম্মিলিত হয়ে এক নতুন পন্থের উদ্ভব প্রশস্ত হয়েছে, যেখানে নাথপন্থ বা যোগপন্থ নামে সাহিত্য প্রসিদ্ধ হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় নাথপন্থে শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত দুটি ধারা রয়েছে। শাস্ত্রীয় ধারাটি বেদ, উপনিষদ এবং যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত; লোকায়ত ধারাটি পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ, লাকুলীশ, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, অঘোর, সহজিয়া, সিদ্ধ, অবধূত, কৌল, ভৈরব, সাংখ্যদর্শন ইত্যাদি ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। দেহাত্মবাদী যোগসাধনা আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই চলে আসছে। প্রাগাধুনিক যুগে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী ও নাথপন্থী শৈবদের হাতে যে বাংলা চর্যাপদ রচিত হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে আরও পরে নাথগীতিকার মধ্যেও দেহাত্মবাদী কায়াসাধনার কথা পাওয়া যায়। তবে নাথপন্থের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে

জীবনস্রোতকে রুদ্ধ করে চিরজীবী হওয়ার এক অভিনব পন্থা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। এই দেহতত্ত্বমূলক সাধনা নাথপন্থ থেকে ধর্মসাহিত্যসহ অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য গ্রহণ করেছে। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মাঝখানে উভয়ধর্মের সমন্বয়সাধন ও উভয়ের সংমিশ্রণে বাংলায় নাথধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ও সংঘাত-সমন্বয়ের মাধ্যমে নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতি আজও বাংলায় অব্যাহত ও জীবন্ত রয়েছে। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে নাথসাহিত্য, সংস্কৃতির বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন, সাধনপ্রণালী ও দর্শনের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যময় দিক বাংলাসাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারফলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে হয়ে উঠেছে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়। নাথদের মৌলিক ও অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে এই সাহিত্য অনন্যতা লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যে নাথপন্থের প্রভাব বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রবিচার করে জীবন্ত ধারাটিকে খুঁজে বের করা গবেষণার অভিমুখ হিসেবে কাজ করেছে। আমার অন্বেষা যাতে যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সেইজন্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার জেলা, ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদি জেলাগুলিকে সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করে নাথধর্ম ও সংস্কৃতির লোকায়ত মূল্যমান বিধৃত রূপটি প্রকাশে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে হয়েছে। একটি বিরাট সমাজের অনুভূতি ও উপলব্ধি, আদর্শ ও কল্পনা মিলে যে সুষমাপূর্ণ কাহিনি গড়ে উঠেছে তা প্রাচুর্যে অকুপণ। সমালোচনার কণ্ঠিপাথরে সাহিত্যের উপকরণগুলি প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে পারলেই সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

সামগ্রিক বিচারে নাথধর্ম ও সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

আমাদের উদ্যম যাতে ফলপ্রসূ হতে পারে তার জন্যই বর্তমান প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকর গ্রন্থ:

ক. ১ বাংলা

- অবধূত, কালিকানন্দ। *মরুতীর্থ হিংলাজ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৬২।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগবিদ্য*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৭ মে, ২০১১।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগের পথে নাদ*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৪০৩।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *সদগুরু প্রসঙ্গ*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, আশ্বিন ১৪০৮।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *সাধক জীবনে যোগসিদ্ধি গুরুর কৃপা ও প্রভাব*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, জৈষ্ঠ্য ১৪০৯।
- আনন্দনাথ, যোগী। *আনন্দের অনুভূতি*। বীরনগর নদীয়া: স্বপ্নউড়ান, ২০২৪।
- আলমগীর জলিল (সম্পা.)। *লোক-সাহিত্য সংকলন*। চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, নভেম্বর ১৯৭৬।
- আলী, শওকত। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮।
- ইসলাম, মিরাজুল। *মুঘল গীত*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২য় মুদ্রণ, ২০১৯।
- কবিরাজ, গোপীনাথ (সম্পা.)। *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*। বারাণসী: সরস্বতী ভবন, ১৯২৫।
- কবিশেখরাচার্য, জ্যোতিরীশ্বর। *বর্ণন-রত্নাকর*। কলকাতা: ব্যাপটিস্ট মিশন, ১৯৪০।
- কামাল, মোহিত। *লুইপার কালসাপ*। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১৯।
- *গোরক্ষদর্শন*, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ৩০ আগস্ট ১৯৯২।
- গোরক্ষনাথ। *গোরক্ষশতকম্*। নোনাব্লা পুনে: কৈবল্যধাম সমিতি, ২০১৩।
- গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.)। *অথর্ববেদ*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৫৮।
- ঘোষ, গিরিশচন্দ্র। *পূর্ণচন্দ্র*। কলকাতা: নিউ ওরিয়েন্টাল প্রেস, ২য় সং, ১৩০৫।
- চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। *জলের উপর পানি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ২০২৩।
- চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার। *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., সপ্তম মুদ্রণ, ১৩৮২।
- চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব (সম্পা.)। *শূন্যপুরাণ*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৭৭।
- চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *হাড়মালা*। লালা, কাছাড়: ৬১ তম বার্ষিক অধিবেশন আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ১৯৭১।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, ২০০০।

- জ্ঞানেন্দ্রনাথ তত্ত্বরত্ন। *তত্ত্ব তথা কৌলসাধনা রহস্য*। বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৬।
- তান্ত্রিক বহল (অনূদিত)। গোরক্ষনাথ রচিত *শাবরমন্ত্র গোরখ-তন্ত্র*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৬।
- দত্ত বড়থাল, পীতাম্বর (সম্পা.)। *গোরখবাণী*। প্রয়াগ: হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, ২০০৪।
- দাস, ভবানী। *গোপীচাঁদের পাঁচালী*, ২য় খণ্ড। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪।
- দাস, শ্যামসুন্দর (সম্পা.)। *কবীর গ্রন্থাবলী*। নিউ দিল্লী: তক্ষশিলা প্রকাশন, ২০১৯।
- দেবনাথ, কৃষ্ণ। *প্রেমময়ী পার্বতী*। কলকাতা: নব বাংলার আলো প্রকাশন, ২০১২।
- দেবনাথ, কৃষ্ণ। *রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ*। কলকাতা: নব বাংলার আলো প্রকাশন, ২০১৩।
- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *নাথসিদ্ধোৎ কী রচনা*। নিউদিল্লী: কিতাবঘর প্রকাশন, ২০১৯।
- নাথ, জীবন। *তিননাথের পাঁচালি*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২য় সং, ২০১৬।
- নাথ, জীবন। *ত্রিনাথের মেলা*। গুয়াহাটি: প্রকাশক জয়াদেবী, ২১ অক্টোবর ২০০৬।
- নাথ, নরহরি (সম্পা.)। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত *শাবরচিত্তামণি*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৪৬ বিক্রম।
- নাথ, রাজমোহন (অনূদিত)। *গোরক্ষবাণী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, ১৯৬৭।
- নাথ, রাজমোহন (সম্পা.)। *গোরক্ষপদাবলী*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ১৯৬০।
- নাথ, রাজমোহন (সম্পা.)। *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ১৯৬৪।
- নাথ, রাজমোহন। *নাথযোগীতত্ত্ব*। কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮।
- *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। গোরখপুর: গীতাপ্রেস, ২০১৩।
- প্রকাশনাথ তত্ত্বেশ। *নবনাথ উপাসনা*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৬।
- প্রসন্নকুমার, কবিরত্ন (অনূদিত)। গোরক্ষনাথ রচিত *গোরক্ষ-সংহিতা*। কলকাতা: প্রকাশক গণেশচন্দ্র ঘোষ, ১৫ জৈষ্ঠ্য ১৮১৩ শকাব্দ।
- বকসী, দেবনাথ। *অঘোরীর আনন্দকানন*। দ্বিতীয় সং, দুবরাজপুর বীরভূম: প্রকাশক ছবি সরকার, ১৪২৫।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র (সম্পা.)। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত *কৌলজ্ঞান-নির্ণয়*। কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৩৪।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, শান্তি ভিক্ষু (সম্পা.)। *চর্যাগীতিকোষ*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৫৬।
- বিজ্ঞান, স্বামী (সম্পা.)। *ঘেরণ্ড সংহিতা*। কলকাতা: যোগপ্রকৃতি, ১৪০৬।

- বিলাসনাথ, যোগী। *ওঁ শিবগোরক্ষ ব্রতকথা*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১০।
- বিলাসনাথ, যোগী। *শ্রীগোরক্ষতন্ত্রম্*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৩।
- বিলাসনাথ, যোগী। *শ্রীনাথ রহস্য*। ১ম-৩য় খণ্ড, হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, নবম সং, ৬ই মে ২০১২।
- ভট্টশালী, নলিনীকান্ত (সম্পা.)। *ময়নামতীর গান*। ঢাকা: ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২১।
- ভট্টশালী, নলিনীকান্ত (সম্পা.)। *শ্যামদাস সেনের মীনচেতন*। ঢাকা: ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্রের গান*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫।
- ভট্টাচার্য, গোষ্ঠবিহারী। *যোগসোপান*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১৯৭৫।
- ভট্টাচার্য, নন্দকুমার কবিরত্ন (অনূদিত)। *শিবসংহিতা*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরি, শ্রাবণ ১৪২২।
- ভট্টাচার্য, ভরতচন্দ্র শিরোমণি (সম্পা.)। *যোগিসংস্কার-ব্যবস্থা ও আগমসংহিতা*। লালনা, অসম, ২০১০।
- ভট্টাচার্য, শশিভূষণ (অনূদিত)। *বঙ্গালচরিতম্*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১২৯৬।
- ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ (সঙ্কলিত)। *শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের পাঁচালী*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, আশ্বিন ১৪২৯।
- ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ। *শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালী*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, ১৪১৮।
- ভট্টাচার্য, সুখময় (অনূদিত)। *অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫।
- ভট্টলনাথ, যোগী। *যোগী সম্প্রদায় নিত্যকর্ম সঞ্চয়*। রোহতক হরিয়ানা: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, শ্রীবাবা মন্তনাথ মঠ, অস্থল বোহর, ২য় সং, ২০১০।
- ভাটি, নারায়ণ সিংহ (সম্পা.)। *নাথ-চন্দ্রিকা*। যোধপুর: রাজস্থান শোধ সংস্থান, ১৯৮৯।
- মঞ্জুমদার, ব্রজেন। *সঙ্খ্যাদীপের শিখা*। কলকাতা: বর্ণনা প্রকাশনী, ২০১৯।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *গোখবিজয়*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ২য় সং, ১৯৯৭।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *পুঁথি-পরিচয়*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫৮।

- মণ্ডল, পঞ্চগনন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ১ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
- মণ্ডল, পঞ্চগনন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ৪র্থ খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬৬।
- মণ্ডল, পঞ্চগনন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ৫ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১ম সং, সেপ্টেম্বর ১৯৬৬।
- মাওলা, আহমেদ। *ময়নামতী উপাখ্যান*। ঢাকা: পরিবার পাবলিকেশন্স, ২০১৮।
- মুখার্জী, রিয়া। *অঘোরী মা ষোড়শীনাথ*। কলকাতা: খোয়াই পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৯।
- মোহাম্মদ, সাইদুর (সম্পা.)। *লোক-সাহিত্য সঙ্কলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
- যতীন্দ্রনাথ, যোগী। *গোরখবাণী অউর গোরখযোগ*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৮।
- যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.)। কবি শুকুর মাহমুদ রচিত *গুপ্তচন্দ্রের সন্ধ্যাস*। ঢাকা: রায়মন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
- রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী। *গোসানী-মঙ্গল*। কলকাতা: প্রকাশক মজুমদার, ব্রজচন্দ্র, ১৩০৬।
- লালমোহননাথ, যোগী (সম্পা.)। যোগী রাজচরণনাথ রচিত *শ্রীশ্রী গুরুব্রত যোগসংগীত*। যুবরাজনগর, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা: গুরুধাম যোগাশ্রম, ২১ মার্চ, ১৯৯৭।
- শাস্ত্রী, স্বামী দ্বারিকাদাস (সম্পা.)। গোরক্ষনাথ রচিত *সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ*। বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৯।
- শ্রীউপাসু (সম্পা.) ও রায়, সুভাষচন্দ্র (সংগ্রহ ও রচনা)। *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান*। মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতি, ১৪২০।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। গোরক্ষনাথ রচিত *অমনস্কযোগ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫৬ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ২০৩৬ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরখবাণী*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫১ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *নাথসিদ্ধচরিতামৃত*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ২০৭১ বি.।
- শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ, যোগী। *মহাযোগী শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও উপদেশাবলী*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম, ২০১১।
- শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম, ২০১১।
- শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী। *শ্রীশ্রীভক্তমাল*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., ষষ্ঠ সং, ১৪০৫।

- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *তনের বারমাসি*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৩৭৬।
- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *মহামন্ত্র উপাসনা*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ৩য় সং, ২০১১।
- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ৪র্থ সং, ১৪১৭।
- শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী (সম্পা.)। সাত্তারাম যোগী রচিত সচিত্র *হঠযোগ প্রদীপিকা*। দক্ষিণেশ্বর: আদ্যাপীঠ বালকশ্রম, ২০১১।
- *শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*। কলকাতা: দেবসাহিত্য কুঠীর, ১৩৬৮।
- সুধানাথ, যোগিনী। *শব্দমালা*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ২০১১।
- সূর্যোদয়নাথ, যোগী (সম্পা.)। রাজচরণনাথ যোগী রচিত *লোকসঙ্গীত*। শিবনগর, কাঞ্চনপুর, ত্রিপুরা: যোগে যুক্ত যোগী সমাজ, জানুয়ারি ১৯৯৯।

ক.২ ইংরেজি

- Awasthi, Brahma- Mitra. Ed. *Yoga- Bija*. Delhi: Swami Keshawananda Yoga Institute, V.2042.
- Kiss, Csaba. *The Yoga of the Matsyendra-Samhita*. Pondicherry: French Institute of Pondicherry, 2021.
- *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*. Ed. Mallik, Kalyani. Poona: Oriental Book House, 1954.
- Mallinson, James. *The Khecarividya of Adinatha*. Varanasi: Indica, 2010.
- Sastri, A. Mahadeva. *Yoga Upanisads*. Madras: Theosophical Society, 1920.
- *Matsyendra-Samhita*. Ed. Sensharma, Debabrata. Calcutta: The Asiatic Society, 1994.
- Md, Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs*. Calcutta: Bangla Academy, 1966.

খ. সহায়ক গ্রন্থ

খ. ১ বাংলা

- অনিবার্ণ। *যোগসম্বন্ধ প্রসঙ্গ*। কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭।
- আনন্দনাথ যোগী। *ভক্তি-মুক্তি*। কলকাতা: এশিয়ান প্রেস বুকস, ২০২৩।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলা লোকসাহিত্য মন্ত্র*। ঢাকা: আনন্দধারা, এপ্রিল ২০১০।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৮।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বইপত্র, আগস্ট ২০১৬।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: গতিধারা, ৫ম সং, সেপ্টেম্বর ২০১২।

- আহমদ, ওয়াকিল। *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*। ঢাকা: বইপত্র, ২য় সং, নভেম্বর ২০১৪।
- আহমেদ, নাজিমুদ্দিন। *মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর*। ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ২য় সং, মে ১৯৭৯।
- আহসান, সৈয়দ আলী। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*। ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০১৪।
- ওয়াহাব, আব্দুল। *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৭।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *কাশীর সারস্বত সাধনা ও পত্রাবলী*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০১১।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তত্ত্ব ও সাধনা*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২য় সং, ২০১৩।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তত্ত্ব ও আগম-শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন*। হাওড়া: প্রাচী প্রকাশনী, ২য় সং, ২০১৩।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তাত্ত্বিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সং, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *ভারতীয় সাধনার ধারা*। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫।
- কর, সুজনসারথি। *নাথসাহিত্য ধর্ম ও সমাজ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৭ মে ২০১২।
- কালিকানন্দ, অবধূত। *কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও সাধনা*। কলকাতা: গিরিজা, ৪র্থ সং, ডিসেম্বর ২০১৫।
- কুণ্ড, সুমিত্রা (সম্পা.)। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক রচিত *ধর্মমঙ্গল (নিরঞ্জনমঙ্গল)*। শান্তিনিকেতন: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, ৮মে ২০০০।
- কৈবল্যনাথ যোগী। *যোগাশ্রম প্রার্থনা*। কটক: কiyারব্যাক্ষ যোগাশ্রম মঠ, ৯ম সং, জুন ২০১৯।
- খান চৌধুরী, আমানাতুল্লাহ আহমেদ। *কোচবিহারের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কোচবিহার: অথরিটি অফ কোচবিহার এস্টেট, ১৯৩৬।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ২০১৭।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ডিসেম্বর ২০১৮।
- খানম, মাহমুদা। *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী-কাব্যের প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৩।
- গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র। *গিরিশচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭।
- গঙ্গোপাধ্যায়, বিপুলকুমার। *মহাপীঠ তারাপীঠ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: জয়তারা পাবলিশার্স, ৫ম সং, ১৪২৪।

- গঙ্গোপাধ্যায়, বিপুলকুমার। *মহাপীঠ তারাপীঠ*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: জয়তারা পাবলিশার্স, ৪র্থ সং, ৪ঠা পৌষ, ১৪১৯।
- গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২য় সং, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৮।
- গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪০৪।
- গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। *বিক্রমপুরের ইতিহাস*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ৩য় সং, ১৯৯৮।
- গোস্বামী, নিত্যানন্দ বিনোদ। *বাংলাসাহিত্যের কথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩।
- গৌরনাথ অঘোরী যোগী (সম্পা.)। *যোগী অমরনাথ রচিত সং গুরুতত্ত্ব ও সংগুরু বাণী*। সোদপুর: মা করুণাময়ী নাথ আশ্রম, আষাঢ় ১৩৯৯।
- ঘোষ, অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল, ১৯৯৯।
- ঘোষ, বারিদবরণ। *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীপাবলিশিং হাউস, ২০১১।
- ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫৭।
- ঘোষাল, চিত্তরঞ্জন (অনূদিত)। *উপনিষদ সংগ্রহ*। কলকাতা: গ্রন্থিক, ৫ম সং, ১৪১৬।
- চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ। *তন্ত্রকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৬২।
- চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, মার্চ ২০০৫।
- চক্রবর্তী, পবিত্র। *বাক্ধর্মী বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস*। কলকাতা: অমরভারতী, এপ্রিল ২০১৮।
- চক্রবর্তী, প্রফুল্লচরণ। *নাথধর্ম ও সাহিত্য*। আলিপুরদুয়ার: জয়ন্তী পাবলিশার্স, ১৯৫৫।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৩য় সং, জানুয়ারি ২০১৬।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ১৯৯৩।
- চক্রবর্তী, বলরাম (সম্পা.)। *শৈবনাথ যোগিধারা*। ১ম-৩য় খণ্ড, কলকাতা: স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন, ২০০১।
- চক্রবর্তী, বলরাম (সম্পা.)। *শৈবনাথ যোগিধারা*। ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন, ১৪১০।
- চক্রবর্তী, মহিমা নিরঞ্জন (সম্পা.)। *বীরভূম বিবরণ*। ২য় খণ্ড, বীরভূম: হেতমপুর রাজবাটি, ১৩২৬।
- চক্রবর্তী, রতনলাল। *বাংলাদেশের মন্দির*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৮৭।
- চট্টোপাধ্যায়, অনিমেস। *উত্তর রাঢ়ে শামাধর্ম*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০০।
- চট্টোপাধ্যায়, অলকা। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনি*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জুন ২০১০।

- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *ভারতীয় দর্শন*। আদিপর্ব, কলকাতা: কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৮০।
- চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র। *বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৯।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (অনূদিত)। *ভূতডামরতন্ত্র*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, কার্তিক ১৪১৮।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (সম্পা.)। *দত্তাশ্রয়-তন্ত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১লা বৈশাখ, ১৪২০।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (সম্পা.)। *যোগশাস্ত্র ঘেরণ্ড-সংহিতা*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৪২৮।
- চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।
- চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি*। কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, প. ব. সরকার, ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*। কলকাতা: প. ব. বাংলা অকাদেমি, ষষ্ঠ সং, জুলাই ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *সাংস্কৃতিকী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: বাক-সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬৮।
- চন্দ, রমাপ্রসাদ। *গৌড়রাজমালা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, মে ২০১৪।
- চৌধুরী, অচ্যুতচরণ। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কথা, ২০১০।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, নভেম্বর ২০০০।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় সং, অক্টোবর ২০১২।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, জুলাই ২০০১।
- চৌধুরী, সন্ধ্যা (অনূদিত)। *দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ রচিত আলোকপর্ব*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪।
- জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০০৮।
- জ্ঞানদেব। *অমৃতানুভব ও চান্দদেব-পাসষ্টী*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৫।
- তর্করত্ন, পঞ্চগনন (সম্পা.)। *শিবপুরাণ*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১৬।
- তর্করত্ন, পঞ্চগনন (সম্পা.)। *স্কন্দ-পুরাণম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৪১৯।

- দত্ত, অক্ষয়কুমার। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২য় সং, আষাঢ় ১৪০৬।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র (সম্পা.)। *হিন্দুশাস্ত্র*। কলকাতা: নিউলাইট, ১৪০১।
- দাশ, আশা। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ভাদ্র ১৩৬৭।
- দাস, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *পরশুরামকল্পসূত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫।
- দাস, উপেন্দ্রনাথ। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ৩য় সং, আগস্ট ২০১০।
- দাস, রবীন্দ্রনাথ। *ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: নিউ এজ, ১৩৮২।
- দে, দিলীপকুমার। *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অগ্নিমা প্রকাশনী, ২য় সং, আগস্ট ২০১৫।
- দে, মধুপ। *জঙ্গলমহলের লোককথা*। মেদিনীপুর: বিপ্লবী সব্যসাচী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
- দে, মধুপ। *জঙ্গলমহলের লোকযাত্রা*। কলকাতা: মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১৪।
- দে, মৌমিতা। *মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও এক অজানা অভ্যুত্থানের কাহিনি*। কলকাতা: কুলিশ প্রকাশনী, ২০১৫।
- দে, রঞ্জিৎ। *ত্রিপুরার লোকসাহিত্যে জনজীবন*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুন ১৯৯৫।
- দে, রঞ্জিৎ। *ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ও জনজীবন*। কলকাতা: পুথিপত্র, ২০০৪।
- দে, হরেকৃষ্ণ। *আত্মারাম শ্রীশ্রীবাবা সুন্দরনাথ*। গৌহাটি: সঙ্ঘতীর্থ, ১৯৭৫।
- দেবনাথ, আর. এম। *বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৬।
- দেবনাথ, প্রফুল্লকুমার। *দেশ বিদেশে নাথতীর্থ, মঠ ও মন্দির*। কলকাতা: শৈব প্রকাশনী, ১০ মার্চ, ২০১৩।
- নস্কর, দেবব্রত। *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯।
- নস্কর, সনৎকুমার। *প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা*। কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ১ম সং, ১৫ আগস্ট, ২০১২।
- নাজমা, নার্গিস। *অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধ মনন ও বিন্যাস*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১৩।
- নাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গচন্দ্র। *নাথবন্ধু হরিমোহন*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১৩৬২।

- নাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গচন্দ্র। *সখা-সম্মিলনী কথা*। কলকাতা: নাথ সাহিত্য সংসদ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৬।
- নাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র। *রাজগুরু যোগিবংশ*। কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ৫ম সং, অগ্রহায়ণ ১৪২২।
- নাথ, কৃষ্ণধন। *ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে নাথধর্ম*। আগরতলা: মৌমিতা পাবলিশার্স, ২০০৪।
- নাথ, গোবিন্দ। *শ্রীহট্ট পরিচয়-প্রসঙ্গ*। ধর্মনগর- ত্রিপুরা: সরস্বতী লাইব্রেরি, ১৯৮৯।
- নাথ, জীবন। *ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২০০১।
- নাথ, জীবন। *রাজমোহন নাথ*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২০১৮।
- নাথ, ডম্বরধর। *অসম বুরঞ্জী*। গুয়াহাটি: অরুণ প্রকাশন, আগস্ট ২০০৫।
- নাথ, ধরনীধর। *আঙ্গুলের ধর্মধারা লোকদেবতা জনযাত্রা ও পূজাপার্বণ*। কটক: বিজয়িনী পাবলিকেশন, ২০২৩।
- নাথ, নরেন্দ্রচন্দ্র ও নাথ, হিরণ্ময় (সম্পা.)। গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট রচিত *বল্লাল-চরিতম্*। আগরতলা: প্রকাশক শ্রীমতী রাণী দেবী, ১৯৯৬।
- নাথ, নরেন্দ্রচন্দ্র। *নূতন আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*। আগরতলা: ত্রিপুরা রাজ্য নাথ কল্যাণ সমিতি, ১ম সং, ১৯৯৫।
- নাথ, প্রফুল্লকুমার। *অসমের নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি*। গুয়াহাটি: চন্দ্রপ্রকাশ, ২০১৩।
- নাথ, প্রভাসচন্দ্র। *সিদ্ধ সাধক গাথা ও যোগাশ্রম কথা*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম, ১৪০৩।
- নাথ, প্রমথনাথ ও নাথ হরিহর। *আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ইতিহাস*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ২য় সং, ৯ই মার্চ, ১৯৮৫।
- নাথ, বিমলেন্দু। *তন্ত্রে সনাতন নাথ-যোগশাস্ত্র*। শিলচর: নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১।
- নাথ, ভবকান্ত (সম্পা.)। *পণ্ডিতপ্রবর প্রত্নতাত্ত্বিক রাজমোহন নাথের রচনাবলী*। গুয়াহাটি: এল বি এস পাবলিকেশনস্, ২য় সং, ২০১৫।
- নাথ, ভোলানাথ। *ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয়*। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, মার্চ ১৯৭৪।
- নাথ, রাজমোহন। *উপনিষদে সাধনরহস্য*। কলকাতা: ধ্যানবিন্দু, সেপ্টেম্বর, ২০২০।
- নাথ, রাজমোহন। *গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগী-সম্মিলনী, ১৩৬৯।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *বঙ্গীয় যোগিজাতি*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ৩য় সং, ১৭ জুলাই ২০০১।

- নাথ, শশিভূষণ। *যোগি-দর্পণ*। কলকাতা: সাম্য-প্রেস, ১ম সং, ১৩৩২।
- নাথ, স্বরূপা। *নাথযোগিলীলামৃতম্*। বোলপুর-বীরভূম: বীরুজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, আগস্ট ২০২৩।
- নাথ, হিরণ্ময়। *উত্তর-পূর্ব ভারতের শৈব-নাথ সম্প্রদায়*। কলকাতা: ধ্রুবপদ প্রকাশনী, ২০১৪।
- পাল, মানচিত্র। *লোকদেবতা ত্রিনাথ*। হিন্দুমোটর: অক্ষরযাত্রা প্রকাশন, ১লা মে, ২০২৪।
- পালিত, হরিদাস। *আদ্যের গম্ভীর*। কলকাতা: বলাকা, ৩য় সং, ২০১৩।
- প্রামাণিক, আব্দুল হালিম। *বাংলাদেশের নাথ-নাট্য ঐতিহ্য*। রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, এপ্রিল ২০১৩।
- বড়ুয়া, বেণীমাধব। *বঙ্গীয় যোগিসমাজের মন্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি*। কলকাতা: নাথ সাহিত্য সংসদ, ১৯২৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *শ্রীশ্রীযোগিরাজ-গম্ভীরনাথ-উপদেশামৃত*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০২৪।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *শ্রীশ্রীযোগিরাজ-গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ*। কলকাতা: নবজীবন প্রেস, ১৩৬২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচার*। ১ম পর্ব, কলকাতা: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রা. লি., ১৩৭২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাষচন্দ্র। *মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস*। কলকাতা: এম সি সরকার এণ্ড কোম্পানি, ১৪১৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ। *ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ*। কলকাতা: প্রকাশক- বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশনাথ, ১৩৬১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। *পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, জুন ২০০১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৩য় সং, ১লা জুলাই, ১৯৬৭।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। *তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন*। কলকাতা: এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., ১ম সং, ফাল্গুন ১৩৮৩।
- বসু, গোপেন্দকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সং, মে ২০২৮।
- বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪।
- বসু, মনীন্দ্রমোহন। *চর্যাপদ*। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০১২।

- বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ২০২১।
- বসু, রত্না (অনূদিত)। জি. টি. দেশপাণ্ডে রচিত *অভিনবগুপ্ত*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২য় সং, ২০১৫।
- বসুনীয়া, নারায়ণচন্দ্র। *গোরক্ষনাথের গান: লোকপুরাণের আউনায় রাজবংশী জীবন-কথা*। কলকাতা: গ্রন্থবিকাশ, জানুয়ারি ২০১৪।
- বাগচী, জলি। *ইতিহাসের বীক্ষণে কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীত আধুনিক পর্ব*। কলকাতা: অন্যতর পাঠ ও চর্চা, ২য় সং, ২০১৯।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র। *দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি*। কলকাতা: নবাব, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।
- বালা, অমৃতলাল। *রবীন্দ্রনাথ ও বাউল*। ঢাকা: মূর্ধন্য, ডিসেম্বর ২০১২।
- বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। *কৌলমার্গ সাধনরহস্য*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশন্স, ২০১৮।
- বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন (অনূদিত)। বেদব্যাস রচিত *শিবগীতা*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.)। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের *মনসামঙ্গল*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, ২০১৫।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান*। কলকাতা: নিউ বইপত্র, জানুয়ারি ২০২১।
- বিশ্বাস, বাসুদেব। *দক্ষিণবঙ্গের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- বিশ্বাস, শিপ্রা। *অশ্বেষণ বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ*। কলকাতা: অদলবদল, ৩০ মার্চ ১৯৯৬।
- বিশ্বাস, সুশান্ত। *লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, কলকাতা, জুলাই ২০১৭।
- ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত। *ভারতের অধ্যাত্মবাদ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৩।
- ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য (সম্পা.)। যোগী সাত্ত্বারাম রচিত *সচিত্র হঠযোগ প্রদীপিকা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জি এণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., ষষ্ঠ সং, ১৯৭৫।
- ভট্টাচার্য, গুরুদাস। *বাংলা কাব্যে শিব*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ১৯৫৬।
- ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ। *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০০০।
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, (অনূদিত)। *অবধূত-গীতা*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশন্স, ২০১৮।

- ভট্টাচার্য, মালিনী, বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, জানুয়ারি ২০০২।
- ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন ও অন্যান্য (সম্পা.)। *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*। ২য় খণ্ড, কলকাতা : প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।
- ভট্টাচার্য, সুখময় (অনূদিত)। *অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পা.)। *দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।
- ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ। *ডাকিনী-তন্ত্র*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৮।
- ভাণ্ডারী, অজয়কুমার। *রমতায়োগী ও নাথসম্প্রদায়*। কলকাতা: গিরিজা, ২০১৮।
- *ভারতীয় সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২৫।
- ভিক্ষু, সুনন্দপ্রিয়। *বাংলায় প্রচ্ছন্নধারার বৌদ্ধ ও খেরবাদ পরম্পরা সংঘমনীষা*। ঢাকা: সৌগত প্রকাশন, ২০১৭।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৩৭৩।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ৩য় সং, ১৩৬৪।
- মজুমদার, শিশিরকুমার (সম্পা.)। *উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১২মে ১৯৮৬।
- মল্লিক, কল্যাণী। *নাথপন্থ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চৈত্র ১৩৫৭।
- মল্লিক, কল্যাণী। *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬।
- মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *জেমস ওয়াইজ রচিত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*। ৩য় ভাগ, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২।
- মিত্র, নীলরতন (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্র*। ঢাকা: প্রকাশক-কালীপ্রসন্ন নাথ, রিপন লাইব্রেরি, ১৩২৬।
- মিত্র, সতীশচন্দ্র। *যশোহর খুলনার ইতিহাস*। ১ম-২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, জুন ২০১৩।
- মুখোপাধ্যায়, অণিমা, কুণ্ডু, সুমিত্রা ও অন্যান্য (সম্পা.)। *পুঁথি প্রাকৃতিক পদ্ধতন মণ্ডল: চর্চা ও চর্চা*। কলকাতা: সোপান, ২২ শে শ্রাবণ, ১৪২৪।
- মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র। *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর*। কলকাতা: কারিগর, ২০১৮।

- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *কপিল রচিত সাজ্জ্যদর্শন*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., জানুয়ারি ২০২১।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *গুরুনানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাই-র দোঁহাবলী*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., জানুয়ারি ২০১৭।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *পবনবিজয়-স্বরোদয়ঃ*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নভেম্বর ২০১৪।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *মহানির্বাণ-তন্ত্রম্*। বসুমতী কর্পোরেশন লি., কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *যোগশাস্ত্র*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৭ম সং, এপ্রিল ১৯৯৮।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *সাত্ত্বারাম যোগী রচিত হঠযোগ-প্রদীপিকা*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৩৬।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, জুন ১৯৮৮।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *বাংলার নাথ-সাহিত্য*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১লা বৈশাখ ১৪০১।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৯৬১।
- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ১ম খণ্ড- প্রাচীন যুগ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম সং, ডিসেম্বর, ২০১৪।
- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ২য় খণ্ড-মধ্যযুগ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ সং, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী (অনূদিত)। *অভিনব গুপ্ত রচিত তন্ত্রালোকঃ*। কলকাতা: আদ্যাপীঠ, চৈত্র ১৪০২।
- যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ। *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
- যোগী, ব্রহ্মনাথ। *শৈব নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা*। হুগলি: মহানাদ জটেশ্বরনাথ শিবমন্দির, মার্চ ২০২৪।
- রওশন, ইজদানী। *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *কালান্তর*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আশ্বিন ১৪২৫।
- রাণা, সুমঙ্গল। *চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৮১।
- রামনাথ অঘোরী যোগী। *জয়গুরু গোরক্ষনাথ*। বানুরঘাট: সজ্জতীর্থ যোগীরাজ শ্রীশ্রী অঘোরীবাবা আশ্রম, ১৩৮৬।

- রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী। *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯২।
- রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬।
- রায়, কামিনীকুমার। *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার*। কলকাতা: বাসন্তী লাইব্রেরি, ১৯৮০।
- রায়, গিরিজাশঙ্কর। *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ*। শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।
- রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সং, ডিসেম্বর ২০০১।
- রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: দি বুক এম্পোরিয়াম, ১৩৫১।
- রায়, বিশ্বনাথ। *প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার: রবীন্দ্র উদ্যোগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৩৯৯।
- রায়, যতীন্দ্রমোহন। *ঢাকার ইতিহাস*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ২য় সং, জানুয়ারি ২০০০।
- রায়, রথীন্দ্রনাথ ও ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পা.)। *গিরিশ রচনাবলী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।
- রায়, শঙ্করনাথ। *ভারতের সাধক*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৭শ সং, ১৪২৪।
- রায়, শঙ্করনাথ। *ভারতের সাধক*। ৫ম খণ্ড, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ৯ম সং, ১৪২২।
- লালা, আদিত্যকুমার। *বাংলায় নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সঙ্গী, ২০১২।
- শক্তিনাথ যোগী (সম্পা.)। *শৈব সংসার*। বালুরঘাট: যোগীরাজ শ্রীশ্রী রামনাথ অঘোরী বাবা আশ্রম। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১১।
- শক্তিনাথ যোগী। *আর্যগুরু যোগীবংশ: সৃষ্টি ও রহস্য*। বড়পাথর-অসম: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১০।
- শরীফ, আহমদ। *বাঙলার সূফী সাহিত্য*। ঢাকা: সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০১০।
- শরীফ, আহমদ। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম সং, ১৯৭৪।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.)। *মদানন্দ ভট্ট রচিত বঙ্গাল-চরিতম্*। কলকাতা: প্রকাশক- আর. দত্ত, হেয়ার প্রেস, ১৯০১।
- শাহরিয়ার, শিহাব। *বাংলাদেশের কোচ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪।
- সরকার, জগদীশ নারায়ণ। *বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৯।

- সরকার, ভবনাথ। *নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: এ. কে. বুক ট্রাস্ট, ২য় সং, ১৯৯২।
- সরস্বতী, স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ (সম্পা.)। *যোগিনীতন্ত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫।
- সাঁতরা, অনুপকুমার। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় পুঁথির গুরুত্ব*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: পুরুষোত্তম পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
- সাঁতরা, তারাপদ। *পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর*। কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, ২য় সং, ২০১৭।
- সাক্বায়েন, গোলাম। *বাংলায় মসীয়া সাহিত্য*। ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ২য় সং, এপ্রিল ১৯৬৯।
- সাধক বাসুদেব যোগী। *মহানিশার শাসানে শাসানে*। বঙ্কেশ্বর: বাসুদেব মিশন ইন্টারন্যাশনাল, ৩য় সং, ১০ই আষাঢ়, ১৪২৪।
- সাধক, বাসুদেব। *মা*। কলকাতা: সংস্কার, ২০১৫।
- সাম্রা, তৃপ্তি (অনূদিত)। সান্যাল, চারুচন্দ্র রচিত *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১৭।
- সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলার মন্দির*। কলকাতা: কারিগর, ২য় সং, জানুয়ারি ২০১৫।
- সামন্ত, শিশুতোষ। *বীরঙ্গনা ময়নামতী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, নভেম্বর ১৭, ২০১৩।
- সামন্ত, শিশুতোষ। *সামন্তরাজা লাউসেন ও ময়নাগড়*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
- সিংহরায়, গোপীমোহন (অনূদিত)। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ রচিত *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা*। কলকাতা: ভারবি, অক্টোবর ১৯৯৬।
- সিদ্দিকী, আশরাফ। *লোকসাহিত্য*। ২য় খণ্ড, ঢাকা: গতিধারা, আগস্ট ২০০৮।
- সুফী, মোতাহার হোসেন। *বাংলা সাহিত্যে রঙ্গপুরের অবদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
- সেন, উমা। *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭১।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *চিন্ময়বঙ্গ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সং, এপ্রিল ১৯৫৮।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *বাংলার সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫২।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *হিন্দুধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চৈত্র ১৩৫৬।

- সেন, গিরীশচন্দ্র (অনূদিত)। *জ্ঞানদেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী*। নতুনদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ৩য় সং, ২০১৬।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সং, ডিসেম্বর ১৯৯১।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *সরল বাঙ্গালা সাহিত্য*। কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, শ্রাবণ ১৩২৯।
- সেন, সুকুমার। *প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-দেবতা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: এ কে সরকার এণ্ড কোম্পানি, ১৯৮৪।
- সেন, সুকুমার। *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৫৩।
- সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সং, ১৯৭৮।
- সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ৩য় সং, ১৯৭৫।
- সেন, সুকুমার। *বিচিত্র সাহিত্য*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: ইস্ট এণ্ড কোম্পানি, ১৯৫৬।
- সেনগুপ্ত, অম্বরনাথ। *ষোড়শ শতকে ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা*। কলকাতা: অণিমা প্রকাশনী, ২০০৫।
- সেনশর্মা, অর্জুনদেব। *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*। কলকাতা: ভারবি, ২০১৫।
- সেনশাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন। *বাংলার বাউল*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- সেলিম আল দীন। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুলাই ২০১৮।
- সোম, অশ্বিনীকুমার তত্ত্বনিধি (সম্পা.)। *কবিচন্দ্র দাস রচিত গোরক্ষবিজয়*। ফেনী: সোম লাইব্রেরি, ১৩৩৯।
- স্বামী, অভেদানন্দ। *যোগদর্শন ও যোগসাধনা*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ৪র্থ সং, এপ্রিল, ২০১০।
- স্বামী, অভেদানন্দ। *যোগশিক্ষা*। কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, একাদশ সং, মার্চ ২০০৯।
- হক, মুহম্মদ এনামুল। *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ সং, মে ২০১৩।
- হালদার, বিশ্বজিৎ (সম্পা.)। *লোক-ঐতিহ্যের ধারায় দুই ২৪ পরগণার শিবসংস্কৃতি: চড়ক, ধর্মদেল, গাজন ও বালাগান*। কলকাতা: তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। *বাংলাদেশের পুরাকীর্তির খোঁজে*। কলকাতা: সুচেতনা, ১৪২৬।
- হীরা মণ্ডল, অনুপম। *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১০।

খ. ২ হিন্দী

- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *গোরখনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ৩য় সং, ২০২০।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *নাথ অউর সন্ত সাহিত্য: তুলনা ত্রক অধ্যয়ন*। বারাণসী: অমৃত প্রকাশন, ২য় সং, ১৯৯৭।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *বৌদ্ধ কাপালিক সাধনা অউর সাহিত্য*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০৯।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় সাহিত্য কে নির্মাতা গোরখনাথ*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *অখণ্ড মহাযোগ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ৫ম সং, ২০২১।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *শান্তবীতন্ত্রম্*। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৯৪।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *সাধন-পথ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২য় সং, ২০২০।
- খণ্ডেলয়াল, এস. এন. (সম্পা.)। *সিদ্ধনাগার্জুনতন্ত্রম্-সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটম্*। বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৪।
- গোরক্ষনাথ। *শাবরমন্ত্র বিদ্যা*। মথুরা: শ্রীজী বিদ্যামন্দির, ২০১৮।
- গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ। *গোরখ মহিমা*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, জানুয়ারি ২০০০।
- গৌতম, চমনলাল (সম্পা.)। *গোরক্ষনাথ রচিত গোরক্ষ- সংহিতা*। বরেলী: সংস্কৃতি সংস্থান, ১৯৯২।
- চতুর্বেদী, পরশুরাম। *উত্তর ভারত কী সন্ত পরম্পরা*। এলাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার লিডার প্রেস, ১৯৭২।
- তন্ত্রেশ, প্রকাশনাথ। *শ্রীগোরক্ষনাথ তন্ত্রমন্ত্র সাধনা*। আজমের: শ্রীসরস্বতী প্রকাশন, ৩য় সং, ২০০০।
- দাস, শ্যামসুন্দর (সম্পা.)। *কবীর গ্রন্থাবলী*। নিউদিল্লী: তক্ষশিলা প্রকাশন, ২০১৯।
- দুবে, অমিতা এবং অন্যান্য (সম্পা.)। *নাথপন্থ: সাধনা অউর সাহিত্য*। লক্ষ্ণৌ: উত্তরপ্রদেশ হিন্দী সংস্থান, ২০২০।
- দ্বিবেদী, ব্রজবল্লভ (সম্পা.)। *মহেশ্বরানন্দনাথের মহার্থমঞ্জরী*। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
- দ্বিবেদী, শ্যামাকান্ত (সম্পা.)। *মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ঃ* ১-২ খণ্ড, বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমি, ২০১৩।
- দ্বিবেদী, শ্যামাকান্ত। *নাথ সম্প্রদায় এবং উসকী যৌগিক-তাত্ত্বিক সাধনা*। বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০২০।
- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *নাথ সম্প্রদায়*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ১৯৯১।

- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *মধ্যকালীন ধর্ম সাধনা*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ২০১৯।
- নাথ, নরহরি (সম্পা.)। *হরিহর বিরচিত ভর্তৃহরিনিবেদনাটকম্*। বারাণসী: গোরক্ষটিলা, ২০২১ বি.।
- পাণ্ডে, দিবাকর। *গোরখনাথ এবং উনকী পরম্পরা কা সাহিত্য*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০০৫।
- দত্ত বড়থাল, পীতাম্বর। *যোগপ্রবাহ*। বারাণসী: কাশী বিদ্যাপীঠ, ১৯৪৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *নাথ-যোগ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ১৯৯৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *যোগ-রহস্য*। গোরখপুর: শ্রীমোহান্ত দিগ্বিজয়নাথ ট্রাস্ট-গোরক্ষনাথ মন্দির।
- ভারতী, ধর্মবীর। *সিদ্ধ সাহিত্য*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ২০১৬।
- যদুবংশী। *শৈবমত*। পাটনা: বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ২য় সং, ১৯৮৮।
- যোগী, অবৈদ্যনাথ। *হঠযোগ: স্বরূপ এবং সাধনা*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫৬ বি.।
- যোগী, কে. বি.। *জয় গুরু গোরক্ষনাথ*। দার্জিলিং: দার্জিলিং যোগী কল্যাণ সংঘ, নভেম্বর ২০১২।
- যোগী, চুল্লীনাথ। *তন-প্রকাশ*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২৬ মার্চ, ২০০৫।
- যোগী, বিলাসনাথ। *নবনাথ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথ সম্প্রদায় আরতি ভজন সংগ্রহ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৯।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথসিদ্ধ পাঠ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি ২০১০।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথসিদ্ধোৎ কী ওঁ-কার সিদ্ধি উপাসনা সাধনা*। অম্বুল বোহর রোহতক-হরিয়ানা: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, শ্রী বাবা মন্তনাথ মঠ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রীনাথ সম্প্রদায় কে তীর্থস্থল এবং প্রাচীন ভর্তৃহরি গুফা মাহাত্ম্য*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৮ আগস্ট, ২০১৫।
- যোগী, বীরনাথ। *শ্রী নাথ চরিত*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩।
- যোগী, শুক্রাইনাথ। *সর্বোপরি গুরু গোরক্ষ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভৈষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৪।

- যোগী, সন্তোখনাথ। *শ্রী নাথ গুপ্ত রহস্য অউর নাথ অবধূত মন্ত্র*। ১ম-৩য় খণ্ড, জুনাগড়-গুজরাট: নবনাথ তপস্বলী, চৌরঙ্গীনাথ সিদ্ধ ভূমি আশ্রম, ২০২১।
- যোগী, সবাইনাথ (সম্পা.)। *নাথসম্প্রদায় অউর সূক্ষ্ণবেদ*। সিরোহি-রাজস্থান: গুরু গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সমিতি, আশ্বেশ্বরধাম, ২০০০।
- যোগী, সুরেশনাথ। *শ্রী গোরখ বাণী সংগ্রহ তথা নাথ সম্প্রদায় কী বাণী*। মথুরা: শ্রীজী বিদ্যা মন্দির, ২০১৯।
- রাঘব, রাঙ্গেশ। *গোরক্ষনাথ অউর ওনকা যুগ*। নিউদিল্লী: অনন্য প্রকাশন, ২০২৩।
- রাষ্ট্রীয় সংগোষ্ঠী। *নাথপন্থ অউর ভক্তি আন্দোলন*। গোরখপুর: ২৮-৩০ অক্টোবর, ২০১০, মহারাণা প্রতাপ মহাবিদ্যালয় ও ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি।
- শর্মা, অরুণকুমার। *রহস্যময় কাপালিক মঠ: যোগ-তাত্ত্বিক কথা প্রসঙ্গ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২য় সং, ২০১৪।
- শিবযোগী, ভোলেবাবা (সংগৃহীত)। *দত্তায়েয় রচিত গোরখ সাগর গুটকা*। নিউদিল্লী: ডিপবি পাবলিকেশন্স, ২০১৬।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরখচরিত*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২য় সং, ২০১৯।
- সাংকৃত্যায়ন, রাহুল। *দোহাকোশ*। পাটনা: বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ২য় সং, ১৯৯৭।
- সাংখলা, কমলকিশোর। *রাজস্থানের নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। যোধপুর: মহারাজা মানসিংহ পুস্তক প্রকাশ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১১।
- সিংহ, উদয়প্রতাপ (সম্পা.)। *নাথ সম্প্রদায় বিবিধ আয়াম*। প্রয়াগরাজ: হিন্দুস্তানী একাডেমি, ২০২১।
- সিংহ, উমা। *গোরক্ষনাথ এবং পতঞ্জলি কে যোগদর্শন কে তাত্ত্বিক স্বরূপ কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০০৫।
- সিংহ, কমল। *গোরক্ষনাথ অউর ওনকা হিন্দী সাহিত্য*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৯।
- সিংহ, বিজয়পাল। *গোরক্ষদর্শন*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৪৯ বিক্রম।
- সোলংকী, কোমলসিংহ। *নাথপন্থ অউর নির্গুণ সন্তকাব্য*। আগরা: বিনোদ পুস্তক মন্দির, ১৯৯৭।

খ. ৩ ইংরেজি

- Agarwal, Rajeev. *Secrets of Aghora*. Agra: Shri Vinod Pustak Mandir, 2019.
- *An Introduction to Natha-Yoga*. Gorakhpur: Gorakhnath Mandir, 1993.
- Bandyopadhyay, P. K. *Natha Cult and Mahanad A Study in Syncretism*. Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1992.
- Banerjee, Akshaya Kumar. *Philosophy of Gorakhnath with Goraksha-Vacana-Sangraha*. Delhi: MLBD Publishers Pvt. Ltd., 6th edition, 2017.

- Barman, Binay & Barman, Kartick Chandra (ed.). *History and Culture of North Bengal*. Kolkata: Pragatishil Prokashak, July 2015.
- Bevilacqua, Daniela & Stuparich, Eloisa. (ed.). *The Power of the Nath Yogis: Yogic Charisma, Political Influence and Social Authority*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022.
- Bhattacharya, Tarapada. *The Cult of Brahma*. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2nd edition, 1969.
- Biswas, Kamal. *The Yogi Caste of Bengal: History and Evolution (1872-2011)*. New Delhi: Abhijeet Publication, 2023.
- Bouillier, Veronique. *Monastic Wanderers: Nath Yogi Ascetics in Modern South Asia*. New Delhi: Manohar, 2017.
- Briggs, G. W. *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*. New Delhi: MLBD Publishers, 8th edition, 2016.
- Chatterjee, Suniti Kumar. *Jayadeva*. Delhi: Sahitya Academy, 1973.
- Chatterji, Suniti Kumar (ed.). *Varna-Ratnakara*. Calcutta: Royal Asiatic Society, 1940.
- Chatterji, Suniti Kumar. *Kirata-Jana-Krti*. Calcutta: The Asiatic Society, 1974.
- Choudhary, Radhakrishna. *Vratyas in Ancient India*. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964.
- Dasgupta, Shashi Bhushan. *An Introduction to Tantric Buddhism*. Calcutta: University of Calcutta, 3rd edition, 1974.
- Dasgupta, Shashibhusan. *Obscure Religious Cults*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., 1976.
- De, Bhakti (ed.). *Arya Dravida Vidyaraja*. Kolkata: The Asiatic Society, March 2009.
- Debnath, Kunal. *Caste Marginalisation and Resistance: The Politics of Identity of the Naths (Yogis) of Bengal and Assam*. Leiden: Boston: BRILL, 2023.
- Dehejia, Vidya. *Yogini Cult and Temples: A Tantric Tradition*. New Delhi: National Museum, 1986.
- Gharote, M. L. & Pai, G. K. (ed.). *Siddhasiddhantapaddhati: A treatise on the Natha philosophy by Goraksanatha*. Pune: The Lonavla Yoga Institute, 2016.
- Gold, Ann Grodzins. *A Carnival of Parting: The Tales of King Bharthari and King Gopi Chand*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1993.
- Grierson, G. A. *Song of Manik Chandra*. Calcutta: Baptist Mission, 1878.
- Lorenzen, David N. & Munoz, Adrian (ed.). *Yogi Heroes and Poets*. Delhi: Dev Publishers & Distributors, 2012.
- Magee, Michael (Trans.). *Kaulajnana-Nirnaya of Matsyendranatha*. Varanasi: Prachya Prakashan, 2007.

- Majumdar, R. C. *The History of Bengal*. Vol. I, Dhaka: The University of Dacca, 1943.
- Max Muller, F. *Lectures on the Origin and Growth of Religion*. Varanasi: Indological Book House, 1964.
- Muni, Swami Rajarshi. *A Great Indian Yogi Gorakshanath*. Vadodara: Life Mission Publications, 2017.
- Nath, D. (ed.). *Religion and Society in North East India*. Guwahati: DVS Publishers, 2011.
- O'Malley, L. S. S. *Bengal District Gazetteers Midnapore*. Kolkata: The Bengal Secretariat Book Depot, Govt. of West Bengal, December 1995.
- Osho. *Maro He Jogi Maro*. Pune: Osho International Foundation, 2018.
- Pandey, K. C. & Dwivedi, R. C. *An Outline of History of Saiva Philosophy*. New Delhi: MLBD Publishers, 1986.
- Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal*. Vol. I, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892.
- Sadhu, Santinatha. *Experience of a Truth Seeker*. Vol. I, Gorakhpur: Gorakshanath Temple, 1946.
- Salgaokar, Jayraj. *The Gorakhnath Enlightenment the Path to Om*. Mumbai: Indus Source Books, 2016.
- Sastri, A. Mahadeva. *Yoga Upanisads*. Madras: Theosophical Society, 1920.
- Satpathy, Bandita & Mandal, Niradbaran (ed.). *Amrtasiddhiyogah*. Pune: Kaivalya Dhama S. M. Y. A. Samiti, December 2018.
- Sen, Dinesh Chandra. *Banga Sahitya Parichaya*. Part. 1, Calcutta: University of Calcutta, 1914.
- Sen, Sukumar (ed.). *Sekasubhodaya of Mishra Halayudha*. Kolkata: The Asiatic Society, 2002.
- Singh, Mohan. *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*. Lahore: Oriental College, 1936.
- Sinha Roy, Pranabesh (Trans.). *The Mystic Songs of Kanha and Saraha: The Doha-Kosa and the Carya*. Kolkata: The Asiatic Society, March 2020.
- Tobdan. *Nathapanth in Western Himalaya*. New Delhi: Kaveri Books, 2015.
- Vasu, Nagendranath. *Hindi Visva Kosha*. Vol. 28, Calcutta: N. Vasu & V. Vasu, 1925.
- Winternitz, M. *A History of Indian Literature*. Vol. II, New Delhi: MLBD, 1983.
- Yogi, Hukam Singh Tanwar. *Nath Sampraday (Itihas evm Darshan)*. Jodhpur: Rajasthan Granthagar, 2012.
- Yogi, Surajnath & Yogi, Bhagavannath. *Gorakh Sabadi: The Sayings of Gorakh*. Pimpri Gawali: Ahmednagar- Maharashtra, 2nd edition, January 2020.
- Yogi, Surajnath. *Insight into Meditation and Yoga*. Ahmednagar- Maharashtra: Pimpri Gawali Nath Math, 3rd edition, 2022.

- Yogi, Vilasnath. *Sri Nath Siddha Kavacam*. Haridwar: Akhil Bharatvarshiya Avadhoot Bhesh Barah Panth Yogi Mahasabha, Guru Gorakshnath Mandir, 13 July 2003.
- Yogiraj, Satgurunath Siddhanath. *Wings to freedom Journey of a Nath Yogi*. Pune: Siddhanath Pratishthan, 2016.

গ. পত্ৰপত্ৰিকা

গ. ১ বাংলা

- *আদিনাথ শিক্ষাভাণ্ডার স্মরণিকা*। প্রকাশক- নাথ, সুকুমার। শিলচর, অসম, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- *আদেশ পত্ৰিকা*। অঘোৰীবাবা সংখ্যা, প্রকাশক- সেন, পরেশচন্দ্র। গৌহাটি, ৬ই জানুয়ারি ১৯৮১।
- *কল্যাণ-যোগাঙ্ক*। গোরখপুর: গীতাপ্ৰেস, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন কল্যাণ-যোগাঙ্ক, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৯৬২ বি.।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৪ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০১৯, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৫ বর্ষ, আগস্ট ২০২০, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৫ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০২০, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.)। *প্রবাসী*। ১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।
- চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.)। *প্রবাসী*। ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩২৮।
- চন্দোলা, শান্তিপ্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।
- দাস, বেলা (সম্পা.)। *বিভাগীয় পত্ৰিকা*, বাংলাবিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ৪র্থ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- দেবনাথ ভট্টাচার্য, গোষ্ঠবিহারী (সম্পা.)। *নাথপত্ৰ*। ৪র্থ বর্ষ, ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৩৭৯, কলকাতা।
- দেবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র (সম্পা.)। *নাথবন্ধু*। ১৭ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯০, চিংড়িঘাটা, কলকাতা।
- দেবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র (সম্পা.)। *নাথবন্ধু*। ২২ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, মহালয়া ১৩৯৫, চিংড়িঘাটা, কলকাতা।
- দেবনাথ, সন্তোষ (সম্পা.)। *শারদীয় শৈবভারতী*। বিংশতি বর্ষ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪০৭, কলকাতা।
- নাথ, অরুণপ্রকাশ (সম্পা.)। *যোগিসংখ্যা*। ৬৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৭।

- নাথ, অরুণপ্রকাশ (সম্পা.)। *যোগিসংখ্যা*। ৬৭তম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭।
- নাথ, জীবনকৃষ্ণ (সম্পা.)। *যোগিসংখ্যা*। ১০৬ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৬, কলকাতা।
- নাথ, পার্থসারথি (সম্পা.)। *শারদীয় যোগিসংখ্যা*। ১১৫ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫, কলকাতা।
- নাথ, পার্থসারথি (সম্পা.)। *শারদীয় যোগিসংখ্যা*। ১১৮ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮, কলকাতা।
- নাথ, হরকুমার (সম্পা.)। *যুগবাণী*। গুয়াহাটি: অসম প্রাদেশিক যোগী সম্মিলনী ৯৮ বর্ষীয় হোজাই অধিবেশন সংখ্যা, ১০-১২ নভেম্বর ২০১৭।
- নাথ, হরকুমার (সম্পা.)। *সংহতি*। গুয়াহাটি: ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯।
- নাথ, হিরণ্যকুমার (সম্পা.)। *যুগবাণী*। গুয়াহাটি: অসম প্রাদেশিক যোগী সম্মিলনী, জালাহ অধিবেশন সংখ্যা, ১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০২৫।
- *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। শান্তিনিকেতন: জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।
- ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা.)। *লোকশ্রুতি* পত্রিকা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, ডিসেম্বর ২০০২।
- ভট্টাচার্য, মালিনী ও অন্যান্য (সম্পা.)। *লোকশ্রুতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, খণ্ড ৭, সংখ্যা ২, জুন ২০০৯।
- *যোগবাণী* পত্রিকা (গোরখবাণী বিশেষাংক)। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, গোরখপুর, ১৯৭৯।
- রায়, অমিতাভ (সম্পা.)। *সুন্দরবন আলোচনা*। ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২১।
- শর্মা, চন্দ্রধর (সম্পা.)। *নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা*। ২য় খণ্ড, বারাণসী, ১৯৭৭।
- *শিল্প সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, মে ১৯৮১, শিল্প।
- *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। ১৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৪৩০।
- *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। ৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৩৩।
- সেনগুপ্ত, সুমন (সম্পা.)। *দেশ* পত্রিকা। ৯১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, কলকাতা ৭০০০০১, ২ এপ্রিল ২০২৪।

গ. ২ ইংরেজি

- Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.). Vol. 66 (2), Dhaka, 2021.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. Part. I, No. 3, Calcutta, 1878.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XXVI, Calcutta, 1930.
- The Heritage Multi-lingual Research Journal. Issue No. 3, Vol. II, Guwahati, 2011.

ঘ. পুস্তিকা

ঘ. ১ বাংলা

- কুলাবধূত, সৎপুরানন্দনাথ। *বজ্রযান পরিচিতি*। ব্যক্তিগত নোট, পৃ. ১-২৯।
- নাথ, পার্থসারথি। *চর্যাপদে নাথ ঐতিহ্য: সঙ্কলনী দৃষ্টিতে*। মণ্ডল, বরেন্দ্র (সম্পা.)। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের সেমিনার উপস্থাপনাপত্র সংকলন, বাংলা বিভাগ, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৩-১৬।
- নাথ, পার্থসারথি। *নাথসাহিত্যে রাঢ়-বাংলা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পাঠ*। অন্তর্মুখ পত্রিকা, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১, বর্ধমান, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৭-২৪।
- নাথ, পার্থসারথি। *প্রাচীন রাঢ়-বাংলার নাথ-সাধনা কেন্দ্র মহানাদ ও নাথসংস্কৃতি*। INSIGHT: An International Multilingual Journal for Arts and Humanities, Vol. 2, Issue. 10, University Research Publications, Ernakulam, Kerala, December 2022।
- নাথ, প্রফুল্লকুমার। *নাথ সকলর সমাজ-সংস্কৃতি*, দাঁ, বিতোপন, হাজারিকা, রেবিকা এবং অন্যান্য (সম্পা.)। অসমর সংস্কৃতি পরম্পরা আরু পরিবর্তন। গুয়াহাটি: পূর্বায়ণ প্রকাশন, ১ম সং, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১১-২৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল। *ধর্মপূজাবিধি*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ১৭৯-১৮৪।
- বসু, রমেশ। *বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা*। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃ. ৩৭-৪৪।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *সভাপতির অভিভাষণ*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ২১-৪৭।

ঘ. ২ ইংরেজি

- Barua, Dipak Kumar. *Legacies of Buddhism in Bengal*. Chakraborty, Janardan (ed.). Acharya Radhagobinda Nath Smarak-Grantha. Calcutta: Sadhana Prakasani, March 1973, pp. 69-77.
- Bhattachaya, France. *La Secte Des Nath Et Le Manasa Mangal*. Purusartha (18), 1995, pp.315-325.
- Bouillier, Veronique & Khan, Dominique-Sila. *Hajji Ratan or Baba Ratan's Multiple Identities*. Journal of Indian Philosophy, December 2009, pp. 1-37.
- Bouillier, Veronique. *Kanphata Yogis*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol.III, Leiden: Brill, 2011, pp.347-354.
- Debnath, Kunal. *Radical-Pragmatic Debate over Reservation: A Study of the Naths of West Bengal and Assam*. E-journal of the Indian Sociological Society, Vol. 4, Issue 1, April 2020, pp. 135-148.
- Ernst, Carl W. *The Islamization of Yoga in the Amrtakunda Translations*. Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3, Vol. 13, Issue 2, U. K., July 2003.

- Gold, Daniel. *Nath Yogis as Established Alternatives: Householders and Ascetics Today*. Journal of African and Asian Studies, 34(1), 1999, pp.68-88.
- Kalhor, Zulfiqar Ali. *Between Marhi and Math: The Temple of Veer Nath at Rato Kot (Sindh, Pakistan)*. Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. LXIII, No. 4, Islamabad, 2015, pp. 75-86.
- Lorenzen, David and Adrian, Munoz. *Yogi Heroes and Poets: Histories and Legends of the Naths*. New York: State University of New York Press, 2011.
- Lorenzen, David. *The Kapalikas and Kalamukhas: Two Lost Saivite Sects*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Losty, J. P. *Ascetics and Yogis in Indian Painting: The Mughal and Deccani Tradition*. July 2016, pp.1-38.
- Mallinson, James. *Nath Sampradaya*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol. III, Leiden: Brill, 2011, pp.409-428.
- Mallinson, James. *Hatha Yoga*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol. III, Leiden: Brill, 2011, pp.770-781.
- Mallinson, James. *The Yogis' Latest Trick*. Journal of the Royal Asiatic Society, 24(1), 2014, pp.165-180.
- Mallinson, James. *Yoga and Yogis*. Namarupa, March 2012, pp.2-27.
- Nath, Partha Sarathi. *An Insight into Nath panth shrines and perpetual Tradition in West Bengal*. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Vol. 10, Issue 2, February 2023, pp. b709- b721.
- Nath, Partha Sarathi. *Nath Pantha Shrines and perpetual Tradition in Bangladesh*. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 66 (2), 2021, pp. 187-215.
- Powell, Seth. *Sixteen- Century Visual and Material Evidence of Saiva Ascetics and Yogis in Complex Non-Seated Asanas at Vijayanagara*. Journal of Yoga Studies, Vol. I, 1st May 2018, pp. 45-106.
- Reddy, Venkata. *Hathayoga as Holistic System of Medicine*. Bulletin Ind. Inst. Hist. Med., Vol. XVI, Madras, 1986, pp. 19-29.
- Sharma, Mahesh. *Marginalisation and appropriation: Jogis, Brahmins and Sidh Shrines*. Indian Economic Social History Review 33, (1), New Delhi, 1996, pp. 73-91.
- White, David Gordon. *Sinister Yogis*. Chicago: University of Chicago Press, 2009, p.199-226.

ঙ. অভিধান

- *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সং, জানুয়ারি ২০০৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.)। *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯১।

- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫।
- হালদার, নারায়ণ। *বাংলা অভিধান: প্রসঙ্গ অতিথি শব্দ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৯।

পৰিশিষ্ট- ১

ক্ষেত্ৰসমীক্ষা: তথ্যদাতা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	নিবাস	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	সংগ্ৰহের স্থান	সংগ্ৰহের তারিখ	সময়
১	দুলালচন্দ্র নাথ	ভবানীপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।	পুরুষ	৮৬	এম. এ. (ইংরেজি), বি. এড।	অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক	নিজ বাড়ি	১৮/০৪/২০২২	সকাল ১১:১৫
২	অমরচন্দ্র নাথ গুরু যোগী বিজয়নাথ	পূর্ব-পীতপুর, পাঁশকুড়া, পূর্বমেদিনীপুর	পুরুষ	৭৩	বি. এ	কৃষিকাজ	পাঁশকুড়া সিদ্ধিনাথ মঠ, পূর্বমেদিনীপুর	০৬/০৬/২০২৪	সকাল ১০:৩০
৩	যোগী সীতারামনাথ গুরু যোগী শিবনাথ	পাঁশকুড়া সিদ্ধিনাথ মঠ, পূর্বমেদিনীপুর	পুরুষ	৫১	মাধ্যমিক	নাথসন্ন্যাসী কপিলানীপস্থ	পাঁশকুড়া সিদ্ধিনাথ মঠ	১৫/০১/২০২৪	বিকেল ৩: ১৫
৪	ড. শ্যামল বেরা	আব্দুল হাওড়া	পুরুষ	৫৮	এম. এ. বি. এড, পিএইচ. ডি	শিক্ষক	নিজবাড়ি	৩০/০৫/২০২৩	বিকেল ৪: ৩০
৫	যোগী সুমননাথ গুরু যোগী বীরনাথ অধোয়ী	পাহাড়েশ্বর শিবমন্দির, মামাভাঙ্গে পাহাড়, দুবরাজপুর, বীরভূম	পুরুষ	৩৮	অজানা	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বরীপস্থ	মামাভাঙ্গে পাহাড় দুবরাজপুর	২২/০৩/২০২৪	বিকেল ৫: ৪০
৬	যোগী মণিকর্ণিকানাথ	আদিসগুগ্রাম হুগলি	স্ত্রী	৩৪	অজানা	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বরীপস্থ	কঙ্কালীতলা সতীপীঠ মন্দির বীরভূম	২১/০৭/২০২৪	সকাল ১১:২৫
৭	যোগী অবন্তিকানাথ	গীর্ণার গুজরাট	পুরুষ	৩৯	অজানা	নাথসন্ন্যাসী পাশপতকৌল	চলভাষ মাধ্যম	১৩/০৭/২০২৪	বিকেল ৫: ২৬
৮	যোগী আনন্দনাথ গুরু যোগী রামনাথ	ডানলপ উ: ২৪ পরগণা	পুরুষ	৩৭	বি. এস. সি অনার্স অর্থনীতি	নাথসন্ন্যাসী ভর্তৃহরবিরাগপস্থ	আসামবঙ্গ যোগি-সম্মিলনী অফিস, ঢাকুরিয়া কলকাতা	২৮/০৭/২০২৪	দুপুর ১: ৩৫
৯	যোগী কুলাবধূত সংপুরানন্দনাথ	কালিম্পং	পুরুষ	৬৩	গ্রাজুয়েট	নাথসন্ন্যাসী কৌল	শান্তিনিকেতন বীরভূম	২২/০২/২০২৩	সকাল ১১:৪০
১০	ড. জীবন নাথ	গুয়াহাটি অসম	পুরুষ	৮৮	এম. এ. পিএইচ. ডি	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক	গুয়াহাটি অসম	০৮/০৫/২০২৪	সকাল ১০:৩৫
১১	হিরণ্য নাথ	গুয়াহাটি অসম	পুরুষ	৯১	এম. ই.	অবসরপ্রাপ্ত চিফ-ইঞ্জিনিয়ার	গুয়াহাটি অসম	০৮/০৫/২০২৪	সকাল ১১:২৫

১২	সৰ্বেশ্বৰ নাথ গুৰু যোগী অস্থিনীনাথ আদিনাথপন্থ	শিলচৰ অসম	পুৰুষ	৬১	বি. এস. সি.	দূৰদৰ্শন কৰ্ম	শ্ৰীশ্ৰীবাবা যোগী পুষ্কৰনাথ যোগেশ্বৰ, শিলচৰ	১২/০৭/২০২৩	সকাল ১০:৫০
১৩	তপনকান্তি নাথ গুৰু যোগী শিবনাথ	শিলচৰ অসম	পুৰুষ	৫৯	গ্ৰাজুয়েট	শিক্ষক	নিজবাড়ি	১২/০৭/২০২৩	সকাল ১১:৪০
১৪	যোগী কৈবল্যনাথ গুৰু যোগী শিবনাথ	বৰগাঁও বৰগাঁও অসম	পুৰুষ	৬৬	অজানা	নাথসন্ন্যাসী সত্যনাথপন্থ	মহানাদ মঠ হুগলি	০৯/১২/২০১৮	বিকেল ৩: ৩০
১৫	যোগী ব্ৰহ্মনাথ গুৰু যোগী শিবনাথ	মহানাদ জটেশ্বৰনাথ মঠ	পুৰুষ	৬৭	অজানা	মোহান্ত নাথসন্ন্যাসী মহানাদ জটেশ্বৰনাথ মঠ	মহানাদমঠ হুগলি	০৯/১২/২০১৮	সকাল ১১:৩০
১৬	যোগী শিবনাথ	কেয়াৰবান্ধ মঠ কটক ওড়িশা	পুৰুষ	৭৭	এম. এ. দৰ্শনশাস্ত্ৰ	নাথসন্ন্যাসী সত্যনাথপন্থ	গোৱক্ষবান্ধুলি মঠ দমদম	০৭/১২/২০১৮	বিকেল ৫: ১০
১৭	যোগী বিজয়নাথ	দমদম গোৱক্ষবান্ধুলী মঠ	পুৰুষ	৪৮	অজানা	নাথসন্ন্যাসী কপিলানীপন্থ	গোৱক্ষবান্ধুলী মঠ, দমদম	১০/০৭/২০২২	বিকেল ৪: ২০
১৮	যোগী ড. বিলাসনাথ	নাসিক মহাৰাষ্ট্ৰ	পুৰুষ	৭৬	এম. এস. সি, পিএইচ. ডি	নাথসন্ন্যাসী আইপন্থ	গোৱক্ষবান্ধুলী মঠ, দমদম	১৬/০১/২০২২	বিকেল ৫: ২৫
১৯	যোগী শক্তিনাথ গুৰু যোগী ৰামনাথ অম্বোৰী	বড়পাথৰ অসম	পুৰুষ	১১০	অজানা	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বৰীপন্থ	কাঞ্চননগৰ বৰ্ধমান	১৪/০১/২০১৮	সকাল ১১:১৫
২০	যোগী শনিনাথ গুৰু যোগী ভৈৰনাথ	কলকাতা	পুৰুষ	৪০	অজানা	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বৰীপন্থ	মহানাদ মঠ হুগলি	২৩/১১/২০২৩	সকাল ১০:২৫
২১	যোগী আকাশনাথ গুৰু যোগী শনিনাথ	হাওড়া	পুৰুষ	৪২	বি. এস. সি	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বৰীপন্থ	গড়িয়া কলকাতা	২০/০৬/২০২২	সকাল ১১:৪০
২২	যোগী মহালক্ষ্মীনাথ গুৰু যোগী ত্যাগীনাথ অম্বোৰী	কালিম্পং	স্ত্ৰী	৪০	এম. এ	নাথসন্ন্যাসী নটেশ্বৰীপন্থ	চলভাষ মাধ্যম	২৫/০৫/২০২৩	বিকেল ০৩:৩৫
২৩	সম্ৰাট ৰায় গুৰু যোগী শনিনাথ	ৰিষড়া হুগলি	পুৰুষ	৪৪	পোস্টগ্ৰাজুয়েট	বিচাৰক ও কৌল-গবেষক	গোৱক্ষবান্ধুলীমঠ দমদম	০৬/১০/২০২৩	বিকেল ৫: ১৫

২৪	তাপসকুমার নাথ গুরু যোগী অবেদ্যনাথ	বিরাটি কলকাতা	পুরুষ	৭৭	গ্রাজুয়েট	সরকারি চাকুরিজীবী	নিজবাড়ি	০৫/০৬/২০২২	বিকেল ৩: ৫০
২৫	সুগত চক্রবর্তী গুরু যোগী শক্তিনাথ	বালুরঘাট দ: দিনাজপুর	পুরুষ	৩০	বি. টেক	ইঞ্জিনিয়ার	নরেন্দ্রপুর দ: ২৪ পরগণা	১০/১০/২০২৩	সকাল ১০:৫০
২৬	ড. জীবনকৃষ্ণ নাথ	সন্তোষপুর কলকাতা	পুরুষ	৭৫	এম. এ, পিএইচ. ডি	শিক্ষক	আসামবঙ্গ যোগি- সম্মিলনী অফিস	৩০/০৯/২০২৪	বিকেল ৩: ২০
২৭	তুষাররঞ্জন নাথ	গলফগ্রীণ, কলকাতা	পুরুষ	৬৫	এম. এস. সি	সরকারি অফিসার	নিজবাড়ি	০৭/০৮/২০২৩	সকাল ১০:২৫
২৮	বরুণকুমার নাথ	শিবপুর, হাওড়া	পুরুষ	৪৮	গ্রাজুয়েট	চাকুরিজীবী	নিজবাড়ি	১১/১০/২০২৩	দুপুর ১২:৩০
২৯	মণ্টু দেবনাথ	হাবরা উ: ২৪ পরগণা	পুরুষ	৭৪	পোস্টগ্রাজুয়েট	শিক্ষক ও পত্রিকাসম্পাদক	নিজবাড়ি	০৪/০৫/২০২৩	বিকেল ৩: ১০
৩০	যোগী সূর্যোদয়নাথ গুরু যোগী রাজচরণনাথ	কাঞ্চনপুর উত্তর ত্রিপুরা	পুরুষ	৬৩	এম. এ. ইংরেজি	নাথসম্মাসী আদিনাথপন্থ	নিজবাড়ি	১৪/০২/২০২৩	সকাল ৯: ২০
৩১	ড. কুণাল দেবনাথ	বহরমপুর মুর্শিদাবাদ	পুরুষ	৩৮	এম. এ, পিএইচ. ডি	অধ্যাপক	মহানাদ জটেশ্বরনাথ মঠ	১০/০৮/২০২২	সকাল ১০:২৫
৩২	পার্থপ্রতিম নাথ	আরামবাগ হুগলি	পুরুষ	৩৫	এম. এস. সি	শিক্ষক	নিজবাড়ি	৮/০৭/২০২৪	সন্ধ্যা ৬: ৩৫
৩৩	ভাস্কর দেবনাথ	বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ	পুরুষ	৪২	এম. এ. বি. এড	শিক্ষক	মহানাদ জটেশ্বরনাথ মঠ	১৭/০৮/২০২২	সকাল ১১:৩০
৩৪	সুবলচন্দ্রনাথ গুরু যোগী শক্তিনাথ	কাঞ্চননগর বর্ধমান	পুরুষ	৮২	গ্রাজুয়েট	সরকারি-কর্মি	নিজবাড়ি	০৫/০৬/২০২১	বিকেল ৩: ৩৫
৩৫	কৃষ্ণধন নাথ	সাক্রম, আগরতলা, ত্রিপুরা	পুরুষ	৭৭	পোস্টগ্রাজুয়েট	ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস	ত্রিপুরা ভবন কলকাতা	০৭/০৯/২০২৪	সন্ধ্যা ৭: ৪৫
৩৬	ড. দিলীপ নাথ	ধর্মনগর ত্রিপুরা	পুরুষ	৪৮	এম. এস. সি, পিএইচ. ডি	অধ্যাপক	নিজবাড়ি	২৫/১২/২০২৩	বিকেল ৩: ৩৫
৩৭	দীপেন নাথশর্মা	খোয়াই ত্রিপুরা	পুরুষ	৪৯	এম. এ.	ব্যবসায়ী	নিজবাড়ি	২৬/১২/২০২৩	সকাল ১১:৪০
৩৮	মুকুন্দ দেবনাথ	আগরতলা ত্রিপুরা	পুরুষ	৭৫	গ্রাজুয়েট	বি. এস. এন. এল অফিসার	নিজবাড়ি	২৭/১২/২০২৩	বিকেল ৩: ৩০
৩৯	ড. কে. কে. দেবনাথ	কোচবিহার	পুরুষ	৭৩	এম. এস. সি, পিএইচ. ডি	অধ্যাপক	নিজবাড়ি	২৬/১২/২০২২	সকাল ১১:৩৫

৪০	নীহাররঞ্জন নাথ	হবিগঞ্জ, সিলেট বাংলাদেশ	পুরুষ	৬৫	অজানা	সেনা অফিসার	কলকাতা	১৭/০৪/২০১৯	দুপুর ১: ১০
৪১	আজহার ফরহাদ	কুমিল্লা বাংলাদেশ	পুরুষ	৪৪	এম. ফাইন	শিল্পী ও সাধক কবি	ঢাকা বাংলাদেশ	৩০/১১/২০১৫	সকাল ১১:৩০
৪২	ড. আর. এম. দেবনাথ	ময়মনসিংহ বাংলাদেশ	পুরুষ	৭৭	এম. কম. পিএইচ. ডি	লেখক ও গবেষক	ঢাকা বাংলাদেশ	২৯/১০/২০১৫	সকাল ১০:২০
৪৩	হরেন্দ্রকুমার নাথ	চট্টগ্রাম বাংলাদেশ	পুরুষ	৭৫	অজানা	ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ রেলওয়ে	চট্টগ্রাম	২৮/১০/২০১৫	সকাল ১১: ১০
৪৪	মিঠুন দেবনাথ	শিবগঞ্জ, বগুড়া, বাংলাদেশ	পুরুষ	৩২	এম. এ.	নাথপুরোহিত	যোগীর ভবন বগুড়া	২৭/১০/২০১৫	বিকেল ৩: ১০
৪৫	ড. মো. আব্দুল হালিম প্রামাণিক	ঢাকা বাংলাদেশ	পুরুষ	৪৭	এম. এ. পিএইচ. ডি	অধ্যাপক, নাট্যনির্দেশক	কলকাতা	৭/০৫/২০২৩	বিকেল ৫: ৫০
৪৬	যোগী রুদ্রনাথ	পুষ্কর রাজস্থান	পুরুষ	৩৭	অজানা	নাথসন্ন্যাসী ধর্মনাথপন্থ	শ্রীরামপুর, হুগলি	২৫/১২/২০২০	সকাল ৯: ০৫
৪৭	কুমুদচন্দ্র দেবনাথ	নওগাঁ বাংলাদেশ	পুরুষ	৫৭	এম. এ.	শিক্ষক	কলকাতা	১৬/০৬/২০২৩	সকাল ৮: ৫৫
৪৮	সুজয় দেবনাথ	আলিপুরদুয়ার	পুরুষ	৪৪	এম. এ.	অধ্যাপক	কোচবিহার	৫/০৮/২০২৪	বিকেল ৩: ৩৫
৪৯	ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনায়া	দিনহাটা কোচবিহার	পুরুষ	৪৮	এম. এ. পিএইচ. ডি	অধ্যাপক	জটেশ্বর আলিপুরদুয়ার	১৯/১০/২০২৪	সকাল ১১: ১০
৫০	অক্ষন বর্মণ	মাথাভাঙ্গা কোচবিহার	পুরুষ	৩৩	এম. এ.	গবেষক	মাথাভাঙ্গা	১৬/০৩/২০২২	বিকেল ৫: ১০
৫১	ঈশ্বরচন্দ্র দেবনাথ	বহরমপুর মুর্শিদাবাদ	পুরুষ	৫৪	গ্রাজুয়েট	এল. আই. সি	কলকাতা	১০/০৬/২০২৩	সকাল ১১:৩৫
৫২	রণজিৎ দেবনাথ	কাশীনগর, রায়দীঘি, দ: ২৪ পরগণা	পুরুষ	৪১	এম. এস. সি	ব্যাঙ্ককর্মি	সোনারপুর দ: ২৪ পরগণা	২১/০৪/২০২১	বিকেল ৪: ২৫
৫৩	কুলবাহাদুর যোগী	দার্জিলিং	পুরুষ	৭৭	অজানা	সিভিল সার্ভিস	কলকাতা	২৩/০২/২০২৩	সকাল ১১: ১০
৫৪	যোগী ড. সুন্দরনাথ গুরু যোগী বিজয়নাথ	কলকাতা	পুরুষ	৪৭	এম. এস. সি পিএইচ. ডি	নাথসন্ন্যাসী কপিলানীপন্থ	কলকাতা	০৬/০৬/২০২২	বিকেল ৪: ২০
৫৫	কার্তিক মাইতি	বেলদা পশ্চিম মেদিনীপুর	পুরুষ	৪১	বি. এ. অনার্স	লোকগান সংগ্রাহক	কলকাতা	০৬/০৬/২০১৮	দুপুর ১: ২৫
৫৬	লক্ষ্মীন্দর পালুই	গোপীবল্লভপুর পশ্চিম মেদিনীপুর	পুরুষ	৩৯	এম. এ.	অধ্যাপক	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	১৮/০৯/২০২২	সকাল ১১:৩০

৫৭	দীপ্ত দেবনাথ	বগুড়া বাংলাদেশ	পুরুষ	২২	গ্রাজুয়েট	নাথপুরোহিত	যোগীর ভবন বগুড়া	২৭/১০/২০১৫	বিকেল ৩: ০৫
৫৮	মনোরঞ্জন আচার্য গুরু যোগী শনিনাথ	বক্রেশ্বর বীরভূম	পুরুষ	৩৮	গ্রাজুয়েট	পুরোহিত	বক্রেশ্বর সতীপীঠ মন্দির	২২/০৩/২০২৪	সকাল ১১:৩৫
৫৯	স্বরূপা নাথ	দুর্গাপুর পূর্ববর্ধমান	স্ত্রী	৬৮	এম. এ.	লেখক ও শিক্ষক	কলকাতা	১২/০৮/২০২৩	বিকেল ৩: ৩০
৬০	প্রবীর দেবনাথ	কালিয়াগঞ্জ উ: দিনাজপুর	পুরুষ	৪৪	এম. এ.	শিক্ষক ও নাট্যকর্মী	কলকাতা	৮/০৭/২০২১	বিকেল ৪: ৩৫
৬১	সৌরভকুমার নাথ	বিরিটি কলকাতা	পুরুষ	৩৮	গ্রাজুয়েট	ব্যবসা	নিজবাড়ি	৮/৭/২০২১	সকাল ১১: ১৫
৬২	বলাই চক্রবর্তী গুরু যোগী রামনাথ অঘোরী	নরেন্দ্রপুর, দঃ ২৪পরগণা	পুরুষ	৭৮	অজানা	পুরোহিত ও সাধক	নিজবাড়ি	১০/১০/২০২৩	সকাল ১০:৩৫

ক। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ধারণকৃত চিত্র



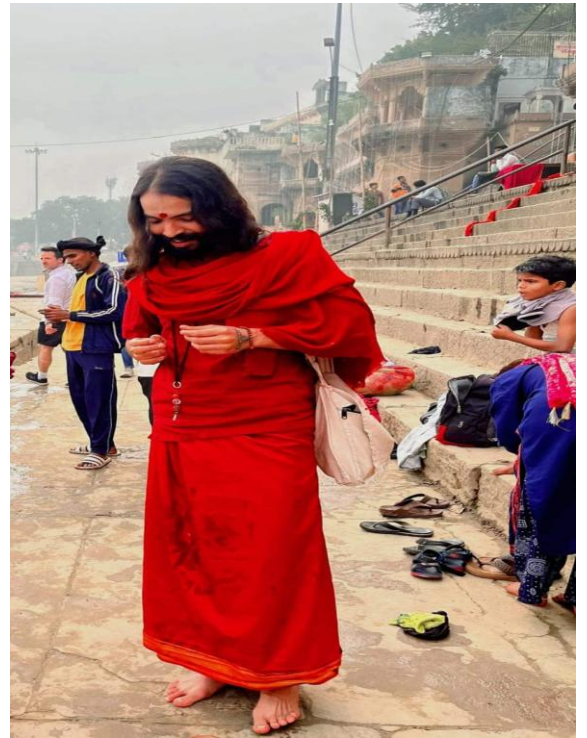
চিত্র:- ১ কৌলনাথ যোগী সৎপুরানন্দনাথ



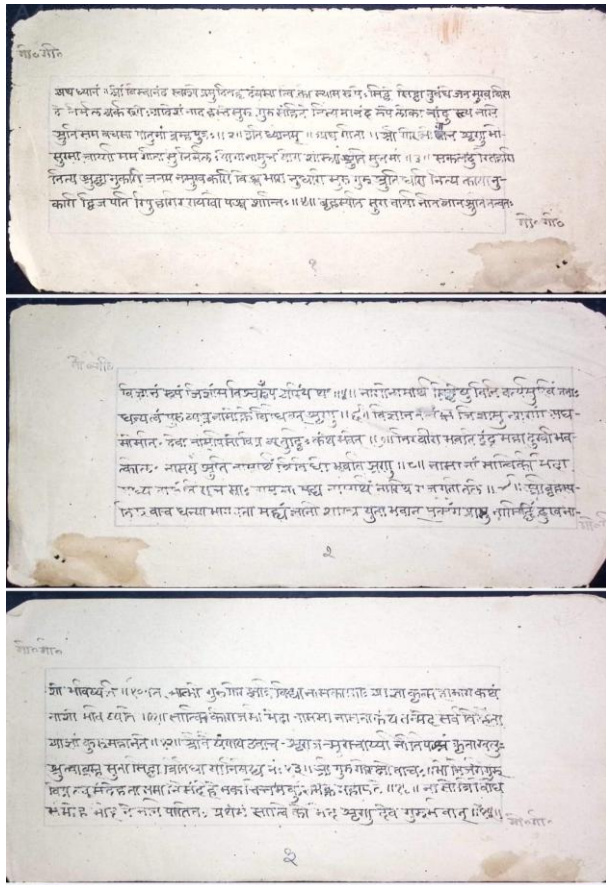
চিত্র:- ২ যোগী সৎপুরানন্দনাথ ও তাঁর শক্তি



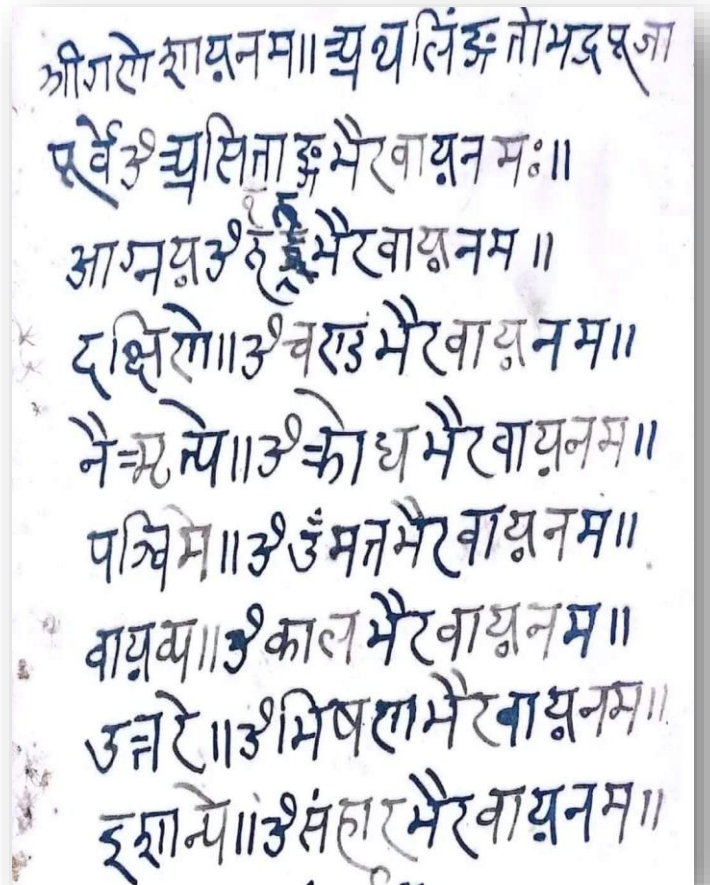
চিত্র:- ৩ ধুনিসাধনারত নাথযোগী



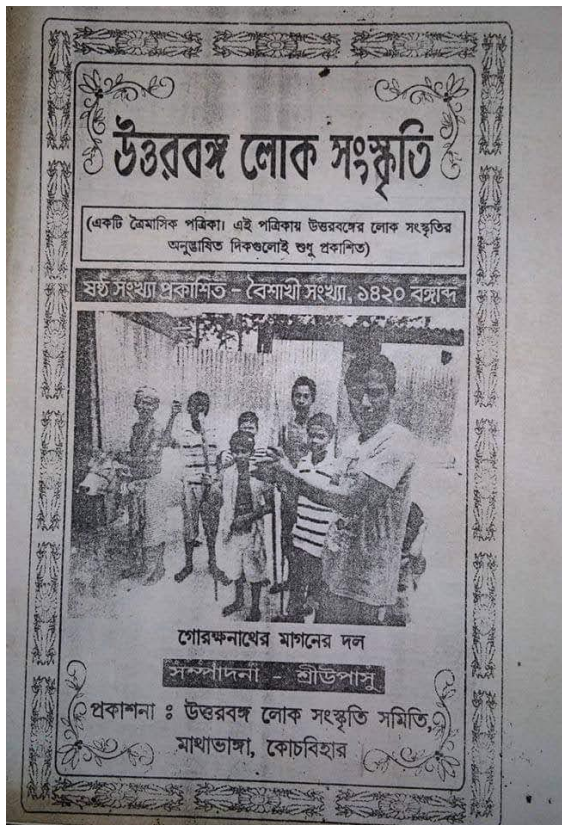
চিত্র:- ৪ পাশুপত কৌলনাথ যোগী অবন্তিকানাথ



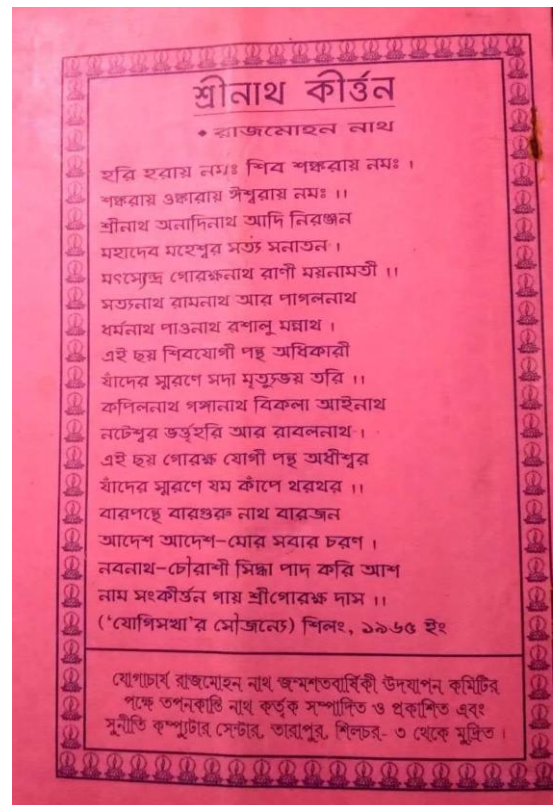
চিত্র:- ৫ গোরক্ষগীতা



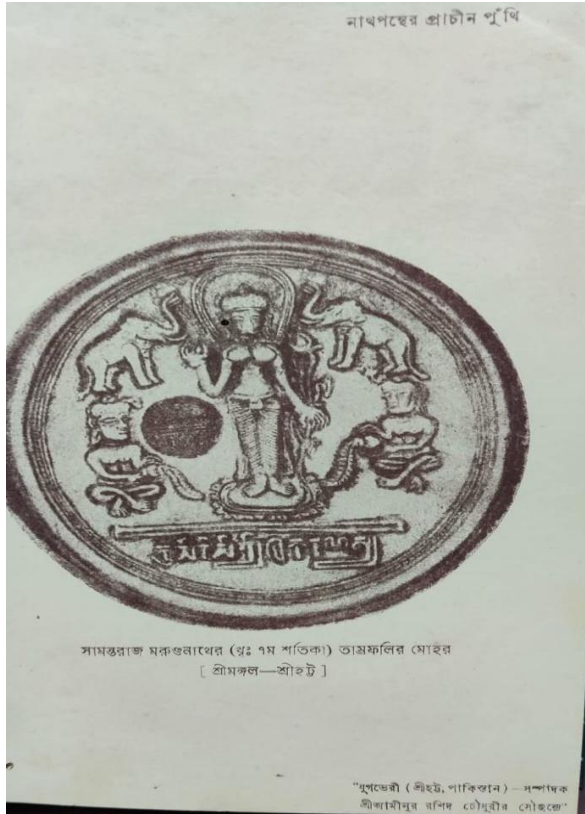
চিত্র:- ৬ ভৈরবনাথ স্তোত্র



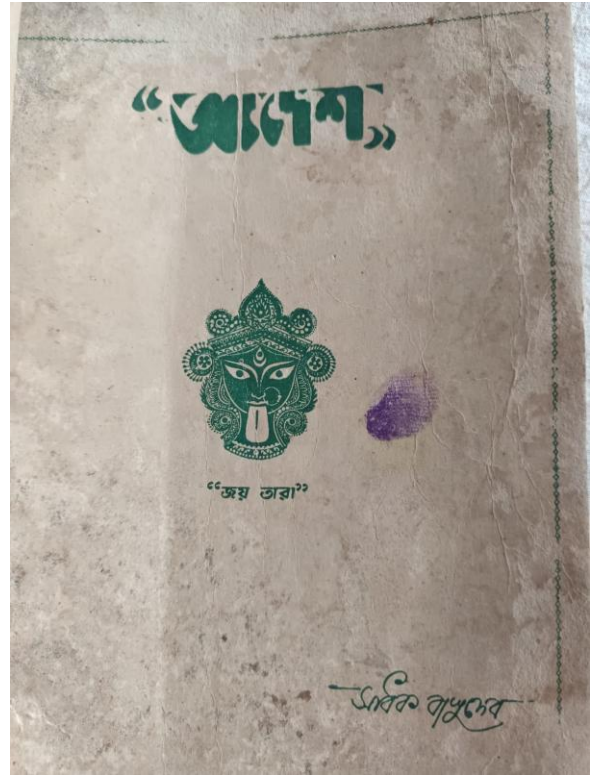
চিত্র:- ৭ গোরক্ষনাথের মাগনের
গানের প্রচ্ছদ চিত্র



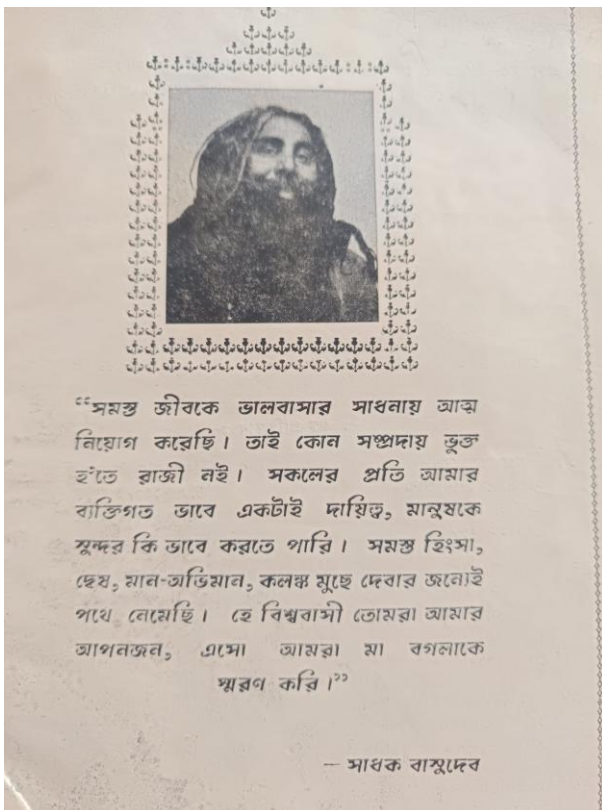
চিত্র:- ৮ শ্রীনাথ কীর্তন



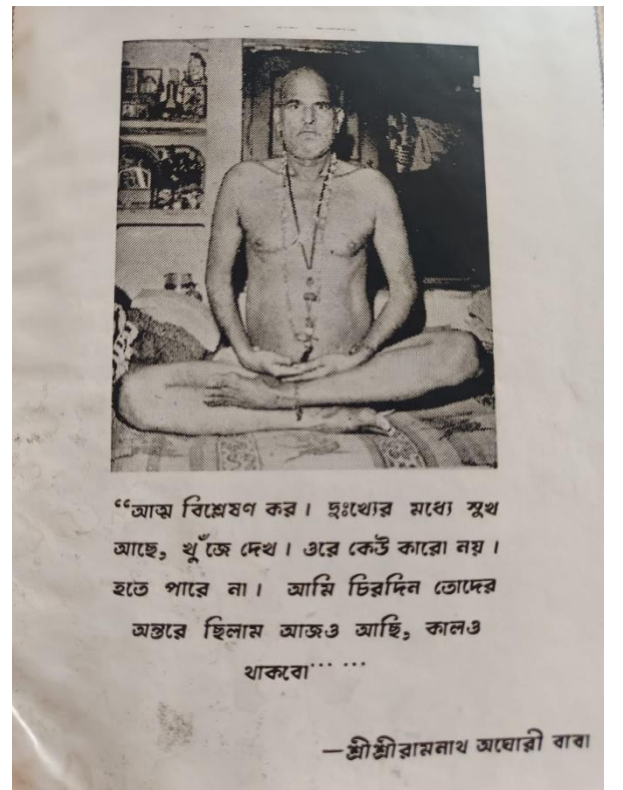
চিত্র:- ৯ সামন্তরাজ্য মরুণনাথের তাম্রফলক



চিত্র:- ১০ আদেশ পত্রিকার প্রচ্ছদ



চিত্র:- ১১ আদেশ পত্রিকায় যোগী সাধক বাসুদেব



চিত্র:- ১২ আদেশ পত্রিকায় যোগী রামনাথ অঘোরী



চিত্র:- ১৩ আইপশ্বী যোগিনী হুমাইনাথ



চিত্র:- ১৪ ভর্তৃহরি বিরাগ পশুর যোগী আনন্দনাথ



চিত্র:- ১৫ নটেশ্বরীপশুর যোগী শনিনাথের সঙ্গে গবেষক



চিত্র:- ১৬ ভর্তৃহরি গুফা, উজ্জয়িনী



চিত্র:- ১৭ আদিনাথপন্থের যোগী রাজচরণনাথ



চিত্র:- ১৮ আদিনাথপন্থের যোগী সূর্যোদয়নাথের সঙ্গে
গবেষক



চিত্র:- ১৯ নবনাথ ঝুণ্ডিয়াত্রা



চিত্র:- ২০ চৌরঙ্গীনাথ সমাধি মন্দিরে গবেষক



চিত্র:- ২১ বগুড়া যোগীর ভবন



চিত্র:- ২২ নাথ সম্প্রদায়ের সমাধি



চিত্র:- ২৩ নাথ সম্প্রদায়ের সমাধি মন্দির



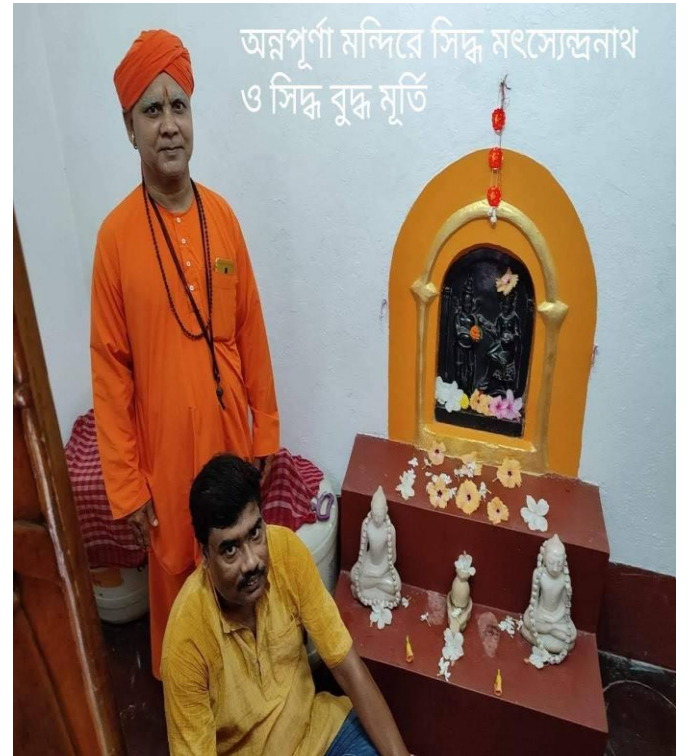
চিত্র এ:- ২৮ গোরক্ষবাণ্ডলী মন্দির, দমদম



চিত্র:- ২৯ কক্সবাজার আদিনাথ মন্দির



চিত্র:- ৩০ মহানাদ বশিষ্ঠগঙ্গা সরোবর তীরে
গবেষক



চিত্র:- ৩১ মহানাদ মঠে অনপূর্ণা মন্দির



চিত্র:- ৩২ ধ্যানরত যোগী শনিনাথ



চিত্র:- ৩৩ নাথ সম্প্রদায়ের যোগীর গানের চিত্র



চিত্র:- ৩৪ গৃহস্থনাথ দীক্ষা অনুষ্ঠান

খ। ক্ষেত্রসমীক্ষার ছবির লিংক

১. পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষায় ধারণকৃত চিত্র

<https://drive.google.com/drive/folders/1IMflKW34If4Sy8UH8S4MnY3qAIJ0Hfmz?usp=sharing>

২. ত্রিপুরার ক্ষেত্রসমীক্ষার চিত্র

https://drive.google.com/drive/folders/1jczF_iGlXgQ1lyAh8OQEYj4pvv9dLmcD?usp=sharing

৩. বাংলাদেশের ক্ষেত্রসমীক্ষার চিত্র

https://drive.google.com/drive/folders/1DnWZ07MWWESEK9yoG_Eihn1STK9Dyo1o?usp=sharing

৪. নেপালের নাথ সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির

https://drive.google.com/drive/folders/1W_DuutSmv2hFCOVMhN_aAUg8frlwHKTK?usp=sharing

৫. রাঁচিতে নাথ জমাতের চিত্র

<https://drive.google.com/drive/folders/1dIxmdGNE0oNLkrt4zhrU9ueN9oHthLzg?usp=sharing>

পরিশিষ্ট - ৩

ভিডিও লিংক

ক. ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিডিও লিংক

১. কৌল নাথসন্ন্যাসী সৎপুরানন্দনাথ ও কপিলানী পন্থের নাথযোগী বিজয়নাথের ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার

https://drive.google.com/file/d/1A0swss0_5JfkJ2YaoVhbnUEoAFB6AKa9/view?usp=sharing,

<https://drive.google.com/file/d/1C-7a-gb0xnTgdVVPJLSOe2szltjkbGEM/view?usp=sharing>

২. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত যোগীর গান ও নাথসংস্কৃতি

<https://drive.google.com/file/d/1CIxa4Qvi75Unou38ViyuJTV6vPDqZFXy/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1MaCSqmMyLO7p9xSepiBZEX90qFAy3C4L/view?usp=sharing>,

https://drive.google.com/file/d/1VQub7IazzpKUSanEOD1YV_0ZhxBsLPVD/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1eeI3tNwgsyaprbFqsipuTL_ZBFN9b6kn/view?usp=sharing,

<https://drive.google.com/file/d/1mdTvtIb3i49BamHNgl1mbdCnuceizNTp/view?usp=sharing>

৩. ক্ষেত্রসমীক্ষায় ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর-এ যোগীর গানের ভিডিও

<https://drive.google.com/file/d/15gnOSnz5l7hnSr3AisiXn6fIP9EvPIws/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/16vkgKgvTciwFmT542x1A3FevGClrQRkR/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1ANsBd9MHPDR0LhvTlSWPWWz2MrczSmNA/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1CfC4asbJY11BNvrS29TXEvtxeNk6ybHe/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1DKfTMjkRyUm8zTn6V4FzENaTScIf0eX4/view?usp=sharing>,

https://drive.google.com/file/d/1EEXgiXLSEJT_7mIutbswYdhNsmhDJYS2/view?usp=sharing,

<https://drive.google.com/file/d/1QTubRCJuotHYF6sJtwUM0UJAcOYZ1zi/view?usp=sharing>,

https://drive.google.com/file/d/1Qh8_eO2tO8JoYY9ZIZrGenZyRusc_FEO/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1TT4R9vMt_xDvzSW9daWnH378oYZFc70E/view?usp=sharing,

<https://drive.google.com/file/d/1VlzUAvFvgxgAce9QxipepsNoypYrzoBv/view?usp=sharing>,

<https://drive.google.com/file/d/1taDnQjo3Glym2d2U4gSc0e7BRSGoelXV/view?usp=sharing>,

https://drive.google.com/file/d/1uy33UsIKUPnqBg9Um0nDt9zZPW_mJ431/view?usp=sharing

৪. নবনাথ মন্দির, নাসিক, মহারাষ্ট্র

<https://drive.google.com/file/d/1NMqwhMYIwNJxx7Uc8qAv2ys4EB2ynqPi/view?usp=sharing>

খ. ইউটিউব ভিডিও লিংক

খ. ১ নাথকীর্তন: যোগীরগান - বাংলার লুপ্তপ্রায় নাট্যধারা, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৩/০২/২৫, ৫:৪০ PM

➤ <https://youtu.be/zu4lFIH0Kh0?si=2E0SDsgIqX0CcFpa>

গ. ফেসবুক ভিডিও লিংক

গ. ১ নাথজমাত, মস্তনাথ মঠ, অস্থল বোহর, রোহতক, হরিয়ানা, ২২/০১/২৪, ২:৪০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/15ccFo4Szf/>

গ. ২ রমতা নাথযোগীর যোগীর গান, ২৩/০১/২৪, ৩:৪০ PM

<https://www.facebook.com/share/v/15xs1Upf5Y/>

গ. ৩ নাথজমাত, প্রয়াগরাগরাজ কুম্ভমেলা, গুরু গোরক্ষনাথ আখড়া, ২৩/০১/২৫, ৩:৪০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/1A2DATzFt6/>

গ. ৪ প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলায় নাথধ্বজ উত্তোলন অনুষ্ঠান ২৩/০১/২৫, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/19tJXndAHu/>

গ. ৫ নাথযোগী সম্মাসীগণের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড, ২৩/০১/২৪, ৫:৪০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/1EJAti6ZW2/>

গ. ৬ নাথযোগী সম্প্রদায়ের যোগীর গান, ২৩/০১/২৪, ৮:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/18hAYc134N/>

গ. ৭ নাথধুনি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান, ১২/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/p/1FGRnTEYwr/>

গ. ৮ নাথঅঘোরী যোগিনী চঞ্চলনাথের যোগীরগান, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/1AwR3Y6cie/>

গ. ৯ নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/17znYzikWY/>

গ. ১০ নেপালে সিদ্ধরতননাথ মঠের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/bYxjzmoPuKRziTQ2/>

গ. ১১ আদিনাথ লোকেশ্বর নাথমঠ, নেপাল, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/f7BThKaqhAnMXy3N/>

গ. ১২ গোরক্ষনাথী নিগুণী সঙ্গীত, ৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/zJb2mC67Rcve7yrj/>

গ. ১৩ গোরক্ষনাথ মঠ, জুনাগড়, গুজরাট, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/r/DSrXAKoFa9ef6ZmA/?mibextid=xfxF2i>

গ. ১৪ মেদিনীপুর, যোগীর গান, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/v/PCD7qJm7J2LXVxFE/?mibextid=oFDknk>

গ. ১৫ যোগীযাত্রা, চম্পাবতী পালা, কেশিয়াড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩/০১/২৪, ৪:৩০ PM

<https://www.facebook.com/share/v/gLE12YzuFNGcrNZi/?mibextid=oFDknk>